অন্তর্দাহ

মঞ্জু সরকার

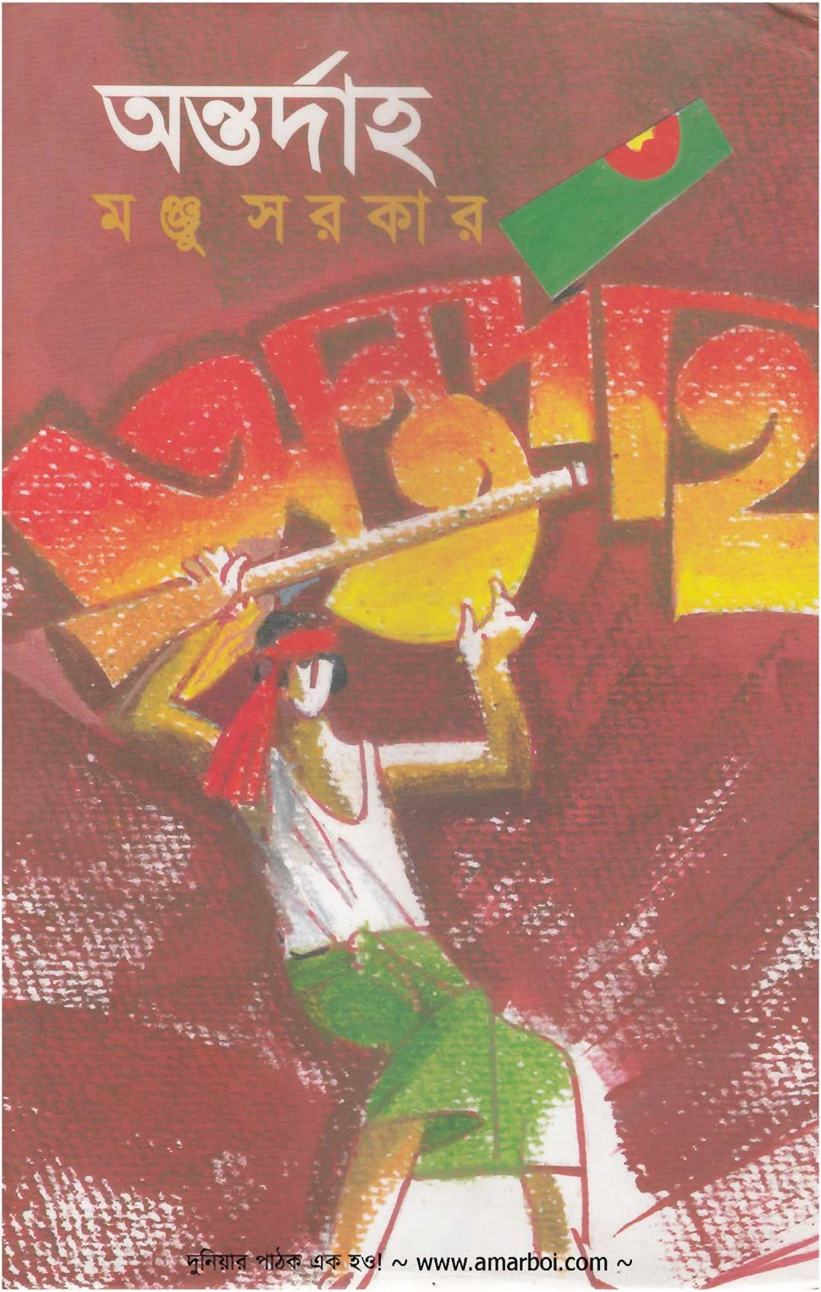

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১-এ অবরুদ্ধ স্বদেশে
মৃত্যুর বিভীষিকা ও
অপরাজেয় দেশপ্রেম
মুক্তিকামী বাঙালির জীবন
যেভাবে আলোড়িত করেছে,
তার বিশ্বস্ত রূপায়ণ ঘটেছে
এ উপন্যাসের কাহিনিতে।
ঐতিহাসিক কালপর্বের
প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসের
বিশাল ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে
উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা দিক,
জনজীবনের চিত্র এবং প্রাপ্ত
স্বাধীনতার রূঢ় বাস্তবতাও।
আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি ও
সমাজ-সম্পর্কের টানাপড়েনে
সৃষ্টি হয়েছে মর্মস্পর্শী কিছু
ব্যক্তিচরিত্রের। মুক্তিযুদ্ধের
বিয়াল্লিশ বছর পরে প্রকাশিত
মঞ্জু সরকারের ব্যতিক্রমধর্মী
ও বহুমাত্রিক এ বই শুধু
মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক
গল্প-উপন্যাসের সারিতে নয়,
বাংলাদেশের
উপন্যাস-সাহিত্যেও এক
উজ্জ্বল সংযোজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

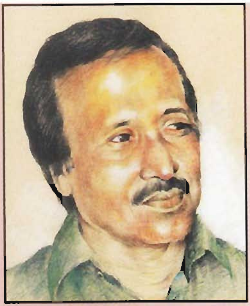

মঞ্জু সরকারের জন্ম ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩, রংপুরে। ১৯৮২-তে প্রথম গল্পগ্রন্থ *অবিনাশী আয়োজন* প্রকাশের পর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, লাভ করেন ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত সমাজসচেতন এই লেখকের নিরন্তর লেখালেখির ফসল অর্ধশতাধিক গ্রন্থ। কথাসাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন বাংলা একাডেমী, ফিলিপস ও আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। ছোটদের বইয়ের জন্য পেয়েছেন দুবার অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার। ২০০৬ সালে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে' নির্বাচিত লেখক হিসেবে অংশ নেন। সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দশ বছর দুটি জাতীয় দৈনিকে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে সার্বক্ষণিক লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত, বেশিরভাগ সময় কাটান রংপুরের নিভৃত গ্রামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ISBN-978-984-90470-2-5

অন্তর্দাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঞ্জু সরকার

বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ॥ প্রকাশক : আবুল খায়ের, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স লিমিটেড, বেঙ্গল সেন্টার, প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, খিলক্ষেত, ঢাকা ১২২৯, বাংলাদেশ। ফোন : + [৮৮০ ২] ৮৯০১১৮০, ৮৯০১১৮৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ॥ প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণ : এম কে প্রিন্টার্স অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৮৯/১ তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮
মূল্য : ৬৫০ টাকা

ISBN 978-984-90470-2-6

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী
অগণিত শহীদের স্মৃতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিবকে কাছে থেকে দেখার জন্য তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির সামনে এসে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে মানিক। চারদিক থেকে মিছিলের স্রোত বাড়িটি ঘিরে পাক খায়। নেতার বাড়ির বাতাস পেয়েও যেন মিছিলের লড়াকু জোশ বাড়ে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনাকে ঠিকানা বলে, নদীর ঢেউয়ের মতোই উত্তাল মানুষ, জয় বাংলা স্লোগানের তীব্রতায় ভেসে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মেরে বাংলাদেশ এখনই স্বাধীন করার দাবিতে সোচ্চার সবাই, নেতাকে সাহস জোগায় — মুজিব তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে।

মানিক অন্যদের মতো স্লোগানের সঙ্গে চেঁচিয়ে-লাফিয়ে উত্তাল জনতার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভেতরে অদৃশ্য নেতার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার আবেগ-উত্তেজনা অনুভবে জাগে না তার। বরং স্রোতের আবর্তে ভাসমান খড়কুটোর মতো নিজেকে অসহায় এবং তুচ্ছ মনে হতে থাকে। ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখ খোঁজে সে। একটি বাদামঅলা ছেলে জয় বাংলা বাদাম বলে ভিড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাদাম বেচছে। মানিক কারো চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও পারে না। ভিড়ের মধ্যে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে দেশের ভবিষ্যৎ বুঝতে নিজেকে আজ দীর্ঘ মিছিলের স্রোতে ভাসতে দিয়েছে সে। মুজিবকে কাছে থেকে দেখার, ঘরোয়া পরিবেশে চেনার ও কথা শোনার আগ্রহ এবং কৌতূহল অবশ্য মনে ছিল। গ্রামে ফিরলেই লোকজন ঢাকার খবর জানতে চাইবে। ঢাকা মানে এখন আন্দোলনের শহর, আর আন্দোলিত জনতার যেন একটাই নাম, শেখ মুজিব। ভোটের সময় দেখেছে মানিক, দেশের প্রসঙ্গ উঠলে মুজিবকে নিয়ে ভক্তির আবেগে ও সাহসে গদগদ হয় গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। মুজিবকে ঘিরে আগ্রহ ও কৌতূহলেরও শেষ

নেই তাদের। নিজেদের বাড়ির চাকর বাংটুও একদিন হুঁকো টানার আসরে মানিকের কাছে জানতে চেয়েছিল, ‘ও ভাইজান, শেখ মুজিবর যে পাইপখান টানে, তাতে কি হামার দেশি তামাকু, নাকি বিদেশি তামাক খায়?’

গ্রামে নিজ বাড়িতে নয় শুধু, রতনপুরজুড়ে লোকজনের মুজিবভক্তি বেড়েছে মানিকের বাবার কারণেও। সজব ভূঁইয়া শুধু ভক্ত নয়, দলের থানা কমিটির সম্পাদক, জেলা অফিস ও নেতাদের সঙ্গেও নিয়মিত ওঠাবসা তার। ভোটের সময় শেখ মুজিব রংপুরে জনসভা ও কর্মিসভা করতে গেলে, সভাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে মনিকের বাবার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, বাবা রতনপুরের লোকজনকে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান নানাভাবেই দিয়েছে। মানিকদের বাড়ির কাছারিঘরে শেখ মুজিবের ছবিযুক্ত কিছু দলীয় পোস্টার তো সারাক্ষণ শোভা পায়। তরপরও দেশের হালহকিকত জানাতে নেতা ও দলের খবর গ্রামবাসীর সামনে তুলে ধরাটা তার দৈনন্দিন কাজ। এমন মুজিবভক্ত পিতার সন্তান, ইউনিয়নের একমাত্র যুবক যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, দু'বছর ধরে আছে ঢাকায়, অথচ মানিক এখনো শেখ মুজিবকে দেখেনি! কথাটা গ্রামবাসীর কাছে স্বীকার করতেও সংকোচ হয়। আর বললেও কি বিশ্বাস করবে কেউ?

মুজিবকে একেবারে চাক্ষুষ করেনি, তা ঠিক নয়। দু'দিন আগেও পল্টনে ছাত্রদের জনসভায় মুজিব বক্তৃতা করেছেন। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমিছিলের সঙ্গে মানিকও গিয়েছিল। মাইকে নেতার গমগমে ভাষণ কানে এলেও, দূর থেকে চেহারা চোখের সামনে পষ্ট হয়নি। ঊনসত্তরে জেল থেকে বেরিয়ে পল্টনে যে সভা করেন, তখন ঢাকাতেই ছিল বলে সেই জনসভা দেখেছে। কিন্তু এসব দেখা তো দূর থেকে অনেকটা নক্ষত্র দেখার মতো। সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে মুখমণ্ডলে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে না রাখলে মানুষকে দেখার আনন্দ পূর্ণ হয়? মাইকে নেতার ভাষণ শুনেছে, কিন্তু মাইক ছাড়া ঘরোয়া পরিবেশে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা-হাসিঠাট্টা শোনার অভিজ্ঞতা না হলে স্মৃতিতে কেউ চেনা মানুষ হয়ে জায়গা পায়? রুমমেট আরিফের সঙ্গে মুজিবের কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তার টানেই মানিক আজো মিছিলে নেমেছে নেতাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাবে বলে।

কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল আরিফ? ছাত্র ইউনিয়নের পাতিনেতা, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সব বড় নেতাকেই চেনে। কেন্দ্রীয় নেতারাও অনেকেই চেনে তাকে। শেখ মুজিবকে কাছে থেকে অনেকবার দেখেনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু, মুজিবও নাকি ব্যক্তিগতভাবে আরিফকেও চেনেন, দেখা হলে নাম ধরেই ডাকেন। নিজে ছাত্রলীগ না করলেও আরিফের চাচা খুলনা অঞ্চলে মুজিবের দলের প্রধান নেতা। ভোটে জিতে এমএনএ হয়েছে। এমএনএ চাচার সঙ্গে প্রথম মুজিবের বাড়িতে গিয়েছিল আরিফ। চাচা আরিফকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নেতার সঙ্গে। তারপর থেকে ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা হলে মুজিব নাকি আরিফের কথাও জিজ্ঞেস করেন। সেই আরিফ আজ সকালে হলে প্রস্তাব দিয়েছিল, চল মানিক আমাদের মিছিলে, ৩২ নম্বরে গিয়ে আজ তোকে নিয়ে সরাসরি মুজিবের ড্রয়িংরুমে ঢুকব, আমরা স্বাধীনতার ঘোষণাও আদায় করে ছাড়ব আজ।

রাজনীতির সঙ্গে মানিকের যেটুকু সম্পর্ক কিংবা দূরত্ব, তার পেছনে রাজনীতিগ্রস্ত রুমমেট আরিফের অবদান অনেকখানি। আরিফ বিশ্বাস করে, রাশিয়ার মতো সারা দুনিয়ায় একদিন দেশে দেশে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। তার কমিউনিজমের স্বপ্ন-তত্ত্ব স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ভেতর দিয়েও কিভাবে কার্যকর হয়ে উঠবে, আরিফের মেলা ঘরোয়া বক্তৃতা শুনে, কখনো-বা তর্কবিতর্ক করেও বুঝতে পারে না মানিক। বোঝার জন্যই যেন আজো মিছিলে যোগ দিয়েছিল সে। ক্যাম্পাস থেকে শাহবাগ ছাড়ার পর মিছিলটা আর শুধু ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল থাকেনি, ক্রমে জনস্রোতে পরিণত হয়েছে। ফলে মিছিলে যোগ দেওয়ার পর মানিককে আর হাঁটতেও হয়নি। মিছিলের স্রোতই তাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছে। আরিফ মিছিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকায় সামনে ছিল। ছাত্রজনতার দীর্ঘ মিছিল ৩২ নম্বরে পৌঁছার আগেই আরিফ চোখের আড়াল হয়ে গেছে। আরিফকে কোথাও খুঁজে পায় না মানিক। এখন এই মিছিলের শিকল ভেঙে ভিড় ডিঙিয়ে কে তাকে বাড়িটার ভেতরে এবং মুজিবের কাছে নিয়ে যাবে?

রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে মানিক চুপচাপ, নেতার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভিড় ঠেকাতে এবং ভিড়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গেটের কাছে পুলিশের ভূমিকায় কিছু স্বেচ্ছাসেবক যুবক। দু'জন মুখচেনা নেতাকে মানিক ভেতরে ঢুকতে দেখে। মানিকের কথা ভুলে গিয়ে আরিফ অন্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে কি না কে জানে। বড় নেতাদের কাছাকাছি থাকার জন্য মানিকের মতো তুচ্ছ ও রাজনৈতিকভাবে একদম মূল্যহীন যুবককে ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভুলে না গেলেই বা কী। এখন যদি আরিফ তাকে খুঁজে বের করে, এই ভিড় ঠেলে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে হয়তো, কিন্তু নেতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে নিয়ে গিয়ে কী পরিচয় দেবে সে মানিকের? দেশের এই সংকটমুহূর্তে নেতার কাছে তো বটে, নিজের কাছেও ব্যক্তিগত সবকিছু তুচ্ছ মনে হয় মানিকের।

আরিফ বাড়িতে ঢুকে সরাসরি মুজিবের ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাবে শুনেই বুক কেঁপে উঠেছিল মানিকের। মানিক যে ছাত্রলীগ বা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ কর্মীও নয়। মুজিবভক্ত পিতার দলীয় পরিচয় দিতে পারে। মুজিব যদি তাঁর দলের এক গ্রামীণ কর্মীকেও মনে রেখে থাকেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে মানিকের এই সাক্ষাৎকারের কথা পিতা জানতে পারে, তবে তুচ্ছ এই ঘটনা গ্রামে বড় গুরুত্ব পাবে। নেতার সঙ্গে ছেলের গর্বেও স্ফীত হবে বাবার বুক। কিন্তু বাপের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে হয় না মানিকের। বংশগত ভুঁইয়া টাইটেলটাও রাখেনি নামের শেষে। এর মূলে হয়তো কাজ করেছে রাজনৈতিকভাবে এলাকায় বাবার প্রধান শত্রু, মুসলিম লীগের রাজনীতির ঘোর সমর্থক পাকিস্তানপন্থী নানার প্রভাব। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গ্রামে যেমন প্রভাবশালী নানা, ঢাকায় তেমনি চাকরিজীবী মামা ও তার অবাঙালি উর্দুভাষী শ্বশুরকুলের সঙ্গে সম্পর্ক লুকাবার চেষ্টা করে না মানিক। রুমমেট আরিফও জানে মানিকের নানা ও মামাদের খবর। মানিকের নামাজ পড়া দেখে ফিউডাল ফ্যামিলির ছেলে হিসেবে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে অনেক। কাজেই শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে আরিফ যদি তার নানার প্রসঙ্গ তোলে, মানিকও কি নেতার কাছে সন্দেহজনক শত্রুপক্ষ হয়ে যাবে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর, প্রথম নাতির জন্ম হলে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শন হিসেবে নানা তার নাম রেখেছিল মোহাম্মদ আলী। জিন্নাহর বদলে মায়ের আদরের ডাকটা শেষে যোগ করেছে মানিক। শুধু নামকরণের মধ্যেই নয়, পাকিস্তানের উপযুক্ত মুসলমান নাগরিক হিসেবে মানিককে মানুষ করার চেষ্টায় এখনো কমতি নেই নানার।

এখন যদি সেই স্বপ্ন-সাধের পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার এই অগ্নিগর্ভ সময়ে, শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে মানিককে দাঁড়ানো দেখতে পেত নানা! এমন ঘটবার আশঙ্কা থেকেই বুড়ো চিঠি পাঠিয়ে শরীর খারাপের কথা বলে মানিককে জরুরি তলব করেছে কি? চিঠিতে নানা মৃত্যুর আগে নাতিবউ দেখে যাওয়ার ইচ্ছেটিও পুনর্ব্যক্ত করেছে এবারে। কিন্তু মানিক না পারছে অসুস্থ নানা ও হবু স্ত্রীর সন্ধানে গাঁয়ে ফিরতে, না পারছে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আরিফদের মতো আত্মোৎসর্গ করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে মার্চের ১ তারিখ থেকেই ঢাকার পরিবেশ এমন অগ্নিগর্ভ ও উত্তাল হয়ে উঠবে, মানিক ভাবতে পারেনি। কেউ এমনটি আশাও করেনি বোধহয়। ভোটে জিতে যেহেতু মুজিব ও তাঁর দল জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, গণতন্ত্রে আস্থাবান বিশ্ববাসী মুজিবকে পাকিস্তানের শাসক হিসেবে দেখার জন্য প্রস্তুত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী আখ্যা দিয়েছে। এ কারণে ১ মার্চ সংসদ অধিবেশনের তারিখ স্থগিত ঘোষণা করে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদ হিসেবে দেখছে সবাই। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠছে গোটা দেশে। সেই আগুন নেভার কোনো লক্ষণ নেই। ছাত্ররা স্বাধীন বাংলার পতাকা পর্যন্ত উড়িয়ে দিয়েছে। ৩ তারিখে ছাত্ররা মুজিবকে নিয়ে পল্টনে জনসভাও করেছে। তারপর থেকে ঢাকা হয়ে উঠছে টানা হরতাল-মিছিলের শহর। মিছিলের বিক্ষুব্ধ মানুষের কণ্ঠে রণহুংকার, হাতে লাঠি। সবার দাবি এখন একটাই — স্বাধীনতা।

পাঁচদিন ধরে উত্তাল জনসমুদ্রে ভাসার পরও, মিছিলের যুদ্ধংদেহি চেহারা দেখার পরও মানিক পায়ের নিচে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি খুঁজে পায় না, আবার পুরনো পাকিস্তানকেও সামনে দেখতে পায় না। আতঙ্ক-টেনশন কাটে না তার। টেনশনমুক্ত হওয়ার জন্যও হয়তো লোকজন নেতার কাছে ছুটে এসেছে। দেশের মানুষ যখন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে দিগ্বিদিক ছটফট করছে, তখন অন্তরালে বসে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নেতারা কে জানে।

AMARBOI.COM

মিছিলের স্লোগান ছাড়াও, ভিড়ের নানা কণ্ঠের বিক্ষিপ্ত মন্তব্য কানে আসছিল মানিকের : একটু পরে বাড়ি থেকে মুজিব ভাষণ দেবেন... ঐ যে বারান্দায় দেখেন মাইক লাগাচ্ছে... মুজিব ভেতরে মিটিং করছেন এখন... তাজউদ্দীন আর তোফায়েলকে দেখলাম ভেতরে যেতে.... সব ছাত্রনেতাও আছে... আরে ভাই, এত মানুষ কি আর এমনি... এত মানুষ কী, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন মুজিবের নির্দেশে রাস্তায় নেমেছে ... স্বাধীনতা ছাড়া আমরা ঘরে ফিরব না... বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাঙলাদেশ স্বাধীন করো...

নানারকম বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও উত্তপ্ত স্লোগান-উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে সাড়া জাগে, মুজিব নিজ বাড়ির খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। পাশে তাজউদ্দীনসহ আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা। মুজিবকে দেখতে পেয়ে গগনবিদারী স্লোগানে ফেটে পড়ে জনতা। জনতার সঙ্গে কথা বলার জন্য নেতার বাড়িতে হ্যান্ড মাইক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেডি করাই ছিল। সেই মাইকে মুজিবের কণ্ঠ গমগম করে বাজে — ভায়েরা আমার, তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালায়ে যাও। বিজয় আমাদের হবেই। ৭ তারিখে রেসকোর্সে আমি আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি দেব। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ আমাদের দখলে থাকবে। জয় বাংলা।

জয় বাংলা ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে ৩২ নম্বর। জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে নেতারা আবার ভেতরে অন্তর্হিত হলে, মানিকও ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হওয়ার মতো জায়গা খোঁজে। ভেতরে ব্যক্তিগত নানা ভয়-ভাবনা ছাড়াও তলপেটে পেশাবের চাপ বোধ করছে। এত লোকজন ডিঙিয়ে লেকের ধারে গিয়ে কাজটি করতে দ্বিধা। আবার মিছিল করে হলে পৌঁছতেও অনেক সময় লাগবে। কলাবাগানে মামার বাসার কথা মনে পড়ে এবং সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। মিছিলের স্রোতে ভেসেই আবার মামার বাসার দিকে হাঁটতে থাকে। নানার ডাক এবং বাড়িতে ফেরা না-ফেরার সিদ্ধান্তটি পাকা করতেও মামার বাসায় যাওয়া দরকার।

AMARBOI.COM

দুই

নানার চিঠি পাওয়ার পর মার্চের ১ তারিখ বিকেলেও মামার বাসায় গিয়েছিল মানিক। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রেডিয়ো–ভাষণ মামার বাসাতেই শুনেছে। ভাষণ শুরুর আগে বাসার পরিবেশটা ছিল একান্ত পারিবারিক, অন্তরঙ্গ হাসিখুশির। হলে খাওয়ার কষ্ট ভেবে বাসায় গেলে মামি ভাগ্নেকে বিশেষ খাতিরযত্ন করে। সেদিনও মাংস পরোটা করেছিল। নানার চিঠির সূত্র ধরে কথা উঠেছিল মানিকের বিয়ে নিয়ে।

মামি ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ভালোই হবে, আব্বাজান তোমার পাত্রী দেখুক। পছন্দ হইলে শুধু কলেমাকবুল করে বউকে আপাতত তোমার নানার কাছেই রাইখা আসলা। নাতিবউকে লিয়ে আব্বাজান বাড়িতে থাউক, তোমার যখন পড়া শেষ হবে তখন বউকে তুলে ঢাকায় আনলেই হলো।'

অবাঙালি মামি মামার পরিবারে ও গ্রামীণ আত্মীয়স্বজনের কাছে আপন হয়ে উঠতে পারেনি। সে জন্যই কি মানিকের বিয়ের ব্যাপারে অমন উৎসাহ দেখায়? মানিক এমনিতে লাজুক টাইপের। তার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামা-মামির সামনে নিজের অনাগত স্ত্রী প্রকাশ্য হয়ে ওঠায় যে লজ্জা, তা শুধু বিরক্তি ও নানার ওপর রাগ প্রকাশ করে ঢাকতে পারছিল না মানিক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ তাকে রক্ষা করেছিল। ভাষণ শোনার জন্য রেডিয়ো চালিয়ে মামা বাচ্চাদেরকেও ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।

ভাষণ শুনে সামিয়া মামিও খুশি হতে পারেনি। বলেছে, 'ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মুজিব দলবল নিয়ে তৈরি হয়ে আছে, প্রেসিডেন্ট এটা কী করলেন! পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদি শেখকে না দিয়ে কোনো উপায় আছে।'

মামিটি নিজে অবাঙালি পরিবারের মেয়ে বলেই হয়তো মানিকের সামনে তার বাঙালি হওয়ার চেষ্টা যেন বেশি। মানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেই বোধহয় তাকে বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্ব দেয়ও বেশি। মানিক কিছু বলার আগেই উত্তেজিত মামা মন্তব্য করেছে, ওই শোন, বাইরে লোকজন রাস্তায় নেমেছে, প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়েছে।

মানিককে সেই রাতে বাসায় থেকে যাওয়ার জন্য মামা-মামি দুজনেই খুব বলেছিল। কিন্তু মামির আদর-যত্ন উপভোগের চেয়ে হলে থেকে আন্দোলনের উত্তাপ ভোগটাই যেন মানিকের কাছে জরুরি, এমন ভাব করে রাতেই হলে ফিরেছে। কিন্তু মামার বাসা থেকে দূরে দূরে থাকার আসল কারণটি কি মামা-মামি আন্দাজ করেছে কিছু?

মানিক মামার বাসায় থেকে ইউনিভার্সিটি পড়বে বলেই তো মামা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আলাদা বাসা ভাড়া নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঢাকায় এসে মামার বাসায় বেশ কিছুদিন থেকেছে মানিক। বাসায় উঠে বুঝেছিল সে, শ্বশুরবাড়ি থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা বাসা ভাড়া নেওয়ার কারণ শুধু মানিক ছিল না। মামার বাচ্চাদের ওপর উর্দুভাষী নানা-নানির প্রভাব কম হোক, সেটাও হয়তো একটা কারণ ছিল। পাঁচ বছর ও তিন বছর বয়সী মামাতো বোন দুটিকে নিজেদের আঞ্চলিক মাতৃভাষা শেখানোরও দায়িত্ব দিয়েছিল মামা মানিককে। মেয়েরা মানিক ভাইকে বেশি জ্বালাতন করতো বলে মামি ভাগ্নেকে বেশি আদরযত্ন করে পুষিয়ে দিতে তৎপর ছিল সবসময়। তবু মামার বাসা ছেড়ে হলে ওঠার পর গ্রামে ও বাড়িতেও অনেকেই মামির দোষ খুঁজেছে। যে বিহারি মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে নানা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও মেনে নেয়নি, সেই মেয়ে বাঙালি ভাগ্নেকে মেনে নেবে কেন? ভাতের বদলে চারবেলা রুটি খেতে দিয়ে তাড়িয়েছে। এরকম মন্তব্য করেছে গ্রামের আত্মীয়রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে ব্যাপারটা উল্টো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের সহপাঠী কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক দূরে থাক, মন খুলে কথাবার্তা বলার মতো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। কিন্তু মামার বাসায় কয়েক মাস বসবাসের ফলে মামির সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মানিকের দৃষ্টিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যে-কোনো মেয়ের চেয়েও মামি বেশ সুন্দরী। পরিবারের সকলের মতামত অগ্রাহ্য করে এক অবাঙালি মোহাজেরের সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে মামা যে একটুও ভুল করেনি, মামার বাসায় থেকেই সেটা হাজারবার মনে হয়েছে মানিকের। কিন্তু বয়সে সামান্য বড় কি সমবয়সী মামির সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মামির রূপলাবণ্যে ভরা শরীরটাই বাধা হয়েছিল ক্রমে।

একদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকে, পোশাক পাল্টানোর সময় মামির বেআব্রু শরীর একঝলকে অনেকটা দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল সে। হুঁশ ফিরতেই লজ্জা ঢাকার জন্য মামার বাসা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনো ভালো উপায় খুঁজে পায়নি। মামি নির্জন বাসায় মানিককে নিজের রূপের আগুন দেখিয়ে দগ্ধ করতে চেয়েছে, এমন সন্দেহ করার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু সেদিনের দুর্ঘটনার পেছনে কোনো বদ মতলব কিংবা মামিকে খুব ভালো লাগার সঙ্গে নিষিদ্ধ কোনো কামনার সম্পর্ক নেই, সেটা বোঝানোর জন্য সেইদিনই হলে উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল সে।

মামির কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েও মামিকে ভালোলাগার আকর্ষণটা মিথ্যা হয়ে যায়নি মানিকের। এই ভালোলাগা হয়তো দোষের কিছু নয়, দোষ খুঁজে পাওয়ার মতো কিছুই করেনি মানিক, তারপরও অবসরে একাকিত্বে ভালোলাগার ঘোরটা মানিকের ভেতরে বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটাতে চায়। এতটাই বাড়াবাড়ি যে মানিকের কামনায় একদিন স্বপ্নেও বেআব্রু মামি তার হলের বিছানায় হানা দিয়েছিল। স্বপ্নদোষের পর মানিক আরো সতর্ক হয়েছে। নামাজ পড়াটাকে নিয়মিত করেছে, আর মামার বাসাতেও যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে প্রায়।

মামির ভাবনা কমিয়ে দিতে রোকেয়া হলের মেয়েদের দিকে, এমনকি নিজের কল্পিত ভবিষ্যৎ সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকাতেও শুরু করেছে। দেশে অস্বাভাবিক ও অচলাবস্থা শুরু হওয়ায় কি মানিকের ভালোলাগার প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার অবসর ও তৃষ্ণাটা প্রবল হয়ে উঠতে চাইছে? এখন যদি হরতালের রাস্তায় হেঁটে মানিক মামার বাসায় রোজ যায়, ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলন ছাড়া কিছু করার নেই বলে মামার বাসায় থাকতে শুরু করে আবার, মামা-মামি বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশিই হবে।

কলাবাগানের সেকেন্ড লেনের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে মানিকের মামা কাজী আমিন। আন্দোলনে অফিস-আদালতও বন্ধ বলে মামার বাসাতেই থাকার কথা। কড়া নাড়তেই আজ দরজা খুলে দেয় মামার শ্বশুর মবারক খাঁ। কাছেই মোহাম্মদপুরে নিজের বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে ভাড়াটে কিংবা ঘরজামাই হিসেবে মামা থাকতে চায়নি বাচ্চাদের মাতৃভাষা উর্দু হয়ে ওঠার ভয়ে, আবার আলাদা হয়েও শ্বশুরবাড়ি থেকে খুব দূরে যেতে চায়নি ওই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার গরজেই। মামি মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে যেতে দেরি করলে, একমাত্র মেয়ে ও নাতনিদের দেখার জন্য যখন-তখন এ বাসায় ছুটে আসে। বাসায় এসে ফাও নাতি হিসেবে মানিককে পেলে সব সময় খুশি হয় তারা।

আজো মানিককে দেখে খুশিতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মবারক খাঁ, 'আল্লাহ তোমাকে অনেকদিন বাঁচায় রাখবে হে ব্রাদ্রার। বাসায় এসে আমি তোমার খবর জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমার নানিকে জিজ্ঞেস করো, সামিয়াকেও পুছো, সাচ বললাম কি না। তা হরতাল মিছিল করে করে খুব টায়ার্ড হয়ে গেছ মনে হয়।'

মানিককে স্বাগত জানাতে মামি, তার মা এবং বীণা-মিনা সবাই ছুটে আসে, যেন রণক্ষেত্র থেকে অক্ষত ছুটে এসেছে মানিক। মামাও খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

'কী মানিক, তোমার মা বাড়িতে যাওয়ার কথা, আমরা তো ভাবলাম চলেই গেছ।'

'দেশের এ অবস্থায় যাই কী করে মামা?'

'এখন তো তবু রাতে ট্রেন চলছে, ৭ তারিখের পর মনে হয় তাও চলবে না।'

কথাটা বলার সময় সরকারি চাকুরে মামার উৎফুল্ল চেহারার মধ্যেও আন্দোলনের প্রতি তার পক্ষপাত গোপন থাকে না।

'আমি তো এখন ৩২ নম্বর থেকে এলাম। স্বাধীনতার দাবি নিয়ে শত শত মিছিল যাচ্ছে শেখ মুজিবের বাড়িতে। মুজিবের সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনলাম, সবাই বলছে ৭ তারিখে রেসকোর্সে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করবে।'

মবারক খাঁর উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আন্দোলন দেখে ভয় পেয়েই জামাইয়ের বাড়িতে এসে উঠেছে কি না কে জানে। উদ্বেগ চেপে কথা বলে হাসিমুখে।

'মানিক, তোমরা ছাত্ররা তো পাকিস্তানের পতাকা পোড়ায় দিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় দিলা। দিনে রাতে মিছিল কইরা বাঙালিকে জাগাইতেছো, সত্যই কি পাকিস্তান আর তোমরা চাও না?'

মানিক বলে, 'না নানাজি, পাকিস্তান মনে হয় আর টিকবে না। সব বাঙালি চাইছে মুজিব এখনই স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করুক।'

'কিন্তু মানুষ তো পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুজিবকে ভোট দেয় নাই। বাঙালি ন্যায্য অধিকার চায়, এটা ঠিক আছে। কিন্তু নিজেদের স্টেট হিসেবে পাকিস্তান ভাঙা কি তারা সাপোর্ট করবে?'

নিজের রাজনৈতিক মতামত জোরালো নয় বলেই বোধহয় রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক করে না মানিক। সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে জানতে চায়, 'পাকিস্তান টিকবে না বলে আপনার কি খুব টেনশন হচ্ছে নানাজি?'

'হ্যাঁ, টেনশন হওয়াই তো জরুর ব্রাদার। দেখো, মুসলমানের জন্য ব্রিটিশরা ইন্ডিয়া ভাগ করে পাকিস্তান করেছিল বলে নিজের জন্মভূমি ইউপি ছেড়ে মোহাজের হয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানে দশ বছর কাটালেও সেখানে থিতু হলাম না। ছেলেটা করাচিতেই থেকে গেল। কিন্তু আমি তো পূর্ব পাকিস্তানের মায়া ছাড়তে পারলাম না। এদেশটা আর দেশের মানুষকে ভালো লাগল। চাকরিতে রিটায়ার করার আগে এখানে বাড়ি করে সেটেল্ড হলাম। এখন যদি সেই পাকিস্তানই আর না থাকে, তাহলে আমার মতো নন-বেঙ্গলি মোহাজেরদের তো ডর করবেই, না কি বলো।'

AMARBOI.COM

'আপনাদের কে বলে অবাঙালি? আপনারা সবাই তো এখন চমৎকার বাংলা বলেন, মামি তো আমাদের গ্রামের ভাষাও কিছু শিখে ফেলেছে।'

'দেখো, তোমার আপনা নানাজি, মানে আমার বেহাই সাব তো খাঁটি মুসলিম লীগার, পাকিস্তানের মহাভক্ত। তিনিও কিন্তু আমার মতো অবাঙালি মোহাজেরকে আত্মীয় হিসেবে সহজে মানিয়া লিতে পারে নাই। আমরা আপন করতে চাইলে তোমরা কি আপন ভাবতে পারবে? গত চার/পাঁচদিনের আন্দোলনে সারা দেশে কতগুলি বিহারির দোকান-অফিস লুট হইল, আগুন দিয়া জ্বালায় দিল, তার হিসাব লইছো তোমরা?'

শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ করে জামাই, 'এই পরিস্থিতি ক্রিয়েটের জন্য প্রেসিডেন্টই দায়ী আব্বাজান।'

মানিকও মামাকে সমর্থন জানায়, 'মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলার পরও ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে এত টালবাহানা করছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের মানুষ আর কত সহ্য করবে নানা?'

'প্রবলেম বাধাচ্ছে আসলে ভুট্টো। অ্যাসেম্বলিতে যোগ দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তো ওয়ালি খান ঢাকায় আসল। লেকিন ভুট্টো এমন হুমকিধমকি দিতে শুরু করল, প্রেসিডেন্ট সংসদ আহ্বান করেও বাতিল ঘোষণা করলেন। তা আবার তো সংসদের তারিখ ঘোষণা করেছেন তিনি।'

'পষ্ট করে তো কিছু বলেননি, তার ওপর আর্মিরা মিছিলে গুলি চালিয়েছে।'

মামি চা-নাশতা নিয়ে আসে।

'পলিটিক্যাল গোলমাল সহজে থামবে বলে মনে হয় না। তা মানিক, তুমি বাড়িতে না গিয়ে আন্দোলন-পলিটিক্স করছ, আর ওদিকে আব্বাজান হয়তো তোমার চিন্তায় আরো বিমারি হইতেছেন। তা কবে যাবে বাড়িতে?'

'এখন কি আর বাড়ি যাওয়ার সময় মামি! ৭ তারিখে শেখ মুজিব হুকুম দিলে তো ছাত্ররা মনে হয় অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। আমার রুমমেট ছাত্র ইউনিয়নের নেতা, সে বলে, রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা দুনিয়ার কোথাও আসেনি, বাংলাদেশেও আসবে না।'

সবাই মানিকের দিকে তাকায়। মামি ঘোষণা করে, 'আমি তোমাকে হলে আর যেতে দেব না। তোমার একটা কিছু হলে আব্বাজান আমাদের আর কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। তার চেয়ে তুমিও আমাকে গ্রামে নিয়ে চলো মানিক। বীণারও স্কুল বন্ধ, ঢাকার এরকম অবস্থা আর ভালো লাগছে না।'

যে মহিলার সান্নিধ্য এড়ানোর জন্য মানিক সবসময় দূরে থাকতে তৎপর, সে প্রকাশ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চাইবে, ভাবতে পারেনি। মানিক মামার দিকে তাকায়।

'মামাও কি বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, আব্বা তো ঢাকায় আসবে না, আমাদেরই আরেকবার যাওয়া উচিত ভাবছি। তুমি না হয় তোমার মামিকে নিয়ে ট্রেনে যাও, আমি দেখি পরিস্থিতি কী হয়। ক'দিন পর না হয় নিজে গিয়ে তোমার মামিকে নিয়ে আসব।'

'দু'দিন অপেক্ষা করে দেখি, ৭ তারিখে রেসকোর্সে মুজিব নতুন কী কর্মসূচি দেয়, কী দাঁড়ায় পরিস্থিতি।'

'৭ তারিখের পর দেশের অবস্থা কিন্তু আরো খারাপ হইতে পারে মানিক। তোমরা তো ভুলে গেছ দেশে এখনো মিলিটারি গভমেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। প্রেসিডেন্ট তো বলে দিয়েছেন, পাকিস্তানের ইন্টিগ্রেটি নষ্ট হয় — এমন কিছু আর বরদাস্ত করা হবে না। তোমরা দেশের পতাকার অসম্মান করছ, ভায়োলেন্স করছ — আর্মিরা কিন্তু এসব বরদাস্ত করবে না।'

'৭ তারিখে মুজিব যদি ঘোষণা দেয়, বাঙালিরা এদেশে আর্মির শাসন একদিনও বরদাস্ত করবে না, তাহলে কী হবে নানাজি?

মবারক খাঁ গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে নিচু কণ্ঠে বলে, 'সেই জন্য তো তোমার কথা ভাবিয়া চিন্তা হইতেছিল ব্রাদার। শোনো, ক্যান্টনমেন্টে আমার এক কর্নেল বন্ধু আছে, তার কাছে খবর পেয়েছি। ৭ তারিখে মুজিব যদি স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার দেয়, এমনকি এন্টিস্টেট কথাবার্তা বলিয়া বিশৃঙ্খলা বাড়াইতে পাবলিককে উস্কানিটুস্কানি দেয়, তবে আর্মিও কিন্তু আরো হার্ডলাইনে যাবে। তোমার হলে থাকাটা মোটেও ঠিক হবে না মানিক।'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন নানাজি?'

'তোমরা হইলা শেখ মুজিবের সৈনিক, তোমাদের ভয় দেখানোর আস্পর্ধা আমার নাই। আমি শুধু তোমাকে হলে না থাকার রিকোয়েস্ট করছি ব্রাদার, আর্মি অ্যাকশন শুরু করলে তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে আগে যাবে। তুমি গ্রামে ফিরতে না চাইলে আমার বাড়িতে থাকো, মামার বাসায় এসে থাকো।'

মামি বলে, 'শেখের সাপোর্টার তো আমরাও মানিক। তোমার মামা হরতাল করছে, তোমারও ক্লাস নাই, বাসায় বসে যত খুশি আমাদের সঙ্গে পলিটিক্স করো।'

'তোমার ঢাকায় থাকার দরকার কী। মুজিবের ভাষণ তো রেডিয়োতে রিলে করবে শুনলাম। বাড়িতে বসেও শুনতে পারবে।'

মানিককে বাসায় রাখার জন্য মামি বেশি আগ্রহ দেখায় বলে কি মামা বাড়ি যেতে উৎসাহ দেয়? মানিকের মনে এরকম সূক্ষ্ম সন্দেহ জাগতে না জাগতেই মামা তা নিজেই মুছে দিয়ে বলে, 'আমি বলি কি ৭ তারিখের আগে তুমি মামিকে নিয়ে বাড়িতে যাও মানিক। সামিয়াও যেতে চাইছে। আমি পরিস্থিতি দেখে তোমার মামিকে নিয়ে আসব।'

দেশের এরকম টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভাগ্নের সঙ্গে মামির গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকার ব্যাপারটা মানিক সহজভাবে নিতে পারে না। বিয়ের পর তো বাড়ি ও পিতার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক নেই মামার। সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মানিকের মধ্যস্থতায় মামি তার বাবা-মাকে নিয়ে গিয়েছিল একবার। মামা এরপরেও দু'একবার বউ-বাচ্চা নিয়ে গেছে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে মানিকের সঙ্গে বউ-বাচ্চাকে অনিশ্চিত সময়ের জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর চিন্তায় যেন দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানারকম অশুভ আশঙ্কা ও টেনশনটাই প্রধান। মামা মানিকের পিতার মতো অন্ধ ভক্ত না হলেও, মুজিবের সমর্থক। নৌকায় ভোট দিয়েছে। স্বামীর সমর্থনে মামিও। কিন্তু পাকিস্তান ভেঙে যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি মামার শ্বশুরকুলের কেউ সমর্থন করবে না, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না মানিকের। মামা কি এ কারণে অবাঙালি শ্বশুরকুল থেকে পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে? কিন্তু মানিকের নিজের নানাও তো প্রথম থেকেই শেখ মুজিব ও তাঁর নৌকার কট্টর বিরোধী। মুজিবের নেতৃত্বে যখন বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে, তখন মানিককেও ঢাকা থেকে সরিয়ে বিরোধী শিবিরে ঠেলে দেওয়ার চিন্তা কেন?

সঠিক সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারে না মানিক। ট্রেনের খোঁজখবর নেওয়া এবং হল থেকে জিনিসপত্র নেওয়ার কথা বলে দুপুরে খাওয়ার পর মামার বাসা থেকে বেরিয়ে যায়।

হলে ফেরার পরও বড় অস্থির লাগে মানিকের। এই অস্থিরতা নিয়েই যেন হলের ছেলেরা সবসময় উত্তেজিত হয়ে আছে। সময়ে অসময়ে মিছিল করে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেওয়াই যেন ছাত্রদের একমাত্র কাজ। মানিকের মনে হয়, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাটাই যদি এ সময়ের বড় করণীয় হয়ে থাকে, তাহলে অন্য ছেলেদের চেয়েও সার্থকভাবে আরো নিবেদিত হয়ে সে কিছু করতে চায়। কিন্তু কী যে করবে, ভেবে পায় না। ভেতরে এরকম উত্তেজনা অস্থিরতা নিয়ে ছটফট করে। অনেকেই হল ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে শুরু করেছে। আবার আরিফের মতো যারা, এ মুহূর্তে তাদের চিন্তাচেতনায় আন্দোলনে উত্তাল পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য ছাড়া যেন আর কিছু নেই। আরিফের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের করণীয় সম্পর্কে আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মানিক।

আরিফ হলে ফিরে আসে সন্ধ্যারও বেশ কিছু পরে।

'মিছিল থেকে কোথায় সটকে পড়েছিলি মানিক? ৩২ নম্বরে গিয়ে তোকে কতো খুঁজলাম।'

'তুই কি এতক্ষণ শেখ মুজিবের বাড়িতেই ছিলি?'

'সারাদিনে চারটা মিটিং করলাম। আমাদের সংগঠনের নেতারাও গেছিল আজ বত্রিশ নম্বরে। মুজিবের সঙ্গে আমাদের নেতাদের মিটিং হলো, তারপর সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে গেলাম পার্টি অফিসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী হলো তোদের মিটিংয়ে? কী বললেন শেখ মুজিব?'

'মুজিবকে প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে ইয়াহিয়া নানা আপস প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু মুজিব আন্দোলনের বুকে ছুরি মেরে, বাঙালির ন্যায্য দাবির সঙ্গে আপস করবে না। আমি সিওর, ৭ মার্চের পর এদেশের মানুষ এমন আন্দোলন দেখাবে, যা বিশ্ব কখনো দেখেনি।'

'৭ তারিখে কি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবে মুজিব?

'আরে স্বাধীনতার ঘোষণা তো হয়েই গেছে মানিক। স্বাধীন বাংলার পতাকাও মুজিবের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্ররা। এখন মুজিবের যেমন পাকিস্তানি পতাকাকে স্যালুট করার উপায় নেই, আমাদেরও তেমনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

'বুঝলাম না তোর কথা। এখন আসলে আমাদের কী করতে হবে?'

'এই গণজাগরণকে কীভাবে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপ দেওয়া হবে, আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে কী করতে হবে — এসব বিষয় নিয়ে পার্টি অফিসে আমাদের আলোচনা হলো মানিক। আন্দোলনকে আরো চাঙ্গা করতে হবে আমাদের।'

'ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী কিন্তু এত সহজে পাকিস্তান ভেঙে যেতে দেবে না আরিফ। জানিস তো, আমার মামার শ্বশুর নন-বেঙ্গলি, আর্মি অফিসারদের মধ্যেও তার বন্ধু-বান্ধব আছে। তার কাছে শুনলাম, আর্মিরা হার্ডলাইনে যাবে। আমাকে হলে থাকতে না করে দিলো।'

'তোকে আমি শালা আজ মিছিলে নিয়ে গেলাম, আর তুই মিছিল আন্দোলন থেকে পালিয়ে মামার বাসায় গিয়ে উঠেছিলি! তা এখন কি হল ছেড়ে মামার বাসায় গিয়ে থাকবি?'

'কী যে করি, বুঝতে পারছি না। পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে ভেবে মামা আবার মামিকে নিয়ে গ্রামে যেতে বলছে, ওদিকে আমার চেয়ারম্যান নানা খুব অসুস্থ। ঢাকার অবস্থা যে রকম আগুন হয়ে উঠছে, আমি হলে থেকেই বা দেশের জন্য কী করতে পারি বল।'

আরিফ সন্দেহের চোখে কয়েক মুহূর্ত মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বভাব ও রাজনৈতিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও রুমমেট হিসেবে মানিককে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে তার। মানিকের সঙ্গে তাদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে রিয়াকশনারি নানা এবং মামার বাসায় গিয়ে মানিকের মামা-মামিকেও দেখেছে আরিফ।

তোর মামি তো খুব সুন্দর রে — আরিফের এ মন্তব্য শুনে মানিক বন্ধুর চোখেও নিজের ব্যাপারে গোপন সন্দেহ খুঁজেছে। কিন্তু সব জানার পরও, আজ মানিকের দিশেহারা অসহায় অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহানুভূতি দেখানোর বদলে পুরনো রাজনৈতিক খোঁচা দেয়।

'তোর দ্বারা কিছু হবে না মানিক। ফিউডাল চিন্তাভাবনা আঁকড়ে রাখায় আমাদের পলিটিক্সে তোর বিশ্বাস নেই। মিছিলে নেমেও গলা ছেড়ে স্লোগান দিতে পারিস না। নানা-মামাদের মতো পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে বলে তুইও খুব চিন্তায় পড়েছিস মনে হয়। কিন্তু আমি বলছি মানিক, পাকিস্তান ইজ গন কেস। ঠিক আছে তুই নিরাপদ আস্তানায় উঠে যেতে চাস যা, আমাকে আরো কিছু টাকা দিয়ে যা দোস্ত। এখন আমাদের স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক ফান্ড দরকার হবে।'

মানিকের আশা ছিল, স্বাধীনতার লড়াইয়ে মানিককেও শামিল করার জন্য আরিফ উৎসাহ জোগাবে। তার বদলে শুধু টাকা চাওয়ায় সে হতাশ বোধ করে। এ সময় দলের দুজন ছেলে এসে আরিফকে আবার ডেকে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার দাবিতে যখন বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক জাগরণ ঘটছে, তখন মানিক তার পাকিস্তানপন্থী আত্মীয়দের সঙ্গে মিশে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। আবার এই মহাজাগরণের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার ভাষা ও উপায়ও খুঁজে পায় না। আরিফ তাকে বিদ্রূপ করায় খারাপ লাগে। আরিফ তো তার আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা বাবার কথাও জানে। কিন্তু মানিক আরিফদের সংগঠনে যোগ দেয়নি বলে নিজেকে সে প্রতিক্রিয়াশীল বা দেশপ্রেমহীন মানতে পারে না। দেশই যদি এখন সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে ওঠে, তবে সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করবে মানিক। তার আগে জন্মভূমিতে ফিরে নতুন জন্ম নিয়ে শুরু করবে নতুন জীবন।

মানিক হঠাৎ আবেগময় সিদ্ধান্তে স্থির হয়। একা একাই রাতের ট্রেন ধরার জন্য ব্যাগে জামাকাপড় গোছাতে থাকে।

তিন

রতনপুরে রাত ভোর হয় মোরগের বাক আর পাখির কিচিরমিচির কলরব দিয়ে। আজ ফজরের ওক্তে এসব পরিচিত আওয়াজ শুনে পুরো গ্রামটাই প্রথমে জেগে উঠতে থাকে বাণ্টু বক্করের ঘুমছুট চেতনায়।

বাণ্টু রাতে ঘুমায় নিজেদের কুঁড়েঘরে, মা ও ছোট ভাইবোনদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে। দিন কাটে ভুঁইয়াবাড়িতে। খাওয়া, ফাইফরমাশ খাটা আর হালগেরস্তি কাম সবই সেখানে। বলতে গেলে সে এখন ওই বড়বাড়িরই মানুষ। গরিব কামলা সেরাজ বাউদিয়ার খেড়িঘর আর গাঁয়ের সেরা ধনী গেরস্তের বড়বাড়ির মাঝখানে ছড়ানো যে গাঁও-গেরাম, বাণ্টু তাকে নিজের বলেই জানে। জন্মের পর থেকে হেসেখেলে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বড়বাড়ির চাকর হওয়ায় সে অধিকার কমেনি, বেড়েছে বরং। তারপরও ভোরবেলা মোরগের বাক শুনে বাণ্টু বুঝতে পারে না — ঠিক কোন বাড়ির খোঁয়াড় থেকে ডাকছে মোরগ। আওয়াজটার মাত্রা মেপে নিকট পড়শী কিংবা হিন্দুটাড়ির বাড়িগুলোর কথা মনে হয়। মোরগডাকা বাড়ি না চিনলেও পাখির কিচিরমিচির ডাকের উৎস অবশ্য পরিষ্কার।

বাণ্টুদের বাড়ির কাছেই জগন্নাথ বিলের জঙ্গল। শেয়াল-বেজি যেমন, পুরনো আমলের কিছু ভূতপেত্নীও বাস করে সেখানে। দিনে সব পাখি স্বাধীন ওড়াউড়িতে ক্লান্ত হলে, সাঁঝবেলা ওই জঙ্গলেই ফেরে সবাই। রাত পোহালেই একসঙ্গে কিচিরমিচির করে একে অন্যের ঘুম ভাঙায়। পাখিরা ভূতের অত্যাচারে কাঁদে, নাকি ভূতের বাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সবাই মিলে গান গায় — সেটা বাণ্টুর কাছে আজো রহস্য।

পাখির কলরব থিতিয়ে আসার পরও শীতের বিছানায় কাঁথার উম ছাড়তে ইচ্ছে করে না। গায়ে-মাথায় কাঁথা মুড়ে আরো ঘুমাতে চায়। দু'দিন আগে, জগন্নাথের জঙ্গল থেকেই কি না কে জানে, ভোরের স্বপ্নে অসম্ভব সুন্দর এক পরি এসেছিল বাণ্টুর বিছানায়। পরির ডানা ধরে উড়ে যাওয়ার ভয় আর ভালোলাগা নিয়ে পরিকে জড়িয়ে ধরেছিল সে। ধস্তাধস্তির সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সেই পরিকে স্মরণ করতে গিয়ে বাণ্টু বড়বাড়ির মেয়ে বিউটিকে দেখতে পায়। চোখ বুজে পরি ও বিউটির অলীক সৌন্দর্য দেখতেও ভালো লাগে। কিন্তু ভোরের আলো বেড়ার ফাঁকফোকর দিয়ে ঘরে ঢুকে বাণ্টুকে ডাকবে, মেঝের বিছানা থেকে মা ডাকবে, পাশ থেকে ছোট ভাই মাদু গা ঝাঁকিয়ে ডাকবে, এমনকি মনিববাড়ির গোয়ালের গরুর ডাকও শুনতে পাবে বাণ্টু। আজ রাত ভোর-করা এসব হাঁকডাক শুরু হওয়ার আগে তলপেটের প্রাকৃতিক ডাকটাই জরুরি হয়ে ওঠে। গায়ের কাঁথা ঘুমন্ত ছোট ভাইয়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে বাণ্টু।

বাঁশের ঝাঁপ খুলতেই গায়ে শীতের ঝাপটা লাগে। মাঘ মাস পেরিয়ে গেছে, তবু এত হিম কেন? আজ বেশ কুয়াশাও পড়েছে। সাদা কুয়াশায় আসমান-জমিন সয়লাব, দশ হাত দূরের লাউমাচা আর কাঞ্চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজনে গাছটাও পষ্ট নজরে আসে না।

ঘরে এখনো ঘোলাটে আঁধার। মেঝেতে মাটির ওপরে পোয়াল-খড়ের গদিতে ঢালাও বিছানা। সেখান থেকে খসর-মসর আওয়াজ, তারপর শীত-কাঁপা মায়ের কণ্ঠ, 'ও বাবা বক্কর, উঠছিস? খুব জার পড়িছে বাহে! তোর বাপের পুলিশি পিরানটা গাত দিয়া যা। ফজরের ওক্তে স্বপন দেখনু, তোর বাপ কামত গিয়া ফরিদপুর শেখ মুজিবরের বাড়ির বগলে গেইছে। ঠাণ্ডার মধ্যে দোলাবাড়িত খালি গায় শুতিয়া আছে আর হুহু করি খালি কাঁপতোছে।'

সাতসকালে নিরুদ্দেশ বাবার স্বপ্ন কি দুশ্চিন্তা ভালো লাগে না বাংটুর। দড়িতে ঝোলানো বাবার পুরনো জামাটা গায়ে চাপায়। গামছা দিয়ে কান-মাথা ঢেকে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, মায়ের বিছানা থেকে ছোট বোন টেপির ডাক, 'ও ভাই, মোর জন্যে আইজ গোশত-ভাত আনবু। না আনলে কিন্তু হুম...

গত সন্ধ্যায় ভাতের সঙ্গে দু'টুকরা মাংস এনেছিল বাংটু। ভাগে কম পড়ায় টেপি অনেক রাত কেঁদেছে। অতৃপ্তির জ্বালা নিয়ে বোনের হাড্ডি চোষা দেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল বাংটু, 'এরপর গোশত-ভাত আনলে টেপিই খাবে সব।'

মা স্বপন দেখে বাবাকে, আর ঘুমের ঘোরেও টেপি কি রাতভর খাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে? বাবা ফিরে এলে হাট থেকে এক সের ভইষের গোশত আনতে বলবে বাংটু। কিন্তু কবে ফিরবে বাবা? বাবা বাড়িতে নেই বলে রাতের খাবারটা বাড়িতে এনে ভাই-বোনদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়। আবার চাকরি বাঁচাতে সাতসকালে ছুটতে হয় বড়বাড়িতে।

ঘন কুয়াশায় চেনা গ্রাম তলিয়ে গেছে। চারপাশে কুয়াশার নরম দেয়াল। সেই দেয়াল ভেদ করে পায়ের আন্দাজে চেনা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে, একটি ধানকাটা ভুঁইয়ের ভেজা খয়েরি নাড়ার ফাঁকে হাগতে বসে বাংটু। পরনের জামাটির দিকে তাকিয়ে আবারো বাবার কথা মনে পড়ে। বড় বন্যার সময় বাবা যখন এই জামাটা রিলিফ হিসেবে পেয়েছিল, তখন এর রং ছিল খয়েরি, অবিকল পুলিশি জামার মতো। আর বাবা ছিল তখন বাংটুর জায়গায়, ভুঁইয়াবাড়ির বাঁধা চাকর। কিন্তু জামাটা পাওয়ার আনন্দে বাবা সেদিন পুলিশ সেজে বেশ মজা করেছিল।

সাঁঝবেলা মায়ের রান্নাবান্না ঘিরে চুলার ধারে বসে আছে সব ভাই-বোন। নতুন জামাটা গায়ে বাবা বাড়িতে এলো, যেন অন্য মানুষ। কাঁধের বাউঙ্কা বন্দুকের মতো উঁচিয়ে ধরে, গলার স্বর পাল্টে বলেছিল,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি পুলিশ, থানা থাকি আইলাম। বাংটুর মাও মণ্ডলের বাইগন চুরি করিছে, করিস নাই? এই চুন্নি মাগি, চল থানা মে।'

মা নকল পুলিশকে চেনার আনন্দে, সাহসের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল পুলিশকে, 'কী হামার পুলিশ রে! থানায় নিয়া যায়া যেন মোর বাল ছেড়ে।'

বাবা তখন গুলি ছুড়ল, হুটহুট হুটুস!

বাংটুর দীর্ঘশ্বাসে শৈশবের আনন্দঘন স্মৃতি নকল পুলিশের মতোই মিথ্যা হয়ে যায়। আর পাঁচ-ছয় বছর পরে, পনেরো থেকে কুড়ি বছরে পৌছানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, বাংটু যদি আরো ইঞ্চি চারেক লম্বা হতে পারে, বাবার মতো দশাসই জোয়ান পুরুষ হয়ে উঠবে তাহলে। তখন এরকম জামা পরলে তাকেও হয়তো পুলিশের মতো দেখাবে। কিন্তু তা বলে সত্যি সত্যি পুলিশ হওয়া দূরের কথা, একটা চৌকিদারের চাকরিও কি কপালে জুটবে তার? সেরকম ভাগ্য হলে ভুঁইয়াবাড়ির চাকরিতে লাথি মারার মেজাজ নিয়ে বাংটু চোখ বুজে তলপেটের চাপ প্রয়োগ করে।

নির্জনে হাগতে বসে নানা কথাই মনে পড়ে। ভোটের আগে সবাই বলাবলি করত, নৌকায় ভোট দাও, শেখ মুজিব পাওয়ারে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিকে আর ঠকাতে পারবে না। চালের মণ হবে দশ টাকা, চিনির সের চার আনা, আর বাঙালির ছেলে যত বেঁটেই হোক, পুলিশ-মিলিটারির চাকরিটা অন্তত পাবে। কে জানে কথাটা কতখানি সত্যি। শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ তো ভোটে জিতল, কিন্তু বাংটুর মতো গরিব কামলার ছেলের কোনো সরকারি চাকরি হওয়ার আইন কি হবে এবার? এই প্রশ্নটা কাউকে করতে পারে না সে। পাছে বউদিয়া সেরাজের বেটা, বার্ষিক ত্রিশ টাকা বেতনে ভুঁইয়াবাড়ির সামান্য চাকর, পনেরো বছরের বাংটুর পুলিশ হওয়ার খায়েশ দেখে সবাই হাসতে থাকে।

প্রাকৃতিক ক্রিয়ার দ্বিতীয় ভাগে, লুঙ্গি তুলেই বেশ খানিকটা হেঁটে পানি খরচ করার জন্য জগন্নাথের বিলে নামে সে। বিলের পানি থেকেও কুয়াশা উঠছে। কচুরিপানার ফাঁকে ঠাণ্ডা পানিতে হাত দিয়ে দেখতে পায় মাত্র কয়েক হাত দূরে এটি সাদা বক। মানুষের সাড়া পেয়েও বগা অনড়, ঘুমাচ্ছে যেন। আশপাশে শুকনো ঢিল না পেয়ে এক খাবলা ভেজা মাটি তুলে ঢিল ছোড়ে বাংটু। মুহূর্তেই ডানা ঝাপটে কুয়াশার ভেতর মিলিয়ে যায় সাদা পাখিটি। জিভের ডগায় আফসোস ধ্বনিত হয় বাংটুর, একটা শক্ত ঢিল পেলে বগাটা নিশ্চয় মারা যেত।

বিল থেকে উঠে বাংটু এবার সোজা মনিববাড়ির দিকে হাঁটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। ভেজা ঘাস-মাটির পরশে খালি পা দুটি এরই মধ্যে কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। দাঁত ঘষার জন্য বিলের ধারের বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি ভাঙার সময় বাঁশপাতায় সঞ্চিত শিশির বৃষ্টির মতো গায়ে ঝরে পড়ে। বাংটু ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু বিষকাঁটালীর ঝোপের ধারে হঠাৎ একটা শেয়ালের মুখোমুখি হতেই ভয়ে থমকে দাঁড়ায়। বুকে কয়েকবার থু ছিটানোর পর ধাতস্থ হয় সে।

শেয়ালটি মন্থর পায়ে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের দিকে এগোয় আর মাথা ঘুরিয়ে বাংটুর দিকে তাকায়। মুখের দাঁতন হাতে নিয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলে বাঘের মতো গর্জে ওঠে বাংটু, ভ্যাঁও। শেয়ালটা ছুট দিলে, তু, ধর ধর, তুউ ধর ধর বলে — কুকুরকে ডাকে এবং কুকুর ছুটে আসার আগে নিজেই শেয়ালের পেছনে ছুটতে থাকে। দিনের বেলা শেয়াল বেরোলে তাকে জগন্নাথের বড় জঙ্গলে না ঢোকানো পর্যন্ত সেটার পেছনে ছোটার মতো সাহসী চ্যাংড়া ও কুকুরের অভাব হয় না গাঁয়ে। কিন্তু এখন কয়েক পা দৌড়াতেই কুয়াশার মধ্যে কোথায় যে সেটা অদৃশ্য হয়! বাংটু দৌড় থামায়।

সামনে একটি পগারের ওপরে নজিবরের যাদুর বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে ভুটি কুত্তাটি ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দিলে, কুকুরকে ধমকে নজিবর হাঁক দেয়, 'বাংটু না কাঁয় রে? ফুটিকে বিহানে শিয়ালের পাছত লাগছিস ক্যানে?'

নজিবরের খুলিতে আগুন জ্বলতে দেখে এগিয়ে যায় বাংটু। শীতের ভোরেও শুধু নিজে বিছানা ছাড়েনি নজিবর, এরই মধ্যে গোয়ালের গরু বের করেছে। এখন সপরিবারে আগুন পোহাচ্ছে খুলিতে। এ মৌসুমে দুই মণ সরিষা পেয়েছে নজিবর। মাড়াইকৃত সরিষার শুকনো ডালপালায় 'পোড়' সাজিয়ে ভোরে আগুন পোহায় প্রতিদিন। বাংটু আগুন তপাতে বসে শেয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ধারাবিবরণী শোনায়।

নজিবরের ছেলে একাব্বর, বাংটুর ছোট ভাই মাদুর সমান বয়সী ছেলেটা জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করে, 'বিহানে ডাইন পাকে শিয়াল গেইছে বাংটু ভাই, তোর একটা বিপদ হইবেই।'

ডানপাশে শেয়াল দেখার মানে বাংটুরও জানা। ভেতরের ভয় উড়িয়ে দিয়ে জবাব দেয় সে, 'বাল হইবে মোর।'

'তোর বাউদিয়া বাপ ক্যানে বা এলাও কাম থাকি ফিরি আসিল না বাহে! সেই যে ভোটের পরে গেল, তারপাছে বা বিয়াশাদি করি ঠ্যাং গাড়ছে বিদেশের মাটিত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউয়ের কথার প্রতিবাদ করে নজিবর বলে, 'আরে দূর! সেরাজ মোক কইছে এবারে কামে ফরিদপুর যাইবে, শেখ মুজিবরের বাড়িটা আর তার বাপমাকে দেখি আসপে। ফিরে আসলে শোনেন তার গল্প।'

বাবার প্রসঙ্গে মুজিবভক্ত নজিবরের কণ্ঠে শেখ মুজিব এসে পড়ায় বাংটু পারিবারিক সমস্যা চাপা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে বলে, 'যাদু বাহে, টাউনে বোলে খুব গণ্ডগোল। তোমার শেখ পেরসিডেন্ট হবার পায় কি না পায়।'

ভুঁইয়াবাড়ির চ্যাংড়া চাকর বাংটুর মুখে জঙ্গল-শেয়ালের কেচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি দেশের হালচাল সম্পর্কে তার কথাবার্তাও ফেলনা নয়। কারণ সজব ভুঁইয়া এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগের বড় নেতা। তার বাড়িতে রেডিয়ো-পেপারে প্রতিদিনই খবর আসে, ঢাকার হালচাল নিয়ে আলোচনা হয়। ভুঁইয়ার ছেলে মানিক পড়ে ঢাকায়। নজিবর তাই বাংটুর জানাকে গুরুত্ব দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে, 'শালা এয়াহিয়া খান গণ্ডগোল করি করবেটা কী? এ আন্দাজ আইউব খান, আন্দোলনে সেও ক্ষমতা ছাড়তে দিশা পায় নাই। এ শালাও ক্ষমতা ছাড়ি পালাইতে দিশা পাবার নয় বাহে।'

'আরে বাহে যাদু, শয়তানের গোড়া হইল ভুট্টো। রেডিয়োতে সেদিন কইছে। ওই শালায় শেখকে পাওয়ার দিবার চায় না। নিজে রাজা হবার চায়।'

অন্তরঙ্গ ঘরোয়া পরিবেশে সাতসকালে অহেতুক দেশ ও গণ্ডগোল টেনে আনায় নজিবরের স্ত্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ গ্রহণের মেজাজে বলে, 'জয় বাংলা জয় বাংলা করি সউগ মানুষ নাওতে ভোট দিলে। হামার বাড়ির জন তো শেখের নামে জিউ ছাড়ি দেয়! তা এলা ক্যানে ফির গণ্ডগোল?'

মেয়েমানুষটির প্রশ্নের জুতসই জবাব দিতে না পারায় নজিবর ও বাংটু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিন্তু গোলমালের কারণ নিয়ে বউটার মোটেও মাথাব্যথা নেই। সে হাসে এবং সগর্বে জানায়, 'সেই জন্যে মুই ভোটও দিবার যাঁও নাই। বাংটুর মাও তো এক টাকার লোভে ভোট দিবার যায়া নাওয়ের বদলে সিল মারছে বাঘের মুখত।'

রাজরাজড়ার গল্পের মাঝে বাংটুর মায়ের অভাব-অজ্ঞতা টেনে এনে নজিবরের বউ মজা পাওয়ার হাসি হাসলে পিত্ত জ্বলে বাংটুর। দেশ সম্পর্কে মতামত দেওয়ার উৎসাহটুকু নিভে যায়।

একাব্বরের মা ভালো মানুষের মতো আবার শুধায়, 'ক্যান বাহে বাংটু, এই জারের রাইতে বাড়ি আসি থাকিস? বড়বাড়িতে কি তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার জায়গা হয় না, নাকি তোর মাও একলায় ঘরত থাকিবার পারে না?'

বাংটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নজিবরের বউয়ের চোখের কোণে বদ হাসি। তার আপাত সরল জিজ্ঞাসার পেছনে কী যেন রহস্য। বাংটু রাতে নিজের খাবার বাড়িতে এনে খায়, মনিবগিন্নির সেটা পছন্দ নয়। তাকে যে জবাব দিতে পারেনি, একাব্বরের মাকে তা জোরগলায় শুনিয়ে দেয়।

'চাকর হইছি বলিয়া কি হামার স্বাধীনতা নাই? আইতত মুই কোন্ঠে থাকিম, কখন খাইম — সেইটা মোর ইচ্ছা।'

'ট্যারা জহির যে তোর নামে কত কথা কয়া বেড়ায়।'

বড়বাড়ির বড় চাকর, বয়োজেষ্ঠ সহকর্মীর চেহারা দেখলে তো বটে, নাম শুনলেও মেজাজ বিষিয়ে ওঠে। লজ্জাও পায়।

কিছুদিন আগেও বাংটু যথারীতি ভুঁইয়াবাড়িতে চাকরদের ঘরে রাত কাটাত। সঙ্গে থাকত সহকর্মী ট্যারা জহির। রাতে বিছানায় বাংটুকে শান্তিতে ঘুমাতে দিত না। জানোয়ারের মতো ব্যবহার করত। সইতে না পেরে একদিন শয়তানটাকে লাথি, চড় আর গলা ছেড়ে গাল দিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়েছিল বাংটু। স্বয়ং সজব ভুঁইয়া ঝগড়ার কারণ জানতে চাইলে লজ্জায় বলতে পারেনি। অথচ খচ্চর চ্যাংড়ার দল বাংটু ও জহিরের সম্পর্কটা নিয়ে বাজে কথা বলে মজা পায়, কেউবা বাংটুকে দু'হাতের আঙুলকে দুটি প্রতীক বানিয়ে দেখিয়েও দেয়। বড়বাড়িতে আলাদা বিছানায় শুয়েও অসভ্য ট্যারার খপ্পর থেকে মুক্তি পায়নি বাংটু। ঘুমন্ত বাংটুর কাঁথা পেচ্ছাপ করে ভিজিয়ে দিয়েছিল একদিন এবং পরদিন গ্রামের সকলকে বলে বেড়িয়েছে, 'নিঁদ গেইলে বাংটু মুতিয়া বিছানা ভাসায় দিছে বাহে!'

নতুন করে সেই ঘটনার ফাঁদে ফেলে বাংটুকে লজ্জা দিয়ে বউটির আনন্দ পাওয়ার হীন স্বার্থপরতা দেখে বাংটুর মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে। ভাবে, পোড়ের আগুন তপিয়ে বেশরম বউটার কুড়কুড়ি জাগছে বোধহয়।

'তোর ঢোঁড়া চাচাও বউ তালাক দিয়া শুনি ফের বিয়া করার জন্য পাত্রী খোঁজে। তোর মাও কয়...

বাংটু ধমকের গলায় বলে, 'যাদুর সাথে দেশ নিয়া দরকারি কথা কই, আর তোমার মুখে নাইকামের ফ্যাদলা চাচি। হামরা কোন্ঠে থাকি, কী খাই, কাঁয় কোন্ঠে বিয়া করে, তা নিয়া মানুষের বাইগনবাড়ি জ্বলে ক্যানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য চাকরের মুখে আপন লজ্জাস্থানের তাপ নির্ণীত হতে দেখে নজিবরের বউ অপমানিত বোধ করে। স্বামীকে শুনিয়ে বলে, 'শয়তানটার কথা শোনো। ভালো কথা পুছ করনু, আর হারামজাদার মুখের ভাষা দেখো...

বাংটু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। নজিবরের বউকে আজ উচিত জবাব দিতে পেরে হালকা লাগে নিজেকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে কুয়াশার ভেতর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় সে।

বড়বাড়ি এখনো সুনসান, ঘরে ঘরে ঘুমের স্তব্ধতা, জানালা-কপাট বন্ধ। প্রকাণ্ড ঘরগুলোর টিনের চাল বেয়ে টপটপ শীত ঝরছে। শীতভেজা আঙিনা পেরিয়ে বাংটু পেছনের খুলিতে যায়। বাড়ির পেছনের খোলা প্রাঙ্গণকে ভুঁইয়ার খামারবাড়ি বলা চলে। একদিকে গোয়ালঘর, খড়ের অতিকায় পুঞ্জ, আরেক দিকে চাকরদের ঘর এবং নিকানো উঠানে মাড়াই হওয়ার অপেক্ষায় ধানের আঁটির পাহাড়। খোলা জায়গাটার ওপারে ভিটার সৌন্দর্য হিসেবে সার বাঁধা সুপারির গাছ, আম-কাঁঠাল-জামবুড়ার বড় গাছ, এমনকি ভূতের থান হিসেবে একটি পুরনো তেঁতুলগাছও আছে। তেঁতুলগাছে এক ল্যাংটা পেত্নিকে এ বাড়ির অনেকেই তো বটে, স্বচক্ষে মজিব ভুঁইয়াও একবার দেখেছে। বড় বাড়ির সব সম্পদ ও রহস্য যখন আজ কুয়াশার চাদরে ঢাকা, খোলানের এক কোণে পোড় সাজিয়ে আগুন জ্বেলেছে ট্যারা জহির। বাড়ির সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠাটা চাকরদের জন্য বাধ্যতামূলক। এতক্ষণ একলা আগুন পোহাচ্ছিল ট্যারা, বাংটুকে দেখে হুঁকো টানায় বিরতি দিয়ে দাঁত কেলায়। আসলে কথা বলার আগে তার বড় দাঁত দুটি ইয়ার্কি দেওয়া হাসির মতো এভাবেই প্রকাশ পায়।

'হুঁকার ডাক শুনিয়া ছুটি আসলু? বেলা না উঠলে আইজ আর কাম হবার নয় রে বাংটু।'

হুঁকার ডাক অগ্রাহ্য করে বাংটু গইল ঘরের ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যায় ট্যারা জহির গরু গোয়ালে তুললে ভোরে গরু বের করার দায়িত্ব বাংটুর। ছোট মনিবের সাড়া পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে গরুগুলো উঠে দাঁড়ায়। কেউ-বা প্রাতঃকালীন সরব ক্রিয়ার মাধ্যমে বাংটুকে স্বাগত জানায়। কিন্তু গইলের ভেতরে এখনো আঁধার জমাট বেঁধে থমকে আছে। বাংটু বক্করকেও থমকে দাঁড়াতে হয়। আঁধারভেদী দৃষ্টিকে শাণিত করার চেষ্টাটা এখন এত তীব্র যে, কোণে বাঁধা গাইয়ের ওলানে দুধখেকো দাঁড়াশ সাপটাও যেন পষ্ট দেখতে পায়। আসলে গোয়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে দাঁড়াশ সাপের দুধ খাওয়ার গল্পটা বহুজনের কাছে শুনেছে। ট্যারা একবার এক চক্ষে এই গোয়াল থেকেও দাঁড়াশ সাপ বেরোনোর দৃশ্য দেখে গল্প করলে বিশ্বাস করেনি বাংটু, কিন্তু মনে মনে ঠিকই আমল দিয়েছে। ফলে সকালে গোয়ালে ঢুকলেই নিজের অজান্তে সতর্ক হয়ে ওঠে বাংটু, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। গোবর-চোনার উৎকট গন্ধে ভারি ঠাণ্ডা বাতাস বুকে নিতে নিতে যখন গোয়ালের ভেতরটা খানিকটা স্পষ্ট হয়, বাইরে থেকে ট্যারা জহিরের বিকট সুরের গান শুনতে পায়। বাংটুর উদ্দেশেই গান ধরেছে ট্যারা।

যখন সে গরুগুলো পোয়ালের পুঞ্জের চাকদিকে বেঁধে দেয়, ট্যারা জহির তখন বেসুরো গান দিয়ে কথা বলে, 'কীসত গোসা হলু রে/ নাল বাজারের চ্যাংড়া বন্ধু রে/ ও বন্ধু নিদেরও আলিশে/ হাত পড়ে বালিশে/ চেতন হয়া দেখোঁ মুই বন্ধুয়া নাই মোর পাশে...

ট্যারার গান শুনে মেজাজ ক্ষিপ্ত হলেও সাপের ভয় খানিকটা কমে যায়। গানের আওয়াজকে সাপ তাড়ানো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে নিজেও গরুর সঙ্গে কথা বলে, 'কুত্তাভোকা গান শুনিয়াও ঘুম ভাঙে না বলদের! ওঠ, ওঠ শালা, হুট হাট।'

গোবর-চোনা এড়িয়ে একে একে আটটা গরুর দড়ি-খুট হাতে নিয়ে, পোয়ালের পুঞ্জের চারদিকে এনে বেঁধে দেয় বাংটু। এঁড়ে বাছুরটাকে বের করার সময় বাছুরের হুড়কো টান সামলাতে না পেরে বাংটুর একটি পা এক তাল গোবরের মাঝখানে পড়ে যায়। গোবরের ভেতরের উষ্ণতা অনুভব করেও গা ঘিনঘিন করে। তীব্র অস্বস্তিবোধ নিয়ে বাছুরের পিছে দৌড়ায় সে।

এঁড়েটাকে পুঞ্জের পাশে দড়িবাঁধা করে তার পিঠে জোরে একটা থাবড়া দিয়েও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না বাংটুর। পায়ের গোবর ধানের আঁটিতে মুছতে মুছতে, বানরের মতো তরতর করে সে ধানের আঁটির উপরে উঠে যায়। তারপর একটার পর একটা ধানের আঁটি এমন ক্ষিপ্র গতিতে নিচে ছুড়তে থাকে, যেন ট্যারাকে চাবকাচ্ছে। ছোটটি কাজ শুরু করলে বড়টিও আর পোড়ের উত্তাপে অলস বসে থাকতে পারে না। হাল নিয়ে মাঠে যাওয়ার আগে, ধানের মৌসুমে ধানের আঁটির 'মাড়া' সাজিয়ে গরু খচিয়ে ধান মাড়াই করা এ বাড়ির চাকরদের প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক কাজ।

কর্তব্যকর্মে বাংটুর আজ এমন উৎসাহ দেখে 'বেশ্বকর্মা' বলে বিদ্রূপ করে জহির। তারপর লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে নিকানো খুলিতে ধানের আঁটি বিছিয়ে মাড়া সাজাতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতের সকালে ধান মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত থাকলে শরীর থেকে শীতবোধ যেমন উবে যায়, তেমনি পেটের খিদেটাও চনমন করে বাড়তে থাকে। একসময় কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে পুব আকাশে নিস্তেজ সূর্য ইঙ্গিত করে হালের সময়। তখন ধান মাড়াইয়ের কাজে আজকের মতো ক্ষান্ত দিয়ে, বলদ জোড়াকে খৈল-পানি খেতে দিয়ে বাংটু ও ট্যারা হাতমুখ ধুতে যায়। হাল নিয়ে মাঠে যাওয়ার আগে রান্নাঘরের বারান্দায় খেতে আসে তারা।

রাঁধনঘরে সকালের নাশতা তৈরি হচ্ছে। ঘিয়ে ভাজা পরোটার গন্ধ চুলার আগুন ধোঁয়ায় মিশে সারা আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ছে যেন। সেই গন্ধের টানেই কি না কে জানে, ধানের মাড়ার ধান খুঁটে খাওয়া মুরগিগুলো এখন উঠানেও ছোটাছুটি করছে। চারদিকে প্রকাণ্ড টিনের ঘরগুলো নিয়ে মাঝখানে প্রশস্ত উঠান। সুপুরি গাছের পাতায় বানানো ঝাঁটা নিয়ে কাজ শুরু করেছে নয় বছরের ফেলানি। ছোট হলেও মেয়েটা আঙিনা-ঘর ঝাঁট দেয় ভালো। ফেলানির মা এখন রাঁধনঘরের কামে।

উঠানঘেরা ঘরগুলোর টিনের চাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ও শীত ঝরে আঙিনায় লম্বা এক সার ছোট গর্ত সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মের ধূলিবালিতে ঢেকেও যায় আবার। আজ সকালের কুয়াশা ঝরেও গর্তগুলো ভিজে আছে। সেই ভেজা গর্তে কেঁচো কি ঘুগলি খুঁজছিল একটি ডেকি মুরগি। বাড়ির পেছনের খোলানে ধান মাড়াইয়ের ধানখেকো মুরগির দল থেকে একটি লাল মোরগ কক কক ধ্বনি নিয়ে আঙিনায় ছুটে আসে এবং গর্তের কেঁচোখেকো ডেকিটার মাথার ঝুঁটি কামড়ে ধরে তার শরীরের ওপর উঠে বসে। সকালের খাওয়ার অপেক্ষায় রান্নাঘরের দাওয়ায় অপেক্ষার সময়ে দশ হাত দূরেই মোরগ-মুরগির মিলন দেখে বাংটু রান্নাঘরে চোখ ফেরায়। কিন্তু জানোয়ার ট্যারা জহির বেশরম খুশির সঙ্গে কথা বলে, 'ক্যারে বাংটু, এই মোরগটাকে না খাসি করিয়া দিছিনু? এটা ফের কোন মুরগা?'

বাংটু মোরগের কাণ্ড বা ট্যারার আনন্দ ফিরেও দেখে না আর। দামড়ি গরু বা হাইলন ছাগির ডাক উঠলে ষাঁড় কিংবা পাঁঠা দেখানো, ভাদ্রমাসী কুত্তা-কুত্তির মিলন বাড়ির বাইরে স্বাভাবিক ভাবা যেতে পারে। তা বলে বাড়ির মেয়েমহলে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখে আনন্দ পাওয়াটা ট্যারার মতো জানোয়ারের পক্ষে সম্ভব। রান্নাঘরে চুলার তাওয়ায় পরোটা ভাজছে মনিবের স্ত্রী। ঘিয়ের কড়া গন্ধ পেটের নেতানো খিদেটাকে চিমটি কাটে যেন। চুলার উল্টাদিকে আগুনের ওপর এক হাত পেতে বসে আছে এ বাড়ির বড় মেয়ে বিউটি। ঠিক এমনি এমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, ঠাণ্ডায় আগুন পোহানোর আরাম কার না ভালো লাগে? চুলার আগুনের তাপ নিতে নিতে পোড়া কাঠের আঙড়া দিয়ে দাঁত ঘষছে সে। কয়লার গুঁড়োমাখা আঙুল ও ঠোঁট, কালো রসের ফাঁকে সাদা দাঁতের ঝিলিক এবং এলো চুল আর গলায় লাল ওড়না নিয়ে যে চেনা মেয়েটি, তাকেও অনেক সময় অচেনা আর রহস্যময় মনে হয়। ভালো করে দেখেশুনে চেনার আগ্রহটাও বাড়ে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নে যে পরিটাকে দেখেছিল বক্কর, সেই পরিটা বেশি সুন্দর ছিল, নাকি বিউটি? কিন্তু খিদের পেটে এসব স্বপ্ন-ভাবনা পোষায় না। বিউটিকে ভালোলাগা আড়াল করতে তার সৎমায়ের দিকে তাকিয়ে বাংটু অধৈর্য কণ্ঠে বলে, 'হামাক ভাত দাও নয়া মা, হালের বেলা যায়।'

রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে দুজন। বিউটির সৎমাই তো এখন বড়বাড়ির একচ্ছত্র কর্ত্রী। পরোটা ভাজার খুন্তি বিউটির হাতে দিয়ে চাকরদের বাসি ভাত রেডি করে সে। বিউটি পরোটা উল্টে দিয়ে কালো রসমাখা দাঁত দেখিয়ে কথা বলে বাংটুর সঙ্গে, 'ও বক্কর, ঢাকায় বলে খুব গণ্ডগোল? লোক মারা গেছে। ইউনিভার্সিটি বন্ধ, ভাইজান তবু বাড়ি আইসে না কেন? আজ নানার বাড়ি গিয়া দেখ তো, নানা কোনো খবর পাইছে কি না।'

সব কাজ রেখে বিউটির আদেশ এখনই পালন করতে পারলেই তো বাংটু বক্কর খুশি হয়। তার একটা কারণ, এ বাড়ির মধ্যে মানিক ভাই আর বিউটিই তাকে আসল নামটি ধরে ডাকে। বয়সে মাত্র তিন মাসের বড় হয়েও বিউটিকে সে বুবু ডাকে, বিউটিও সৎমা ও সৎ ভাই-বোনদের মতো বাংটুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। এলাকার নামকরা মানুষ কাজী চেয়ারম্যানের মেয়ে হিসেবেই নয় কেবল, মানিক-বিউটির মা যে এ বাড়ির বউ হিসেবেও অনেক বেশি যোগ্য ছিল, সেটা তো গাঁয়ের মানুষ এক কথায় সায় দেবে। মায়ের সুনাম বিউটির মধ্যেও খুঁজে পায় বাংটু। কিন্তু মানিকের সৎমাকে তার বড় ভয়, তার দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'চেরম্যান নানার বাড়িত যাই কোনবেলা বিউটিবু? চতলার ভুঁইতে হাল নিয়া যাই যে।'

'হাল ছাড়ি দিয়া যাইস। মুই আব্বাকে কইম এলায়।'

বাংটু মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়। বিউটির যে-কোনো কামের হুকুম পেলে আগ্রহী হওয়ার আরো কারণ আছে বাংটুর। কিছুদিন আগে নানার গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছেলে হান্নানকে বিউটির লেখা একটি চিঠি পৌঁছে দিয়েছিল বাংটু। চিঠিটা আসলে লেখা ছিল মানিক ভাইয়ের উদ্দেশে। হান্নান ঢাকায় যাবে শুনে মানিক ভাইকে দেওয়ার জন্য গোপনে চিঠিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংটুকে দিয়ে সতর্ক করেছিল, 'কাউকে দেখাইস না, কাউকে কইস না।'

সৎমায়ের সংসারে ভাই-বোনের এই গোপন দুঃখভরা চিঠি বহন করতেও বুক টনটন করছিল বাংটুর। ঢাকা থেকে ফিরে হান্নানও হাটের মধ্যে বাংটুকে ধরে চায়ের দোকানে বসিয়ে গজা আর চা খাইয়েছে। বিউটির জন্য মানিক ভাইয়ের লেখা চিঠি গোপনে তুলে দিয়েছে বাংটুর হাতে। বাংটুও সরল বিশ্বাসে সে চিঠি গোপনে বিউটির হাতে এনে দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বার একইভাবে হান্নান তার হাতে চিঠি তুলে দেওয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, 'মানিক ভাইজানের এত চিঠি তোমরা পান কোন্‌ঠে? ফের ঢাকা গেইলেন কোনদিন?'

হান্নানের জবাব সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় বিউটির কাছে সন্দেহটা প্রকাশ করেছিল। বিউটি কাতর গলায় অনুনয় করেছে, 'জীবন গেলেও চিঠির কথা কাউকে কইস না। আর হান্নান ভাইয়ের চিঠিও আনিস না।' ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়েছে বাংটু। কিন্তু মানিক ভাইজান বাড়িতে আসলে তাকে চিঠির কথা বলবে কি না, জিজ্ঞেস করে নেবে বাংটু।

মানিক ও বিউটি সৎমাকে নয়া মা বলে ডাকে, বাংটুও তাকে নয়া মা বলে সম্মান দেখায়। কিন্তু মহিলাটি চাকর-বাকরদের মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। বড় অযত্নে সে চাকরদের বাসি ভাত খেতে দেয়। বাংটুর থালে আজ ভাতের পরিমাণ খুবই কম। অথচ ট্যারার থালায় প্রায় ডবল। রোজই বাংটুর প্রতি এরকম অবিচার হয় — গোশতের বড় টুকরাটা, ভালো হাড় কি মাছের বড় ঠুমা ট্যারার পাতেই বেশি পড়ে। ট্যারা তার বাপের বাড়ির গ্রামের মানুষ বলেই কি? অথচ বাংটু ছোট হলেও ট্যারা জহিরের থেকে কোন কাজটা কম করে? এমনিতে ট্যারা জহিরের চেয়ে বেতন পায় কম, তা বলে খাবারও দেবে কম? গৃহকর্ত্রীর অন্যায় পক্ষপাত অনেকদিন চুপচাপ মেনে নিলেও আজ আর সইতে পারে না বাংটু।

'এই অল্প একনা ভাত খায়া কি একদুপুর হাল বওয়া যায় নয়া মা?'

'পেট ভরলেও তোর চোখ ভরে না। রাইতে গামলা বোঝাই ভাত বাড়িতে নিয়া গিয়া গুষ্টিবাড়ি খাইস, বাসি ভাত বেশি আইসে কোন্‌ঠে থাকিয়া?'

বাংটু যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল, তেমনি দপ করে নিভেও যায়। ভয় হয় তার। রাতের খাবার বাড়িতে নিয়ে খাওয়ার নতুন নিয়মটিও বুঝি বাতিল হয়ে যাবে। কথা না বাড়িয়ে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত ও বেগুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাজি হিংস্র দাঁতে পিষতে থাকে সে।

'ভাত নাই তো একখান পরোটা দিলেই হয় নয়া মা। হাল বওয়ার কি কম খাটুনি?'

বিউটির সহানুভূতিমাখা শান্ত চোখ দুটি যে এতক্ষণ বাংটুর প্রতি নিবদ্ধ ছিল, বুঝতে পারেনি সে। তার দরদমাখা কণ্ঠ শুনে, চোখাচোখি হতেই ভেতরের চনমনে ক্রোধটা কান্নার মতো ভারি হয়ে আসে।

'হয় হয়, পরোটা-আণ্ডা আর এক বদনা চা খায়া চাকররা হাল ধরি যাউক, আর তোমরা পান্তাভাত খায়া পড়তে বইস।'

সরল কথার এমন বাঁকা জবাব পেয়ে বিউটি ঘর থেকে বেরিয়ে কুয়াতলায় যায়। ট্যারা জহির ভাত মুখে গুপগুপ হাসে। তারপর গৃহকর্ত্রীর বিদ্রূপের সঙ্গে যোগ করে, 'চা খাইলে মোর খালি পেসাব বাড়ায়। বাংটু তো একদিন চা খায়া জিভা পুড়ি ফেলাইছে। তা বাদে রাতে বিছানা ভাসায়...

ঘৃণ্য সহকর্মীকে গাল দেওয়ারও রুচি হয় না বাংটুর। থালে পানি ঢেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কুয়াতলায় বদনায় পানি নিয়ে মুখ ধুচ্ছে বিউটি। তার দিকেও তাকায় না আর। গোয়ালঘর থেকে লাঙ্গল-জোয়াল বের করে খুলিতে সশব্দে নামিয়ে রাখে। কিন্তু যত রাগই হোক, তামাক না টেনে কামে গেলে মেজাজ আরো খিঁচড়ে যাবে। হুঁকো-তামাক সাজার কাজটা সাধারণত ট্যারাই করে এবং এ কাজটা সে ভালোই করে। আজ ট্যারার ভরসায় না থেকে বাংটু বক্কর হুঁকো-তামাক নিয়ে কল্কেয় আগুন ভরার জন্য রান্নাঘরে যায় আবার।

লাঙ্গল-জেয়াল কাঁধে, আর বলদ জোড়ার দড়ি হাতে নিয়ে মাঠে যাওয়ার সময় যথারীতি ট্যারা জহিরও সঙ্গে থাকে। লাঙ্গল-জোয়াল একই রকম হলেও বড় বলদ জোড়া তার দখলে। অভ্যাসমাফিক বকবক করতে থাকে ট্যারা। সামনের বছর নাকি ভুঁইয়া তার বিয়ে দেবে। ফেলানি ও তার মা যেমন, তেমনি ট্যারা জহির ও তার হবু বউয়ের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে এ বাড়িতেই। ফেলানির মায়ের হাতের রান্না মুখে তুলতে পারে না ভুঁইয়া। এ কারণে ট্যারা জহিরের জন্য ভালো ঘরের মেয়ে খোঁজা হচ্ছে, যাতে এ বাড়ির রান্নাবান্নার ভারটা নিশ্চিন্তে জহিরের বউয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। আর জহিরের বউ যদি রান্নার দায়িত্ব পায় বাংটুর পেটের ভোক আর চোখের খিদে অবশ্যই দূর হবে। বউকে বলে দেবে জহির, বাংটুকে যেন গোশত-মাছ একটু বেশি বেশি করে দেয়। আর বউ যদি তার কথা না শোনে, 'তা হইলে কিন্তু এই হালুয়া পেনটি হারামজাদির পুকটির ভিতরা সোন্দায় দিম রে বাংটু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ চেনে নাই তো মোক।'

হবু স্ত্রীর সঙ্গে সহকর্মীর বাক্যালাপ মোটে কানে তোলে না বাংটু। তার কানে তখনো বেজে চলেছে বিউটির দরদি কণ্ঠ এবং গৃহকর্ত্রীর বিদ্রূপ। তার আনমনা অবস্থার সুযোগ নিয়ে দড়ি ছাড়া বলদ দুটি আইল ছেড়ে ডান দিকের মরিচ খেতে মুখ লাগায় এবং এক লহমায় কে কতটি চারাগাছ সাবাড় করবে, তারই প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে।

লাঙল-জোয়াল কাঁধে নিয়ে বাংটু ছুটে গিয়ে হাতের পেনটি গরুর পিঠে ভেঙে ফেলতে চায় আজ। সপাং সপ আওয়াজ ওঠে।

ট্যারা জহির পেছন ঘুরে প্রতিবাদ করে, 'শালা, তোকে কতদিন কহিছোঁ না, অবলা জীবকে অমন ডাং দিবু না।'

'চোপ হারামজাদা, তোর বাপের গরু? শালা নিজে একটা জানোয়ার, তার আবার গরুর জন্যে দরদ!'

বয়সে ছোট হলেও বাংটু বক্করের তেজ এত বেশি যে, ভয়ে নয়, একটু সমীহ দেখাতেই যেন অবাক হয়ে জহির তাকিয়ে থাকে।

'তোর এত রাগ ক্যানে রে বাংটু! কও নাই তোকে, হামার মতো গরীব চাকরের এমন হট মেজাজ থাকা ভাল নয় রে। ভুঁইয়া যদি লাথিগুড়িও দেয়, সহ্য না করিয়া হামার উপায় আছে!'

কোনো জবাব দেয় না বাংটু। চাকর হলেও সে যে ট্যারা জহিরের মতো বেহায়া ও বদ নয়, এটা সে প্রমাণ করবে কীভাবে? ভুঁইয়াবাড়ির চাকরির ওপর মন যত বিষিয়ে উঠুক, ভুঁইয়ার কাছে নেওয়া আগাম বেতনের টাকার খাটুনি শেষ না হতেই কাঁধের লাঙ্গল-জোয়াল ছুড়ে দিয়ে পালাবার কোনো পথ খুঁজে পায় না বাংটু বক্কর।

চার

দুপুরে হালের বলদ বিশ্রাম পায়, কিন্তু বাংটু বক্কর আজ নাওয়া-খাওয়ারও সময় পায় না। ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরতেই স্বয়ং মনিবের ডাক। বক্করকে দু'চারজন ছাড়া গ্রামবাসী সবাই বাংটু বলেই ডাকে। সহজভাবে মেনে নিয়ে সাড়াও দেয় বাংটু। কিন্তু মনিবের কণ্ঠে জোরালো বাংটু ডাক শুনলেই কেন যেন বুকখানা ধড়াস কেঁপে ওঠে। তার বাপেরও কাঁপত। মনিবের হাঁকডাক শুনে তো বটে, তার চোখের দিকে তাকালেও বুক কাঁপত সেরাজ বাউদিয়ার। দেওয়ানীর চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে পড়ার ভয়েই বাবা গ্রাম থেকে পালিয়ে থাকে বলে মায়ের ধারণা। বাংটুর পালাবার জায়গা নেই বলেই মনিব ডাকা মাত্র পড়িমরি ছুটে যায়।

সকালে বিউটির নরম গলার আদেশটি ছুড়ে দেয় মনিব, 'মানিকের কোনো খবর আছে কি না, বুড়ার বাড়ি গিয়া শুনি আয়।'

হুকুম পালনে উৎসাহিত হয়ে বাংটু সাইকেলের সমস্যায় মাথা চুলকায়, 'হাঁটি গেইলে তো মেলা টাইম নাগবে। ভাইজানের সাইকেলখান যে রফিক স্কুল নিয়া গেইছে।'

ট্যারা জহির সহকর্মীকে শাসন করে, 'শালা ভদ্রলোকের গাই! কয় মাইল আস্তা? হাঁটি যাওয়া যায় না?'

'মানিক ভাই যদি আসি থাকে, সাইকেলত চড়ায় আনা লাগবে না?'

'পরেশের সাইকেলখান নিয়া যা। আর পরেশ বাড়িতে থাকলে আসতে বলিস।'

বাংটু গায়ের জামাটা ঘাড়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয়।

সজব ভুঁইয়া শ্বশুরকে বুড়ার অধিক মর্যাদা দেয় না, আড়ালে শ্বশুরের চরিত্র নিয়েও গালমন্দ করে। আর নিজে চেয়ারম্যান হতে পারেনি বলে চেয়ারম্যান শ্বশুরের সঙ্গে তার দা-কুমড়া সম্পর্ক। তবে ছেলেমেয়ে দুটিকে নানার কাছ থেকে আলাদা করতে পারেনি। মানিক ছুটিছাটায় গ্রামে এলে নানাবাড়িতেই বেশি দিন থাকে। বিউটিও সৎ ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে বেড়াতে যায় প্রায়ই। আর নানা ও নাতি-নাতনির দূত হিসেবে কাজ করে বাংটুর কাছে চেয়ারম্যানবাড়িও নিজের নানার বাড়ির মতো হয়ে গেছে। চেয়ারম্যানকে সে নানা বলেই ডাকে। সুযোগ পেলে দুই-একটা ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করে।

বাংটু সাইকেল চালানো শেখার পর, এই বিদ্যেটা চেয়ারম্যান নানার বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজনে কাজে লাগায় বেশি। বড়বাড়িতে সাইকেল আছে দু'খানা। মানিক ভাই বাড়িতে না থাকলে তার সাইকেলখানা ব্যবহার করতে পারে বাংটু। কিন্তু নয়/দশ বছরের রফিক বড় ভাইয়ের সাইকেলখানা দখল করে নিয়েছে প্রায়। সিটে বসলে পা পেডেল পর্যন্ত আসে না, পাছা ঝুলিয়ে তল থেকে চালায়, তারপরও সাইকেল ছাড়া দশ হাত দূরেও যেতে পারে না রফিক। অন্যদিকে মনিবের সাইকেল অলস পড়ে থাকলেও হাত দেওয়ার সাহস হয় না কারো। মনিবের খালি চেয়ারে বসার সাহস হয় না যেমন, তেমনি তার সাইকেলের সিটে বসার কথা ভাবলেও পাছা শিরশির করে বাংটুর। মানিকের সাইকেলখানা রফিককে শেখাতে গিয়ে নিজেও কারো সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াই শিখে ফেলেছে বাণ্টু। শিখতে গিয়ে মাত্র দুবার উল্টে পড়েছিল, এখন হাত ছেড়ে দিয়েও চালাতে পারবে। সজব ভুঁইয়া শ্বশুরের চেয়ারম্যানি পেলে নিজের জন্য মোটরসাইকেল আর রফিকের জন্য একটি ছোট সাইকেল কিনবে বলেছে। আবার মানিক ভাই বিয়ে করলে শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটরসাইকেল যৌতুক তো পাবেই, এমনকি মোটরগাড়িও পেতে পারে। তবে বড়বাড়ির এরকম উন্নতিতে বাণ্টু পুরনো সাইকেল স্বাধীনভাবে চালাবার সুযোগ পাবে কি না কে জানে।

পরেশের সাইকেলের জন্য বাণ্টু ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হেঁদুটাড়ি ছুটে যায়। রতনপুরে বড়বাড়ি যেমন, হেঁদুটাড়ির মধ্যে তেমনি সাহা বাবুর বাড়ি। দুই বাড়ির মধ্যে ব্যবধান যাই হোক, নৌকামার্কা রাজনীতির কারণে সজব ভুঁইয়া ও পরেশ সাহা যেন এখন মায়ের পেটের ভাই। বাণ্টুও অবাধে ঢুকে যায় বাবুর বাড়ির ভেতরে।

দুর্ভাগ্য বাণ্টুর, পরেশ কাকা বাড়িতে নেই, সাইকেল নিয়েই একটু আগে বাজারে গেছে। প্রায় মাইল চারেক পথ হেঁটে চেয়ারম্যানের বাড়ি যাওয়া বাণ্টুর জন্য কঠিন কিছু নয়, কিন্তু মনিব সাইকেলে যাওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সাইকেল না পাওয়াটা সহজভাবে নিতে পারে না বাণ্টু। পরেশের বউকে বলে, 'ও কাকি, বড় ভেজালে পড়লাম। কী করি কন তো। কাকার সাইকেলখান নিয়া বড় আব্বা মানিক ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার জন্য জরুরি নানাবাড়ি যাওয়ার হুকুম দিছে। কাকা যে কখন আইসে?'

'মানিক আসছে নাকি রে?'

'সেই খবরটা নেওয়ার জন্যে তো জরুলি চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়া দরকার। ঢাকায় তো গণ্ডগোল। বড়বা তোমার সাইকেলখান নিয়া উড়িয়া যাইতে কইল, কাকাকেও কেনবা ডাকাইল। মানিক ভাইয়ের সাইকেল নিয়া গেইছে রফিকে, কাকাও নাই বাড়িতে। কী সমস্যা কন দেখি!'

পরেশের স্ত্রী পরামর্শ দেয়, 'নরেশ হাটখোলা থাকি ফিরছে। তার সাইকেলখান নিয়া যা।'

পরেশের ছোট ভাই নরেশ কাকার সাইকেল তো নতুন। নরেশের সাইকেল তার ঘরের বারান্দায় উঁকি দিয়ে ডাকছে যেন। আর কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করে এবং আর কেউ দেখার আগেই, সাইকেলখানা নিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বাণ্টু।

গ্রামের বেশিরভাগ হালুয়া-চাষার সঙ্গে সাইকেলের সম্পর্ক নেই, চালাতেও পারে না। বাণ্টু পরের সাইকেল একটু সময়ের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানোর সুযোগ পেলেই 'মুই কী হনু রে' গর্ব-আনন্দ চেপে রাখতে পারে না। সাইকেলে চড়লেই মনে হয়, সে আর বড়বাড়ির চাকর নেই। স্বাধীন মানুষের মতো যেদিকে খুশি ছুটে যেতে পারে। সাঁ সাঁ বেগে সাইকেল ছুটলে মন এমনিতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে বাংটুর। আজকের আনন্দ আরো বেশি। কারণ যাচ্ছে কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের বাড়ি। জিজ্ঞেস না করলেও চেনা পথচারী দু'একজনকে নিজের গন্তব্য ও যাওয়ার কারণ চেঁচিয়ে জানায় সে।

মানিকের চেয়ারম্যান নানা যে তার ভুঁইয়া বাপের তুলনায় অনেক বেশি গণ্যমান্য মানুষ, এটা এলাকার সবাই জানে, এমনকি মানিকও নিশ্চয় তা মানে। বাপের চেয়েও তাই নানার সঙ্গে তার মাখামাখি সম্পর্ক বেশি। সজব ভুঁইয়ার জায়গাজমি বেশি, তার ওপর শেখ মুজিবের দল করে। কিন্তু ভোটে দাঁড়িয়ে চেয়ারম্যান শ্বশুরকে হারাতে পারেনি একবারও। বিপদ-আপদে রতনপুরের মানুষজনও কাজী চেয়ারম্যানের কাছেই ছুটে যায়, অনেকে জামাইয়ের বিরুদ্ধে শ্বশুরকে অভিযোগ শোনায়। এমন নামিদামি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা তো গর্বের কথা। বাংটুর শুধু চেনাজানার সম্পর্ক নয়, চেয়ারম্যানের অন্দরমহলেও অবাধ যাতায়াত। চেয়ারম্যানের আসল নাম যে কাজী আফতাব হাজী, বেটা আমিন কাজী বিহারি মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে নাতি মানিককেও সে ঢাকায় ছেলের বাসায় রাখেনি, চেয়ারম্যানের হালগেরস্তির মালিক যে হরিপুরের সতজন আধিয়ার এবং চেয়ারম্যানের কুজা চাকর, যে চাকর চেয়ারম্যানের চেয়েও বেশি ডাট দেখায় — এসব হাঁড়ির খবর বাংটু ছাড়া বিশদ আর কে বলতে পারবে?

সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে বাংটু সোজা চেয়ারম্যানবাড়ির আঙিনায় গিয়ে নামে। এত বড় মানুষ, পাকা দালানবাড়ি, কিন্তু বাড়িতে আপন বলতে চেয়ারম্যানের কেউ নেই বললেই চলে। চেয়ারম্যানের বড় মেয়ে অর্থাৎ মানিকের মা মারা যাওয়ায় ভুঁইয়া যেমন করেছে, তেমনি চেয়ারম্যানও মানিকের আসল নানি মারা যাওয়ার পর দশ/বিশ বছর আগেই আর একটা বিয়ে করতে পারত। গ্রামে কত ছোটখাটো গেরস্তও শখ করে দুই-তিনটা বিয়ে করে সংসারে অশান্তি স্থায়ী করেছে। কিন্তু চেয়ারম্যান সে পথে যায়নি কেন? মানিক আর বিউটিই নানাকে সৎ নানির অশান্তি থেকে রক্ষা করেছে। তাছাড়া বউ মরার পর চেয়ারম্যানের বিধবা বোনই ভাইয়ের সংসার সামলে রাখে। সেই রাঢ়ি নানিও মানিক-বিউটির কাছে আপন নানির চেয়ে কম না। বাংটু সেই নানিকে শোনাতে ক্রিং ক্রিং বেল বাজায়, বেলে কাজ না দেওয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেঁচিয়ে ডাকে, 'আরে ও বুড়ি কোন্‌ঠে গেইলেন? তোমাকে নিতে পালকি নিয়া হাজির হইছি।'

নানির আগে চেয়ারম্যানের কুঁজো চাকরটি ঘাড়ে ডালা নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বাংটুকে চিনেও ধমক দেয়, 'বাড়ির ভিতরা ঢুকিয়া বেল বাজাইস বেয়াক্কেল চ্যাংড়া! কী খবর নিয়া আসলু?'

'সেটা তোমাকে কইলে হইবে?' চেয়ারম্যান নানাকে কওয়া লাগবে। নানা কই?'

'কাছারিঘরত দেখ গিয়া।'

কাছারিঘরে যাওয়ার আগে বুড়ি নানি বেরিয়ে আসে। বাংটুকে স্বাগত জানানোর হাসি নিয়ে জানতে চায়, 'ও মা! বাংটু না তুই? কী খবর রে, মানিক আসছে বাড়িতে?'

'আরে মানিক ভাইয়ের খবর নেওয়ার জন্যে তো মুই ছুটি আসনু। ঢাকায় মিছিলে গুলি হইছে, খবর পান নাই কিছু?'

'গণ্ডগোল করার মতো মানুষ তো নয় মানিক। আল্লার কলমাকালাম আর নিজের বই পড়া ছাড়া কিছুই বোঝে না। ইউনিভার্সিটি বন্ধ দেখিয়া মনে হয় মামার বাসায় গিয়া উঠছে। তা বিউটিকে নিয়া আসলি না কেন?'

বাংটুর এই প্রথম মনে পড়ে, এ বাড়িতে সাইকেলে আসার অতি উৎসাহে বিউটিকে জিজ্ঞেস করাও হয়নি, গোপনে নানা-নানিকে বলার মতো তার কোনো খবর আছে কি না। বিউটি না বললেও বাংটু যা জানে, তাই নির্ভয়ে চাপা গলায় পরিবেশন করে। ভাইয়ের মতো বিউটিও নানাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করলে অনেক বেশি ভালো থাকত। কিন্তু ভুঁইয়া মেয়েকে এ বাড়িতে আসতে দেয় না কেন জানেন? চেয়ারম্যান হইতে না পারার ঝাল-দুঃখ বড় কথা নয়। আসল কারণ সতীনের বেটি বাড়িতে না থাকলে দজ্জাল সৎমা জ্বালাবে কাকে? ভুঁইয়ার নয়া বিবি চাকর ট্যারা জহিরকেও আপন ভাতিজার মতো খাতির করে। তার কারণ কী জানেন? ট্যারাকে দিয়ে গোপনে ফি হাটে ধান-সরিষা কি কোষ্টা বেচে নিজের তবিল বাড়ায়। স্বামীকে মানিক-বিউটির নয়া মা রোজ রাইতে কী কানপড়া দেয় জানেন? মানিক-বিউটির নানার তো মেলা আছে, ভুঁইয়া যেন তার সম্পত্তি ছোট বউয়ের বেটা-বেটির নামে লিখে দিয়ে যায়। আর ভুঁইয়ার কাছেও গ্রামের মানুষ বেশি বিচার-সালিশ নিয়া যায় না, তার কারণ কী জানেন? ঘরের খাইষ্টা স্বভাবের দজ্জাল বউ হাজার দোষ করলেও ভুঁইয়া বউকে লাথিগুড়ি দূরে থাউক, চড় দিতেও ভয় পায়। এমন বউয়ের ভারুয়া চেয়ারম্যান হইলেই-বা কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালের বিচার করবে মানুষের! কন নানি কথা ঠিক কি না।

রাঢ়ি নানি সহাস্য সম্মতি দিয়ে খবর দেয়, 'সেই জন্যে চেয়ারম্যান মানিকের বিয়া দিবার চায়। বিয়ার পর মানিক টাউনে বাসা নিয়া থাকলে বিউটিটাও সেখানে থাকতে পারবে। ভাই-ভাবির কাছে থাকি ভালো পরিবেশে লেখাপড়া শিখতে পারবে বিউটি। মামার বাসায় তো বিহারি মামির কারণে ভাই-বোন কেউ থাকতে চায় না।'

বিউটিকে শহরে রাখার চিন্তাটা তেমন পছন্দ হয় না বাংটুর। বলে, 'খালি টাউনে পাঠাইলে সমস্যার সমাধান হয় নানি? যাই হউক, আগে মোর সমস্যার সমাধান করো।'

'তোর ফির কী সমস্যা রে?'

'ও বুড়ি, হাল ছাড়ি দিয়া ডাইরেকট আসনু। তার ওপর এতরখান ঘাটা সাইকেল দাবড়ানোর খাটনি কম? পেটত কিন্তু আগুন জ্বলতেছে, এই আগুন ঠাণ্ডা না করলে হালুয়া পেন্টি হাতত নাই তো কী, সাইকেল তোমার পিঠিত ভাঙিম।'

বাংটুকে মরদ স্বামীর ভূমিকায় দেখে বুড়ি মজা পায়। হাসুর মাকে ডেকে আদেশ করে, 'তাড়াতাড়ি হারামজাদাকে খাইতে দে, না হইলে সাইকেল মোর পিঠিত আছড়ে ভাঙবে।'

হাসুর মা বারান্দার টেবিলে ভাত-তরকারি এনে সাজিয়ে দেয়। চেয়ারে বসে খাওয়া শুরু করে বাংটু। এ বাড়িতে এলে নিজেকে চাকর-বাকরের মতো তুচ্ছ মনে হয় না। সাইকেলে আসা ভদ্রলোক অতিথির মতো টেবিলে বসে বড় তৃপ্তির সঙ্গে লাউয়ের ঝোল আর পুঁটি মাছের চচ্চড়ি দিয়ে অনেকটা ভাত খায় বাংটু। বুড়ি নানি তখন বিউটিকে দেওয়ার জন্য এটা-সেটার পোঁটলা বাঁধছে, যা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে বাংটুকে নিয়ে যেতে হবে।

খাওয়ার পর হাসুর মায়ের কাছে পান-সুপারিও চেয়ে নেয় বাংটু। বুড়ির দেওয়া পোঁটলা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে নানির কাছে বিদায় নেয়। ফেরার আগে নানার সঙ্গেও দেখা করা দরকার। কারণ মানিকের খবরটা বুড়োর কাছে কিছু না শুনে গেলে বড়বা রাগ করবে। কাজী চেয়ারম্যান বাইরের কাছারিঘরে বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে। বিচার সালিশ যে নয়, তা কাছারিঘরের সামনে রাখা একখানি মোটরসাইকেল দেখে এবং ভেতরের আধো কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারে বাংটু।

কাছারিঘরে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন ভদ্রলোক, টাউনের কোনো অফিসার বোধহয়। অন্যান্যের মধ্যে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও জসিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেম্বারকে চিনতে পারে বাংটু। চেয়ারে বসা এত সব বিশিষ্টজনের মধ্যে সাদা টুপি ও বিলকুল পাকা চাপ দাড়ি নিয়ে চেয়ারম্যানই যে আসল কাজী, সেটা তার মতামত শোনার জন্য লোকদের অপেক্ষা ও আগ্রহ থেকেও বোঝা যায়। আসলে কথা হচ্ছিল ঢাকার পরিস্থিতি তথা শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানকে নিয়েই। আলোচনা কাছারিঘরেও বেশ উত্তাপ ছড়িয়েছে, সেটা প্রিন্সিপালের কথা শুনেও বুঝতে পারে বাংটু।

'ইয়াহিয়া বলেন আর আর্মি বলেন, শেখ মুজিবকে বিশ্বাস করবে কেমনে? ভোটে জেতার পর পাকিস্তানের উন্নতির জন্য, মুসলামানদের উন্নতির জন্য কোনো ওয়াদা পর্যন্ত দেয় নাই। পাইছে একখান জয় বাংলা স্লোগান, মুখে খালি বাঙালি বাঙালি বললেই বাঙালি কি মুসলমানি পরিচয় ভুলি থাকবে? চেয়ারম্যান চাচা বলেন তো, ভারতের হিন্দু বাঙালি আর পাকিস্তানের বাঙালি কি এক জাতি হইবে কোনোদিন?'

কাজী চেয়ারম্যান রায় দেয়, 'ভারতের উস্কানিতেই যে মুজিব নাচে, সেটা বাঙালি মুসলমনারা এখনো টের পায় নাই। যতই জয় বাংলা হাঁকুক, বাঙালি মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ মানবে, তবু ভারতের হিন্দুদের পায়ের তলে থাকতে চাইবে না, অসম্ভব।'

'ঢাকায় ছাত্ররা মিছিল-মিটিংয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের দাবি তুলেছে, এর পেছনে মুজিবের সমর্থন বা ষড়যন্ত্র নাই মনে করেন?'

'যুক্তফ্রন্টের সময় গদি পাইয়াও এরা পাকিস্তান শাসনের যোগ্যতা দেখাইতে পারে নাই। শেখ মুজিব মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য সেসময় কী করছে, ভুলে গেইছেন সে ইতিহাস? এবারেও ক্ষমতা না পাইয়া মুসলমানদের বড় রাষ্ট্র পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে তাল দিতেছে অনেকেই। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র চালার ক্ষমতা যেমন মুজিবের নাই, তেমনি পাকিস্তান ভাঙাও এত সহজ না।'

বাংটু ভদ্রলোকদের পলিটিক্স ও ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা ভালো না বুঝলেও, চেয়ারম্যান নানা যে জয় বাংলা ও শেখ মুজিবের ঘোরতর বিরোধী পক্ষ, সেটা ভালো করেই জানে। দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা খুঁটতে খুঁটতে ভেতরের কথা শুনছিল সে। তার মতো আরো কয়েকজন কামলা-কিষাণ শ্রোতা আছে বলেই হয়তো বাংটুর দিকে কারো নজর নেই। অগত্যা নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করার জন্য বাংটু ঠাট্টার গলায় বলে, 'ও নানা, জয় বাংলা ভোটে জেতার পর এলাও আপনে মাউরা বিহারির পক্ষে কথা কন! মুজিব ক্ষমতায় যাউক আগে, তোমাকে ভালো মতো টাইট দেওয়া হইবে।'

ঘরের সবাই তাকায় বাংটুর দিকে। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বিস্ময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করে বলে, 'কোন চ্যাংড়া বাহে তুই! ঠিক চিনলাম না তো।'

বাংটু আত্মপরিচয় দেয়, 'জয় বাংলার বাড়িতে থাকি, আমিও জয় বাংলা। রতনপুরের খালি ভুঁইয়া আর সাহা বাবুরা নয়, হামার গ্রামের সবাই জয় বাংলা। শেখ মুজিবের পক্ষে।'

কাজী চেয়ারম্যানের ঠোঁটে হাসি ফোটে। বাংটুকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'ভুঁইয়ার চাকরও কীরকম পলিটিশিয়ান হইছে দেখেন। তা কী খবর আনলি রে বাংটু? মানিক-বিউটির কী খবর?'

'ভাইজানের খোঁজ নিতে বড়বা আমাকে পাঠায় দিলে। সাইকেল নিয়া আসলাম ভাইজানকে নিয়া যাওয়ার জন্য। ভাইজান তো শুনলাম এলাও ঢাকা হইতে আইসে নাই।'

'দু'চারদিনের মধ্যেই নিশ্চয় আসবে। তুই যা ভেতরে, তোর নানি দেখ বিউটির জন্য কিছু দেয় নাকি?'

'নানির সাথে আমার কথাবার্তা খাওয়া-দাওয়া কম্পিলিট হইছে। মানিক ভাই আসলে বাড়িতে পাঠায় দেবেন তাড়াতাড়ি। বিউটিবুর কোনো খবর থাকলে আসব আবার। আমি এখন যাই নানা। মানুষের সাইকেল করজ নিয়া আসছি।'

নৌকা ও জয় বাংলার পক্ষে থাকলেও চেয়ারম্যান নানার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা যে বাংটুরও কিছুমাত্র কম নয়, তা সবাইকে দেখিয়ে দিতে বিদায় নেওয়ার আগে বুড়াকে কদমবুসি করতে যায় সে, 'ও নানাজি, তোমার পলিটিক্সের কথা শুনিয়া সালাম দিতেও ভুলি গেছিনু। ঠ্যাংখান বাড়ায় দেন তো, একনা চিমটা দিয়া যাই।'

চেয়ারম্যান হেসে বাংটুর মাথায় আদুরে চাটি মারে, 'যা হারামজাদা, সালাম করা লাগবে না। বিউটিকে গিয়া কইস, মানিক মনে হয় রাস্তায় আছে।'

যাকে সঙ্গে করে নেওয়ার জন্য সাইকেলে প্রায় দুই ক্রোশ পথ ভেঙে হরিপুরে আসা এবং যার দেখা না পাওয়ার হতাশায় ফেরার পথে সাইকেলের গতি এমনিতে মন্থর হয়ে যায়, আল্লাহ যে ইচ্ছে করলেই তাকে হঠাৎ আসমান থেকে বাংটুর একদম চোখের সামনে হাজির করাতে পারে, স্বপ্নেও ভাবেনি বাংটু। উল্টা দিক থেকে আসা মানিককে দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না বাংটুর। জোড়া মানুষের একটি সাইকেলে, রডের ওপর বসে আছে মানিক। চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে ছুটে আসছে সাইকেলখানা। ভালো করে দেখার জন্য একটানা দৃষ্টি দিতেই রাস্তার লিকে ধাক্কা খেয়ে বাংটুর সাইকেল উল্টে পড়ার উপক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে, ব্রেক কষে নিজেই নামে। সামনে ছুটে আসা সাইকেলটিও থামতে বাধ্য হয়।

মানিকও বিস্মিত, জানতে চায়, 'কী রে বক্কর তুই এখানে! নানার বাড়িতে গেছিলি?'

'বুড়া কইল যে তোমরা রাস্তায়, আমি তো বিশ্বাস করি নাই ভাইজান।'

'নানাজি জানল কেমনে? আমি তো ট্রেন থেকে নেমে খবর দেওয়ারও কাউকে পাইনি। বাসেদ মামাই দেখে জোর করে সাইকেলে তুলে নিল। তা নানাজির কী খবর রে, ভালো আছে?'

'ভালো মানে, কাছারিঘরে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আর মেম্বারকে নিয়া জয় বাংলার বিরুদ্ধে পলিটিক্স করতে আছে। ওদিকে বিউটি আর বড়বা তোমার চিন্তায় আধমরা।'

সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বাঁধা ব্যাগটি খুলে নেয় মানিক। শহর থেকে এলে সাধারণত স্টেশন থেকে সোজা নানাবাড়িতেই আগে ওঠে মানিক। কিন্তু আজ বাংটুকে দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। বাহককে বলে, 'ও মামা, আপনি নানাজিকে আমার খবরটা দেবেন। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি আগে।'

ক্যারিয়ারে ব্যাগ বেঁধে নিয়ে, মানিক বাংটুর সাইকেলের রডে ওঠার আগে দ্বিধা নিয়ে বলে, 'তুই কি চালাতে পারবি?'

মানিক ভাইয়ের মতো মানুষকে নিয়ে সাইকেল চালানোর কথা ভাবেনি কখনো। জোর করে তাকে সামনে বসিয়ে বাংটু আজ যখন সাইকেল চালায়, বারবার মনে হতে থাকে, এই দৃশ্য যদি সজব ভুঁইয়া আর বিউটি দেখতে পেত! সাইকেল জোরে চালাতে গিয়ে হাঁফায় বাংটু, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না। আবার থুতনির কাছে ভাইজানের মাথা দেখে চুপচাপ থাকতেও পারে না।

'আচ্ছা ভাইজান, চেয়ারম্যান নানা দরবেশও নাকি? তোমরা যে আস্তায় আছেন, আগে থাকি জানল কেমনে?'

'নানাজি তো আগেই চিঠি দিয়া আমাকে আসতে কইছে।'

'নানাজি আইজ কয়, শেখ পাওয়ার পাইলেও দেশ চালাইতে পারবে না। কথাটা কি ঠিক ভাইজান?'

'আরে ও বুড়ার কথা বাদ দে।'

মাথার ওপরে বাংটুর সঘন তপ্ত নিশ্বাস, তার ওপর ওর কথা বলার ক্লান্তি না বাড়াতে মানিক চারপাশে চেনা প্রকৃতির রূপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

রেসকোর্সের সভায় শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ শুনবে বলে মানিক ৮ তারিখ সকালে ট্রানজিস্টর হাতে বাড়ির কাছারিঘরের বারান্দায় বসে। যে ভাষণ লাখ লাখ মানুষ একযোগে শুনেছে, তা ঘরের কোণে একা শোনাটা মানায়? ভুঁইয়াবাড়ির কাছারিঘর ফাঁকা থাকে না সাধারণত। কিন্তু এখন ফাঁকা। রেডিয়োর আওয়াজ শুনলে নিশ্চয় ছুটে আসবে। মানিকের আব্বা যেহেতু বাড়িতে, সে তো শুনবেই। পিতার জন্য নির্ধারিত চেয়ার খালি রেখে মানিক অন্য চেয়ারে বসে। হাতের বই ও ট্রানজিস্টরখানা নামিয়ে রাখে বেঞ্চের ওপরে।

কাছারিঘরের বেড়ায় সাঁটানো পুরনো পোস্টার দুটি এখনো অক্ষত দেখে অবাক হয় মানিক। ভোটের সময় লাগানো হয়েছিল। একটিতে বড় হরফে জিজ্ঞাসা — সোনার বাংলা শ্মশান কেন। জবাব হিসেবে নিচে দেখানো হয়েছে গত ২৪ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা পূর্ব পাকিস্তানকে কতভাবে শোষণ করছে তারই কিছু তথ্য পরিসংখ্যান। অন্য পোস্টারটিতে এ শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কায় ভোটদানের আহ্বান, যার ওপরের অংশে আহ্বানকারী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের আঙুল তোলা রুদ্র মূর্তি। ভোটের আগে নৌকা মার্কার আরো কিছু পোস্টার পড়েছিল। ছিঁড়েফেড়ে গেছে, কিন্তু শেখ মুজিবের পোস্টারটা ছেঁড়ার কেউ সাহস পায়নি বোধহয়। তবে ছবিতে শেখ মুজিবের গোঁফটাকে কাঠ-কয়লা দিয়ে গরুর লেজের মতো প্রায় একহাত লম্বা করে দিয়েছে কোনো দুষ্ট চ্যাংড়া। মানিকের ছোট ভাই রফিকের কীর্তি হতে পারে।

পোস্টার দুটিকে পেছনে রেখে বারান্দায় বসলে, সামনের কাঁচা সড়ক পেরিয়ে ধু-ধু ফসলের প্রান্তর। ডানদিকে হিন্দুটাড়ি ও মাইলখানেক দূরে ভাটিয়াপাড়ার সবুজ গ্রাম এবং তার ফাঁকফোকর দিয়ে তিস্তা নদীঘেঁষা বাঁধ-সড়কটাও চোখে পড়ে। শহর থেকে বাড়িতে এলে, খানকাঘরের বারান্দায় বসলেও আজন্ম পরিচিত প্রকৃতির সঙ্গে সহজ একাত্মতা ও ভালোলাগার বোধ জাগে। কিন্তু আজ মানিকের মন প্রকৃতির দিকে নেই। রেডিয়োর দেশাত্মবোধক গান ও গানের সঙ্গে পুরো আন্দোলনমুখর শহর চেতনায় সাড়া জাগায়। বাড়িতে আসার পর, পুরনো বইপত্রের মাঝে রক্তশপথ নামে একটা পুরনো একুশে সংকলন খুঁজে পেয়েছে মানিক। সংকলনটি চোখের সামনে মেলে ধরে। নাম থেকে শুরু করে সম্পাদকীয় এবং প্রায় সব লেখা বর্তমান পরিস্থিতির

সঙ্গে খুব প্রাসঙ্গিক। কিন্তু পত্রিকার ভেতরে বেমানানভাবে নিজের প্রেমের কবিতা দেখে নিজেও লজ্জা পায় মানিক।

আসলে মানিক যেমন সহপাঠী আরিফের মতো রাজনীতির নেতাকর্মী নয়, তেমনি সম্ভাবনাময় কবি হিসেবেও কেউ চেনে না তাকে। একাকিত্ব ও ভাবনা-অনুভূতির তীব্রতা নিয়ে অনেক সময় কিছু লেখার চেষ্টা করে। আরিফ তাদের সংগঠনের পক্ষে এবার একুশের সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই সংকলনে মানিককেও কিছুটা জড়িত করেছিল সে। মানিকের কাব্যপ্রতিভার কারণে নয়, প্রেসকে দেওয়ার জন্য মানিকের কাছ থেকে দুইশো টাকা ধার নিয়েছিল বলেই হয়তো। টাকাটা আরিফ এখনো তাকে ফেরত দেয়নি। তবে মানিকের ভালোবাসার ভিখিরি নামক কবিতাটি পড়ে হেসেছিল। একুশের সাহিত্য সংকলনে আরিফের রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি যেমন মানিকের ভালো লাগেনি, আরিফেরও হয়তো ভালো লাগেনি মানিকের নিভৃত প্রেমপিপাসার আবেগ। ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তুই শালা বড়লোক জোতদারের ছেলে, ভেক নিয়েছিস ভিখিরির!' মুখে যাই বলুক, কবিতাটি ছেপে দেওয়ায় উৎসাহিত হয়েছিল মানিক।

নিজের কবিতাটি পড়ে আজ নিজেও লজ্জা পায় মানিক। আগুন জ্বলা দেশ নিয়ে লক্ষ মানুষ যখন দেশপ্রেমের আবেগে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তখন কল্পিত প্রেয়সীকে নিয়ে নিভৃতে পালানোর চিন্তা বড় অসঙ্গত মনে হয় তার। আরিফ হয়তো এ জন্যই মিছিল-আন্দোলন ছেড়ে মানিকের বাড়িতে আসার সিদ্ধান্ত শুনে বিদ্রূপ করেছিল। কিন্তু অগ্নিগর্ভ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে নিরাপদ গ্রামে চলে আসার পরও দেশের কথা ভেবে দেশকে ভালোবাসার আবেগে এত ছটফট করছে কেন মানিক? রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার। দেশকে নিয়ে একটি কবিতা লেখারও চেষ্টা করেছে সে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরও ছাত্ররাজনীতি থেকে দূরে দূরে ছিল। কোলাহল ও ঝগড়াঝাঁটি ভালো লাগে না তার। আরিফের মতো মার্কসবাদ বোঝে না, দেশের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়নি তেমন, কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে কি দেশপ্রেম থাকতে নেই? তাই যদি হবে, বাঙালি জাতির জাগরণ দেখে তার মধ্যেও এতো আলোড়ন কিসের? মিছিল-মিটিঙে গিয়ে স্লোগানে-ভাষণে গলা ফাটায়নি, তা বলে এই দেশ এবং দেশবাসীর জন্য তার মঙ্গলকামনা আর কারো চেয়ে কম?

মানিক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে ছড়ানো জন্মভূমির রূপবৈচিত্র্য দেখে। সামনের উন্মুক্ত ধু-ধু প্রান্তরে আইলঘেরা অসংখ্য চষা ভূঁইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোটিতে আউশ ধান বা পাটের সবুজ অঙ্কুর, কোথাও-বা রবিশস্যের পরিপক্বতা। হাল-বলদ নিয়ে চাষিরা মাঠে নামতে শুরু করেছে। ডানদিকের বাঁশঝাড় ঘেঁষে তামাক ক্ষেতে পানি দিচ্ছে বাড়ির জহির ও বক্কর। বৈঠকঘরের বারান্দায় পায়ের কাছে সকালের শিশু রোদের খেলা। খুলির এক কোনায় দিঘির পাড়ে মাদুরের ওপর বই মেলে বসেছে তার ছোট ভাই-বোনরা। পড়াশোনার বদলে মুড়ি চিবানোর প্রতিযোগিতায় মেতেছে তারা। ভাষণ শুরুর আগে ট্রানজিস্টরে দেশাত্মবোধক গান 'ও আমার দেশের মাটি' মানিকের ভেতরে আজ বড় বেশি দেশপ্রেমের আবেগ জাগায়।

একা সে নয়, দেশে বড় ধরনের সংকট ও রক্তপাতের আশঙ্কায় ছাত্ররা অনেকেই রেসকোর্সের ভাষণ না-শুনেই হল ছেড়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলনের উত্তাপ আর মিছিল থেকে অনেক দূরে, গাঁয়ের শান্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেও গত রাতে দেশের চিন্তায় তার ভালো ঘুম হয়নি। কারণ গতকাল ছিল ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে জনসভা থেকে শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিয়োতে সরাসরি প্রচারের কথা ছিল। সেই ভাষণ শোনার জন্য রেডিয়ো নিয়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল গাঁয়ের মুজিবভক্ত লোকজন। কিন্তু কী কারণে মানিক জানে না, রেডিয়োতে মুজিবের ভাষণ প্রচারিত হলো না। তারপর হঠাৎ রেডিয়ো সেন্টার বন্ধ। নেতার কণ্ঠ শুনতে না পেয়ে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় মানিকের বাবাও ছটফট করেছে। অশুভ আশঙ্কায় মানিকও অনেক রাত জেগে থেকেছে। সকালে রেডিয়ো ছাড়তেই ঘোষণা, শেখ মুজিবের গতকালের ভাষণ আজ একটু পরে প্রচারিত হবে।

ভাষণ শোনার জন্য অধীর অপেক্ষার সময়টুকুতে মানিক যখন তার ভেতরে দেশ ও দেশপ্রেমের আগুন আবিষ্কারে মগ্ন, বই-খাতা হাতে ছোট বোন বিউটি এসে বলে, 'ভাইজান, এই ট্রান্সলেশনটা করে দেন তো।'

'এখন রাখ তোর ট্রান্সলেশন। আব্বাকে বল ভাষণ শুরু হবে।'

'আচ্ছা ভাইজান, শেখ মুজিব পাওয়ারে গেলে নাকি ইংরেজি ওঠায় দেবে?

ছোট বোনের ইংরেজিভীতি মানিকের অজানা নয়। হাসি পায় তার। বলে, 'উঠিয়ে না দিলেও ইংরেজিতে তোকে এমনি এমনি পাশ করিয়ে দেবে।'

বিউটি ঠোঁট বাঁকিয়ে চলে যায়। ঘড়ির দিকে তাকায় মানিক।

রেডিয়োতে আজ শেখ মুজিবের বাসি ভাষণ প্রচারিত হওয়ার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামের ট্রানজিস্টরঅলা সব বাড়িতেই জানা হয়ে গেছে। হিন্দুটাড়ি থেকে পরেশ কাকার এ বাড়িতে আসা এবং তার কণ্ঠের উল্লসিত চিৎকার শুনে খবরটা আরো অনেকেই শুনতে থাকে। পরেশ লোকজনকে চেঁচিয়ে শোনায়, 'আরে বাহে, মুজিবের কণ্ঠ বাংলার আকাশে বাতাসে বাজিবে না — এটা কথা হইল! কী বাহে মানিক, আর কত দেরি? তোর রেডিয়ো ফুল ভলিউমে ছাড়ি দে। আগে জানলে আমি মাইক নিয়ে আসতাম। তোর বাপ কই? ও দাদাআআ...'

বয়সে মানিকের থেকে মাত্র বছর দশেক বড় হলেও, বাবার সঙ্গে পরেশ কাকার সম্পর্কটা বন্ধুত্বমূলক। দুজনই আওয়ামী লীগের থানা কমিটির নেতা। দুজন একসঙ্গে রোজ অনেকটা সময় কাটায়। দুজন একসঙ্গে বাজারে, থানা কি জেলা শহরে যায় প্রতি সপ্তাহে। গতকাল নেতার ভাষণ প্রচারের বদলে ঢাকা রেডিয়োর সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাবার চেয়েও বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল পরেশ কাকা। আজ তার খুশির সীমা নেই।

সাইকেলে কাশিয়াবাড়ির হামিদ মুন্সি সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কোথাও। পরেশের হাঁকডাক তাকেও থামিয়ে দেয়, 'ও বাহে মুন্সির বেটা, খাড়া হন, শেখের ভাষণ শুনি যাও।'

সাইকেলসহ লোকটা এগিয়ে আসে, সাইকেল কাছারিঘরের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখে এবং মানিককে শুধায়, 'কবে আসলেন বাবাজি?'

বাড়ির ভেতর থেকে সুজন ভুঁইয়া পান মুখে সিগারেট হাতে বেরিয়ে আসে, 'ও পরেশ, হামার নজিবর বোধহয় এলাও খবর পায় নাই। ডাক দে।'

পরেশ সামনের মাঠের হাল-চাষিদের লক্ষ করে চেঁচায়, 'ও বাহে, শেখের ভাষণ শুনি যাও, আরে ও বাণ্টু, নজিবর ভাইকে খবর দে তো...

পরেশের উৎসাহী হাঁকডাকে যেন উৎসব শুরু হয়ে যায় ভুঁইয়াবাড়িতে। মাঠে হালবলদ খাড়া রেখে ছুটে আসে চাষিরা। তামাক ক্ষেতে পানিসেচের কাম ফেলে ছুটে আসে বাণ্টু ও জহির। ফুল ভলিউমে রেডিয়োতে শেখ মুজিবের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলিতে একটা ভিড় তৈরি হয়ে যায়। সেই ভিড়কে, শেখ মুজিব দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেশের সংকটময় পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেন। পার্লামেন্টে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভের পরও, ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টালবাহানার কথা বলেন। আলোচনার জন্য শর্ত রাখলেন চারটা। অতঃপর বজ্র কণ্ঠে আহ্বান জানালেন, শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের। শেষে তিনি উচ্চারণ করলেন, 'এবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

নেতার বক্তৃতা শেষ হলে নজিবরই প্রথম হাতের গরু খেদানো লাঠি উঁচিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'হারামজাদা পশ্চিমাদের হালুয়া পেনটির ডাঙে দেশছাড়া করিবার হুকুম দিলে না ক্যানে মুজিব?'

মুজিব-ভক্তির আতিশয্য দেখে এবং মজিবর নামে এক ভাগ্নে থাকায় গাঁয়ে নজিবরের নামকরণ হয়েছে শেখের মামু। দেশ, স্বাধীনতা, আন্দোলনের মতো বড় বড় ব্যাপার যাদের সংকীর্ণ চেতনায় ঠাঁই পায় না, চোখে না দেখা পর্যন্ত বা সরাসরি স্বার্থে আঘাত না আসা পর্যন্ত কোনো কিছুতেই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বভাব নয় যাদের, ভিড়ের মধ্যে এরকম শ্রোতার সংখ্যাই বেশি। রেডিয়োর ভাষণ তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারলেও পরিচিত সহকর্মীর উত্তেজিত ভঙ্গি দেখে তারা বেশ মজা পায়। ঠাট্টা করে বলে একজন, 'ইয়াহিয়া খানের বন্দুকের গুলির সামনে তোর এই হালুয়া পেনটি নিজের গোয়ার মধ্যে ঢুকপে। শেখ মুজিবর কইল কী আর হামার শেখের মামু বুঝল কী!'

নজিবর ও ছেদরা সলেমনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা সচরাচর এরকম বিরোধিতাতেই জমে ওঠে। হালের গাঁথায় যেমন, তেমনি রেডিয়ো শোনা আসরেও ছেদরা সলেমনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ উপভোগ করে সবাই। ট্যারা জহির দাঁত কেলিয়ে হাসতে থাকে।

'চোপ শালা আহম্মক কাঁহেকা। সাত কোটি বাঙালির সামনে আইফেল বন্দুক! কয়টাকে মারিবে? শুনলু না মুজিব কইল — রক্ত দিছি, আরো দেব, তবু এদেশের মানুষকে কী করিয়া ছাড়ার কথা কইল বাবা?'

পরেশ বুঝিয়ে দেয়, 'মুক্ত করবে, পশ্চিমাদের শাসন-শোষণের শিকল ভাঙি মুক্ত করবে ইনশাআল্লাহ।'

'ভাতে মারার পানিতে মারার কথা কইলে না? ভাত-পানি বন্ধ করি দিলেই তো হয়, বিহারি শালারা বাংলা হইতে পালাইতে দিশা পাবার নয়।'

'ঘরে ঘরে বন্দুক না কী বানাবার হুকুম দিলে বাহে?'

'বন্দক না, দুর্গ, দুর্গ গড়তে হবে।'

অজ্ঞ চাষাভূষোদের মুখ থেকে ভাষণ প্রসঙ্গটি নিজেদের স্তরে টেনে তোলার জন্য পরেশ এবার মানিককে শুধায়, 'কী বাহে মানিক, কী বুঝলু তুই?'

মানিক চট করে জবাব দিতে পারে না। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে ও নড়েচড়ে বসে। তার পাশে বসা হামিদ মুন্সির কপালের রেখায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুশ্চিন্তা। ইসলাম ও পাকিস্তানের প্রতি অগাধ আস্থা সত্ত্বেও, সজব ভুঁইয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্কের কারণে সে এবার নৌকায় ভোট দিয়েছিল। মানিকের কাছে জানতে চায় সে, 'পাকিস্তান কি টিকবে না বাবা?'

'ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে মানুষ তো মিছিল করছে। মুজিবও তো বলল, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আবার আলাপ-আলোচনা করার শর্তও দিলো।'

'পকিস্তান আর হামরাও চাই না বাহে, পাকিস্তান আর হামার দরকার নাই।'

এমনভাবে হাত ঝাড়া দেয় নজিবর, যেন পাকিস্তানের পশ্চিম অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এখনই।

'ঠিকই, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকিয়া হামার লাভ কী?'

'পাকিস্তান ভাঙিয়াই বা লাভ কী হইবে? আবার হিন্দুস্তান গ্রাস করি নেবে না?'

'লাভ হবার নয় মানে? শালা এক হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তান। ধর্মের নামে দোহাই দিয়া বাংলাকে চুষি খাইছে, শ্মশান করিছে। আর নিজের মরুভূমি জায়গাখানকে বেহেশত বানাইছে।'

পরেশের কথায় সায় দিয়ে নজিবর হামিদ মুন্সিকে ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চায়, 'শোনেন নাই বাহে সেই গল্পটা? হামার গাই, হামরা তাকে ঘাস-পানি খাওয়াই। কারণ গাইয়ের মুখখান পূর্ব পাকিস্তানে, গোয়াখান হইল পশ্চিম পাকিস্তানে। গাই ঘাস খায় পূর্ব পাকিস্তানে, দুধ দেয় পশ্চিম পাকিস্তানে।'

সলেমন আবার খোঁচা দেয়, 'কোন গাইয়ের কথা কয় ফের শেখের মামু? মোর লাল গাইটা নাকি?'

'গাই হইল তুই। শালা আহাম্মক, বোঝে না কিছু না, খালি দাঁত কেলায়।'

সজব ভুঁইয়া এবার ভাষণের সারকথাটি বুঝিয়ে দেয় সকলকে, 'আসল কথা হইল পাকিস্তান টেকা না টেকা এখন ইয়াহিয়ার ওপর। যদি সব শর্ত মানি নিয়া আমাদেরকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়, তো ভালো। না হইলে নেতার হুকুম মতো বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই।'

'আচ্ছা ভাই, ইয়াহিয়া ভালো মানুষের মতো শেখ মুজিবকে গদি ছাড়ি দেয় না ক্যানে?'

ভুঁইয়া কিছু বলার আগে বাংটু জবাব দেয়, 'এয়াহিয়াকে কন ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ! সেদিন পেপারে ছবি দেখিছোঁ মুই, নাই দেখেন তো একটা ভোটা কুত্তা।'

'ঠিক কইছে বাণ্টু। আর ভুট্টো অবিকল এক শিয়াল।'

'এই কুত্তা শিয়াল পাছে পাগলা হইয়া কামড়াইতে আইসে?'

'তা হইলে এই হালুয়া লাঠির ডাং।'

শেখ মুজিবের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক শুনে রতনপুরের নিরক্ষর চাষাভূষারাও যখন শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণায় আর রণচণ্ডী উত্তেজনায় এভাবে ফেটে পড়ে, মানিক তখন ভাবে, শেখ মুজিব ৭ মার্চ আরো স্পষ্ট করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে অবস্থা কী রকম দাঁড়াত? ঘোষণা করলেই কি স্বাধীন হতো দেশ? যুদ্ধ বাধত না? নাকি অসহযোগ আন্দোলন করে স্বাধীনতা আসবে, ব্রিটিশদের মতো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরাও আপসে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে বাঙালিদের? এসব প্রশ্ন নিয়ে পরেশ কাকা মানিকের আব্বার সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ শুরু করলে হয়তো মানিকেরও বুঝতে কিছু সুবিধা হতো। কিন্তু বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা দূরে থাক, পারিবারিক আলাপও খুব একটা হয় না। পরেশ কাকার সঙ্গে অবশ্য মন খুলে কথা বলা যায়। কিন্তু ভিড়ের কামলা-চাষিরা মাঠে ফিরে গেলে, হামিদ মুন্সিও সাইকেল নিয়ে তাম্বুলপুরে চলে যায়। পরেশ কাকা ভুঁইয়াকে প্রস্তাব করে, 'ও দাদা, চলেন আজ টাউনে যাই। পার্টি অফিস থেকে একবার ঘুরিয়া আসি। নতুন কী কর্মসূচির কথা কয়, নতুন পোস্টার লিফলেট কিছু হইছে নাকি দেখি আসি।'

'যাবি? সাইকেল নিয়া বারায় আয় তবে, আমিও রেডি হই।'

বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে পরেশ মানিককেও আমন্ত্রণ জানায়, 'মানিক চল হামার বাড়ি, তোর কাকির বলে কী জরুরি কথা আছে তোর সাথে।'

'কী কথা কাকা?'

'সেটা তোর কাকির কাছে শুনিস এলা। চল।'

'পরে যাব কাকা। বাড়িতে আসার পর নানার সঙ্গে দেখা করিনি এখনো। একবার যাওয়া দরকার।'

'তোর বুড়া নানা তো জান গেলেও পাকিস্তানের মায়া ত্যাগ করতে পারবে না। তোর কাছে ঢাকার পরিস্থিতি শুনলে হয়তো শরীর আরো জ্বলবে।'

মানিকের বাবা বলে, 'এই পরিস্থিতিতে বুড়ার কাছে যাওয়ার দরকারটা কি? বিউটিকে পর্যন্ত আমি যেতে দেই না আজকাল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নানার পলিটিক্যাল পরিচয় যাই হোক, সম্পর্ক তো অস্বীকার করতে পারব না।'

মানিক এমন শক্ত জবাব দেবে, কেউ হয়তো আশা করেনি। পরেশ সমর্থন করে বলে, 'তা ঠিক। তুই যা মানিক, দেখ বুড়াকে বুঝায়সুঝায় এই বেলা হামার নৌকায় চড়াইতে পারিস কি না দেখ। নানার বাড়ি হইতে ফিরলেই কিন্তু আসিস আমাদের বাড়িতে।'

ছয়

মায়ের কথা মনে হলে শৈশবে মাকে ঘিরে সব সুখস্মৃতির মধ্যে নানাবাড়ি হরিপুরে যাওয়ার কথা আগে মনে পড়ে। একই ইউনিয়নের দুই প্রান্তে দুটি গ্রাম, তবু তা ছিল এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়ার মতো রোমাঞ্চকর। গরুগাড়িতে চড়ে বাপের বাড়ি নাইয়র যাওয়াটা ছিল মায়ের জন্যও খুশির দিন। নাইয়রিদের গাড়ি ছইয়ের মুখ শাড়ি কাপড়ে ঘেরা হতো। মা মরে যাওয়ার পরও সেই বদ্ধ ছইয়ের ভেতর মায়ের গন্ধ ও গাড়ির চাকা ঘোরার আওয়াজ স্মৃতিতে এখনো জীবন্ত। ছইয়ের সামনের বা পেছনের পর্দা ফাঁক করে মা বাইরের প্রকৃতি দেখত, মানিককেও দেখাত। জগন্নাথের বিল, জঙ্গল, কালীর থান, তেপথীর বটের তল, হরিপুর হাই স্কুল, রমজান মামুর বাড়ি আরো কত কী! এইসব চেনা-অচেনা স্থান আরো ভালো করে দেখার জন্য মানিক পর্দার বাইরে একদম গাড়োয়ানের পেছনে বসত। বিশাল বলদ দুটির গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি ঘণ্টা দেড়েক চলার পর নানাবাড়িতে পৌঁছলে মানিকদের বরণ করে নেওয়ার জন্য ছুটে আসত বাড়ির সবাই।

এলাকায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জামাই-শ্বশুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িতেও বড় অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। একবার ভোটের সময়, মানিক যখন প্রাইমারির ছাত্র আর বিউটি মায়ের কোলে, সজব ভুঁইয়া শ্বশুরকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য স্ত্রী-সন্তানদেরও কাজে লাগাতে চেয়েছিল। গরুগাড়িতে চড়ে নানাবাড়িতে সেই যাত্রা ছিল অন্যরকম, মায়ের মুখ বেজার, ফলে মানিকও বিষণ্ন। মা গাড়িতেই ছেলেকে প্রশ্ন করেছিল, 'বল তো বাবা, চেয়ারম্যানের বেটি থাকা ভাল, না চেয়ারম্যানের বউ হওয়া ভাল?' মানিক কিছুমাত্র না ভেবেই জবাব দিয়েছিল, 'চেয়ারম্যানের বেটি।' কেন সে এমন রায় দিয়েছিল, নিজেও জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্যবারের মতো, সেবারও নানাজি মেয়ে ও নাতি-নাতনিকে বাড়িতে পেয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ভোটের আগে, মেয়ে আর নাতি-নাতনিকে ফিরে যেতেও দেয়নি। সেবারও বিপুল ভোটে জিতে চেয়ারম্যান হয়েছিল নানা। কিন্তু পরাজিত স্বামীর গৃহে ফিরে যাওয়ার পর মায়ের কষ্ট কি বেড়ে যায়নি? বাবা অনেকদিন মায়ের সঙ্গে কথা বলেনি। সেই সময়ে বাবার আর একটি বিয়ে করার কথা লোকজনের মুখে শুনতে পেত মানিক। কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে কেউ বললেও খুব খারাপ লাগত মানিকের। এরপর বছর তিনেক মা বেঁচে ছিল। মায়ের মৃত্যুর পেছনে বড় অসুখ কাজ করলেও, স্বামীর কাছে পাওয়া কষ্ট ও মানসিক নির্যাতনও তার বাঁচার ইচ্ছে দুর্বল করেছিল বোধহয়। মায়ের মৃত্যুর পর সংসার সামলাতে বাবার আবার বিয়ে না করে উপায় ছিল না। সৎমা ঘরে আসার পর মানিকদের বাড়ি আরো ভরে গেছে, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর যে বিষণ্ন একাকিত্ব গ্রাস করেছিল মানিককে, তা আজো যেন তার চিরসঙ্গী হয়ে আছে।

সর্বশেষ চেয়ারম্যানি ভোটের সময়েও শ্বশুর-জামাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হবার ভয়ে বাবা মানিক-বিউটিকে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তবে নতুন কৌশল হিসেবে। শ্বশুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আর রাজি নয় সে। চেয়ারম্যান এবার দাঁড়াবে না শুনেই তার সমর্থকদের পরামর্শে ভুঁইয়া দাঁড়িয়েছে। উনি যদি শেষ বয়সেও তথা আমৃত্যু চেয়ারম্যানের গদি আঁকড়ে থাকতে চান, আপত্তি নেই তার। শ্বশুরের প্রতি সম্মান নিয়ে সজব ভুঁইয়া নিজেই বসে পড়বে। নানাকে বসার অনুরোধ নয়, তার নির্দেশনা পাওয়ার জন্যই ছেলেমেয়েকে তার কাছে পাঠিয়েছিল ভূঁইয়া।

AMARBOI.COM

গাঁয়ের গরিবগুর্বো মানুষের কাছে যেমন, শৈশবে মানিকের কাছে বাবাও ছিল তেমনি রতনপুরের সেরা মানুষটি। দেখলেই ভয়-ভক্তি জাগত। বাবার চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতা নিয়েও কোনো সংশয় ছিল না তার। কিন্তু চেয়ারম্যান নানা তার কাছে এত প্রিয় ও কাছের মানুষ ছিল, গাঁয়ের লোকজনের মতো নানাকে চেয়ারম্যান ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারত না। বাবার মুখের ওপর না করার সাহস ছিল না। বিউটিকে সাইকেলে নিয়ে নানার বাড়িতে গিয়েছিল মানিক।

সেবার নানাবাড়ি গিয়ে বিউটিই প্রথম নানার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছিল।

'নানাজি, শ্বশুর-জামাইয়ের ভোটের লড়াই দেখিয়া মানুষ আমাদের কত টিটকারি দেয়। আমাদের খারাপ লাগে। আপনি তো অনেক বছর চেয়ারম্যানি করেছেন, আপনি দাঁড়াইলে তো আব্বা কোনোদিনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ারম্যান হতে পারবে না। সেই জন্য আপনি না দাঁড়িয়ে জামাইকে একবার সুযোগ দেন।'

নাতি-নাতনির উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হয়নি বুড়োর। বলেছিল, 'আমি বেঁচে থাকতে তোর বাপ হরিপুরের চেয়ারম্যান হইতে চায় কেন? তোর বাপকে পাবলিক পছন্দ করে না, সেটা কি আমার দোষ?'

'আপনি ভোট দিতে বললে সবাই তাকে ভোট দেবে।'

'কেন আমি একটা খারাপ লোককে ভোট দিতে বলব। সে চেয়ারম্যান হইতে চায় শুধু আমাকে টেক্কা দেওয়ার জন্য, পাবলিকের ভালো করা তার উদ্দেশ্য নয়।'

নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার ব্যাপারে কাজী চেয়ারম্যান যেন মানিকের বাপের চেয়েও এক ডিগ্রি ওপরে। নিজের স্থানে আর কাউকে মানতে সে রাজি নয়। কিন্তু বাড়ির মধ্যে লোকটাকে একা ও অসহায় মনে হয়। নাতি-নাতনির কাছেও অনেক সময় শিশুর মতো সরল হয়ে ওঠে।

'চেয়ারম্যানি ছাড়ি দিলে আমি কি নিয়া থাকব রে? তোর নানি মরে গেল, বিহারি মেয়ে বিয়ে করিয়া একমাত্র ছেলে ঘরজামাই হইল। ঢাকা ছাড়ি আসবে না সে। আদরের বড় মেয়ে তোদের মাকে রতনপুরের ভুঁইয়াবাড়িতে বিবাহ দিছিলাম, চোখে চোখে রাখতে পারার আশায়। এখন মনে হয়, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই আমার মেয়ের জীবনটা অকালে শেষ করল তোদের বাপ। আবারও তোদের দুই ভাইবোনকে পাঠিয়েছে আমার কাছে চেয়ারম্যানগিরি ভিক্ষা চাওয়ার জন্য। তোদেরকে আর ওই বাড়িতে যেতে দেব না আমি। আমার বাড়িতে যদি থাকতে না চাস, তোরা মামা বা খালার বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখবি।'

জন্মদাতা পিতা কিংবা মাতামহকে বেছে নেওয়ার এই দ্বন্দ্ব মনে মাকে হারানোর বেদনা জাগায়। মা বেঁচে থাকতে এই দ্বন্দ্ব মাকেও খুব কষ্ট দিয়েছে। মুখে কিছু না বললেও বাবা-মায়ের ঝগড়া এবং মায়ের মন খারাপ কান্না দেখে মানিক সেটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। এমনকি কিছু বোঝার মতো বয়স না হলেও বিউটি ভাইকে বলেছে অনেকবার, 'আমরা নানার বাড়ি আর যাব না ভাইজান।'

সেবার বিউটিসহ নানাবাড়িতে গিয়ে মানিকও যুক্তি হিসেবে মায়ের কথাটা বলেছিল আগে, 'আপনাদের জামাই-শ্বশুরের সম্পর্ক দেখে মা অনেক কষ্ট নিয়ে মরে গেছে। অনেকদিন তো চেয়ারম্যানি করলেন নানা, বাকি জীবনটা আল্লাহর এবাদত বন্দেনি করে কাটান।

'চেয়ারম্যানি করা কি আমার বেধর্মী কাজ? মানুষ বিপদে পড়লে বিচার-সালিশ নিয়া আমার কাছে ছুটে আসে, যতটা পারি ন্যায়নীতির পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকি, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী চলি। ইউনিয়নের বেশিরভাগ লোক যেদিন তোর বাপের মতো শয়তানকে ভোট দেবে, সেদিন থেকে আমি অবসরে যাব।'

'আপনি চেয়ারম্যান হওয়ায় কি এই ইউনিয়ন খুব উন্নত হয়েছে? গরিব মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে?'

'আল্লাহ আমাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করছি আমি। তুই বড় হয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কি প্রেসিডেন্ট হইস, ইসলামী শাসন কায়েম করিস সারা দেশে, তখন যদি দেশের উন্নতি হয়, এই জায়গারও উন্নতি হবে, শান্তি আসবে।'

মেয়েকে একবার নাতি-নাতনিসহ ভোট পর্যন্ত আটকেছিল চেয়ারম্যান, কিন্তু বিউটিকে নিয়ে মানিক সেদিনই বাড়ি ফিরে এসেছিল। ফলাফল জানার জন্য উদগ্রীব ছিল বাবা। শ্বশুরের দোয়া ও সমর্থন পাওয়ার বদলে তার জেদের কথা শুনে হতাশায় ম্লান হয়েছিল তার মুখ। নিজে বসেনি, উল্টা প্রচারণা জোরালো করেছিল। টাকাও খরচ করেছিল প্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গত ভোটেও শ্বশুরের কাছে ১০২৭ ভোটের ব্যবধানে হেরেছে সজব ভুঁইয়া।

নানাবাড়ি যেতে যেতে পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে এখন পর্যন্ত নিজের ওপর নানার প্রভাবের ভালো-মন্দ দিক নিয়েও ভাবে মানিক। আত্মসমালোচনার সুবিধা পেতেই যেন হরিপুরে যাওয়ার জন্য শর্টকাট মেঠোপথে হেঁটেই রওনা দিয়েছে মানিক।

নামকরণের সময়েও নাতিকে পাকিস্তানের হেফাজতকারী একজন জাঁদরেল মানুষ হিসেবে দেখার স্বপ্ন ছিল নানার। শৈশব-কৈশোরে ধর্মকর্ম যতটুকু শিখেছে মানিক, সব নানা ও মায়ের কাছেই। স্কুলে যাওয়ার আগে পাকিস্তানি জাতীয় সংগীত পাকসার জমিন সাধবাদ, কিশওয়ারে হাসিন সাধবাদ — নানাই শিখিয়েছে তাকে। এখনো গাঁয়ের অনেকেই বাপের সঙ্গে তুলনার বদলে যোগ্য নানার উপযুক্ত নাতি হিসেবেই চেনে মানিককে। তরুণ বয়সেও ভালো ছাত্র মানিকের লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্মনিষ্ঠা দেখে নাতিকে পাকিস্তানের খয়ের খাঁ হিসেবে দেখার স্বপ্নটা জোরালো হয়ে উঠেছিল কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য এলাকার মেম্বারদের নিয়ে ঢাকা গেলে মানিককেও সঙ্গে নিয়েছিল নানা। আইয়ুব খান ও কায়েদে আজমের বোন ফাতেমা জিন্নাহর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ-রাজনীতিতে ডুবে ছিল গাঁয়ের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা। আর মানিক কৈশোরে সেই প্রথম ঢাকায় গিয়ে নিজের পথ খুঁজতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল মনে মনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্র ও গণআন্দোলনের উত্তাপের ছোঁয়ায় গত দু'বছরে মানিক একটু একটু করে বদলে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু তা বলে মানিক নিয়মিত নামাজ পড়াটা ছেড়ে দেবে, পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলন সমর্থন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেবে — নানাজি হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি।

ঢাকায় থেকে নানার সঙ্গে দূরত্ব যত বাড়ছে, প্রিয় নাতিকে নিজের আদর্শ ও প্রভাবের ছায়ায় রাখার চেষ্টাটাও তত বাড়ছে নানার। এই চেষ্টা থেকেই সম্ভবত নিজের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে মানিককে এখনই বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করছে বুড়ো। অবশ্য মানিকের বিয়ে নিয়ে নানার আগাম চিন্তাভাবনার মধ্যে তার একাকিত্ব ও পারিবারিক সংকটটাও কম দায়ী নয়। একমাত্র ছেলের পরিবারকে কাছে না পাওয়ার শূন্যতা হয়তো নাতিকে বিয়ে দিয়েও কিছুটা ভরাতে চায় নানাজি। তাছাড়া সৎমায়ের সংসারে বিউটির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা উদ্বিগ্ন। কাজেই খানদানি বংশের একটি উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যখন প্রস্তাব এসেছে, মানিক বিয়ে করে বউ আপাতত নানাবাড়িতে রাখলেও বিউটির লেখাপড়া ও ভবিষ্যতে তাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করা সহজ হবে। নানাবাড়িতে পৌঁছার আগে মানিক সিদ্ধান্ত নেয়, দেশ-রাজনীতির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বিয়েশাদির ব্যাপার নিয়ে নানার সঙ্গে আলোচনা করবে। তাতে নানাকে পরাস্ত করাও সহজ হবে।

হরিপুর গাঁয়ের সীমানায় ঢুকলে গ্রামবাসী প্রায় সকলেই মানিকের নানা-মামা কিংবা নানি-মামি। রাস্তায় কুশলাদি বিনিময় করতে হয় অনেকের সঙ্গে। বাড়িতে পৌঁছলেও চেয়ারম্যানবাড়ির অন্দরমহলের বাসিন্দারা এবং পড়া-পড়শী মামা-মামিরা ভিড় জমায় মানিককে ঘিরে। ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নয়, বরং মামার বাসার খবর জানতে চায় সবাই। রাঢ়ি নানি অভিযোগ করে, 'চেয়ারম্যান গোস্বা হইছে তোর সাথে। কয়দিন হইল বাড়িতে আসছিস। একদিন দেখা করিয়াও গেলি না! বিউটি আসার কথা। কিন্তু বিউটিকেই কেনবা আনলি না সাথে?'

'নানা নাকি আমার জন্য বিয়ের পাত্রী ঠিক করেছে। শরমে নানাকে মুখ দেখাই কেমন করিয়া?'

অজুহাতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় সবার কাছে। মানিকের শরম ভাঙানোর চেষ্টায় পাত্রীর চৌদ্দগুষ্টি সম্পর্কে নানা তথ্য জানিয়ে এবং না-দেখা পাত্রীর রূপগুণের বয়ান দিয়ে, সর্বোপরি মানিকের জরুরি বিয়ে করার যৌক্তিকতা নিয়েও রঙ্গরস করে রাঢ়ি নানি। তাকে সহযোগিতা করে পড়শী নানি ও মামিরাও। চেয়ারম্যান বাড়িতে নেই, বালাটারির অসুস্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলিল হাজীকে দেখতে গেছে। আর চেয়ারম্যান বাড়িতে না থাকলে বাড়ির অন্দরমহলের উটকো ভিড়, বিশেষ করে কাজে-অকাজে উপস্থিত মেয়েরা বেশি স্বাধীন হওয়ার তৎপরতা দেখায়। বাড়ির কাজের লোক কুজা মামার বউ বলে, 'বিয়া করলে বউকে তোমার দজ্জাল সৎমায়ের হাতত তুলি দেন না। হামরা এ বাড়িতে তোমার ঘরদুয়ার সাজেয়া রাখছি। ও আম্মা, ভাইগ্নার জন্য পাইস না পিঠা বানামো আগে?'

নিজ বাড়ির তুলনায় নানাবাড়িতে মানিকের নির্ধারিত ঘরটা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বারান্দা ও উঠানের ভিড় এড়াতে মানিক নিজের ঘরে একা হয়, লোকমুখে শোনা হবু বউটিও যেন মানিকের বিছানায় আসে। কিন্তু অবেলায় কল্পিত স্ত্রীর সান্নিধ্যসুখ উপভোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আঙিনায় নানার উপস্থিতি ঘোষণা। বাড়িতে এসেই মানিকের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে সে।

নানার রাগ-অভিমান ভাঙাতে বরাবরের মতো কদমবুসি করে হাসিমুখে কৈফিয়ত দেয় মানিক, 'আপনি সুস্থ আছেন শুনে এর মধ্যে আর আসিনি নানাজি।'

দেশ-রাজনীতি নিয়ে নানার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না ঠিক করলেও কাজী আফতাবই শুরু করে প্রথম।

'ঢাকায় মুজিবের চেলা হয়ে এখন মিটিং-মিছিল করিস, শুনলাম এবার ঢাকায় শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়া তার সঙ্গে দেখাও করছিস। আবার গ্রামে আসিয়া বাপের সাথে মিলিয়া পাকিস্তান ভাঙার পলিটিক্স করছিস, সব খবরই আমার কানে আসে রে। পরেশ সাহা সেদিন বাজারে কয়, এ আন্দাজ নানাভক্ত মানিক, সেও এখন কাজী চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে।'

মানিক জানে, গ্রামের উর্বর ভূমির মতো বাতাসে কথারাও বৃক্ষ হয়ে দ্রুত ডালপালা ছড়ায়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানিকের ভেতরে যে আলোড়ন, তার ছিটেফোঁটা প্রকাশও হয়তো নানার কানে অনেকগুণ বেশি বেজেছে।

'আপনি কি রেডিয়োতে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ শোনেন নাই নানাজি? ভাষণে এই আন্দোলনকে মুজিব তো স্বাধীনতার সংগ্রাম আর মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে ডিক্লেয়ার দিয়েছে।'

'মুজিব ডিক্লেয়ার দিলেই পাকিস্তান ভাঙবে, এত সহজ? শোন, জন্মের পর হইতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র তো কম দেখলাম না। ইন্ডিয়ার উস্কানিতে চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়া মুজিব পাকিস্তান ভাঙার জন্য যতই অশান্তি উত্তেজনা সৃষ্টি করুক, আল্লাহই মুসলমান আর পাকিস্তানের হেফাজত করবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গাঁয়ের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চায় না, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়।'

'আরে রাখ, গ্রামের পাবলিককে কি তুই আমার চেয়ে বেশি চিনিস? এখনই বালাটাড়ির মানুষের সাথে কথাবার্তা কয়া আসলাম। মুসলমানরা না খেয়ে থাকবে পাকিস্তানে, তবু ফের হিন্দু কংগ্রেস আর ভারতের অধীনতা মানবে না। '

মানিক নানার আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতি ও মুসলিম লীগ বা ইসলামপন্থী দল সমর্থনের যুক্তিগুলো বিশদ জানে। এ নিয়ে তর্ক করতে চায় না। নানি গরম পায়েস নিয়ে ঘরে এসে রাজনীতি থেকে উদ্ধার করে দুজনকেই, 'ভাইজান কী হিন্দুস্তান পাকিস্তান নিয়া তরকাল শুরু করছেন! এদিকে মানিকের জন্য পাত্রী ঠিক করছেন শুনিয়া শরমে নাকি বেচারা আইসে নাই। বিয়ের পর বেশি শরম পাইলে বউয়ের আঁচলে মুখ লুকায় থাকিস মানিক।'

'শেখ মুজিবের আন্দোলনে যখন তোদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অফিস-আদালত অচল হয়ে যাচ্ছে, এই সুযোগে তোর বিয়াটা করে ফেলাই ভালো। গাইবান্ধায় একটা ভালো ফেমিলির মেয়ের সন্ধান পাইছি, চল দেখিয়া আসি।'

'আপনি কি আমার বিয়ের ব্যাপারে সত্যই সিরিয়াস নানা?'

'আমি কি তোকে ঠাট্টা করে চিঠি পাঠাইছিলাম। বিউটি বলে নাই তোকে সব?'

'দেশের এই পরিস্থিতিতে বিয়েশাদির চিন্তা আপনার মাথায় আসে কী করে নানাজি! পাকিস্তান থাকা না থাকার এই টেনশনের সময়ে আপনি আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখছেন! সত্যি, আপনার দেশপ্রেম নিয়েই আমার মনে সন্দেহ জাগছে।'

'দেশের অবস্থা খারাপ বলে মানুষের বিয়েশাদি, ঘরসংসারের কাজ কি থামি যাইবে? মুজিবের চেলা হয়ে দেখি আল্লাহর হাদিস কালামও ভুলে গেছিস। চল আগে মসজিদে মাগরিবের নামাজটা পড়ে তোর ওপরে শয়তানের আছড় কাটাইতে আল্লার কাছে মুনাজাত করব। তারপর তোদের জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতি ভালো, না বিয়েশাদি ভালো, তা নিয়া আজ রাতভর বাহাস হইবে তোর সাথে। তোর বিয়ার ঘটক সালাম মওলানাকে খবর দেব এখন।'

মানিক জবাব দেয় না। এ বাড়িতে থাকলে মসজিদের জামাতে না গেলেও, নানার সঙ্গে জামাত করে ঘরেও নামাজ পড়তে হয়। মানিক আকামত দিলে ইমামতি করে নানাজি। আজ নামাজে বসে নানা হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান রক্ষার জন্য মোনাজাত করবে, আর তাতে শরিক হতে হবে মানিককেও। বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ছাড়াও দেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে ক'দিন ধরে যে উদ্বেগ-আলোড়ন বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে, তা নানাকে বোঝানোর ভাষা খুঁজে পায় না সে। তা বলে আগের মতো নানার প্রভাবছায়ায় আত্মসমর্পণ করে মসজিদে যেতেও মন চায় না। কমিউনিস্ট রুমমেট আরিফের পাল্লায় পড়েও মানিক ধর্মবিদ্বেষী হয়নি ঠিকই, কিন্তু এ মুহূর্তে নানাকে সে আর আগের মতো সহ্য করতে পারে না।

'আপনি মসজিদে যান নানাজি, আমি অজু করে আসি।'

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘর থেকে বেরিয়ে সে যে কলতলায় গিয়ে বাড়ির পেছনদিক দিয়ে নানাবাড়ি থেকেই বেরিয়ে যাবে, এটা বাড়ির কেউ ভাবতে পারেনি, এমনকি মানিক নিজেও ভাবেনি। সিদ্ধান্তটা আগে নিলে অন্তত অজু করার মিথ্যা অজুহাত দিত না।

সাঁঝবেলায় নানাবাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় হাঁটতে হাঁটতে ভাবে মানিক, নানাজির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা কি তার ঠিক হলো? পিতার রাজনীতি সমর্থন করে নানার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে তাকে শত্রু বানাতে চায়নি সে। ফলে রাতেই মানিকের খোঁজ নেওয়ার জন্য হয়তো রতনপুরে লোক পাঠাবে চেয়ারম্যান। সেই লোককে বলে দিলেই হবে — বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত নানার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না সে।

AMARBOI.COM

সাত

নানাবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নিজ বাড়িতে মানিকের ছটফটানি অস্থিরতা আরো বহুগুণ বেড়ে যায়।

ঢাকায় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে থেকেও উদ্বেগ-অস্থিরতা ছিল, কিন্তু বাড়িতে এসে গাঁয়ের শান্ত পরিবেশে আরো বেশি অস্থির লাগে। মায়ের মৃত্যুর পর বিশেষ করে কলেজে ভর্তি হয়ে শহরবাসী হওয়ায় বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটাই আলগা হয়ে গেছে। শৈশবেও বাবার সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক ছিল না, কৈশোরে বাবার দ্বিতীয় বিয়েটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি বলে দূরত্বটা আরো বেড়ে গেছে। সৎমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরকাল প্রকৃত মায়ের দুঃখের বড় কারণ হয়, তারা সতীনের সন্তানকে আর কতটা আপন করবে? মানিকের নয়া মাও মায়ের শূন্যতা ভরাতে পারেনি, পারবেও না কোনোদিন।

মা মারা যাওয়ার পরও ছোট বোন বিউটির সঙ্গে মাখামাখি ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখন তার বাড়ন্ত শরীরটাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাস টেনে উঠতে না উঠতেই বিউটিও যেন রহস্যময়ী নিষিদ্ধ নারীর দলে চলে গেছে। সৎমায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা ভাইয়ের কানেও লাগায় না আর। নানাবাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসার পর বাড়িতে বড় একা ও অস্থির লাগে মানিকের। করার কিছু নেই। যাওয়ার জায়গা নেই। এরকম অবস্থায় মেয়ে বন্ধুর অভাবে, অবসরে কখনো-বা অনিশ্চিত হবু স্ত্রীর সান্নিধ্য কল্পনায় পুলকিত হয়েছে বটে, অনাবিষ্কৃত নারী-শরীর আবিষ্কারের প্রবল আগ্রহ-উত্তেজনার মুখে অচেনা স্ত্রীকে বিবস্ত্র করতে গিয়ে আপন মামির নগ্ন শরীর দেখে চমকে উঠেছে, তবু নির্দিষ্ট কোনো মেয়েকে বাস্তব জীবনে জড়ানোর কথা ভাবেনি এখনো। দেশের এই টালমাটাল ক্রান্তিলগ্নে অলস ঘরে বসে নিজের বিয়ের চিন্তা, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাও অনৈতিক ও চরম স্বার্থপরতা মনে হয় মানিকের কাছে। দেশে দেশে দেশপ্রেমিক কত মানুষ মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে, এমনকি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে কতজন, আর সে বুড়ো নানা আর নিজের অনাগত হবু স্ত্রীর কল্পিত সুখসান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারবে না?

দেশের মুখ দেখার জন্য মানিক গাঁয়ের পথে-প্রান্তরে অকারণে ঘুরে বেড়ায় দিনমান। জন্মভূমিকে ভালোলাগার টানটা দেশপ্রেমের গভীর আবেগ হয়ে ফুটতে চায়। কিন্তু গাছপালার সবুজ বেষ্টনীঘেরা বাড়িঘর, ফসলের মাঠ, গরু-ছাগল, জঙ্গলের পাখি কিংবা বিলের মাছ — সব মিলিয়ে অতিচেনা গাঁয়ের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাও তার একাকিত্ব পুরোটা ঘোচাতে পারে না। দেখা হলে সব লোক আন্তরিকভাবে কথা বলে, কিন্তু মন খুলে নিজের কথা বলার মতো উপযুক্ত বা সমবয়সী বন্ধু নেই একজনও। দেশের পরিস্থিতি ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য একমাত্র পরেশ কাকাই ভরসা। কিন্তু পরেশের সময় কাটে বেশি মানিকের বাবার সঙ্গেই। দল, পাটের ব্যবসা ও নানারকম স্বার্থের বন্ধনে ঘনিষ্ঠ দুজনের সম্পর্ক। মানিক ও পিতার সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করে পরেশ কাকা। বাবার অনেক কথা পরেশ কাকার মাধ্যমে জানতে পারে সে। পরেশ কাকার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার জন্য সাধারণত তাদের বাড়িতেই যায় মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুটাড়ির সাহা বাবুর বাড়ির সঙ্গে ভুঁইয়াবাড়ির সম্পর্ক অবশ্য পুরনো। মিলটা মূলত শ্রেণিগত। ভুঁইয়ারা এ গাঁয়ের জোতদার, অন্যদিকে ক্ষিতিশ সাহা ছিল এলাকার বড় ব্যবসায়ী এবং সচ্ছল গেরস্ত। ঠ্যাংভাঙা হাটে সাহা বস্ত্রঘর ও পাটের গুদাম ছিল তার, এখনো আছে। ক্ষিতিশ সাহার মৃত্যুর পর তার কাপড়ের দোকান দেখে ছোট ছেলে নরেশ, কৃষি আবাদ ও অন্যান্য ব্যবসা সামলায় পরেশ। দুই ভাই হাল ধরায় সাহারা এখনো এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য পরিবার। বাড়িটাও তাদের দেখার মতো।

গাঁয়ের হিন্দু বসতির মধ্যে একমাত্র সাহা বাবুর বাড়িতে স্থায়ী পূজামণ্ডপ আছে। দুর্গাপূজার সময় বাবুবাড়িতে মেলাও বসে। ছোটবেলায় দেবী দেখা, গান শোনা বা মেলা উপলক্ষে বাবুর বাড়ি দলবেঁধে ছুটে গেছে মানিকও। ধর্মীয় ভেদাভেদ জ্ঞান খুব শৈশবেই জেগে উঠেছিল বলে বাবুর বাড়ির অন্দরমহেল ঢুকতে দ্বিধা-সংকোচ হতো মানিকের। পরেশ ও নরেশ কাকাই ক্রমে তার এ দ্বিধাসংকোচ ঘুচিয়েছে। বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছে পরেশের, সেই বিয়েতেও বরযাত্রী হিসেবে মানিককে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল পরেশ। শহর থেকে ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে কাকার মায়ের মতো নতুন কাকিরাও মানিককে বেশ আদরযত্ন করে।

বাবুর বাড়ির খুলিতে পূজামণ্ডপের মা দুর্গাকে দিঘিতে বিসর্জন দেওয়ার পরও মণ্ডপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। তাদের ভালো করে চেনেও না মানিক। আজ বাড়িতে ঢোকার আগে পূজামণ্ডপের সামনে দাঁড়ানো বাংটুর মাকে দেখে অবাক হয় সে।

'কী বাহে চাচি, তোমরা কী করেন এইঠে?'

'দেবীকে কলা খাইতে দিছে, দেবীর কলা খাওয়া দেখং বাবা।'

পরেশ কাকাদের চাকর কালীচরণ বাড়ি থেকে এক ডালি বিছন ধান নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল। খুলিতে মানিককে না দেখেই সম্ভবত বাংটুর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে, 'কলা খাওয়া দেখিস, না কলা চুরির মতলব?'

'মোসলমান দেখিয়া কি হামার ভয়ডর নাই? হেঁদুর ঘরে দেবীর কলা চুরি করি খামো!'

'তোকে কও নাই মুই — নাই কামত এ বাড়িত ঘুরঘুর করিস না। যা ভাগ।'

'কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করিস ক্যা? হু না হামার মানিক বাবাজি আসল, তাতে তোমার জাইত যায় না? পরেশ যে দিনেরাইতে বড়বাড়িতে পড়ি থাকে, তাতে ওমার জাইত যায় না, তোর এত জ্বলে ক্যানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংটুর মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় খান্তি দিয়া কালীচরণ মানিকের দিকে তাকিয়ে স্বাগত জানায়, 'ভুঁইয়ার বেটা! যাও বাহে বাড়িতে যাও। বড় দাদা ভুঁইবাড়িতে গেইছে, যাও বইস বাড়িতে।'

বাংটুর মাকে খুলিতে রেখে মানিক বাড়ির ভেতরে ঢোকে। পরেশ বাড়িতে নেই শুনে তার মা, নাকি বউকে ডাকবে আগে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের দাওয়ায় নরেশের বউকে দেখে মানিক। বছরখানেক আগে বিয়ে করেছে নরেশ, এর আগে ছোট কাকিকে একবার মাত্র দেখেছে বলে মুখখানা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু সে মানিককে ঠিকই চিনতে পারে, ফলে মানিককে আর কাউকে ডাকতে হয় না।

ইঁদারার পাড় থেকে পরেশের মা ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তার বউ মালতী। অভ্যর্থনা জানাতে বারান্দায় চেয়ার এগিয়ে দেয় নরেশের নতুন বউ। পরেশের মাকে দাদির বদলে দিদি ডাকে মানিক, তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। মালতী কাকির দিকে তাকিয়ে তার ছেলে শিবুকে খোঁজে। শিবু বাপের কোলে চড়ে চতলার ভুঁইবাড়িতে গেছে, আসবে এখুনি। মালতী ছোট জাকে চা বসানোর নির্দেশ দিলে মানিক তার নামটি জানে — অঞ্জনা। মালতীর মতো ফর্সা ও সুডৌল চেহারা না হলেও অঞ্জনাও যে লেখাপড়া জানা মেয়ে, চেহারাতেও তার ছাপ স্পষ্ট।

বাংটুর মা এবার অন্দরমহলে এসে আবার মানিকের কাছে এসে দাঁড়ায়। বউ-শাশুড়িদের মধ্যে কাকে উদ্দেশ করে, নাকি মানিকসহ সকলের উদ্দেশে অভিযোগ জানায় সে, 'কালীটা এ বাড়ির চাকর, নাকি ভোটা কুত্তা? ধান বানার কাম করাইবেন নাকি পুছ করতে আসনু, আর মোকে মানিক বাবাজির সামনে কত কথা শোনায় দিলে?'

মালতী জবাব দেয়, 'গণশার মা হামার ধান ভানে। তোমাকে লাগবে না বাংটুর মা, অন্য বাড়িতে কাম খোঁজ।'

বাংটুর মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'হামার মানিক বাবাজানের মাও চেয়ারম্যানের বেটি যদি আইজ বাঁচি থাকিল হয়, তা হইলে বাংটুর বাপ বড়বাড়ির চাকরি ছাড়িয়া বাউদিয়া হয়া কি দেশান্তরী হয়? মোকেও কাম খোঁজার জন্য হিন্দুটাড়ি আইসা লাগত না।'

এ কথার প্রতিবাদ করতে না পেরে সবাই মানিকের দিকে তাকায়। আর অস্বস্তিকর ঝগড়া বাড়ার ভয়ে মানিকই এবার বাংটুর মাকে শাসন করে, 'ও বাহে চাচি, যাও, অন্য বাড়িতে কাম খোঁজ। কাকার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে।'

বাংটুর মা গজরগজর করে চলে গেলে পরেশের মা বলে, 'বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝগড়ি আর চুরনি মাগি এই বাউদিয়ার বউ। সেই জন্যে তোর সৎমাও উয়াকে দিয়া কোনো কাম করায় না।'

বাণ্টুর মায়ের প্রসঙ্গ চাপা দিতে মানিক নরেশের বউয়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, 'ও কাকি, আমি কিছু খাব না কিন্তু। ছোট কাকার সঙ্গে এখনো দেখাই হলো না। দোকান থেকে কখন আসবে?'

'দুপুরে খাওয়ার সময় আসবে। বসো বাবা তুমি, দুপুরে আমাদের বাড়িতে একদম খেয়ে যাবে।'

মালতী কাকি রান্নাঘরে গেলে তার শাশুড়ি ও জাকে ঢাকার খবরাখবর শোনায় মানিক। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালতী দেশের অবস্থা চাপা দিয়ে জরুরি কথা বলে, 'শুনলাম, তোমার চেয়ারম্যান নানা তোমার জন্য কোথায় পাত্রী ঠিক করেছে। কী বলল তোমার নানা?'

লজ্জা নয়, মানিক এবার জোরালো প্রতিবাদ করে, 'ছি! কী যে বলেন কাকি, দেশের এই পরিস্থিতিতে কি বিয়েশাদি নিয়ে চিন্তা করার সময়? নানাজি এরকম চিন্তা করেছে বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করেছি। ও বাড়িতে আর যাব না ভাবছি।'

পরেশের মা প্রতিবাদ করে, 'তোর নানা কি তোর অমঙ্গল চিন্তা করিয়া তোর বিয়ার কথা ভাবছে? তোর মা যখন বেঁচে ছিল, চেয়ারম্যান জামাইয়ের বাড়ি আসলে হামার বাড়িতেও আসিয়া নাতি-নাতনির কত গল্প করত।'

'নানাজি তো কট্টর পাকিস্তানপন্থী, গোঁড়া মুসলমান। সাহা দাদার সঙ্গে তার তো খাতির থাকার কথা নয় দিদি।'

'তোর দাদা মারা যাওয়ার পর কি চেয়ারম্যান ছুটিয়া আইসে নাই? আসছিল, ক্যানে আসছিল? পাকিস্তান হওয়ার পর বড় বড় হিন্দুরা ইন্ডিয়ায় দেশান্তরী হইল, তোর দাদাও একবার প্লান করছিল ইন্ডিয়া যাওয়ার। কিন্তু কাজী চেয়ারম্যান আর তোর বাপ-দাদারাই আমাদের আপনজনদের মতো বুকত আগলে থুইছে। আর তোর নানার কথা কইস, অমন ভালো মানুষ মুসলমান আর কয়জন আছে রে? একবার ভোটের সময় ঠেকায় পড়ি তোর দাদার কাছে পাঁচ হাজার টাকা নিছিল, তোর দাদা সেই টাকা ফেরত নিতে চায় নাই। কিন্তু তারিখ মতো বাড়িতে আসিয়া সেই টাকা কড়ায়গণ্ডায় শোধ দিয়া গেইছে।'

'কিন্তু নানাজি তো শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে, স্বাধীন বাংলাদেশও চায় না।'

'না চাউক। শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসলেও এদেশ আসলে তোমারগুলা মানে মুসলমানেরই দেশ থাকবে, ঠিক কি না দাদা ক?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বিধবা বুড়ির রাজনৈতিক অবস্থানটা ঠিক ধরতে না পেরে নিজের মতামত জোর গলায় প্রকাশ করে। শ্রোতা হিসেবে অঞ্জনা ও মালতী কাকির অদৃশ্য কানও উৎসাহ জোগায় অবশ্যই।

'শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসুক আর না আসুক, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই দিদি। দেশ স্বাধীন হলে সাম্প্রদায়িকতা মানে হিন্দু-মুসলমানে হিংসাহিংসি আর ধর্মের বিভেদ থাকবে না, এদেশ সবারই সমান হবে।'

ঠিক এ সময় দু'বছরের শিবুকে কোলে নিয়ে সহাস্য পরেশ কাকা ফিরে আসে। পরনে লুঙ্গি, খালি গায়ে অবশ্য সাদা সুতোর পৈতা। মানিক আসার খবর পেয়েই এসেছে সে। মানিকের কথার সূত্র ধরেই যোগ করে, 'বাংলাদেশ স্বধীন না করিয়া হামার উপায় আছে মানিক? হামার শিবুও এখন জয় বাংলা স্লোগান দিতে শুরু করছে, বল তো বাবা, জয় বাংলা।

শিবু ভাঙা বোলে জয় বাংলা বললে সবাই হাসে। মানিক হাত বাড়ালে তার কোলেও আসে শিবু।

পরেশ কাকা মানিককে বারান্দা থেকে সরাসরি তার ঘরে উঠিয়ে নিয়ে যায়। মালতী কাকি চিড়া ভেজে সরষের তেল আর পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মেখেছে। সঙ্গে নারকেলের নাড়ু, গরম চা। শিবুই সবার আগে নাশতার বাটিতে থাবা দিলে মালতী তাকে কোলে নিয়ে আবারও বলে, 'তোমার চেয়ারম্যান নানা তোমার পাত্রী দেখছে শুনিয়া তোমার কাকাকে দিয়া আমিও একটা প্রস্তাব দিছিলাম। তোমার কাকা বলে নাই কিছু?'

AMARBOI.COM

'কাকি বিয়েটিয়ের কথা বললে আপনাদের বাড়িতেও আসব না কিন্তু।'

'ঠিক আছে বাবা আর বলব না। কিন্তু গতবার তুমি কথা দিয়ে গেছ, এবার বাড়িতে আসলে আমার সাথে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। সেই যে আমার বিয়ের সময় একবার গেছিলে, এখনো বাড়ির সবাই তোমার কথা বলে।'

পরেশ কাকা সিদ্ধান্ত দেয়, 'আমরা ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত বেড়াকোড়া বিয়াশাদি সব বন্ধ। আন্দোলনে গোটা দেশ এখন অচল, আর মেয়েমানুষের কেবল বাপের বাড়ি যাওয়ার চিন্তা। এ বাড়িতেই যতবার খুশি নেমন্তন্ন করি খাওয়াও মানিককে।'

'নেমন্তন্ন করা লাগবে কেন? বাড়ির ছেলের মতো আমাদের সঙ্গে খাবে, বস বাবা তুমি, আমাদের রান্না প্রায় শেষ।'

মালতী ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে পরেশ আবার গোপনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চায়, 'শুনলাম বুড়ার সাথে ফাটাফাটি ঝগড়া করিয়া ওই বাড়ি থাকি বারায় আসছিস? যাইস নাই আর?'

গ্রামে কথা ছড়ানোর সময় তিলকে তাল বানানো স্বভাব মানুষের। মানিক সোজাসাপ্টা বলে দেয়, 'নানাজি স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে না আসলে তার বাড়িতে আমি আর যাব না কাকা। নানাজির ধারণা, হরিপুরের বেশির ভাগ মানুষ স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাকিস্তান ভাঙার জন্য মুজিব দেশে যতই আগুন জ্বালাক, গ্রামের লোকজন তাকে সমর্থন করবে না। আসলেও কি তাই?'

'আরে রাখো, তোর কাজীর জামানা শেষ। বুড়ার নিজের দল মুসলিম লীগের তো অস্তিত্ব নাই, এবারের অ্যাসেম্বলি ভোটে জামাতে ইসলামের ক্যান্ডিডেটকে সমর্থন দিছে। তার প্রকাশ্য সমর্থন নিয়াও কয় ভোট পাইছিল জামাতে ইসলাম? মুজিব ক্ষমতায় আসুক আগে, তারপর তোর কাজী চেয়ারম্যান নানা ইউনিয়নে কতটা পপুলার, সেটাও প্রমাণ হবে।'

'কিন্তু স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুধু শহরেই হবে, আর গ্রামে আপনারা চুপচাপ থাকবেন — এই অবস্থানটাও আমার ভালো লাগছে না কাকা।'

'আরে চুপচাপ কোথায়? হামার ক্ষেতের হালুয়া-কামলাদের কাছেও ঢাকার অবস্থার বয়ান দিয়া আসছিলাম এখন।'

'কিন্তু দলের পক্ষ থেকে থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়েও তেমন কর্মসূচি দেখছি না। আর কিছু করা যায় না কাকা?'

'কী করা যায় বল তো?'

মানিক নিজে চটজলদি কোনো কর্মসূচির কথা না বললে পরেশই প্রস্তাব করে, 'ভালো কথা, আজ জগন্নাথের বিলে মাছ ধরার বাইচ নামবে। কয়েক গ্রামের মানুষ আসবে। চল আমরাও যাই বাইচে, মাছ ধরতে ধরতে মানুষের সাথে কথাবার্তা কয়া দেখি আর কী করা যায়?'

মানিকের ধারণা হয়, বাবার সঙ্গে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও পরেশ কাকা অতটা সিরিয়াস না। নইলে সে দেশের এমন পরিস্থিতিতেও কামলাকিষানদের পিছে ঘোরে, আবার বিলে মাছ ধরতেও যেতে চায়? মানিক তার বাবাকে প্রত্যক্ষ চাষাড়ি কাজ বা মাছ ধরার মতো জালুয়ার কাজে দেখার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু পরেশ ব্যতিক্রম। আয়-উন্নতি হয়, এমন কোনো কাজেই হাত লাগাতে দ্বিধা নাই। লোকে বলে, সাহারা গু থেকে পয়সা তুলে নিতেও সংকোচ করে না। সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি নাকি দেশপ্রেম — পরেশের মধ্যে কোনটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতখানি প্রবল বুঝতে না পেরে এবং বোঝার গরজেও খানিকটা জগন্নাথের বাইচ দেখতে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মালতী কাকি অবশ্য স্বামীর বিরোধিতা করে বলে, 'ঢাকার মানুষ, তোমাদের মতো কামলা-মাঝিদের সঙ্গে মিশে মাছ ধরতে যাবে মানিক! তার চেয়ে তুমি বসো তো বাবা, আমাদের দীঘির টাটকা মাছ তুলে দাও, দুপুরে মানিক খেয়ে যাবে।

প্রায় সমবয়সী দুই যুবতী কাকির আদর-আপ্যায়নে অস্বস্তি বোধ করে মানিক, বাড়িতে মিছে জরুরি কাজের কথা বলে বাবুবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

আট

ভুঁইয়াবাড়ির চাকর বাংটু জানে, ঘরে শুয়েবসে বই পড়া বা রেডিয়ো শোনা ছাড়া মনিবপুত্রের আসলে কোনো কাজ নেই। ঢাকায় সব স্কুল-কলেজ তো বন্ধ করে দিয়েছে শেখ মুজিব। পড়া বাদ দিয়ে টাউনে ছাত্ররা আন্দোলন করছে। বাড়িতে এসে রেডিয়োতে শেখের ভাষণ কি খবর শোনার তবু মানে আছে। কিন্তু চুপচাপ বইয়ে মুখ গুঁজে রেখে কী লাভ? পড়াটা যতই দরকারি হোক, কাজটা যে একঘেয়ে বিরক্তির, সে বিষয়ে তার তিলেক সন্দেহ নেই।

সকাল থেকে এক বেলা ভুঁই চাষের পর হালবলদ নিয়ে বাড়িতে ফিরেছে বাংটু। ক্লান্তির বদলে তবু মনে ফুর্তি। ঘরে মানিককে সকালের মতো বই হাতে দেখে বিরক্তিটা তাই আর লুকাতে পারে না।

'ও ভাইজান, এত পড়লে তোমার বেরেন আউট হইবে। তার চাইতে চলেন তো হামার সাথে। জগন্নাথের বিলে আজ মাছের বাইচ নামবে, মাছমারা দেখলেও এলা মন খলবল করবে।'

'তোরাও যাবি নাকি মাছ মারতে?'

'খালি কি হামরা! গেল হাটে ঢোল পিটায় দিছে, মুল্লুকের মানুষ আইজ বাইচে নামবে।'

'হ্যাঁ, পরেশ কাকারাও যাবে বলল। চল যাই।'

মানিক বই রেখে উঠে দাঁড়ায়। বাংটু ছুটে যায় মাছ শিকারের সরঞ্জাম জোগাড় করতে।

বাংটুর আমন্ত্রণ নিথর পানিতে ঢিল দেওয়ার মতো, মানিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরেও মৎস্য শিকারের আনন্দস্মৃতি খলবল করে জাগিয়ে তোলে। বাংটু বক্করের বাপ সেরাজ বাউদিয়ারও ছিল অসম্ভব মাছের নেশা। মাছ ধরাটা তার এ বাড়িতে চাকরির শর্ত ছিল না। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমনকি রাত্রিবেলাতেও মাছ ধরতে যেত খালেবিলে। খলুই ভরা মাছ নিজ বাড়িতে না দিয়ে মানিকের মায়ের কাছে দিলে মাও ভারি খুশি হতো। মানিকও ছোটবেলায় খলুই হাতে লোকটার মৎস্যশিকার অভিযানে সঙ্গী হয়েছে কতবার যে! সেরাজ যাদু জগন্নাথের বিলে জাল বা বড়শি নিয়ে গেলে খলুই হাতে তার পাশে বসে বিলের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আজ গ্রামবাসীর সঙ্গে বিলে নামার কথা ভাবতেও অজানা ভয়ে-উত্তেজনায় মানিকের গা কাঁটা দেয় কেন?

বাড়িতে থাকলে জগন্নাথের বিলের ধারে বেড়াতে যাওয়াটা তার অভ্যাস। তিস্তা নদী গ্রাম থেকে মাইল তিনেক দূরে সরে গেছে। জগন্নাথের বিল ও কুড়াটাই এখন এলাকার সবচেয়ে বড় জলাধার, সর্বজনীন মৎস্যভাণ্ডার এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও বটে। অনেককাল আগে তিস্তারই মূলস্রোত ছিল এটা। নদী সরে গিয়ে মরে গেছে বহু আগেই। নদীর বুক দোলার জমি হিসেবে মানুষের দখলে এসেছে, ধুমসে আবাদ হয়। কিন্তু একদা নদী সবচেয়ে গভীর খাত সৃষ্টি করেছিল যে জায়গাটায়, সেটা এখন জগন্নাথের বিল। এ বিলের মধ্যভাগ এত গহিন যে, লোকে জগন্নাথের কুড়াও বলে। লোকে বলে, জগন্নাথের কুড়ায় কোনো এক সাধু হিমালয় থেকে আনা এক লোটা জল ঢেলে পবিত্র করেছে। তারপর থেকে জগন্নাথের কুড়ার পাশে ফি বছর চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলাও বসে। হিন্দুরা বিলে নেমে স্নান করে পুণ্যলাভের আশায়।

চারদিকে আইলঘেরা অসংখ্য ডাঙ্গা জমির মাঝখানে হঠাৎ বিস্তৃত বিলটা দেখলেও চোখ আরাম পায়। বিলের পাড়ে প্রাকৃতিকভাবে গজিয়ে ওঠা কিছু গাছপালা। পাড়ের দিকে কচুরিপানা, মাঝখানে শাপলা-শালুক, লাল পদ্ম আর অগাধ নিথর পানি নিয়ে বড় রহস্যময় এ বিল। হাজার বিঘা জমির এ বিলটা আসলে সরকারি খাস জায়গা, কিন্তু দেখভাল করে প্রকৃতি, আর নিজস্ব জ্ঞানে মাছ ধরে দশ গ্রামের মানুষ।

প্রকৃতিতে ঋতুবদলের সঙ্গে বিলের চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। শীত-গ্রীষ্মে সংকুচিত হয়, কিন্তু বর্ষার পানি বা বানের পানি ঢুকলে এর আয়তন বাড়ে বহুগুণ। চারপাশের ক্ষেতপ্রান্তর গ্রাস করে বিল তখন অনেকের ঘরেও ঢুকে যায়। এ সময় বিলের মাছও ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বর্ষার পানি উঁচু থেকে ঢালু জমিতে নামার জন্য গ্রামে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙা সৃষ্টি হয়, আর ভাঙার স্রোতের মুখে জাল পেতে মাছ ধরে মানুষ। বর্ষাকালে ধানক্ষেতের মাঝখানের আল কেটে বাঁশের তৈরি নানারকম ফাঁদ বসালেও কত যে মাছ ফাঁদে। বর্ষার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার মাছ গিয়ে জড়ো হয় তাদের মূল বাড়ি জগন্নাথের কুড়ায়। জগন্নাথের কুড়ার মাছের গল্প উঠলে সে গল্প শেষ হয় না সহজে। বাইচে নেমে কিংবা একা জাল বা বড়শি ফেলে কে কত মাছ ধরেছে, মাছ ধরতে গিয়ে কে কবে কী বিপদে পড়েছে, সেসব স্মৃতি অন্তরে জিইয়ে রেখেছে সবাই। মাছ ধরার গল্পগাথা যেমন আনন্দ জাগায়, তেমনি জগন্নাথের কুড়ার ভয়ংকর সব মাশান-পিশাচের সত্যি গল্প শুনলেও ভয়ে গা কাঁটা দেয়। ছোটবেলায় শোনা এসব গল্প মানিকের অবচেতনেও বিশ্বাস জাগিয়ে রেখেছে নাকি?

গাঁয়ের খালে-বিলে তো বারো মাসই মাছ ধরে মানুষ। মাছ ধরার জন্য সব গেরস্তবাড়িতেই জাল, ছিপবড়শি, পলো, খোরকো, টেঁটা, কোচ আরো কত কী! কিন্তু সবাই মিলে একই দিনে জগন্নাথের বিলে বাইচের মাছ ধরার আনন্দ-উত্তেজনা আলাদা। বাইচ বা মচ্ছব মানে জগন্নাথের মেলার মতোই বড় উৎসব। হাটে ঢোল পিটিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এমনিতে গ্রামের মানুষের কাজে কি অবসরে মিলেমিশে থাকার অভ্যাস। কিন্তু বাইচের মাছ ধরা মানে যেন প্রাচীন শিকারি সমাজের যূথবদ্ধভাবে শিকারে যাওয়া।

ভুঁইয়াবাড়ির চাকর জহির ও বাংটু দুজনেই যাবে। জহির নিয়েছে তিনকোনা পেলা জাল, বাংটু বাঁশের কাঠিতে তৈরি পলো। মাছ রাখার জন্য কলাগাছের বাকল দিয়ে ঠুসি বানিয়েছে তারা। মানিকের জন্য বাংটু আলাদা একটি পলো জোগাড় করেছে, কলাগাছের বাকলের বড় এক ঠুসিও বানিয়ে দিয়েছে। বেশি পানিতে নামলেও ঠুসি পানিতে ভেসে থাকবে, মাছ বেরিয়ে যেতে পারবে না। ঠুসিতে মাছ ঢোকানোর জন্য বাকল চিরে মুখ বানানো হয়েছে।

মানিকও বাড়ির চাকরদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে দেখে ছোট বোন বিউটি বিস্ময় প্রকাশ করে, 'ভাইজানও মাছ ধরতে যাবেন!'

মানিকের সৎমা ঠাট্টা করে, 'আজ মনে হয় কুড়ার শোল-বোয়ালের খবর আছে। ঠুসি ভরি গেইলে বড় মাছ ঘাড়ে করি আনা লাগবে।'

বাড়ির পেছনের ভুঁইবাড়ির আল ধরে জগন্নাথের কুড়ার দিকে যাওয়ার সময় চোখে পড়ে, গাঁয়ের লোকজন ছোট-বড় সবাই দলে দলে রওনা দিয়েছে। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ছুটে এসে মানিকদের দলেও যোগ দেয় নজিবর ও তার ছেলে। নজিবরকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংটুর চাচা ঢোঁড়া মোহাম্মদও। চৈত্রসংক্রান্তির বান্নির মেলায় যাওয়ার জন্য চারদিকের গ্রাম থেকে লোকজন, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা যেভাবে ছুটে আসে, আজ বাইচের মাছ ধরা ঘিরেও সেরকম উৎসবের আমেজ যেন। মেলার দিনে ছোটরা থাকে প্রধানত দর্শক-ক্রেতার ভূমিকায়, মাছ শিকারের উৎসবে ছোটদের স্থান নিয়েছে বড়রা। একদম ছোট যারা, বিলের পানিতে নেমে মাছ ধরার মতো যোগ্য হয়ে ওঠেনি এখনো, তারাও খলুই হাতে বড়দের পিছে, কিংবা দেখার জন্য খালি হাতেই দৌড়াচ্ছে।

মানিকের ঘাড়ে সাধারণ পলো দেখে ছোট জাল হাতে মন্তব্য করে ঢোঁড়া, 'ও বাহে চেয়ারম্যানের নাতি, পলো দিয়া চুচড়া মাছ ধরা কি তোমাকে মানায়! কুড়ার বড় মাছ ধরার জন্যে বড় একখান লগিজাল কী নজিবর ভাইয়ের মতো টেঁটা নিলেন হয়।'

একাব্বর শোনায় ভয়ের কথাটা, 'আজ কুড়ার মাশানটা কার-বা ঠ্যাং টানিয়া ধরে!'

কুড়ায় বিরাট বোয়াল ও গজার মাছের ছদ্মবেশে যে কিছু ভয়াবহ জীব আছে, গহিন কুড়ায় মানুষ চুবিয়ে মারাসহ তাদের ভয়ংকর কাণ্ডকীর্তির খবর সবাই রাখে। আতঙ্কটাকে আনন্দের রূপ দিয়ে বলে ঢোঁড়া মোহাম্মদ, 'গেলবার বাইচের সময় শিবদেবের হাগরুর পাও কামড়ে ধরি চোঁ চোঁ টান মারছিল, পিন্দনের তবন খুলি দিয়া অল্পের জন্য বাঁচি গেইছে।'

হাগরুর লুঙ্গিখোলা দশা কল্পনা করে হাসে সবাই। ছোট পেলাজাল ঘাড়ে একাব্বর মানিককে সতর্ক করে বলে, 'ও ভাইজান, তোমরা তো ভালো সাঁতারও জানেন না, বড় মাছের লোভে বাবার সাথে কুড়ার মাঝত যান না কিন্তু।'

ঢোঁড়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, 'হামার চুঁচড়া মাছই ভাল বাহে। বড় বড় কয়টা কই মাগুর কী ভেদাই পাইলে মাশান শইল-গজার লাগে না। নাকি কন ভুঁইয়ার বেটা?'

টেঁটা হাতে নজিবর বলে, 'আরে হে, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। মানিক বাবাজি আছে, জয় বাংলা কয়া আজ হামরা কুড়ার মাশান-পিশাচকেও হানমো দেখিস।'

কিন্তু নজিবরের মাশানহানা সাহস সমর্থন করে না কেউ। ঢোঁড়া ইশারায় সতর্ক করে, খবরদার।

বাংটু বলে, 'মানিক ভাই আইজ হামার দলের লিডার হইবে। দেখেন এলা, পলো দিয়াই আজ কত মাছ মারব হামরা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলের চারদিকেই আজ মাছশিকারি মানুষ। গাঁয়ের জেলে-মাঝি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সব শ্রেণির চাষি-মজুর, বেকার চ্যাংড়ারাও বাদ নেই কেউ। মানিককে দেখে খুশি হয় সবাই। তার বাবা কিংবা চেয়ারম্যান নানাকে লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে জেলে-চাষাদের সঙ্গে চাষাড়ি কাজে কি মাছ শিকারের গাঁথায় কল্পনা করতে পারে না কেউ। বাড়ির চাকর-বাকরদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লুঙ্গি মালকোঁচা দিতে মানিকেরও কি সংকোচ হচ্ছে?

শিকারের যন্ত্রপাতি অনুযায়ী দলে দলে ভাগ হতে থাকে লোকজন। টেঁটা ও লগিজাল নিয়ে কুড়ার গভীর পানিতে বড় মাছ ধরবে যারা, তারা নৌকায় কিংবা কলাগাছের ভেলায় চেপে যায় মাঝ বিলে। এই দলে পরেশ ও নরেশ দু'ভাইকেই দেখতে পায় মানিক। নরেশ দোকান-ব্যবসা ফেলে মাছের বাইচে যোগ দিতে ছুটে এসেছে। টেঁটা হাতে নজিবরও যোগ দেয় তাদের দলে। মানিককেও চেঁচিয়ে আমন্ত্রণ জানায় নরেশ কাকা, 'ও মানিক, তুমিও আইস হামার দলত। এমনি ভূড়ায় বসি থাকি বড় মাছ ধরা দেখিও, আইস।'

বাণ্টু বাধা দিয়ে বলে, 'মানিক ভাই হামার দলের লিডার। পলো ও জাল দিয়াই হামরা আইজ বড় মাছ ধরমো। জয় বাংলা বলিয়া পলো ঝাপান বাহে সবাই।'

এত মানুষ একসঙ্গে পানিতে নামলে বিলের মাছের খবর আছে অবশ্যই। অদৃশ্য মাছের খবর নিতে সবার হাতের পলো বিলে ঝপাঝপ পড়তে থাকে। কিনারের হাঁটু পানি থেকে মাঝখানের বেশি পানির দিকে সারবদ্ধভাবে এগোয় অসংখ্য পলো ও জাল। বদ্ধ হলেও অন্যান্য ডোবার মতো এ বিলে কচুরিপানা জমতে পারে না তেমন। পানা তুলে লোকজন ক্ষেতে জমিয়ে পচিয়ে সার করে, গরুকেও খাওয়ায়। কচুরিপানা ছাড়াও নানারকম জলজ উদ্ভিদ ও কিনারে গাছপালা থাকায় জগন্নাথের পানিও কীরকম কালচে এবং রহস্যময়। মাঝখানের কুড়ায় অশরীরী কিংবা মাছের ছদ্মবেশে তেনারা থাক বা নাই থাক, পানিতে জোঁক-সাপ-ব্যাঙ-কাঁকড়া-কুঁচিয়া আছে অবধারিত। কিন্তু অদৃশ্য মাছের পিছে ধাবমান শিকারিদের উত্তেজনায় ভয়ভীতি প্রশ্রয় পায় না। মানিকও জোঁকের ভয় তুচ্ছ করে লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে পলো নিয়ে পানিতে নেমেছে আজ। জোঁক একবার কোন লোকের লিঙ্গের ছিদ্রপথেও ঢুকে পড়েছিল। শোনা গল্পটা স্মৃতিতে ভয় জাগালে নিজের জিনিসটাকেও আগলে রাখার সতর্কতা কাজ করে। জগন্নাথের মেলায় যেমন নানারকম ফটফটি খেলনা ও বাঁশি বাজে, বাইচের মচ্ছব শান্ত বিলের জলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেরকম আওয়াজ তুলছে আজ।

পলোর প্রতি ছাপেই ভেতরে মাছ আটকে যায়, এমন নয়। পাঁচসাত বা তারো বেশি ছাপ দিয়ে হয়তো একবার মাছ আটক হওয়ার সাড়া টের পায় শিকারিরা। বাঁশের কাঠির বেড় থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় পলোর চারদিকে আঘাত করে বন্দি মাছ, বেরিয়ে যাওয়ার পথ পায় না। পলোর ভেতরে আটক মাছের খলবল আওয়াজ পানির তলা থেকে পলোধারীর হাতের মধ্য দিয়েও রক্তের ভেতরে পৌঁছে যায় যেন। বন্দি মাছের মুক্তিসংগ্রাম মানিকের ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে, পলোর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেটাকে শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরতে। একটি বড় সাইজের টাকি মাছ ঠুসিতে ভরতে গিয়ে মানিকের হাত থেকে লাফিয়ে যায়।

কারো পলোতে মাছ আটকালে আশপাশের সবারই কৌতূহল থাকে, কে কত বড় মাছ তুলল। এই কৌতূহলের সুযোগ নিয়ে মস্ত রুই আটকানোর খবর দিয়ে একজন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু পলো থেকে ছোট একটি পুঁটি তুললে হাসাহাসি হয়। পুঁটি ঠুসিতে না ভরে দূরে ছুড়ে দেয় সে।

পলোর পাশাপাশি ত্রিকোণ পেলাজাল ঠেলে এগোয় যারা, মাঝে মাঝে পানি থেকে তারা জাল ওপরে তুললে, জালের থলেতে জড়ো হওয়া মাছের দিকে চোখ তুলে তাকায় কৌতূহলীরা। বড় কিছু আটকালে কেউবা খুশিতে চেঁচিয়ে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তবে বিলের পাড়ে যেসব ছেলেমেয়ে দর্শকের ভূমিকায়, তাদের সকলের চোখ বিলের মাঝখানে কুড়ার দিকেই নিবদ্ধ। সেখানে ভেলায় বা নৌকায় চেপে, কেউবা সাঁতার দিয়ে বিলের গভীর পানিতে লগি জাল বা টেটা ছুড়ে মারছে। নৌকা থেকে পানিতে ডুবে বড় মাছ টেনে তোলার দৃশ্য দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সবাই। মাঝেমধ্যে বড় মাছ পাওয়ার আনন্দ চেঁচিয়ে প্রকাশ করে কেউবা। বিলের নিথর পানিতে বড় মাছের লাফানোর আওয়াজ শুনলেও টনক নড়ে শিকারিদের।

বড় মাছ লাফানোর আওয়াজ শুনে পলো শিকারিদের চোখ যখন মাঝকুড়ার দিকে, মানিকের পলোতে তখন বিরাট এক মাছ আটকা পড়ে। মাছ নয়, যেন বাঘের বাচ্চাকে চেপে ধরেছে সে, পলো ভেঙে ফেলবে। মানিক বড় মাছ মনে করে সর্বশক্তিতে পলো চেপে ধরা ছাড়াও বাংটুকে ডাকে, 'এই বাংটু দেখতো, আমার পলোতে কী এটা?'

নিজের পলো রেখে বাংটু মানিকের পলোটা দু'হাতে চেপে ধরতে গিয়ে পা দুটি শূন্যে তুলে হঠাৎ পানিতে উল্টে পড়ে যায়। আর ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসময় মানিকের পায়ের ওপরের দিকে জোরে গুঁতো মারার মতো কেউ আঘাত করে, পানিতে ভয়ংকর কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেয়ে ভয় চলকে ওঠে ভেতরে, পলো ছেড়েই পাড়ের দিকে দ্রুত পিছায় মানিক। এটা কী রে! ভয়ে পিছায় অন্যরাও। পানিতে খলবল সাড়াটা প্রবল হয়, পানির তলায় অদৃশ্য প্রাণীর দিগ্বিদিক ছোটাছুটি, আর ওপরে মাছ শিকারিদের ছোটাছুটি হঠাৎ বিলের এক জায়গায় আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একজন মরি গেনু রে, বাঁচান, বাঁচান — চিৎকার তুলে পানিতে ডুবে যেতে থাকলে, তাকে টেনে ধরে দুজন, তারপর মাছ ধরা ছেড়ে একে একে সবাই ছুটতে থাকে ডাঙার দিকে।

পাড়ে ওঠার পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খোঁজে ঘটনার শিকার শিকারি দলটি। পানিতে পা টেনে ধরেছিল যার, সে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে বিলের দিকে তাকিয়ে হাঁফায়।

স্বাভাবিক হওয়ার জন্য মানিক বলে প্রথম, 'বিরাট মাছ মনে হয়। আমার পলো উল্টায় দিয়া আমার ঊরুতেও ঢুসা দিছে।'

ধরতে না পারা মাছ সব সময় বড়ই হয়ে থাকে। বাংটু বলে, 'বিরাট মানে, ওটা মনে হয় ঢেঁকির মতো মস্ত একটা গজার কী বাইগর। মুই ভাইজানের পলো ঠাসি ধরতে গেলে মোকেও এমন চটকা দিয়া পালাইছে।'

পানি থেকে টেনে তোলা হয়েছে যাকে, তার অবস্থা এমন, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে উঠে এসেছে। সে এবার আসল তথ্য জানায়, 'কী কইস ফকসা কথা! মাছ ওটা! চেনেন নাই এলাও, মোর পাও ধরিয়া কুড়ার দিকে হুড়হুড় করি টানি নিয়া যাইতেছিল। আল্লারে, বাসেদ আগায় না আইলে আইজ মোর লাশ গেল হয় বাড়িতে।'

ভুক্তভোগীর ভয় সংক্রমিত হয় সবার মাঝে। ভয়-বিহ্বল ভিড়ের সামনে এসে দাঁড়ায় বাংটুর মা আছিমন। বিলের কাছাকাছি বাড়ি বলে মচ্ছবে যোগ দিয়েছে তার সব ছেলেমেয়ে এবং সে নিজেও। বাংটুর মায়ের হাতে একটা খলুই, পায়ে কাদা। মানিকের দিকে তাকিয়ে ছেলেকে ধমকায় সে, 'হায় খোদা, হামার টাউনি বাজানকেও বাইচে নামাইছেন কোন আক্কেলে? কুড়ার মাশান যদি তার কোনো অনিষ্ট করে, তাইলে চেয়ারম্যান তোমার হাজামত বানাইবে। বাবাজি হামার ঢাকায় শেখ মুজিবের বাড়িতেও গেছিল, আর তাকে তোমরা মাছের লোভে মাশানকুড়ায় নামাইছেন আজ! যাও বাবা, মোর খলুইয়ের মাছগুলা নিয়া বাড়ি যাও তো।'

মানিক বিলের দিকে তাকিয়ে দেখে, কুড়ায় নাওয়ে ও কলাগাছের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুড়ায় চেপে মাছ ধরছিল যারা, তারা এখনো শিকারের নেশাতেই মগ্ন। প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়ার কারণেই হয়তো মানিকের দলের আতঙ্কটা টের পায়নি বেশিরভাগ মানুষ। তারা পলো ও জাল নিয়ে বিলের গভীর পানিতে। আর মচ্ছবের নেশা ও আনন্দ-উত্তেজনা মিথ্যে করে দিয়ে, আজগুবি রহস্যময় আতঙ্কের কাছে হার মেনে ফিরে যাবে সে?

উঠে দাঁড়িয়ে মানিক বলে, 'কোথায় মাশান-ভূত? ওটা আসলে বড় মাছ ছিল। ওটাকে আমরা ধরব। চলো।'

তবু দ্বিধাভয় কাটে না অনেকের।

মানিক বলে, 'টাউনে সবাই এক হয়া ইয়াহিয়া খানের মিলিটারির ভয় তুচ্ছ করি আন্দোলন-মিছিল করতেছে, আর আমরা কুড়ার মাশানের ভয়ে পালায় যাব? অসম্ভব, মাছ হউক আর মাশান হউক, ধরব শালাকে। চলো নামি আবার।'

মানিকের ভেতরে যে আবেগময় সাহস হঠাৎ নেতৃত্ব দেওয়ার ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়, তা যেন মানিককেও আরো সাহসী করে তোলে। আতঙ্ক-বিহ্বল ভিড়ে হাজার বছরের পুরনো ভয়ংকর জীবের আক্রমণ-আশঙ্কা ভিড়তে না দেওয়ার জন্য বাণ্টু চেঁচিয়ে বলে, 'জয় বাংলা কয়া আজ মাশানকেই হানবো আমরা। চলো বাহে-এ-এ-এ...

AMARBOI.COM

নয়

রাতে টাটকা ছোট মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে বসে মানিক নিজের হাতে ধরা মাছটি শনাক্ত করতে পারে না। কিন্তু খাওয়ার তৃপ্তির সঙ্গে মচ্ছবের প্রাপ্তি মনকে বেশ প্রফুল্ল করে তোলে। খাওয়ার পর বাণ্টুকে ডেকে মানিক প্রস্তাব দেয়, 'আইজ যে চ্যাংড়াগুলার সাথে মাছ মারলাম, ওদেরকে খবর দিয়ে কালকে ডেকে আনিস তো।'

রাতে ঘুমানোর জন্য নিজবাড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল বাণ্টু। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার বদলে এখনই মানিক ভাইয়ের হুকুম তালিমের প্রস্তুতি নিয়ে জানতে চায়, 'এলায় ডাকাইম কি? কেন ভাইজান, কাইল ফির মাছ ধরতে যাইবেন?

'আরে না। তেমন জরুরি কিছু না, কালকে খবর দিস, দেখি সবাইকে নিয়ে কিছু করা যায় কি না?'

'ঠিক আছে, আপনার ডাক শুনলে সবাই ছুটি আসপে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছ শিকারে গিয়ে গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে যেটুকু একাত্মতা গড়ে উঠেছিল, তেমন একাত্মতা নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবে মানিক। কিন্তু কী করবে এখনো ভেবে ঠিক করতে পারেনি। দেশের সংকটে কিছু একটা করা তার জরুরি আবেগ হয়ে উঠলেও, গাঁয়ের ছেলেরা আগের মতোই নিরুদ্বেগ, গেরস্তি কাজ কিংবা খেলাধুলার আনন্দ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মানিকের মতো শিক্ষিত বেকার গ্রামে নেই বললেই চলে। সকাল থেকে প্রায় সারাদিন এবং রাতেও রেডিয়োখানা হয়ে উঠেছে মানিকের সবচেয়ে প্রিয় ও নিত্যসঙ্গী। রেডিয়ো নিয়ে ঘরে কিংবা বাইরে বসে থাকে।

দেশগেরামে রেডিয়োঅলা বাড়ি খুব বেশি নেই। মানিক যখন প্রাইমারির ছাত্র, তখন বাবা কিনেছিল এই থ্রি-ব্যান্ড ফিলিপস রেডিয়োখানা। শহর থেকে বাবা যেদিন রেডিয়ো নিয়ে আসে, সেদিনটি ছিল গরমকালের চাঁদনি রাত। কাছারিঘরের দাওয়ায় বসে ফুল ভলিউমে বাজাতে শুরু করেছিল। রেডিয়োর আওয়াজ দিয়ে ভুঁইয়াবাড়ির গরিমা ও দিনবদলের আধুনিকতা বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে নিধুয়া পাথারের অন্ধকারেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। তখনো গ্রামে আর কারো বাড়িতে রেডিয়ো হয়নি। কলের গান বা রেডিয়ো শুনতে দুই/তিন মাইল পথ ছুটে যেতে পিছুপা হতো না ছোটরা। হঠাৎ রাতে ভুঁইয়াবাড়িতে রেডিয়োর আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠেছিল নিঝুম গ্রাম। বিছানায় ঘুমানোর আয়োজন ছেড়ে ছুটে আসতে শুরু করেছিল লোকজন।

মায়ের হাত ধরে মানিকও বাবার হাতের রেডিয়োখানার দখল নিতে তৎপর হয়েছিল যেন। ভয়ে ভয়ে যন্ত্রখানা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেছিল। হাতেনাতে সেই প্রথম রেডিয়ো দেখা ও শোনার সময়ে বুকে সে কি তুমুল উত্তেজনা! নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইংরেজি-বাংলা-উর্দু ও আরো কী সব দুর্বোধ্য ভাষার গান ও কথা শুনে নিজেকে সেই প্রথম অচেনা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করার আনন্দময় উত্তেজনা তীব্রভাবে অনুভব করেছিল মানিক।

দশ বছর পর বাড়িতে থেকে সেই রেডিয়োখানাই যখন আবার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, তখন শৈশবের মতো রেডিয়ো শুনে অচিন দেশের হাজারো রহস্যময় মানুষের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চ জাগে না। বরং বিশ্বের মাঝে স্বাধীন স্বদেশকে পাওয়ার স্বপ্ন ও উদ্বেগটাই চাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ। আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা শুনে শুনে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পরিণতি বোঝার চেষ্টা করে মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুঁইয়াবাড়ি ছাড়াও এখন অবশ্য গাঁয়ের বেশ কিছু বাড়িতে রেডিয়ো হয়েছে। পরেশ কাকাদের তো আছেই। কৃষকের ঘরের ছেলেরাও আজকাল বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে একখানা সাইকেল ও রেডিয়ো ডিমান্ড করে। আর মেয়েকে পার করতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদেরও প্রস্তুতি থাকে ডিমান্ড মেটানোর। শখের বশে না যতটা, তার চেয়ে বিয়েশাদির সামাজিকতার কারণে গ্রামে রেডিয়োর সংখ্যা বেড়েছে। অনেকে সরব রেডিয়ো ঘাড়ে ঝুলিয়ে সাইকেল চালিয়ে গাঁয়ের রাস্তায় ছুটে যায়। কিন্তু মানিক যে কারণে দিনেরাতে রেডিয়োখানাতে কান পেতে থাকে, তেমনটি কেউ করে না, সময়ও পায় না বোধহয়।

বাংটুর মা আছিমন একদিন রেডিয়োর সঙ্গে মানিকের কানের সম্পর্ক ছিন্ন করে বলে, 'দিনেআইতে খালি এডিওর গান শোনেন, নাকি মজিবরের ভাষণ শোনেন বাহে? মাইনষে কয় আওয়ামী লীগ বাপ আর চেরম্যান নানার চাইতেও বড়, শেখের মতো নেতা হইবেন তোমরা।'

শহরের আন্দোলনের খবর গাঁয়ের মানুষও কমবেশি জেনে গেছে। বাংটু যে কয়টি ছেলেকে ডেকে এনেছিল, বৈঠকখানায় তাদের কাছেও দেশের পরিস্থিতি ও স্বাধীনতার দাবি ব্যাখ্যা করেছে মানিক। সন্ধ্যাবেলা মানিকের সঙ্গে রেডিয়ো শোনে অনেকেই। যারা আসে না, তারাও দেখা হলে মানিকের কাছে দেশের খবর জানতে চায়। ঢাকায় ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে মুজিবের আলোচনার ফলাফল জানতে উদগ্রীব গাঁয়ের লোকজনও। কিন্তু বাংটুর মায়ের কল্পনায় স্বাধীনতা আন্দোলন হয়তো এখনো অনুপস্থিত। এত বড় আন্দোলন ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই বলেই হয়তো মহিলার সংকীর্ণ চিন্তায় মানিকই অহেতুক বড় হয়ে উঠছে। রেডিয়োর আওয়াজ কমিয়ে তাকেও বোঝানোর চেষ্টা করে মানিক, 'ও চাচি, মুজিবরের ডাকে তো সারাদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হইছে জানেন না? রেডিয়োতে খালি সেই খবর শুনি। দেশ স্বাধীন হইলে তোমারও দুঃখকষ্ট ঘুচবে বাহে।'

'হামার বাংটুও তো সেই কথা কয় বাবা। কিন্তু তোমার যাদু যে দেশের এই গণ্ডগোলে কোন্ঠে পড়ি আছে, আল্লায় জানে।'

'চিন্তা করেন না। দেশ স্বাধীন হইলে যাদুও আর গ্রাম ছাড়ি বিদেশ যাইবে না।'

বাংটুর মাকে নিরুদ্দেশ স্বামী সম্পর্কে সান্ত্বনা দিলেও, সে চলে যাওয়ার পর বাংটুর বাপ সেরাজ বাউদিয়া মানিকের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের জন্মের পর থেকেই সেরাজ যাদু ছিল ভুঁইয়াবাড়িরই বাঁধা চাকর। অলস ও উদাসীন স্বভাবের মানুষ। কাজ যত করত, কথা বলত আরো বেশি। এ জন্য উঠতে বসতে মনিবের গালমন্দ খেত, অনেক সময় কিলচড়ও। তারপরও বড়বাড়ির সঙ্গে তার গোটা পরিবারের বাঁচা-মরার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। মানিকের সৎমা এ বাড়িতে আসার পর তার হাতের ঝাড়ুর ডাং খেয়েছে একবার। সেই আঘাত ও অপমান সহজভাবে মানতে পারেনি সেরাজ বাউদিয়া। চাকরির কপালে ঝাঁটা মেরে সেও একদিন গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। এরপর বাপের বদলি খাটতে কিশোর বাণ্টু এসেছে মানিকদের বাড়িতে। আছিমনই জোর করে ছেলেকে এ বাড়িতে দিয়ে গেছে। সেই থেকে বাণ্টু ভুঁইয়াবাড়ির ছোট চাকর।

প্রথমবার নিরুদ্দেশ হওয়ার মাসছয়েক পর সেরাজ গ্রামে ফিরে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু সন্তানকে মুক্ত করতে নিজে আর ভুঁইয়াবাড়ির চাকরিতে ঢোকেনি। স্বাধীনভাবে ক্ষেতমজুরের কাজ করেছে। তারপর বউ-বাচ্চা রেখে রুজি-রোজগারের ধান্ধায় দিনাজপুর কি বগুড়ায় কাজে যাওয়ার কথা বলে উধাও হয়েছে আবার। সেই থেকে বাউদিয়া উপাধিটি তার নামেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। চাকরি ছেড়ে পালাবার পর থেকে সেরাজ বাউদিয়া ভয়ে সজব ভুঁইয়ার সামনে আসে না কখনো। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে মাথা নিচু করে থাকে, কিন্তু মানিক বাড়িতে এসেছে শুনলেই ছুটে আসে। তার চোখ-মুখের উচ্ছ্বসিত খুশিতে যে স্নেহ-ভালোবাসা ঝরে পড়ে, তা অনেক আপনজনদের মধ্যেও খুঁজে পায় না মানিক। ছোটবেলায় মানিককে কোলেকাঁখে করে নিয়ে বেড়িয়েছে। যাদু সম্বোধন করে মানিকও তাকে চাকর নয়, আপনজনই ভেবে এসেছে। নইলে বাড়িতে এসেও বাউদিয়া যাদুর কথা এত মনে পড়বে কেন? মায়ের মৃত্যুর পর সেরাজ যাদু মানিককে জড়িয়ে ধরে যেমন কেঁদেছিল, সেই কান্নাও ভোলার মতো নয়।

গ্রাম থেকে উধাও হওয়ার কারণ হিসেবে লোকে বলে, দিনাজপুরের কোথায় কোন মহাজনের খামারে চাকরি নিয়েছে। সেখানে সে আর একটা বিয়েও করেছে। মায়া-ছাওয়া ছাড়া পুরুষ মানুষ একা থাকতে পারে কখনো? কথাটার সত্যতা যাচাই করতে মানিক গতবারও বাড়িতে এলে সেরাজ যাদুকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। মানিকের মাথায় হাত রেখে জবাব দিয়েছে সে, 'তোমরা হামার নিজের সন্তানের চাইতেও বেশি, তোমার মাথায় হাত রাখিয়া কইনু বাবা, সব ভুয়া কথা।'

'তাহলে আমাদের বাড়িতে কাম না করেন, ঠিক আছে। কিন্তু গ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকিয়া কামলা খাটলেও তো বউ-বাচ্চার কষ্ট একটু কমে।'

সেরাজ বাউদিয়া জবাব দিয়েছিল, 'গ্রামে থাকলে তোমার বাড়ির চাকর ছাড়া হামার কোনো পরিচয় নাই। কিন্তু চাকরি করার চাইতে স্বাধীনভাবে ঘুরি বেড়াইতেই যে মোর ভাল লাগে। তাছাড়া ফকিরের মতো খালি তো ঘুরিয়া বেড়াই না, কামাইরুজিও করি।'

দেশ স্বাধীন হলে কি গ্রামে থেকেও সেরাজ বাউদিয়ারা স্বাধীন হওয়ার আনন্দ পাবে? রুজি-রোজগার বাড়বে? শেখ মুজিব ক্ষমতায় গেলে গাঁয়ের কৃষক ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষসহ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা কী কী সুবিধা পাবে, তা নিয়ে ভোটের সময় থেকে মেলা রকম আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। কিন্তু দেশ একেবারে স্বাধীন হবে এবং স্বাধীন হলে তাদের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আসবে, তা নিয়ে গ্রামবাসীদের স্বপ্ন ও সচেতনতা বাড়ানোর তেমন প্রচার-প্রচারণা হয়নি। তারপরও স্বাধীনতা এমন এক সর্বজনীন জিনিস, যা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক মানুষের মন এমনিতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে বোধহয়। দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙার তেজ প্রবল হয়ে ওঠে সুযোগ পেলেই। ঢাকা ও অন্য শহরগুলোতে চলমান অসহযোগ আন্দোলন এই আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে রেখেছে। মানিকও কি গ্রামে থেকে এ ব্যাপারে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে না?

AMARBOI.COM

দশ

২৩ মার্চ সারা দেশে বাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াবে মানুষ। খবরটা জানার পর নিজ গ্রামেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ার চিন্তাটি মানিকের মাথায় আসে প্রথম। পতাকা ওড়ালেই দেশ স্বাধীন হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটি আছিমনের মতো দরিদ্র দুস্থ নারীর মনেও জোরালো হবে নিশ্চয়ই। মার্চের ৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানোর সমাবেশেও আরিফের সঙ্গে উপস্থিত ছিল মানিক। স্বাধীনতার দাবিতে ছাত্রদের আপসহীন টগবগে আবেগের প্রকাশ দেখেছে। নতুন পতাকা উড়তে দেখলে গাঁয়ের নিরক্ষর মানুষের চেতনাতেও হয়তো স্বাধীনতার স্বপ্ন জোর বাতাস পাবে। বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য সে গ্রামের কিছু ছেলেকে খবর দিতে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাব শুনে পরেশ কাকাও বেশ উজ্জীবিত, তবু দ্বিধা নিয়ে বলে, 'তোর বাপকে কি বলেছিস?'

মানিক বিরক্ত হয়ে বলে, 'আব্বাকে বলার কী দরকার? শেখ মুজিব তো অর্ডার দেয়নি, তারপরও স্বাধীনতার পতাকা ঢাকায় তিন তারিখেই উড়িয়েছে ছাত্ররা। আজ সারাদেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়াবে মানুষ, আর আমরা পিছিয়ে থাকব?'

'চল তবে বাজারে যাই, নরেশের দোকানে লাল-সবুজ আর সোনালি কাপড় আছে কি না দেখি। থাকলে খালেক খলিফার কাছে কয়টা পতাকা বানায় নিই তো আগে। তারপর দেখা যাউক।'

পতাকা বানাতে পরেশ কাকার বাইসাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বসে ঠ্যাংভাঙা হাটে যায় মানিক।

ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তার ধারে ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, হাই স্কুল, মাদ্রাসা এবং কয়েকটি স্থায়ী দোকান নিয়ে ঠ্যাংভাঙা হাট এখন হাটবার ছাড়াও জমজমাট থাকে প্রতিদিন। হাটবারের জন্য খড়ো চালাগুলো ও নানারকম পণ্যের পৃথক হাটি খালি পড়ে থাকে। কিন্তু বিকেলে বাজার লাগে প্রতিদিন। ক্ষেতেমাঠে যারা কাজকর্ম করে না, এমন সচ্ছল গেরস্ত ও মাতবর শ্রেণির মানুষ বাজারে এসে রোজ আড্ডা জমায়। তাদের বসার জন্য কয়েকটা চায়ের দোকানও হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা খোলা থাকে প্রতিদিন। হাটের কয়েকটা স্থায়ী ব্যবসা-দোকানকে স্থানীয় লোকজন বাসা বলে। এরকম এক বাসা সাহা বস্ত্রঘর, সঙ্গে পাটের গুদামও আছে। হাটবার ছাড়াও হাটখোলায় সারাদিন উপস্থিত থেকে ব্যবসা চালায় নরেশ। সাহাদের কাপড়ের দোকানে মেশিনসহ খালেক খলিফাও সেই দোকানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ যেন। খলিফা মেশিনে পা নাচিয়ে কাপড় সেলাই করছে। আর গদিতে বসে নরেশসহ আরো দুজন গল্প করছিল। মানিককে নিয়ে পরেশ দোকানে ঢুকলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় সবাই।

পরেশ প্রথম খলিফাকে জিজ্ঞেস করে, 'ও খলিফা পতাকা বানাইতে পারবি না?'

খলিফা সগর্বে জবাব দেয়, 'পারব না মানে! স্বাধীনতা দিবসে এ জায়গার স্কুল-কলেজে যত পাকিস্তানি ফেলাগ ওড়ে, সেগুলা কাঁয় বানাইছে? ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য চেয়ারম্যান পর্যন্ত আমার কাছে পতাকা বানায় নিছে। পতাকার মধ্যে এমন চাঁদতারা বানায় দেব, মনে হইবে দিনের মধ্যেও ফকফকা চাঁদনি উঠছে।'

'আরে, হে পাকিস্তানি পতাকার দিন শেষ, স্বাধীন বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতাকা বানাইতে পারবি না?'

খলিফা চমকে ওঠে। জবাব দেয় না। নরেশের গদিতে উপস্থিত একজন মানিকের কাছে জানতে চায়, 'শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ কি স্বাধীন হইল? ঢাকার মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের খবর কী বাহে ভুঁইয়ার বেটা?'

'আলোচনা যাই হোক, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বাঙালি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন থামবে না। আজ সারাদেশের মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়াবে, আমরাও এ গ্রামে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়াব।'

রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ও নেতৃত্ব দেওয়ার স্বভাব নয় বলেই হয়তো মানিকের কথায় অস্বাভাবিক জোর পড়ে। খালেক খলিফা ভয় পেয়ে সতর্ক করে তাকে, 'ও বাবাজি, তোমার চেয়ারম্যান নানার অনুমতি নিছেন? এই বাজারে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়াইলে তোমার হয়তো কিছু হবার নয়, কিন্তু পতাকা বানানেওয়ালার গর্দান যাইবে।'

খালেক খলিফা কথার সমর্থনে কাঁচিখানা নিজের গলার কাছে ধরে খ্যাচ করে কেটে দেয়। এক ফোঁটা রক্ত ঝরে না, কিন্তু খলিফার গর্দানকর্তনের হাস্যকর ভঙ্গি দেখেও হাসে না কেউ। নরেশ একই সঙ্গে খলিফা ও মানিককে সমর্থন করে বলে, 'পতাকা বাজারে ওড়ানোর দরকার কী মানিক? তার চাইতে দুইটা পতাকা বানায় নিয়া তোমার আর হামার বাড়িতে ওড়ায় দাও গিয়া।'

বাজারে মানিকের নানা কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের প্রভাব-প্রতিপত্তি কারো অজানা নয়। কিন্তু এবার বাড়িতে এসে নানার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে তুচ্ছ করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে গিয়ে নানার সঙ্গে শুধু ঝগড়া নয়, নানাবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রতনপুরে আছে মানিক। এ খবর ঠ্যাংভাঙা হাটে পৌঁছেনি বোধহয়। খবরটা নিজেই মানিক সকলকে জানিয়ে দিতে বলে, 'নানাজিকে আপনারা এত ভয় পান কেন? সারাদেশের মানুষ মুজিবের ডাকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, আর আপনারা এখনো কি ওই বুড়ার ভয়ে পাকিস্তানের সমর্থক হয়ে থাকবেন? কাজী চেয়ারম্যান তো আমার চেয়ে আপনাদের বেশি আপন নয়, দেশ ও স্বাধীনতার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি, আপনারা ভয় পান কেন?'

মানিকের কথায় সব দ্বিধা-ভয় ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়ায় খালেক খলিফাই প্রথম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চেয়ারম্যানের নাতি পাশে থাকলে আমি আর বুড়া চেয়ারম্যানকেও ভয় পাই না বাহে। আনো কাপড়, স্বাধীন বাংলার পতাকা কয়খান লাগে, দাও আমি বানায় দেই। আমাকে খালি মাপ আর নকশাটা দেখায় দাও।'

নরেশ লাল সবুজ কাপড়ের থান এগিয়ে দেয়, 'নাও খলিফা, কয় গজ কাপড় লাগবে কাটি নাও।'

মানিক গোটাদশেক পতাকার কাপড়ের হিসাব নিয়ে বলে, 'ও কাকা, কাপড়ের দামটা কিন্তু আমি দেব।'

নরেশ প্রতিবাদ করে বলে, 'কী বলিস বাহে! জয় বাংলার জন্য তোর বাপের সাথে রাজনীতি করিয়া দাদা জীবন দিতে প্রস্তুত, আর আমি স্বাধীনতার জন্য কয়টা পতাকার কাপড় দিতে পারব না! ও খলিফা, হিসাব করি যা লাগে, কাপড় কাট।'

এরপর সাহা বস্ত্রবিতান নামে বাজারের স্থায়ী দোকানটায় পতাকা-উৎসব শুরু হয় যেন। এমনিতেই বাজারে চায়ের দোকানগুলো ঘিরে অলস-আড্ডাবাজ লোকজনের অভাব নেই। তার ওপর রেডিয়ো শুনে পাকিস্তান ভাঙা ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেখার আগ্রহে অধীর হয়ে আছে অনেকেই। নরেশের কাপড়ের দোকানে মানিক এসেছে এবং স্বাধীনতার পতাকা বানানো হচ্ছে শুনে অনেকেই ছুটতে থাকে সেখানে। নরেশের অর্ডার পেয়ে চায়ের দোকান থেকে দশ কাপ চাও কাপড়ের দোকানটায় ঢোকার জন্য তৈরি হতে থাকে। রেডিয়োতে গরম খবর শোনার সময়ে যেমন হয়, নরেশের কাপড়ের দোকানেও সেরকম ভিড় তৈরি হয়।

AMARBOI.COM

ভিড়ের মাঝে পতাকা সেলাই করে খলিফা। লাল সূর্যের ভেতরে সোনার বাংলার মানচিত্র আঁকার জন্য সঠিক রঙের কাপড় মেলানো যায়নি। হলুদের বদলে খয়েরি রঙের কাপড় বাছা হয়। খালেক খলিফা মানচিত্র আঁকতে পারে না বলে মানিক স্কুলে শেখা পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রকে পেনসিলের রেখায় স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে ফুটিয়ে তোলে। তাতেও স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের সূক্ষ্ম-আনন্দানুভূতি ভেতরে শিরশির করতে থাকে তার।

নরেশের দোকানে যখন স্বাধীনতার পতাকা তৈরির উৎসব জমে উঠেছে, বাংটু দোকানের সামনে সাইকেল হেলান দিয়ে রেখে দোকানে ঢোকে। ভিড় ঠেলে মানিকের কাছাকাছি হয়েও ভিড়ের কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না সে। তখন নিজের উপস্থিতি ঘোষণার জন্য চেঁচিয়ে বলে, 'ও ভাইজান, তোমরা এটে কী করেন? ওতি তোমরা বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই দেখিয়া সগাই কয় নানার বাড়ি গেইছেন। আমি সাইকেল দাবড়ে নানার বাড়ি থেকে ঘুরি আইলাম। কীসের কাপড় এগুলা?'

খলিফা কড়কড়ে নতুন কাপড়ের পতাকা সেলাই করছে মেশিনে। তার মেশিন যেমন জোরে চলে, সেই সঙ্গে মুখও চলে সমানতালে, 'এই পতাকা ওড়া মানে কী বাহে জানেন? মুজিব যেমন ঘোষণা দিছে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম এবার হামার ঠ্যাংভাঙা হাটেও শুরু হইল। কাজী চেয়ারম্যান আর তার পাকিস্তানকে হামরা চাই না, এখন থাকি চেয়ারম্যানের নাতি হামার চেয়ারম্যান।'

মানিক বাজারে পতাকা ওড়ানোর কথা ভাবেনি। কিন্তু বাজারে উপস্থিত কয়েকজন লোক মানিকের চেয়েও বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে। পতাকা ওড়ানোর জন্য বাঁশের লাঠি ও রশি জোগাড় করে তারা। প্রথম পতাকাটি নরেশের দোকানেই ওঠে। পরেশ কাকা চেঁচিয়ে স্লোগানও দেয়, 'কন সগাই, জয় বাংলা'।

এরপর মানিকের সাহস পরীক্ষা করতে কিংবা তাকে উৎসাহ দিতেও হতে পারে, তার নানার অফিস অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসেও পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে একজন। কারণ ওটা তো আসলে জনগণের অফিস।

'পরেশ ও নরেশরা চৌদ্দগুষ্ঠি জয় বাংলা। তাদের দোকানে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়া কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইতে পারলে বুঝব মানিক বাপের বেটা।'

নরেশ আবারো সতর্ক করে, 'দরকার নাই বাবা, তোমার নানা সব দোষ আমাদের ওপর চাপাইতে পারে।'

'ঢাকায় মেলা সরকারি অফিসেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ড তো জনগণের অফিস, চলেন ওই অফিসেও পতাকা ওড়াব আমরা।'

ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে পতাকা ওড়ানো যেন পাকিস্তানের একটি দুর্গ দখল করা। স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ানো এরই মধ্যে আশপাশেও বেশ উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অনেকে ছুটে আসছে দেখার জন্য।

বাণ্টু বলে, 'ভাইজান হুকুম দিলে আমি বুড়া নানার বাড়িতে গিয়াও একটা পতাকা ওড়ায় দিয়া আসি?'

মানিক আদেশ দেয়, 'নানার বাড়িতে তোর পতাকা ওড়াতে হবে না। খলিফার কাছ থেকে আর দুইটা পতাকা নিয়া একটা লম্বা বাঁশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটিয়া আমাদের বাড়িতে ওড়াব, আর একটা কাকাদের বাড়িতে।'

ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দা থেকে সমর্থক ভিড় নিয়ে মানিক আবার নরেশের দোকানে ফিরে আসে। নরেশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পতাকা তাজ্জব হয়ে দেখছিল যে লোকটা, তাকে দেখে তার-পতাকাবিরোধী চরিত্রটাও ভিড়ের প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা চাগিয়ে দেয়। ফিসফাস করে সবাই। জসীম মেম্বার, চেয়ারম্যানের প্রধান চেলা। ঠ্যাংভাঙায় রাজনীতিতে মানিকের বাবা ও পরেশদেরও চিহ্নিত প্রতিপক্ষ। মানিকও চেনে লোকটাকে। নানার বাড়িতে অনেকবার দেখেছে। নানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মানিককে আপন ভাগ্নের মতো দেখে।

জসীম মেম্বার ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসিমুখে কথাটা বলে, 'সেই তো বলি বাবা, ঠ্যাংভাঙায় কার এমন বুকের পাটা, পাকিস্তান না ভাঙতেই স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ায় দিয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে?'

মানিক জবাব দেওয়ার আগে বাংটু ঝগড়াটে গলায় জবাব দেয়, 'কী বালের আষ্ট্ররদুহিতার কথা কন! পাকিস্তান হামরা চাই না। ধরি নাও, স্বাধীন আমরা হয়াই গেছি। জয় বাংলা।'

লোকজন হাসলেও মেম্বার বাংটুর দিকে তাকিয়ে কটমট তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোন চ্যাংড়া রে তুই?'

মানিক লোকটাকে পক্ষে টানার জন্য বলে, 'খালি ঠ্যাংভাঙা হাটে না মামা, সারাদেশে মানুষ স্বাধীনতার দাবিতে পতাকা উড়িয়েছে।'

ঝগড়াকাজিয়া লাগানোর বদলে জসীম মেম্বার যেন মুহূর্তেই আত্মসমর্পণ করে। খাতির দেখাতে জোর করে মানিক ও পরেশকে পাশের চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায়। গজা, মিষ্টি ও চায়ের অর্ডার দেয় সবার জন্য। আপ্যায়নের সঙ্গে কাজী চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও সমর্থন জাহির করতে মানিককেও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বাঁধনে জড়িয়ে নেয় যেন।

'ও ভাইগ্না, এবার ঢাকা থাকিয়া আসার পর নানার সাথে কী নিয়া ফাটাফাটি ঝগড়া করেছেন, আমি সবই জানি বাহে। চেয়ারম্যান চাচা গতকালও দুঃখ করি কইল, মানিকটাও বাপের রাজনীতি ধরিছে, নাতিটা তো আমার এরকম ছিল না বাহে!'

'বাপের রাজনীতি কী মামা, স্বাধীনতার দাবিতে সব বাঙালি একাট্টা হয়েছে। এ সময় বাঙালি হয়েও পাকিস্তান রক্ষার নামে নানাজির আন্দোলনের বিরোধিতা আপনি সমর্থন করতে পারেন, আমি করব না। নানাজি স্বাধীনতার পক্ষে না আসলে তার বাড়িতেও যাব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে দিয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে বাবাজি, আগে তো স্বাধীন করো বাংলাদেশ, তারপর আমরা তোমার স্বাধীন বাংলাদেশে না থাকিয়া যাব কোথায়? ইন্ডিয়া তো পালাইতে পারব না। কিন্তু কথা হইল ভাইগ্না, মুজিব তো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান রক্ষার শপথ নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা চালায় যাইতেছে। কথাটা ঠিক কি না কন?'

মানিকের আগে উপস্থিত সমর্থকরা মেম্বারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়, 'কী বলেন, মুজিব বলে নাই এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার হুকুম দেয় নাই? অসহযোগ আন্দোলনে গোটা দেশ আজ অচল কেন?'

যুক্তির চেয়েও নানা কণ্ঠে স্বাধীনতাকামী আবেগের জোরালো প্রকাশ দেখে জসীম মেম্বার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ভিড়কে বলে, 'ঠিক আছে বাহে, ইয়াহিয়া-ভুট্টো যদি মুজিবের হাতে স্বাধীনতা তুলি দিয়া যায়, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে জয় বাংলা বলব। কিন্তু চেয়ারম্যানকে মানাইবেন কী করিয়া? এ অঙ্গাজ হাতের লাঠির চেয়েও বেশি আপন এই নাতি মানিকও তাকে মানাইতে পারে নাই।'

আলোচনার মধ্যে যখন চেয়ারম্যান আবার উপস্থিত, ঠিক তখন বাজারে তার উপস্থিতির খবর জানাতে নরেশের দোকান থেকে ছুটে এসে একজন জানায়, চেয়ারম্যান লাভলুর মোটরসাইকেলে চড়িয়া নরেশের দোকানে হাজির হইছে। ফাটাফাটি শুরু হইছে নরেশের সাথে, ও মানিক ভাই, আসেন তাড়াতাড়ি।'

আলোচনার মাঝে আলোচ্য ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতি তো তার দীর্ঘজীবী হওয়ার লক্ষণ। তার ওপর পরাস্ত জসীম মেম্বারকে উদ্ধার করতেই যেন চেয়ারম্যান যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। ভয়ে, কৌতূহলে কিংবা নতুন ধরনের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার গরজেও হতে পারে, মানিক ও মেম্বারের দিকে তাকায় সবাই।

একজন বলে, 'লাভলুর মোটরসাইকেলে বসিয়া হঠাৎ চেয়ারম্যান বাজারে আইল কেন? নিশ্চয় মেম্বার তার কাছে পতাকা ওড়ানোর খবর পাঠাইছে।'

'আমি দেব কেন, ঠ্যাংভাঙা হাটে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটাইলেন, আর সে খবর বাতাসে চেয়ারম্যানের কানে যাবে না?'

পারিবারিক গণ্ডির বাইরে হাটেবাজারে প্রকাশ্যে নানার সঙ্গে রাজনৈতিক ঝগড়াকাজিয়া করার প্রস্তুতি বা ইচ্ছে ছিল না মানিকের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানার মুখোমুখি হতে চায় না সে। বলে, 'ঠিক আছে নানাজিকে বলে দেন, আমি পতাকা ওড়ায় দিছি। যা বলার যা করার আমার বিরুদ্ধে করবে।'

'তোমার কথা বলার পরও চেয়ারম্যান আরো ফায়ার হইছে। তোমরা না গেলে ও বুড়াকে থামানো যাইবে না।'

পরেশ এবার মানিককে ঢাল হিসেবে বগলদাবা করে দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে। লড়াই দেখতে উৎসুক ও কৌতূহলী লোকজনও পিছু নেয় তাদের।

নরেশের দোকানে চেয়ারে বসে চেয়ারম্যান যেন মানিকের অপেক্ষাতেই ছিল। মানিক সালাম দিয়ে বলে, 'তা আপনি হঠাৎ অবেলায় ঠ্যাংভাঙায় কেন নানাজি?'

'হ্যাঁ, ঢাকায় গোলমাল লাগায় দিয়া এখন ঠ্যাংভাঙা হাট কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ করি ফেললু, সেটা নিজের চোখে দেখতে আসলাম। আমার অফিসে পতাকা ওড়াইল কোন শালা?'

নরেশ মানিকের জরুরি সমর্থন পেতে বলে, 'দেখো তো মানিক, চেয়ারম্যান কাকা পতাকা ওড়ানোর সব দোষ আমাকে দিচ্ছে। আমি তোমাকে ইউনিয়ন কাউন্সিলে পতাকা ওড়ানোর আগে চেয়ারম্যান কাকার অনুমতি নিতে বলেছিলাম, বলো, বলি নাই?'

'স্বাধীনতার পতাকা আমি উড়িয়ে দিয়েছি নানা। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ওই পতাকা নামবে না।'

'তা তোদের নেতা কি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে পেরেছে? গোটা দুনিয়া মানবে তোর নেতার এই আবদার?'

'খবর তো আপনি কিছু রাখেন না। গ্রামে টিভি নাই, বিবিসি শুনলে বুঝবেন আন্দোলনে অচল গোটা দেশেই মানুষ স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য জেগেছে সব বাঙালি।'

বাণ্টু পতাকা হাতে চলে যাওয়ার সময়ে চেয়ারম্যানকে আসতে দেখে থেমেছে। সালাম দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছিল। এখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অহংকার দেখাতেই হঠাৎ বলে ওঠে সে, 'ও চেরম্যান নানাজি, জামাইয়ের হাতে ক্ষমতা না ছাড়েন, নাতির হাতে এলা ক্ষমতা ছাড়েন। তোমার পাকিস্তান আর ইয়াহিয়া ভুট্টাকে মুজিব ফুটবলের মতো এক শটে গদি হইতে উড়ায় দেবে, বাঁচতে চান তো নাতির হাতে তোমরাও ক্ষমতা ছাড়ি দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণ্টুর ঠাট্টা শুনে উপস্থিত সবাই সমর্থন দেবে কী, হাসতেও যেন ভয় পায়।

চেয়ারম্যান ঠাট্টার জবাবে কটমট করে তাকিয়ে মানিককে বলে, 'বাড়ির চাকরবাকর নিয়েও দল পাকইছিস! কিন্তু আমি যদি আমার লোকজনকে হুকুম দিই পতাকা নামায় ফেলতে, পারবি দলবল নিয়ে ঠেকাইতে? অহেতুক মারামারি উত্তেজনা করে এখন গ্রামেও অশান্তির আগুন জ্বালাইতে চাস, বলি মতলবটা কী তোর শুনি।'

'পতাকা নামালেও স্বাধীনতার আন্দোলন ঠেকাতে পারবেন না নানা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।'

মানিকের ঠাণ্ডা দৃঢ়তার পাশে বাণ্টু আবার ঝগড়াটে গলায় যোগ করে, 'ও বুড়া বাঘ, বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না, তা হইলে কিন্তু এই হাতের পতাকা তোমার বাড়িতে গিয়েও ওড়ায় দেব আমি।'

ঠিক এ সময় জসীম মেম্বার বাণ্টুর গালে পটাস চড় বসিয়ে বলে, 'ছোট মুখে বড় কথা বলিস! হারামজাদা তুই এত ফটর ফটর করিস ক্যানে? '

চড় খেয়েও বাণ্টু চুপ করে না, আহত প্রতিবাদী কণ্ঠে চেঁচায়, 'ও ভাইজান, এই মেম্বার নানার চেয়েও বেশি নৌকার বিরোধী। এ শয়তান মেম্বারই নানাজিকে খেপায় দিয়েছে।'

মানিক নানাজির সঙ্গে লোকদেখানো ঝগড়া বাড়তে দিতে চায় না। বিদায় নেওয়ার জন্য শেষ সিদ্ধান্ত জানায়, 'এলাকায় নিজের দাপট প্রমাণ করতে পতাকা হয়তো নামাতে পারবেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, তা কি আপনারা মুছে দিতে পারবেন? এই বাণ্টু চল, ওই পতাকা আমরা গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ওড়াব।'

নানা ও ভিড়কে নরেশের দোকানে রেখেই মানিক বেরিয়ে যায়, পরেশ তাকে আটকে রেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে, কিন্তু মানিক ততক্ষণে বাণ্টুর সাইকেলে উঠে বসেছে। জোরে সাইকেল চালায় মানিক। আর সাইকেলের রডে বসে বাণ্টু হাতের নতুন পতাকাটি যথাসম্ভব মেলে ধরে মেম্বারকে শোনাতেই যেন, চেঁচিয়ে বলে, জয় বাংলা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

নিধুয়া পাথারে ধান কাটার কাম শেষে, এক বোঝা ধানগাছের খয়েরি নাড়াও কেটে নিয়েছে ঢোঁড়া। চুলায় জ্বালানি হবে। মাথায় ধানের নাড়া, গামছায় বাঁধা কামের মজুরি সোয়াসের চাল, আর কোমরে গোঁজা কাস্তেখানা। ঘরে ফেরার জন্য ভুঁইয়াবাড়ি নিশানা করে পাথারের ক্ষেত-আল ভেঙে সোজাসুজি হাঁটে সে। গাঁয়ের সেরা বড়বাড়িটা কাছে থেকে যেমন, তেমনি দূর থেকে দেখলেও তার বিরাটত্ব চোখে পড়ে। বাড়ির সামনের কাছারিঘরের টিনের চাল, ভিটার বড় গাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা, বাড়ির পাশে বড় বাঁশের ঝাড় নিধুয়া পাথার থেকেও দেখা যায়। এসব চেনা দৃশ্যের মাঝে ভুঁইয়ার কাছারিঘরের সামনে বেশ উঁচুতে একটি নতুন জিনিসও সংযোজিত হয়েছে আজ। সেটা অবশ্য পাথার থেকে দেখতে পায়নি ঢোঁড়া। ক্ষেত থেকে বড়বাড়ির সামনের রাস্তায় উঠতেই নজরে আসে জিনিসটা। দেখার জন্য মাথার বোঝা যতটা সম্ভব হেলিয়ে, ওপরে তাকায়।

ভুঁইয়াবাড়ির কাছারিঘরের সামনে লম্বা মাকলা বাঁশের ডগায় বাঁধা অচেনা নিশান এবং নিশানের তলায় লোকজনের ভিড় দেখে কৌতূহল নিয়ে দাঁড়ায় ঢোঁড়া। বেশ কয়েকবার নিশানটা দেখে ও উপস্থিত লোকজনের কথাবার্তা শুনেও তাদের আনন্দ-উত্তেজনার কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। ভিড়ে উপস্থিত ভাতিজা বাংটুকে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'ও বাহে বাংটু, কিসের নিশান উড়াইছেন ওখান?'

বাংটু চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'ও বাহে চাজি, বাংলাদেশ স্বাধীন করি ফেলাইছি হামরা! হাটখোলায় চেয়ারম্যান অফিসে দেখো গিয়া। মানিক ভাই চেরম্যান নানার অফিসেও জয় বাংলার পতাকা ওড়ায় দিছে আজ।'

ভুঁইয়াবাড়িতে চাকরি করে বাংটুর আওবাও এবং চালচলনেও এখন ফোরটুয়েন্টি ভাব। রেডিয়ো শোনে আর রেডিয়োর মতো দুর্বোধ্য কত খবর দেয়! ঢোঁড়ার পছন্দ নয় এসব। গরিবের ছাওয়ার বড়লোকি বুঝতেও পারে না। ভিড়ের মধ্যমণি ভুঁইয়ার ছেলে মানিকের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে সে। মানিক লোকজনকে শেখ মুজিব আর ঢাকার আন্দোলনের খবর বোঝাচ্ছিল। মাঝখান থেকে ঢোঁড়া আসল কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। ভিড়ে শেখের মামু নজিবর হাজির থাকলে সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারত। নিশানের ব্যাপারটা পরে শেখের মামুর কাছেই বিস্তারিত জানা যাবে ভেবে ঘরের দিকে পা বাড়ায় ঢোঁড়া। বড়বাড়ির স্বাধীনতা দেখার চেয়ে এখন ঘরে ফিরে বাংটুর মাও ভাবির কাছে রাতের রান্নাটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়ে নেওয়া জরুরি। রাস্তা থেকে আবারও ফসলকাটা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ঘরের দিকে দ্রুত পা চালায় সে।

নিশান উড়িয়ে বাংটু যতই জয় বাংলা কি স্বাধীন বাংলা করে লাফাঝাঁপা করুক, তার নিরুদ্দেশ বাউদিয়া বাপ আর স্বামীছাড়া মায়ের সংসারে কি ভালো কোনো পরিবর্তন আসবে? আসবে না যে, সেটা ভালো করেই জানে ঢোঁড়া। এ কারণে একটু সান্ত্বনাও পায়। রক্ত সম্পর্ক না হলেও সেরাজ বাউদিয়া ও ঢোঁড়া মোহাম্মদ অভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠী, যদিও জগন্নাথের কুড়ার ধারে ঘেঁষাঘেঁষি কুঁড়েঘরে তাদের ভিন্ন সংসার। মাথা গোঁজার এইটুকু জায়গা ছাড়া দুজনেই পরের ক্ষেতে কামলা খেটে খায়। কামের সন্ধানে সেই যে দিনাজপুর কি ফরিদপুরে গেছে বাউদিয়া, এ বছর ফিরে আসেনি আর। এখন বাংটুর কারণে তার মায়ের সংসারে যদি হঠাৎ স্বাধীনতা সুখস্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়, ঢোঁড়ার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ আছে বৈকি।

আলাদা চালচুলা হলেও সমশ্রেণির ঘনিষ্ঠ দুই পড়শী পরিবারের মধ্যে মিলমহব্বত ছিল না মোটেও। কারণটা অবশ্যই দুই ঘরের 'বেটিছাওয়া'। বাংটুর মাকে ঝগড়ায় পরাস্ত করার মতো ঝগড়াটি বেটিছাওয়া এ গাঁয়ে কমই আছে। ঢোঁড়ার বউ দুবলা-শরীর জুলুর মা পারবে কেন? তবু কারণে-অকারণে বাঁশচেরার মতো গলা ছেড়ে চেষ্টা করত। ছোট জা হিসেবে বাংটুর মায়ের সঙ্গে ঝগড়াটি করে করেই মুখখানা জ্বলন্ত চুলা হয়ে গিয়েছিল বউটার। একদিন ক্ষেতের কাম থেকে ফিরলে, অভুক্ত স্বামীকেও নাম ধরে ডেকে চেঁচিয়ে অপমান করেছিল, 'ওই ঢোঁড়ার বাচ্চা, নিচেটু মরদ! চাউল কই? ভাত দিতে না পারিস তো মুই কি আরেকটা নাং ধরতে যাইম?'

আশ্চর্য, তারপরও বউকে পেটানোর জন্য মাথায় খুন চাপেনি। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'মুই যখন নিচেটু, তখন চেটু ভাতারের কাছে যা।' বউ যাওয়ার জোরালো ইচ্ছে প্রকাশ করতেই ঢোঁড়াও তৎক্ষণাৎ বলে ফেলেছে, 'যা তবে। তোর বাঁধন দিনু আলগা করিয়া। এই যে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, বাইন তালাক। যাহ শালি। এই দণ্ডে যা চলি।'

সংসার ত্যাগের রাগ-অভিমান তো জুলুর মা আগেও দেখিয়েছে কতবার। হাসিমুখে, নীরবে কিংবা গালমন্দ করে স্ত্রীর রাগ-গোস্বা উপেক্ষা করেছে ঢোঁড়া। কিন্তু কেন যে সেদিন ঠাণ্ডা মাথায় মুখ ফস্কে চরম কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল! কথা বলতে ট্যাক্স লাগে না বলে মানুষ তো মুখে কত কথাই বলে। সব কথা কি আর সত্য হয়? কিন্তু ঢোঁড়ার মুখ থেকে কথাটা বন্দুকের গুলির মতো বেরিয়ে যেতেই কিছুক্ষণের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলুর মা। গনগনে চুলার মতো মুখখানা নিভে গিয়েছিল হঠাৎ। কিন্তু পাশের বাড়ি থেকে ছুটে এসে বাণ্টুর মা পাড়াজাগানো গলায় চিৎকার করেছিল, 'হায় আল্লা! বউ তালাক দিলেন যে! তাও এক তালাক দিলেও হইত, তিন তালাক কইলেন ক্যানে?'

বিষয়টা ব্যাখা করার বদলে, ঝগড়ায় অরুচি বোঝাতেও চুপচাপ ঘরের দরজাখানা বন্ধ করে দিয়ে ঢোঁড়া তখন বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। যেতে যেতে বউয়ের কান্না আর বাণ্টুর মায়ের গলায় নিজের সর্বনাশের খবর কিছুটা শুনতে পেয়েছিল ঢোঁড়া। তার ওপর গরম খবরটা জনে জনে দেওয়ার জন্য বাণ্টুর মা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছে ভুঁইয়াবাড়ি পর্যন্ত।

দশের মাঝে জানাজানি হবার পর ঢোঁড়াও আর অস্বীকার করতে পারেনি। বউ সেদিনই ঢোঁড়ার সংসার খালি করতে একমাত্র ছেলে জুলু, হাঁস দুটি, আণ্ডবাচ্চাসহ চারটা মুরগি ও মাথায় কাঁথা-কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। বাপের বাড়ি থেকে আনা বঁটিখান পর্যন্ত রেখে যায়নি। সেই যাওয়াই যে শেষ যাওয়া হবে, ঢোঁড়া বউ তালাক দেওয়ার সময়েও কথাটা ভাবেনি, এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। চলে যাওয়ার পর বাণ্টুর মায়ের কাছে অবশ্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছে, অশান্তির আপদ বিদায় হয়েছে। আল্লা যা করে ভালোই করে। জুলু যেহেতু নাবালক, আর একটু বড় হলেই, হারামজাদির কোমরে তালাকের চূড়ান্ত লাথিটা কষে মারবে। তারপর ছেলেকে সংসারে ফিরিয়ে আনবে সে। ছোটবেলা থেকে ক্ষেতের কামকাজ শেখাবে, তারপর মাস্টারের বাড়িতে গরু চড়ানোর চাকরি নিয়ে দেবে।

সময়-সুযোগ পেলে পড়শী ভাবির সঙ্গে এরকম গল্পস্বল্প করে সান্ত্বনা খোঁজে ঢোঁড়া। বউবাচ্চা ঘরছাড়া হওয়ার পর ঢোঁড়া যে খুব একা হয়েছে, তা নয়। ঘরে আর কতক্ষণ কাটে তার। তবু রাতে এবং দিনে যখনই শূন্য ঘরে ঢুকুক, নিঝুম ঘরটা কবরের মতো দম বন্ধ করতে চায় যেন। যে ঝগড়ার জন্য বউ তালাক দিয়েছে, জুলুর মায়ের সেই ঝগড়াসহ মুখখানা বড় মনে পড়ে। গালিগালাজ দিয়েও যে সংসারটা ভরিয়ে রেখেছিল, সেটা বউ চলে যাওয়ার আগে ভালো বুঝতে পারেনি। তালাকটা জানাজানি হবার পরও বউ ফিরে আসার আশা মন থেকে মুছে যায়নি। শ্বশুরের অবস্থা এমন নয় যে, নাতিসহ মেয়েকে এক মাস বসিয়ে খাওয়াবে। পারলে গরু-ছাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েকে আবার পার করতে চায় এখনই। কিন্তু শোনা কথা, জুলুর মা অন্যত্র বিয়ে বসার বদলে ঢোঁড়ার সংসারে আবার ফিরে আসতে চায়। ঢোঁড়াও মুখে যাই বলুক, বউ ফেরার প্রতীক্ষাতেই দিন গোনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কোনোদিন নিজে গিয়ে বউকে চুলের মুঠি ধরে ফিরিয়ে আনতে পারে ঢোঁড়া। কিন্তু বাধা বাংটুর মা একা নয়। জুম্মার ইমাম হুজুর ফতোয়া দিয়েছে, হিলা লাগবে। গাঁয়ে সব কাকেরই এক রা। তালাকপ্রাপ্ত বউকে আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে বসতে হবে, সে আবার তালাক দেবে, তবেই নিজের বিয়ে করা বউকে আবার বিয়ে করে ঘরে আনতে পারবে। কিন্তু অন্যখানে হিলা বিয়ে বসে পুরনো স্বামীর ঘরে আর আসতে রাজি নয় জুলুর মা। বিয়ে বসলে সে একেবারেই বসবে।

সমস্যাটার সমাধান খুঁজতে ভুঁইয়া ছাড়াও তার শ্বশুর চেয়ারম্যানের কাছেও গিয়েছিল ঢোঁড়া। শুধু চেয়ারম্যান যদি বলত — রাগের মাথায় তালাক হয়নি, আবার যখন ফিরে আসতেই চায়, তবে আন ফিরিয়ে বউকে। তাহলে আর কারো পরোয়া করত না ঢোঁড়া। কিন্তু চেয়ারম্যানও উল্টো রেগে বলেছে, 'কোরান-হাদিসের ফরমান রদ করা কি চেয়ারম্যানের কাজ? বউয়ের ওপর এত দরদ তো তালাক দিলি কেন হারামজাদা!'

গাঁয়ের মাথা সজব ভুঁইয়া ও তার চেয়ারম্যান শ্বশুর — কাউকে ধরেই তালাকটা বাতিল করাতে পারেনি ঢোঁড়া। কিন্তু আজ ভুঁইয়াবাড়িতে নতুন নিশান উড়তে দেখে নতুন সম্ভাবনা জাগে মনে। দেশ যদি স্বাধীন হয়েই যায়, পুরানা নিয়ম কি আর থাকবে? হয়তো নানা ও বাপকে পরাস্ত করে নতুন চেয়ারম্যান হবে মানিকই। ভুঁইয়ার বেটা ঢাকায় থেকে লেখাপড়া করলেও গরিবের জন্য বেশি দরদ দেখায়। মায়ের বংশ ভালো, কাজেই গরিব-দুঃখীর জন্য তার দরদটা হয়তো একেবারে মিছা নয়। সমস্যাটা মানিককেও জানানোর সিদ্ধান্ত নেয় ঢোঁড়া।

বউ তালাকের পর বাংটুর মা ভাবির ওপর নির্ভরতা বেড়েছে ঢোঁড়ার। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির কারণটা ব্যাখ্যাও করে অনেক সময়, 'তোমার বাউদিয়া ভাতার থাকিয়াও নাই, আর মোর মায়া-ছাওয়াও চলি গেল। মিলমিশ না করি থাকিয়া হামার উপায় কী?'

সরল মানুষ ঢোঁড়ার সোজা কথাটাও বাঁকাভাবে নিয়ে হাসাহাসি করে অনেকে। বাংটুর মা মিলমিশ করে থাকার খারাপ অর্থ করেই বোধহয় নির্বিষ ঢোঁড়ার সাথেও গলা ছেড়ে ঝগড়া শুরু করেছিল। নিরুদ্দেশ স্বামীকে সে তো তালাক দেয় নাই, দেবেও না। স্বামী যদি জীবনে ফিরে না আসেও, তবু দ্বিতীয় স্বামী ধরার কথাও ভাববে না। বাংটু তার সেয়ানা হচ্ছে, বাংটুর মায়ের আর চিন্তা কী?

বাউদিয়া স্বামী আর ভুঁইয়াবাড়ির চাকর ছেলের গর্ব যতই করুক আছিমন, দেবর সুবাদের ঢোঁড়াকে দূর ছি করে না। বউ চলে যাবার পর অনেকদিন রান্না করে দিয়েছে। ঢোঁড়ার ঘরদুয়ারও ঝাঁট দিয়ে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন। রান্নার জ্বালানি হিসেবে ধানের নাড়াগুলো ঢোঁড়া বাংটুর মায়ের জন্যই এনেছে। রাতের জন্য ভাত আর একটু আলুর নাড়া রেঁধে নেবে। নাড়ার মধ্যে একটা শুঁটকি পোড়া দিলে স্বাদ হবে দারুণ। রান্না ও খাওয়ার সময় চুলার পাড়ে বসে বিড়ি খেতে বাংটুর মায়ের সঙ্গে গল্পস্বল্প করা, সেটাও একটা লাভ বটে।

ঘরসংসারের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরে ঢোঁড়া পড়শী ঘরের আঙিনায় ঢোকে প্রথমে। মাথার বোঝাটি ধপ করে উঠানে নামিয়ে দিয়ে ভাবিকে ডাকে, 'ও ভাবি, গেইলেন কোন্‌ঠে? দেশ বলে স্বাধীন হইল, পাইছেন সে খবর?'

বাংটুর মা কিংবা তার ছোট ভাই-বোনদের কেউ নেই বাড়িতে। ঘরের কোণের কলাগাছের নিচে দাঁড়াতেই চোখে পড়ে, দূরে বিলের ধারে মেয়েমানুষটি হাঁসের জন্য শামুক খুঁজছে। নাকি মাছ ধরছে? ঢোঁড়া চেঁচিয়ে ডাকে, 'আরে ও বাংটুর মাও ভাবি, ভুঁইয়ার বাড়িতে কী দেখিয়া আসনু, শুনি যাও।'

ডাক শুনে চোখ তুলে ঢোঁড়াকে দেখেও বাংটুর মা আগ্রহ দেখায় না। ছুটে আসার বদলে বিলের ধারে শামুক কী শালুক খোঁজে কে জানে। ঢোঁড়া আবার বলে, 'হামার বাংটু জয় বাংলার নিশান ওড়ায়, আর তোমরা এলাও কী বালের শালুক কুড়ান ভাবি!'

ছেলের কথা শুনেই বোধহয় বাংটুর মায়ের টনক নড়ে। কোঁচড় ভরা শামুক নিয়ে ঘরের দিকে আসে ধীর পায়ে। ভুঁইয়াবাড়িতে ঢোঁড়া যা দেখেছে, যা শুনেছে, তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে বারংবার বলার পরও বাংটুর মায়ের যেন কৌতূহল মেটে না। সবটা বুঝতেও পারে না। কোঁচড়ের শামুক উঠানে নামিয়ে রেখে স্বাধীনতার নিশান স্বচক্ষে দেখার জন্য নিজেই ছুটতে থাকে ভুঁইয়াবাড়িতে।

নির্জন বাড়িতে ঢোঁড়া একা আর করে কী। ঘরে ঢুকে লাউয়ের খোলে জমানো চালের মধ্যে আজকের কাজের মজুরি চালটাও ঢেলে রাখে। বউবাচ্চা থাকতে দিন আনা দিন খাওয়া অবস্থা ছিল তার। এখন ধান কাটার মৌসুমে টানা কাজ করে ঢোঁড়ার ঘরে সের পাঁচেক চালও জমেছে। বাংটুর মাকে এক টালা চাল করজ দিয়েছে। সেটা শোধ না হতেই সে হয়তো আবার চাল করজ চাইবে। বিনিময়ে তার কাছে সেবাযত্ন আর কতটুকুইবা পাবে ঢোঁড়া? পরস্ত্রীর সেবাযত্নের চেয়ে জমানো চাল বাজারে বেচে দুইটা নগদ পয়সা কোমরে গুঁজে রাখলেও কোমরের শক্তি বাড়বে। বাজারে গেলে নতুন নিশান আর স্বাধীনতার ব্যাপারটাও হয়তো ভালো বুঝতে পারবে ঢোঁড়া। ঘরের শূন্যতায় একা একা দুঃখ করার চেয়ে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনার বুটভাজা কিনে বুট খেতে খেতে বাজারের ভিড়ে মিশে থাকলেও সময় কাটবে ভালো। গামছায় চালের পোঁটলা বেঁধে হাতে তেলের শিশিটা ঝুলিয়ে বাজারের দিকে রওনা দেয় ঢোঁড়া।

বাজারে যাওয়ার জন্য পড়শী শেখের মামুকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার আশায় তার বাড়িতে যায় প্রথম। জয় বাংলার নিশানের খবরটা জানালে সব কাজ ফেলে নজিবর বাজারে ছুটবে অবশ্যই। নজিবরের বাড়ির পগারের পাড়ে তার ছেলেকে দেখে ঢোঁড়া জানতে চায়, 'ও বাউ, তোর বাপ কই?'

'বাবা ভূইয়াবাড়িতে নয়া পতাকা দেখতে গেইছে।'

'কীসের পতাকা ওখান ওড়াইছে বাহে?'

'নতুন কাপড় দিয়া বানাইছে, পতাকার ভিতরে মজিবরের ছবিও আঁকি দিছে, না দেখলে দেখ গিয়া।'

ছোট মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি বোঝার চেষ্টা করে না ঢোঁড়া। বাজারে যেতে হলে তো ভুঁইয়াবাড়ির সামন দিয়েই যেতে হবে। নজিবরকেও পাওয়া যাবে সেখানে। ঢোঁড়া আবার বড়বাড়ির দিকে জোর পায়ে হাঁটতে থাকে।

AMARBOI.COM

ভুঁইয়াবাড়ির বৈঠকঘরের সামনে নতুন পতাকাটি বাতাস পেয়ে পতপত উড়ছে। তবে ভিড় কমেছে অবেলায়। বৈঠকখানার বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে মানিক। রেডিয়ো থাকলেও আওয়াজ নেই। পাশে বেঞ্চিতে বসা নজিবর এখন একাই। ঢোঁড়া হাসিমুখে যোগ দিয়েই অভিনন্দন জানানোর ভঙ্গিতে বলে, 'সবাই কয়, হামার মানিক যাদু দেশ স্বাধীন করিয়া বাড়িতে আর চেয়ারম্যান নানার অফিসেও শেখ মজিবরকে ওড়ায় দিছে।'

'দেশ এখনো স্বাধীন হয়নি বাহে। ঢাকায় সবকিছু অচল করে দিয়া মানুষ আন্দোলন করছে। গ্রামেও একজোট হয়ে আন্দোলন করতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ চাই বলে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ায় দিছি আমরা। তোমরা চান না?'

দেশ নিয়ে ঢোঁড়ার মতামত কেউ তো কোনোদিন চায়নি, নিজেও দেয়নি কখনো। অনেকটা লজ্জা পেয়ে বলে, 'মুই গরিব মানুষ বাবা, দেশ স্বাধীন হইলেই কী আর না হইলেই কী?'

'স্বাধীনতা সবারই দরকার, ঠিক না?'

'তা তো ঠিকই। তোমার চাচি মোর ভাত খাওয়ার জন্য আবার ফিরি আসতে চায়। কিন্তু সমাজের ভয়ে আসতে পারে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় থাকে বলে ঢোঁড়ার ঘরসংসার খালি এবং গ্রাম তোলপাড় করা ঘটনাটা মানিক জানে না। অবাক হয়ে জানতে চায়, 'কী হইছে চাচির?'

'ঢোঁড়ার কথা বাদ দাও বাবা। হারামজাদার বউ তালাক দিতে সময় লাগে না, আবার তালাক দেওয়া বউকে ফেরত আনার কথা কইতেও শরম নাই। মুই তা হইলে বাজারে গিয়া নতুন পতাকা বানায় আনি। পরেশ যখন বাড়িতে ওড়ায় দিছে, মোর বাড়িতেও এই পতাকা না ওড়াইলে শেখের মামুর মর্যাদা থাকবে, কন।'

ঢোঁড়া পতাকার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হামাকে একটা নিশান দিলে হামার বাড়িতেও না হয় ওড়ায় দিনু হয় বাহে। হামার বাণ্টু আর বাণ্টুর মাও তো জয় বাংলা কইতে অজ্ঞান।'

'ঠিক আছে, চাচার সাথে তোমরাও বাজারে যাও। নরেশ কাকার দোকানে গিয়ে খলিফা মামার কাছে আমার কথা বললে মাগনা বানায় দেবে, পয়সা দিতে হবে না।'

'নিশান না হয় একখান মাগনা পাইলাম, কিন্তু ওড়ায় দিম কেমন করি বাহে? একটা লম্বা বাঁশও যে দেওয়া লাগবে বাবা।'

'ঠিক আছে, আমাদের ঝাড়ের একটা বাঁশ কাটি নেন।'

ঢোঁড়া খুশি হয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য নজিবরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। পতাকা কাজে না লাগুক, কিন্তু বাঁশটা কাজে লাগবে অবশ্যই। স্বাধীনতার পক্ষে থেকে তার যদি এটুকু লাভ হয়, তা বাদে বউ তালাকের দুঃখের কাহিনিটাও চেয়ারম্যানের নাতিকে বিশদ জানানোর সুযোগ পাওয়া যায়, তাই বা কম কী! ঢোঁড়া নিজে এবং তার হয়ে কেউ কাজী চেয়ারম্যান কি ভুঁইয়াকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারেনি, কিন্তু মানিক অবশ্যই পারবে। হাজার হোক, রক্তের সম্পর্ক।

বারো

বাজারে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোর পর নানার সঙ্গে মানিকের বিরোধের সম্পর্ক লোকজনের গল্পে ভয়াবহ যুদ্ধের রূপ নিতে থাকে। নানাবাড়ির সঙ্গে মানিক চিরদিনের জন্য সম্পর্ক ছেদ করেনি শুধু, চেয়ারম্যান নানার দাড়ি ধরে, কারো মতে পাঞ্জাবি খামচে ধরে, আর কেউ-বা বলে গায়ে হাত না দিয়েও ইংরেজিতে গালিগালাজ করে নানাকে হুঁশিয়ার করেছে, জয় বাংলার পতাকা নামায় কেউ যদি আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের পতাকা ওড়ায়, তা হইলে প্রথমে নানার বাড়িতে আগুন জ্বালায় দেবে সে। চেয়ারম্যান হাটখোলায় ছুটে এসেও পতাকা নামানোর বদলে ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং পতাকা না নামিয়েই পালিয়ে গেছে বাড়িতে। সেই যে বাড়িতে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে, বাড়ি আর মসজিদ ছাড়া কোথাও যায় না চেয়ারম্যান। চোখের পানি সিল্কের গামছায় মুছে ঘোষণা দিয়েছে, নাতি নিজ হাতে পতাকা নামানোর পর নানার কাছে ক্ষমা না চাইলে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে কী ঠ্যাংভাঙা হাটে আর কোনোদিনই ঠ্যাং বাড়াবে না সে।

এদিকে চেয়ারম্যান নানার বদলে বাপকে চেয়ারম্যান করার জন্য মানিক নাকি রতনপুরের ছেলেদের নিয়ে দল পাকাচ্ছে। ঢাকায় মানিক শেখ মুজিবরের বাড়িতে গেলে মুজিব তাকে কী কী বলেছে, সেসব কথাও প্রত্যক্ষ সাক্ষীর মতো কেউ কেউ লোকজনকে শোনায়। আর শেখ মুজিবের শেষ নির্দেশ জানার জন্য মানিক দিনরাত কানে রেডিয়ো নিয়ে থাকে, সেটা তো গাঁয়ের ছোট-বড় সবাই জানে। শেখের হুকুম পেলে গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে মানিক। আর নানা যদি এর মধ্যে জয় বাংলার পক্ষে না আসে, তাহলে তাকেও খতম করবে।

লোকজন যখন মানিকের সঙ্গে কথা বলে, তাকে ঘিরে লোকমানসে ভাবনা-কল্পনায় আতিশয্য ও অতিরঞ্জন টের পায় মানিক নিজেও। তবে নিজের করণীয় নির্ধারণের জন্যই যে ঢাকার পরিস্থিতি ও নেতার নির্দেশ শোনার জন্যই রেডিয়োতে কান পেতে থাকে, এ কথার মধ্যে আতিশয়োক্তি বেশি নেই। অবশ্য সময় কাটাতে আকাশবাণী কলকাতার নাটক ও গানও শোনে সে। সারাক্ষণ কৌতূহল কাজ করে ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য।

মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছে। ১৬ তারিখে শুরু হয়েছে আলোচনা। কিন্তু আলোচনা করে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না বলেই সম্ভবত আন্দোলনের পথ ছাড়েনি মানুষ। স্বাধীনতার দাবিতে অটল সংগ্রামী জনতা। এই জনতা ও অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে অস্ত্র করে মুজিব আলোচনায় পাকিস্তান শাসন করার ক্ষমতা চাইছে। ক্ষমতা পেলে পূর্ব পাকিস্তান হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশ হবে না, কিন্তু ছয় দফা পূরণের মাধ্যমে নিশ্চয় পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে ক্রমে এগিয়ে যাবে। এরকম হলে কি স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা নামিয়ে মুজিব পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানোর নির্দেশ দেবে দেশবাসীকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন ও আলোচনার পরিণতি বোঝার জন্য দিনরাত রেডিয়ো শোনা ছাড়াও রেলস্টেশনের বুক স্টল থেকে একদিন আগের দৈনিক পাকিস্তান এনে পড়ে মানিক। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাছারিঘরে রেডিয়ো শোনার ভিড় বেড়েছে। স্বকর্ণে রেডিয়ো শুনেও যারা প্রকৃত অবস্থা ও সমাধানের পথ খুঁজে পায় না, তাদেরকে নিজের মতো করে যতটা সম্ভব সঠিক পথ চেনাতে সাহায্য করে মানিক। বলতে গেলে দেশের জন্য এটাই তার একমাত্র কাজ হয়েছে। বাবা কিংবা নানা কারো পক্ষে নয়, মানিক স্বাধীনতার পক্ষে, সকল বাঙালির পক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে সত্য ও ন্যায়র পক্ষে থাকতে চায়। কিন্তু এ কথাটা নানাভাবে বোঝানোর পরও গাঁয়ের লোকজন জামাই-শ্বশুরের বিরোধে মানিককে নামিয়ে নানা-নাতির যুদ্ধ বাধিয়ে মজা লোটার কৌতূহল দেখায় কেন? অনেক সময় খারাপ লাগে তার।

নানার সঙ্গে ঝগড়া করে আসার পর নিজের কাছে বীর তো হয়নি, বরং মানসিক কষ্ট বেড়েছে মানিকের। পতাকা উড়লেই দেশ নতুন হবে না, জানে সে। পতাকা উড়িয়ে লোকজনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জোরালো করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু লোকজনকে জাগানোর কাজে মানিক শেখ মুজিব কি মওলানা ভাসানীর পায়ের নখের যোগ্য তো নয়ই, এমনকি বাপ, নানা, কিংবা পরেশ কাকার মতো গ্রামসমাজকে প্রভাবিত করার মতো যোগ্যতাও কি তার আছে? এসব ব্যাপারে কিশোর বাণ্টুকেও অনেক সময় বেশি সাহসী ও লড়াকু মনে হয়। ছোটবেলা থেকে মানিককে নির্বিরোধ ভালো ছেলে হিসেবে দেখছে লোকজন, এখন তার নির্ভীক পালোয়ান হিসেবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার তেজ দেখানোর কথা ভাবলেও নিজের কাছেও কীরকম যেন আশ্চর্য লাগে। অথচ সেই আশ্চর্য রূপান্তর ছাড়া দেশের জন্য কীইবা করতে পারবে মানিক?

গ্রামবাসীরা নানা কি বাবার মতো কিংবা তাদের চেয়েও বেশি মানিককে যে গুরুত্ব দিতে চায়, এটা সে বোঝে। শহর থেকে মানিক যখন বাড়িতে আসে, তাকে দেখার জন্য পড়শীরা অনেকেই ছুটে আসে। মায়ের মৃত্যুর পর গাঁয়ের অনাত্মীয় লোকজনও তাদের দু'ভাইবোনকে এতটা আদরস্নেহ দেখায় যে, অনেক সময় অভিভূত বোধ করে মানিক। এলাকার মধ্যে সে বাবা, নানা ও মামাকে ছাড়িয়েও অনেক বড় হবে বলে বিশ্বাস করে সবাই। আর ঢাকায় থাকে বলে এখন দেশের পরিস্থিতি জানতে বাবার চেয়েও হয়তো মানিককে নির্ভরযোগ্য ভাবাটাই স্বাভাবিক। গাঁয়ের সরল লোকজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগবিহ্বল ভুয়া কথা শুনিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় না বলে মানিক দেশ নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে।

পতাকা ওড়ানোর মাত্র দুদিন পরই রেডিয়োতে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার খবরটি রাতে বিবিসিতে একা শুনে চমকে ওঠে মানিক। ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ফিরে গেছে করাচিতে। আলোচনার জন্য ভুট্টো এসেছিল ঢাকায়। ভুট্টোও ফিরে গেছে সেনাবাহিনীর কড়া প্রহরায়। আপস আলোচনা ব্যর্থ, কী হবে এখন? এই প্রশ্নকে ঘিরে যত উদ্বেগ-উত্তেজনা আলোচনা শুরুর পর থেকে ভেতরে সঞ্চিত হয়ে ছিল, সবই তা একসঙ্গে জেগে উঠতে চায় যেন। স্থির থাকতে পারে না মানিক। রাত ৯/১০টার পর রেডিয়ো শোনার জন্য মানিকের পাশে কেউ থাকে না সাধারণত। আজ বাবাও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মানিক বাবার ঘরের দিকে যায়।

'আব্বা কি ঘুমিয়েছেন?'

অন্ধকার ঘরে হ্যারিকেনের নিভু নিভু শিখা জেগে ওঠে না, কিন্তু মানিকের নয়া মা সাড়া দেয়, 'তোমার আব্বা তো নাক ডেকে ঘুমায়। কী হইছে বাবা? ডাকাইত পড়ল নাকি বাড়িতে?'

'না, আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। ভুট্টো ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে আজ।'

'তোমরা বাপবেটা মিলিয়া নৌকার পক্ষে যে পলিটিক্স শুরু করছেন, ভুট্টো-ইয়াহিয়া পালায় যাইবে কতদূর?' খোঁচা দিয়ে কথা বলাটা নয়া মার স্বভাব, কিন্তু অন্তঃকরণটা অত খারাপ নয় মহিলার। আব্বাকে জাগাতে নিষেধ করে মানিক নিস্তব্ধ আঙিনা পেরিয়ে বাইরে যায়।

কেরোসিন পোড়ার ভয়ে এ গাঁয়ের অধিকাংশ বাড়িতে অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝটপট রাতের খাবার খেয়ে নেয় মানুষ। সন্ধ্যার পরপরই নিশুতি রাত গভীর হতে থাকে। শীত-কুয়াশা মৌসুমের বিদায়ের নীবর ঘণ্টা বাজিয়ে ফকফকা চাঁদনি ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। এরকম চাঁদনি রাতে ভূতের ভয় কমে যায়, গাঁয়ের পথে একা হাঁটতেও ভালো লাগে মানিকের। আজ ভালোলাগার মুগ্ধতা বোধ নিয়ে নয়, ভেতরের উদ্বেগ-উত্তেজনার চাপ থকে মুক্ত হওয়ার জন্য হাঁটে সে। হিন্দুটাড়িতে পরেশ কাকা হয়তো জেগে আছে এখনো। পায়ে পায়ে বাবুর বাড়ির দিকে এগোতে থাকে মানিক।

অনেকেরই ধারণা হয়েছিল, আলোচনা শুরুর পর মুজিবও সন্তোষ প্রকাশ করেছিল, একটা কিছু আপসরফা হবে অবশ্যই। মার্শাল ল তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন পদ্ধতি ও শাসনভার যাই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ক্ষমতা মুজিবের হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে পশ্চিমা শাসকরা। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ মানে কি মুজিবকে ক্ষমতা না দেওয়ার বলিষ্ঠ ঘোষণা?

বাবুর বাড়িতে ঢোকার মুখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সাড়া দেয়, আর নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করার জন্য মানিক কুকুরকে জোরে ধমকাতেও পারে না। চেঁচিয়ে পরেশকে ডাকে, 'ও কাকা, ঘুমিয়েছেন নাকি? আমি মানিক।'

পরেশ কাকার জেগে থাকার কথা, কারণ তার ঘরে রেডিয়োতে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমায় দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শুনতে পায় মানিক। ভেতরে হ্যারিকেনের আলো চাগিয়ে ওঠা বাইরে থেকেও টের পায়।

দরজা খুলে দেয় মালতী কাকি, জ্যোৎস্নাভেজা উঠানে দাঁড়ানো মানিককে ডাকে, 'আসো মানিক, ঘরে আসো।'

ঘরে ঢুকে প্রশস্ত খাটে দৃষ্টি যেতেই মানিক দেখতে পায়, শিবু ঘুমিয়ে গেছে। কাকাও মনে হয় ঘুমিয়েছিল, মানিককে ঘরে দেখে বিছানায় উঠে বসে। রেডিয়ো শুনছিল একা মালতী কাকি? খাটের পাশে আলাদা একটি জলচৌকি, সেখানে বসে মানিক।

'খবর শুনেছেন তো কাকা, আলোচনা ব্যর্থ। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ফিরে গেছে। এখন কী হবে কাকা?'

'হ্যাঁ, খবরটা শুনে তোর কথাটা মনে হইতেছিল, তোর মামার অবাঙালি শ্বশুর বলেছিল না তোকে, পাক আর্মিরা তৈরি হইতেছে? এখন আমাদের কর্মসূচি কি হবে — ভাবতে ভাবতেই ঘুম আসছিল মানিক।'

'আমারও খুব চিন্তা হচ্ছিল মানিক, ঘুম আসছিল না। সে জন্য শেখ মুজিবের নতুন কথা শোনার আশায় কলকাতার খবর শুনছিলাম।'

মানিক কাকির সহানুভূতিকে আমল না দিয়ে বলে, 'আপনাকে বলি নাই কাকা, ঢাকায় অনেক ছাত্রকে বলতে শুনেছি, কেবল শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন আর আলোচনা দিয়ে স্বাধীনতা আসবে না। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা কোথাও আসেনি।'

মালতী এবার তার উদ্বেগ-আতঙ্ক প্রকাশ করে, 'তাহলে কি এবার যুদ্ধ শুরু হবে মানিক?'

'কী জানি। মুজিব তো নতুন কর্মসূচি এখনো দেয়নি। নতুন কর্মসূচি দেওয়ার জন্য দলের নেতাদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেছে বোধহয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুজিব আপস করলে মানে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কথা মানলে তো আলোচনা ব্যর্থ হইত না। ও মানিক, আমরা এ ইউনিয়নে স্বাধীনতার পতাকা যখন উড়ায় দিছি, এবারে ঠ্যাংভাঙা হাটেও আমরা সবাইকে নিয়া মিছিল করব, মিটিং করব, তারপর হাজার হাজার মানুষ নিয়া রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করব। কয়জনকে গুলি করে মারবে শালারা?'

বাঙালির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন মোকাবিলার জন্য মার্চের ১ তারিখের পর থেকেই তো সেনাবাহিনী শক্তি বাড়িয়ে চলছিল। অনেক অবাঙালি ব্যবসায়ী তাদের পরিবারকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাতে শুরু করেছে। গত দুই সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো কয়েক হাজার আর্মি এসেছে পূর্ব পাকিস্তানে। টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়েছে, কিন্তু তাকে শপথ করানোর জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি কেউ রাজি হননি। চট্টগ্রাম পোর্টে অস্ত্রবোঝাই জাহাজ এসেছে। রেডিয়ো ও পেপারে এসব খবর জেনে ভয়টা বেড়েছে, পাশাপাশি পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য আন্দোলনকারীদের সামরিক প্রস্তুতি কতটা বেড়েছে — মানিক নিশ্চিত জানে না কিছুই।

পরেশ কাকার সাহসের মুখেও উদ্বেগ প্রকাশ করে মানিক, 'জনগণ একাট্টা বলেই কি এক লাখ পাকবাহিনীকে ঠেকানো যাবে কাকা?'

'তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন মানিক? দেখ, মুজিব নতুন কী কর্মসূচি দেয় কালকে।'

মালতী কাকিও অভয় দেয়, 'গোলমাল যা হবার, আগে ঢাকাতেই হবে। তুমি আগেভাগে বাড়ি এসে ভালো করেছ বাবা। তোমাকে নিয়ে আগামী মাসে আমাদের বাড়ি দিনাজপুর যাব ভাবছিলাম, তার মধ্যে দেখ আবার কী টেনশন শুরু হলো।'

গোটা দেশ নিয়ে মানিকের এত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তাকে নিছক ব্যক্তিগত ভয় পাওয়া হিসেবে মল্যায়ন করায় খারাপ লাগে মানিকের। কাকির প্রতি বিরাগ নিয়ে খাটের দিকে তাকিয়ে ঘুমন্ত শিবুর পাশে বলিশের ওপর তার অন্তর্বাসটি দেখে আরো অস্বস্তি বাড়ে। এ সময় পাশের ঘর থেকে আসে নরেশ।

'ও মানিক, শালার ভুট্টো-ইয়াহিয়াকে ঢাকার মানুষ যাইতে দিলো কেন, এয়ারপোর্ট কি প্রেসিডেন্ট হাউস ঘেরাও করতে পারল না!'

'আমার মনে হয় আর্মিরা এবার হার্ডলাইনে যাবে, বাঙালির অনেক রক্ত ঝরবে কাকা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে ভুলে যাইস কেন, মুজিব তো কইছে রক্ত যখন দিয়েছি, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব এবার।'

দাদার সাহসের চেয়ে মানিকের ভয়টাই যেন নরেশের মধ্যে সংক্রমিত হয় বেশি।

'হাটখোলায় দোকানে আর ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ ওড়ানোর পর চেয়ারম্যান কাকার রাগ তো আমার ওপরে এখনো কমে নাই মানিক। ফ্ল্যাগটা কি তা হইলে কাইল নামায় ফেলব?'

মানিক এতক্ষণে নিজের ভেতরে সাহস ও সান্ত্বনা খুঁজে পায় যেন। নেতার মতোই সিদ্ধান্ত দেয়, 'না, না, পতাকা নামাবেন কেন? আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এতদিনের এই আন্দোলন তো ব্যর্থ হতে পারে না। দেখি, কাল মুজিব নতুন কী কর্মসূচি দেয়। আমাদের গ্রামের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে।'

সবারই পছন্দ হয় মানিকের কথা। কাকি বলে, 'তুমি বসো বাবা, আমি একটু চা করে আনি। আমাদের গাইয়ের গরম দুধ দেই এক গেলাস?'

'না, এত রাতে কিছু খাব না আমি। আপনারা ঘুমান কাকা, আমি যাই এখন।'

মানিক উঠানে বেরোলে আবার কুকুরটা ভুকতে শুরু করে। নরেশ কুকুরকে ধমক দেয় এবং মানিককে প্রায় তাদের বাড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

AMARBOI.COM

নিস্তব্ধ নির্জন রাতে বাবুর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরও অনেক রাত ঘুম হয় না মানিকের। রেডিয়ো সেন্টার বদলেও নতুন কোনো খবর পায় না। পরেশ কাকা হয়তো সব উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ভুলে থাকার জন্য বউকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। মানিকের জন্য নানা গাইবান্ধায় কিংবা মালতী কাকি তার বাপের বাড়ির কাছে যে মেয়ে ঠিক করে রেখেছে, সেই মেয়ে বউ হয়ে মানিকের পাশে যদি থাকত এখন, তাহলে হয়তো মানিকও তাই করত। বউকে জড়িয়ে ঘুমানোর ইচ্ছেটি প্রবল হয়ে ওঠে যে, মানিক চোখ বুজে আবার পরেশ কাকার খাটে মালতী কাকির কালো ব্রেশিয়ারটি দেখতে পায়। স্মৃতিতে হঠাৎ মামির নগ্ন বুক জ্বলে ওঠে। মামার পরিবারের জন্যও দুশ্চিন্তা হয় তার। ঢাকায় ওরা এখন কী করছে, কে জানে।

উদ্বেগ-অস্থিরতায় কেটে যাওয়া বিনিদ্রপ্রায় রাতটাই যে বাঙালি জীবনের বিভীষিকাময় ২৫ মার্চের কালরাত্রি হিসেবে চিহ্নিত হবে, সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন দিনের আলো ফোটার পর থেকেই টের পায় মানিক। বেলা করে ঘুম ভাঙার পর যথারীতি মাথার কাছে রেডিয়োর নব ঘোরাতেই রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকায় অবাঙালি কণ্ঠ। ঢাকাসহ সব শহরে কার্ফু জারি এবং শেখ মুজিবকে অ্যারেস্ট করার খবর। এতদিন সরকারি রেডিয়ো সেন্টার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম থেকেই দেশাত্মবোধক গান ও খবর প্রচার করেছে। আজ বাংলায় ঘোষণা দেওয়ার জন্য সেখানে কেউ নেই বুঝি। ঘুমভাঙা চেতনায় রাতের আতঙ্ক-উদ্বেগ সম্পূর্ণ ছবি হয়ে ওঠার আগে বাইরে থেকে বাংটুর উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পায়।

'ও ভাইজান, এলাও ঘুমান তোমরা! ওতি কোনা টাউনে বলে মিলিটারি সব শেষ করি দিল। রংপুর টাউন থাকি একজন পালায় আসি বড় আব্বাকে খবর দিছে।'

বাইরে বেরিয়ে কাছারিঘরের বারান্দায় বাবা, পরেশ ও নরেশ কাকা, নজিবরসহ অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ-আতঙ্ক। রেডিয়োর খবর ওরা আগেই শুনেছে। রংপুর শহর থেকে হাজার হাজার লোক নাকি পালিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। পালিয়ে আসা একজন লোক সাইকেল দাবড়ে তিস্তা পেরিয়ে উলিপুরের দিকে গেছে। তার কাছে যে খবর শুনেছে, সেই হায়াত আলী এসে ভুঁইয়াকে তা পরিবেশন করেছে। গত রাতে মিলিটারি শহরে আগুন জ্বালায় দিয়েছে। গুলি করে মেরেছে কতশত মানুষ, তার শুমার নেই। রংপুর শ্মশানে লাশ আর লাশ। শহরের রাস্তায় কামান-ট্যাঙ্ক নিয়ে আজরাইলের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পাকিস্তানি মিলিটারির গাড়ি। রাতের মধ্যেই মশিয়ার উকিল, জজ মিয়াসহ আওয়ামী লীগের বহু নেতাকে গুলি করে মেরেছে। কার্ফু দিয়ে এখন বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করে জয় বাংলার পক্ষের লোক খুঁজছে মিলিটারির দল। এসব খবর ইতোমধ্যে নানা কণ্ঠে অন্তত দশবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরও কথার ধক কমেনি বিন্দুমাত্র। মানিককে নতুন করে শোনানোর সময় সবার চোখে-মুখে দিশেহারা ভয় জ্বলজ্বল করে। নজিবর প্রায় কান্নার গলায় বলে, 'শেখ মজিবরকে বন্দি করছে জারুয়া শালারা, হামার কাউকে আর আস্ত রাখপে না বাহে।'

নজিবরকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে ভুঁইয়া ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকায়।

মানিক পরেশ কাকাকে প্রস্তাব দেয়, 'ও কাকা, চলেন তো সাইকেল নিয়া আমরা টাউনের দিকে আগাই। প্রকৃত অবস্থাটা কী টাউনের কাছাকাছি গেলে ভালো করে জানা যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের প্রস্তাব মৃত্যুকূপে ঝাঁপ দেয়ার দুঃসাহস ছাড়া আর কী? সজব ভুঁইয়া পর্যন্ত অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়। মানিক ভাবে, আব্বা ও পরেশ কাকারা সাইকেলে চড়ে শহরে তো প্রায় সপ্তাহেই যায়। সময় লাগে মাত্র আড়াই ঘণ্টা। ঠ্যাংভাঙা হাট থেকে একটি মুড়ির টিন মার্কা মোটরগাড়ি যায় অবশ্য, সব বাজারে থেমে থেমে যেতে সেটারও সময় লাগে প্রায় তিন ঘণ্টা।

'রেডিয়োতে কী শুনলি? সারা দেশের সব শহরে কার্ফু। টাউনের রাস্তা ছেড়ে মিলিটারির গাড়ি ডিস্ট্রিক বোর্ডের কাঁচা রাস্তায় কখন নামে, আমি সেই কথা ভাবতেছি।'

পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে মানিক, 'আমরা তো টাউন পর্যন্ত যাব না, কাছাকাছি যতদূর যাওয়া যায়, গেলে আসল অবস্থাটা হয়তো আরো ভালো করে জানা যাবে।'

পরেশ এবার সম্মতি দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, চল মানিক। সেইরকম দেখলে সাইকেল সড়কের ওপর থুইয়া চাচা-ভাতিজা দুইজনেই ক্ষেতের মাঝ দিয়া নেংটিছেঁড়া দৌড় দেব।'

পরেশের কল্পিত দৌড় দেখে লোকজনের ভারী উদ্বেগ খানিকটা লাঘব হয়, বেআক্কেল একজন হেসেও ফেলে, আর বাংটু প্রস্তাব দেয়, 'ভাইজানকে আমি সাইকেলে চালায়া নিয়া যাব। অতদূর আস্তা সাইকেল চালায় হয়রান হইলে দৌড়াইবে কেমন করিয়া।'

মানিক বাধা দেয় বাংটুকে, 'তোকে যেতে হবে না। কাকা, আপনি রেডি হয়ে আসেন, আমিও নাশতা খেয়ে রেডি হই।'

পরেশ ও মানিক দুটি বাইসাইকেলে চড়ে যখন ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা ধরে জেলা শহরের দিকে এগোয়, তখন সকালের ঝকঝকে রোদের শরীরে এক বিন্দু ভয়ংকর রাতের কালিমা কিংবা রক্তের লাল দাগ নেই। চারপাশের প্রকৃতি আগের মতো স্বাভাবিক। মাঠে লাঙল-জোয়াল নিয়ে হাল জুড়েছে যারা, তারা হয়তো কেউ রেডিয়োর খবর শোনেনি এখনো। রাস্তায় উল্টোদিক থেকে আসা সাইকেল-আরোহী দেখলে টাউনের খবর জানতে চায় পরেশ। একজন বলে 'খুব গণ্ডগোল' আর একজন বলে 'কার্ফু না হরতাল দিছে শুনলাম'। পায়ে হাঁটা একজন ফকির সাইকেল আরোহী ভদ্রলোকদের সালাম দেয়। সালামের জবাব দিয়ে পরেশ ফকিরের কাছেও জানতে চায়, 'ও বাহে ফকিরের বেটা, কোটে থাকি আসলেন, খবর কী?' ফকির হাসিমুখে আল্লার কাছে শোকরিয়া জ্ঞাপন করে তার ভালো থাকার খবর জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্র মাইল আষ্টেক পথ এগিয়ে সাতদরগা বাজারের টি-স্টলে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখে সাইকেল থেকে নামে দুজন। টি-স্টলের সামনে একটি মোটরসাইকেল দাঁড়ানো। হ্যাঁ, শহর থেকেই ছুটে এসেছে তারা। তাদের কাছে নতুন খবর জানা যায়, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে ফেলেছে হাজার হাজার সাঁওতাল আর পাবলিক। তীর-ধনুক দিয়া মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ করছে তারা। মিলিটারির গাড়ি রাস্তায় নেমেছে, সেগুলো মানুষ দেখলেই এলোপাতাড়ি গুলি করছে। মাহিগঞ্জ শ্মশানে লাশের পাহাড়, পিচের রাস্তায় রক্তের নালা পেরিয়ে পালিয়ে এসেছে। কান পাতলে গোলাগুলির শব্দ হয়তো এখান থেকেও শোনা যাবে।

ভিড়ের কৌতূহল তৃপ্ত করার দায়িত্ব অসমাপ্ত রেখে মোটরসাইকেলের জোড়া আরোহী তাদের বাহনে উঠে বসে। নিজেরা ছুটে পালাবার আগে ভিড়কেও সতর্ক করে, 'অযথা ভিড় করেন না। মিলিটারির গাড়ি যদি এদিকে আইসে আর এরকম ভিড় দেখে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ কইলেও পার পাবেন না কইলাম।'

মোটরসাইকেল ছুটে পালানোর পর পরেশ মানিককে বলে, 'আর আগানোর দরকার নাই বাবা। চল ফিরে গিয়া রেডিয়োতে আকাশবাণীর খবর শুনব।'

AMARBOI.COM

তেরো

শহরে মার্চের সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও গাঁয়ের লোকজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ২৫ মার্চের কালরাত থেকে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সেনাবাহিনীর গণহত্যার খবর ধীরে ধীরে গাঁয়ের শান্ত-স্বাভাবিক পরিবেশে অদৃশ্য আতঙ্কবোমা হয়ে ফুটতে থাকে। সামান্য বেতারযন্ত্র এই ভয়াবহ পরিস্থিতি, এত রক্ত আর লাশের খবর কতটুকুই বা ধারণ করতে পারে? ফলে সংবাদদাতা ও ভাষ্যকারের দায়িত্ব নিয়েছে গাঁয়েরই লোকজন। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর তারা প্রত্যক্ষদর্শীর মতো যথেষ্ট উত্তেজনা আর বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবেশন করে, বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লার কিড়া কাটতেও দ্বিধা করে না। আর এসবের মধ্য থেকে প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টায় মানিক স্বকর্ণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা শুনে নিশ্চিত হয়, বাঙালিরা কেবল ইঁদুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো মরছে না। বাঙালি মিলিটারি, ইপিআর আর পুলিশরাও অস্ত্রহাতে পাকবাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছে। নিজের এবং লোকজনের বাড়াবাড়ি মিলিটারি-আতঙ্ক আর হুজুগ-গুজবের প্রভাব কাটাতে প্রতিরোধ যুদ্ধের খবরই বেশি বেশি ছড়াতে থাকে মানিক।

মানিকের সঙ্গে রেডিয়োতে যুদ্ধের প্রকৃত খবর শোনার জন্য ভুঁইয়াবাড়িতে ভিড় কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সন্ধ্যার পর খড়মের চটচটাস শব্দ তুলে আশপাশের গ্রাম থেকেও দল বেঁধে আসে লোকজন। কাছারিঘরে এত মানুষকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাড়ির সামনের খোলা প্রাঙ্গণে আমগাছ তলায় ঘাস-মাটি-টঙের ওপর বসে পড়ে, তাতেই বরং আরাম পায়। ভিড়ের মধ্যমণি হয়ে চেয়ারে বসে থাকে সজব ভুঁইয়া, পরেশ, মানিকসহ গণ্যমান্যরা। খবর শুরু হলে টেবিলের ওপর রেডিয়োখানা ফুল ভলিউমে বাজে। বাড়িতে মানুষের এই ভিড় দেখেই টের পায় মানিক, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও আক্রান্ত ও লড়াকু বাঙালি জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। জাতীয় জীবনের তীব্র নিরাপত্তাহীনতা আর প্রতিরোধের টানটান চেতনায় রতনপুরের সীমানাও যেন ৫৬ হাজার বর্গমাইলজুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়।

জনগণের ভিড় দেখলে রাজনীতির নেতাদের জনগণকে ভালোবাসার ভাষা ও ভাষণ যেমন উত্তপ্ত ও আবেগময় হয়ে ওঠে, নিজ বাড়িতে সমবেত লোকজনকে দেখেও সেরকম আবেগ জাগে মানিকের। ভিড়ের উদ্দেশে তার পিতা কিংবা পরেশ কাকা যেমন চটজলদি স্বতঃস্ফূর্ত মতামত দেয়, মানিক সেভাবে পারে না। লোকজন অবশ্য শুধু তাদের কথা শুনতেই আসে না, নিজেরাও নানারকম কথাবার্তা বলে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আজ আকাশবাণী কলকাতা থেকে পাকবাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনে হু হু করে কেঁদে ফেলে ফণী বুড়া, তার কান্নার সমর্থনে ভিড়ের কণ্ঠেও নানা ভয় ধরানো মন্তব্য ফোটে।

খানের বাচ্চারা বাঘের চাইতেও বড় জানোয়ার বাহে! পেটের ছাওয়াকেও আইফেলের খোঁচার মারি ফালাইছে... হায় আল্লাহ, তোমার চক্ষু কি মোসলমানের কাণ্ড দেখে না... মাউড়া শালারা সউগ বাঙালি মারিয়া বাংলার মাটি দখল করিবার চায় ... তা হইলে তো টাউন ছাড়িয়া হামার গ্রামেও আসপে... এ গ্রামে আসলে ভুঁইয়া আর বাবুর বাড়িত আসপে সবার আগে... কী কন ভুঁইয়া ভাই আসপে না মিলিটারি?

সজব ভুঁইয়া জবাব দেয় না। পাকবাহিনী যদি সত্যি সত্যি এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামেও আসে, তবে বাড়ি ছেড়ে কোথায় পালিয়ে আত্মগোপন করবে — আগাম ভেবে রেখেছে সে। তবু ভয়পাদুরা লোকজনকে শাসন করে, 'মিলিটারি যদি মোক মারতে আইসে, তোমরাগুলা কি চায়া চায়া দেখপেন?'

'লাঠি-বল্লম নিয়া হামাকও তৈরি থাকা লাগে... কিন্তু লাঠির ডাঙ দেওয়ার আগেই আইফেল দিয়া গুলি চালায় দেয় যদি... তা বাদে কামান-ট্যাঙ্ক দিয়া বলে দুই মাইল দূর থাকিয়া নিশানা করিয়া মানুষ মারে... কাইলকা কাজী চেয়ারম্যানের বাড়িত গেছিনু বাহে, চেয়ারম্যান কয় শেখ মুজিবর অ্যারেস্ট হইছে, তার দল পাকিস্তানে আর থাকবে না। পাকবাহিনী টাউনের আন্দোলন দমন করিছে, বাড়াবাড়ি করলে গ্রামে আসিয়া সবাইকে টাইট দেবে...

লোকজনের প্রতিরোধ চেতনা ছাপিয়ে আবার আতঙ্ক প্রবল হতে থাকলে মানিক নিস্তেজ গলায় সাহস জোগায়, 'আপনারা এত ভয় পান কেন? আমাদের বাঙালি মিলিটারি-পুলিশ-ইপিআর তো যুদ্ধ করিবার নাগছে বাহে।'

'কিন্তু এলায় আন্দোলন আর যুদ্ধ কার হুকুমে চলবে বাবা? আসল মানুষটাকে অ্যারেস্ট করি মনে হয় মারি ফেলাইছে। কাইল স্বপন দেখনু মিলিটারির কামানের ওপর শেখের লাশ কাউয়া ঠুকরায় খায়। মুজিবর নাই চিন্তা করলেই মোর জিউটাও যে উড়ি যায় বাহে মানিক! হায় আল্লাহ, হামাকে আর কাঁয় মুক্ত করবে?'

শেখের মামু হঠাৎ এভাবে ডুকরে কেঁদে উঠবে, কেউ ভাবেনি। ছেদরা সলেমান রসিকতা ভুলে নজিবরকে সান্ত্বনা দেয়, 'হামার শেখের মামু যখন বাঁচি আছে, শেখ মুজিবরও বাঁচি আছে বাহে! তাকে মারা এত সোজা?'

এ সময় পরেশ ভিড়কে ধমক দেয়, 'কী বালের ফ্যাদলা জুড়ছেন তোমরা! রেডিয়োখান কয় কী, আর তোমরা পাবলিক বোঝেন কী। শেখ মুজিবকে অ্যারেস্ট করার খবর আসলে গুজব। সব ভুয়া খবর। মানিক নিজের কানে স্বাধীন বাংলা রেডিয়োর খবর শুনিছে, মেজর জিয়া কইছে যুদ্ধে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাদের সাথেই আছেন। কাজী চেয়ারম্যান পাকিস্তানের দালালি করে বলিয়া মানিক নানার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছে। কী মানিক, মুজিবের অ্যারেস্ট হওয়ার খবর ভুয়া নয়? কী শুনছিস তুই রেডিয়োতে বল।'

মানিক মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাটি হুবহু বলার জন্য যখন গলা খাঁকারি দেয়, ঠিক তখন উৎকর্ণ ভিড়ের কানে আসে, রাস্তা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুটে আসছে একটি চিৎকার।

'ও ভুঁইয়া ভাই, পালান, পালান। এই দণ্ডে বাড়ি ছাড়ি পালান বাহে সগাই, মিলিটারি আসতেছে বাহে! মিলিটারি আসছে এ বাড়িতে... ও ভুঁইয়া ভাই...

মানিক রেডিয়োর আওয়াজ কমিয়ে দেয়। শ্রোতারা সবাই তাকায় রাস্তার দিকে। দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার যে কণ্ঠ থেকে ওঠে, তাকে ঠ্যাংভাঙা হাটের খালেক খলিফা সন্দেহ করে পরেশ। কারণ খলিফা দিনমানই তাদের কাপড়ের দোকানে বসে সেলাই মেশিন চালায়, কাজ না থাকলে লোকজনের সঙ্গে গুলতানি মারে।

'খলিফার গলা নোয়ায় বাহে ওটা?'

পরেশের সন্দেহটা শতভাগ সত্য প্রমাণিত হয় মিনিটখানেকের মধ্যে, ভিড়ের মাঝে ভুঁইয়ার মুখোমুখি হয়ে খলিফা হাঁফাতে থাকে। ভুঁইয়া তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে তীব্র ধমক দেয়, 'কোথায় মিলিটারি? কী সব ভুয়া খবর নিয়া আসলু?'

খলিফা তবু খবর বলা শুরুর বদলে হাঁফানোটাই জরুরি মনে করলে পরেশ আরো জোরে ধমক দেয়, 'আরে ও খইলফা, কী বালের খবর নিয়া আসলু! হামার নরেশ কই?'

ভুয়া বা তুচ্ছ খবর যে নয়, সেটা বিশ্বাস করানোর জন্য শুরুতেই আল্লা-রসুলের কসম কেটে খালেক খলিফা আবার হাঁফায় এবং হাঁফানোর ফাঁকে ফাঁকে খবরটি বিস্তারিত জানায়। সন্ধ্যার পর দোকানে নরেশ, মোর্তজা মাস্টার, হযরত দোকানদার এবং সে বসে বসে মিলিটারির গল্প করছিল। এ সময় চায়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য নিপেনের দোকানের দিকে গেলে তার নজরে পড়ে রাস্তায় মোটরগাড়ির আলো। সেই মোটরগাড়ির আওয়াজ শুনেই বোঝে সে, এইখান তো ঠ্যাংভাঙা হাটের মুড়ির টিন বাস নয়। তিন-চারদিন হইল সেই বাস গ্যারেজে নিয়া থুইয়া দিছে নোয়াখালী আবদুল্লাহ। খালেক যখন এসব ভাবে, ঠিক তখন নিপেন দৌড়ে এসে বলে, 'ও খলিফা মোটরে চড়িয়া মিলিটারি আসতেছে। রাস্তার ধারের পানের দোকানটায় নামিয়া সজব ভুঁইয়া আর পরেশের দোকান কোনটা পুছ করতেছে।' খবরটা দিয়েই নিপেন ছুটতে শুরু করলে খলিফাও আর এক সেকেন্ড দেরি করেনি। নরেশকে খবরটা দিয়েই দোকানের সামনে ওড়ানো স্বাধীন বাংলার পতাকা নামিয়েছে। কারণ ওই পতাকা যে তার হাতে বানানো, এ খবরটি মিলিটারির কানে অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছে কেউ। পতাকা নামানোর সময় মোটরগাড়ির আওয়াজ এবং একটি গুলির শব্দ কানে এসেছে তার। ফলে পতাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামিয়ে নরেশের দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করেনি খলিফা। ভুঁইয়াকে খবরটা দেওয়ার জন্য রাস্তা ছেড়ে ভুঁইবাড়ির মাঝ দিয়ে পাগলা কুত্তার মতো দৌড়াতে শুরু করেছে। কারণ মিলিটারির গাড়ি কামান-বন্দুক নিয়া ভুঁইয়াবাড়ি এই আসল বলে।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় ভিড়ের লোকজন অন্ধকারে রাস্তার দিকে, কেউবা ভুঁইয়া, পরেশ ও মানিকের দিকে তাকিয়ে করণীয় বুঝতে চায়। মানিক খলিফাকে ধমকের গলায় বলে, 'প্রকৃত ঘটনা না জেনে আপনার ছুটে আসা উচিত হয়নি মামা।'

নিষিদ্ধ পতাকা বানিয়ে নেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের শিক্ষিত নাতির ওপর তো রাগ ছিলই খলিফার। পতাকা ডোবার মধ্যে ছুড়ে দিয়েও রাগটা কমেনি। ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব দেয়, 'গাড়ি তো স্বচক্ষে দেখনু বাবা। তারপরও প্রকৃত ঘটনা জানতে কি গুলি খাওয়ার জন্য মিলিটারির কাছে পুকটি আগায় দিবার কইস? বিশ্বাস না হইলে বাজারের দিকে আগায় দেখ, এতক্ষণে মনে হয় হাটের সবাইকে শেষ করি দিছে!'

খলিফার খবরের সত্যতা প্রমাণের জন্য এক পাও আগাতে হয় না কাউকে। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে ভুঁইয়াবাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছে যে রাস্তাটা, সেই বাঁকের মুখে তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর গাড়ির হেডলাইট, অন্ধকারে বাঘের চোখ কেমন জ্বলজ্বল করে, কেউ দেখেনি, কিন্তু মিলিটারির গাড়ির দুটি চোখ আগুনের গোলার মতো ভুঁইয়াবাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখে সবাই। ধীরে ধীরে গাড়ির আওয়াজটাও কানে আসে। ততক্ষণে শেষবারের মতো 'বাঁচতে চাইলে পালান সগাই' বলে সতর্ক করে খালেক খলিফা আবার ছুটতে শুরু করেছে। তার দেখাদেখি কিংবা তার আগে অন্যরাও। সজব ভুঁইয়া 'ও বাবা মানিক, বাড়ির সবাইকে নিয়া পালাও জলদি' শেষ নির্দেশটি শুধু মুখে নয়, ছোটার আগে ছেলের হাত ধরে টেনেও বলে, তারপর বাড়ির উঠান পেরিয়ে মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে।

খুলির জমজমাট ভিড় যখন ভেলকিবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যায়, বাংটু বক্কর তখনো গাছতলার টঙের ওপর দাঁড়িয়ে সম্মোহিত বালকের মতো মিলিটারির ছুটে আসা গাড়ি দেখতেই ব্যস্ত। গাড়ির হেডলাইট দেখলেও আওয়াজটা তার কানে যখন স্পষ্টভাবে ধরা দেয়, তখন খুলিতে একটি মানুষকেও আর দেখতে পায় না সে। বাংটুকে টঙের ওপর রেখেই কে কোথায় পালিয়ে গেছে, বুঝতে পারেনি সে। চকিতে নিখোঁজ বাবার কথাও মনে পড়ে, মা স্বপ্নে দেখেছে মিলিটারির গুলি খেয়ে তার বাবা ধানবাড়িতে মরে পড়ে আছে। আজ কি তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারির গুলি খেয়ে এ গাঁয়ের সবাইকে সত্যি সত্যি মরতে হবে? আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ সে, পালাবার জন্যে ইতউতি তাকায়। কিন্তু গাড়িখানা প্রায় খুলির কাছে এসে গেছে, পালাতে গেলেই গাড়ির তীব্র আলো তার গায়ের ওপর পড়বে নির্ঘাত। বাংটু ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো টঙের ওপরে হেলে পড়া গাছটির ডাল এক লাফে দু'হাতে এবং পরে পা দিয়েও আঁকড়ে ধরে, তারপর বানরের মতো তরতরিয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

ভুঁইয়াবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় একটিমাত্র জিপগাড়ি। পিবিপপিপ করে হর্ন বাজায়। তারপর গাড়ির শব্দ আলো নিভে যায়। ভেতর থেকে সাদা পোশাকে তিনজন মানুষ নামে প্রথম। সুনসান খুলিতে তাদের কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলা কথা, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বাড়ি তো। এই তো ইলেকশনের সময়েও এসেছিলাম। সামনের হিন্দুপাড়ায় সাহাদের বাড়ি। কিন্তু এ বাড়িতে কোনো মানুষের সাড়া নাই কেন?'

'এদিকেও আবার আর্মি আসে নাই তো?'

'আরে না, না। বাজারে লোকজনের কাছে শুনলাম তো। এই, তোমরা সবাই নামো গাড়ি থেকে। ড্রাইভারকে আবার গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি ফেরত পাঠাতে হবে।'

AMARBOI.COM

গাড়ির পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় মেয়েমানুষের ছায়ামূর্তি, শাড়ি পরা দুজনের সঙ্গে বিউটির মতো ফ্রক কামিজ পরা একটি মেয়ে ও ছোট চ্যাংড়াও আছে একটি কি দুটি। টং পর্যন্ত এগিয়ে আসা মোটা পুরুষটি জোর গলায় ডাকে, 'বাড়িতে কে আছেন! ও সজব ভুঁইয়া, সজব মিয়া।'

গাছের ওপর থেকে এইসব দৃশ্য দেখেশুনে ভয়মুক্ত হয় বাংটু। আগন্তুকদের স্পষ্ট চিনতে না পারলেও বুকের দুরুদুরু কম্পন থামে। যেই হোক, মিলিটারি নয় এবং এরা বাঙালি বটে। মোটা লোকটার গলার আওয়াজ চেনা চেনা মনে হয়। ভালো করে চেনার জন্য দ্রুত গাছ থেকে নামতে থাকে সে।

সহসা গাছের ডালপালা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে টঙের ওপর একটি মনুষ্যমূর্তি লাফিয়ে পড়ায় আগন্তুক ভদ্রলোকটি 'এটা কীরে!' আর্তরব তুলে কয়েক পা পিছিয়ে যায়। নারী কণ্ঠেও তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ওঠে। বাংটু চেঁচিয়ে অভয় দেয়, 'ভয় পান না। মুই এ বাড়ির চাকর। আরে তোমরা টাউনের নেতা এমেনে সাইব নোয়ায়? ভোটের সময় আসছিলেন যে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি কে? তা গাছে কেন বাবা?'

'মুই বাংটু বক্কর। এ বাড়ির চাকর। তোমার মোটরখানকে দেখিয়া মিলিটারির গাড়ি আইল মনে করিয়া ভয়ে বাড়ির সব মানুষ পালাইছে। খানিক আগেও খুলিভরা মানুষ ছিল, দেখেন এলা কাঁইও নাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়ামী লীগের জেলা শাখার সভাপতি ও এমএনএ অ্যাডভোকেট মশিয়ার আকন্দ সামান্য এক চাকরকে মিলিটারি, অদ্ভুত জন্তু কিংবা ভূত মনে করেই হয়তো ভয়ে চমকে ওঠার লজ্জা ঢাকতে চেঁচিয়ে বলে, 'এত ভয় পেলে এ দেশ স্বাধীন হবে? এত ভয় পাওয়ার কী আছে, ডাক তোর মনিবকে।'

সঙ্গের লম্বা লোকটি নতুন করে নেতাকে চিনিয়ে দেয়, 'সবাইকে বল যে, টাউন থেকে মশিয়ার আকন্দ উকিল এমেনে সাহেব তার ফেমিলি নিয়া এসেছেন। ভয়ের কিছু নাই।'

আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে বাংটু এবার গলা ছেড়ে চেঁচায়, 'মিলেটারি না হয় বাহে, টাউন থাকি এমেনে সাহেব বউছাওয়া নিয়া আসিছে। মিলিটারি নোয়ায়, এইখান এমেনের মোটর...'

বাংটুর অনেকক্ষণ হাঁকডাকেও বাড়ি থেকে চটজলদি কাউকে ছুটে আসতে না দেখে এ-বাড়ির ভীতু লোকগুলোর ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে এমএনএ সাহেব। চেয়ারে বসে সিগ্রেট জ্বালে। পলাতক মানুষের খালি চেয়ার-বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে পরিবারকেও বসতে বলে, 'বসো তোমরা এখানে। রাতটা এ বাড়িতেই থাকতে হবে। এ গ্রামে আমাদের দলের মেলা কর্মী-সাপোর্টার আছে।'

পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো একে একে ফিরে আসতে থাকে। বাড়ির সকলকে জলদি পালানোর নির্দেশ দিয়ে, প্রাণ বাঁচানোর প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চেয়ে সজব ভুঁইয়া বাড়ির পেছনের ভিটা পেরিয়ে জগন্নাথের জঙ্গলের দিকে ভোঁ-দৌড় শুরু করেছিল। আইলের ওপর হোঁচট খেয়ে হাঁটুর ছাল উঠে গেছে তার। পা খুঁড়িয়ে সে যখন আগন্তুক নেতার মুখোমুখি দাঁড়ায়, বিস্ময় মেশা খুশির আধিক্যে তার আহত পায়ের যন্ত্রণাবোধ চাপা পড়ে, 'আরে স্যার, আপনি আসলেন! আর আমরা মিলিটারি মনে করিয়া ছি ছি! হারামজাদা খালেক খলিফা বাজার থাকি ছুটি আসিয়া মিলিটারির খবর এমনভাবে দিল!'

দলের জেলা কমিটির প্রধান নেতা এবং এমএনএ হিসেবেই নয় শুধু, অ্যাডভোকেট হিসেবেও মশিয়ার আকন্দ জেলার প্রভাবশালী মানুষ। শেখ মুজিব পাওয়ার পেলে তার মন্ত্রী হওয়াটা অনিবার্য। মক্কেল হিসেবেও মশিয়ার উকিলের সঙ্গে সজব ভুঁইয়ার সম্পর্কটা অনেক দিনের। ভুঁইয়াকে থানা কমিটির দায়িত্ব দেওয়ার পেছনেও তার ভূমিকা প্রধান। সভাপতির নিজের নির্বাচনী এলাকা ভিন্ন, তবু গত নির্বাচনী প্রচার অভিযানেও রাজ্জাক মাস্টার এমপির পক্ষে নির্বাচনী সভা করতে ঠ্যাংভাঙা হাটে এসেছিলেন তিনি। রাজ্জাক মাস্টারসহ আতিথ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন সজব ভুঁইয়ার বাড়িতে। আগামীতে শেখ মুজিবকে সজব ভুঁইয়ার থানাতেও একবার নিয়ে আসবেন — এমন কথাও দিয়েছেন। আজ দেশের দুর্যোগের সময় পরিচিত নেতা তার বাড়িতে ছুটে আসায় সজব ভুঁইয়া আনন্দোচ্ছ্বাস দিয়ে অন্ধকারে শেয়ালের মতো ছুটে পালানোর লজ্জা এবং আছাড় খাওয়া হাঁটুর চিনচিনে ব্যথা আড়াল করার চেষ্টা করে।

'আসল খবর তো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না স্যার, শুনলাম রংপুর শ্মশানে বহু লাশ পড়ি আছে, তার মধ্যে আপনার নামটাও শুনলাম। শুনিয়া রাতে আমি অনেক চোখের পানি ফেলছি স্যার আপনার কথা ভাবিয়া। তারপর শুনলাম, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে ফেলছিল হাজার হাজার মানুষ। তারা তীর-ধনুক লাঠি-সড়কি নিয়া যুদ্ধ করতেছে। হাজার হাজার বাঙালির রক্তে টাউনের রাস্তা ভাসায় দিয়া আর্মিরা গ্রামের দিকেও আসতে শুরু করছে। এইসব খবর শুনিয়া আমরা খুব দিশাহারা বোধ করছিলাম স্যার।'

এসব বলে পালাবার ব্যাপারটা যৌক্তিক ও হাঁটুর ব্যথা সহনীয় হয়ে উঠলে ভুঁইয়া ছেলে, মেয়ে ও চাকরদের হাঁকডাক করে, 'মানিক কই? মানিক! ও বিউটি ! দেখ আমাদের বাড়িতে কত বড় মেহমান আসল! স্যারের ফেমিলিকে ভিতরে নিয়া যাও, চা-নাশতা খাওয়ার ব্যবস্থা করো আগে।'

পরিবারকে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিয়ে মশিয়ার আকন্দ তার এই নাটকীয় উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের রাত থেকেই পাকবাহিনী পাগলা কুত্তার মতো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওরা অপারেশনে নামলে ওই রাতেই শহরের বাড়ি ছেড়েছে সপরিবার। নিজের গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে থাকার উপায় নেই, কারণ পাকা রাস্তার ধারে সেই বাড়ি শহরের বাড়ির চেয়েও খুঁজে পাওয়া সহজ। এ কয়টা দিন জান হাতে নিয়ে শহরেই আত্মগোপন করে ছিল। আজ এসডিও সাহেব তার গাড়ি দিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।

এ সময় ড্রাইভার রাতে কারফিউ শুরুর আগে শহরে ফিরে যেতে হবে বলে বিদায় চাইলে, উপস্থিত গ্রামবাসীরা তাকেও রাতের খাওয়াদাওয়া করে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। সজব ভুঁইয়া বাণ্টুকে চা-নাশতা আনার হুকুম দেয়। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে ড্রাইভার এমেনের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয় আবার।

শত্রুবাহিনীর আতঙ্কমাখা আওয়াজ, আলো ও গন্ধ নিয়ে গাড়িখানা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে খুলিতে ফিরে আসা লোকজন অনেকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ভুয়া খবর দেওয়ার জন্য খালেক খলিফাকে খোঁজে সবাই। বিপদ কেটে যাওয়ার খুশিতে নিজেদের পালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করে তারা। ছেদরা সলেমান ঠাট্টা করে বলে, 'হামার শেখের মামু তো এলাও বোধহয় ধানের ডুলিতে পলায় আছে।' নজিবর নিজের পুনরাবির্ভাব ও ভয় পাওয়াকে জোর গলায় ব্যাখ্যা করে, 'শেখ মুজিবকে শালারা বন্দি করিছে শুনিয়া মোর মাথা আউলায় গেছে রে! নেতা না থাকলে বাঙালি ভয় তো পাইবেই।'

মশিয়ার আকন্দ জরুরি দায়িত্ব পালনের জন্যই যেন ভিড়ের কাথাবার্তায় যোগ দেয়, 'ভয়! ভয় করলে তো চলবে না বাহে। যুদ্ধ শুরু হইছে। শেখ মুজিব নির্দেশ দিয়েছে, মাত্র এক সপ্তাহ আগেও নেতার সঙ্গে টেলিফোনে আমার অনেক কথা হইছে, তিনি আমাদের মেলা ইনস্ট্রাকশন দিয়া রাখছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে আমাদের, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, আর বাঙালির মরা-বাঁচার এই লড়াইয়ে ইন্ডিয়ার সমর্থনও আদায় করতে হবে...

ক্রমে গলা চড়ে যাচ্ছিল মশিয়ার উকিলের। কিন্তু বক্তৃতা শুরু করেও তিনি হঠাৎ থেমে যান, হয়তো জোর গলায় বক্তৃতা করার মতো উপযুক্ত ভিড় এখনো তৈরি হয়নি বলে কিংবা হতে পারে শ্রোতাদের মুখ দেখতে না পাওয়ার কারণে। তাছাড়া নিজের ইন্ডিয়া পালানোর পরিকল্পনাটি এখনই ফাঁস করতেও দ্বিধা জাগে। এ ব্যাপারে গ্রামের লোকগুলো তাকে সহযোগিতা করার বদলে গোপনে শহরে গিয়ে আর্মিদের কাছেই খবরটা জানায় যদি?

নেতা থেমে গেলে সজব ভুঁইয়াই তাকে মদদ ও সাহস জোগায় আগে, 'আমার গ্রামের সবাই নৌকা মার্কার পক্ষে স্যার, সবাই জয় বাংলা। একলা নজিবর নয়, মুজিবের ডাকে আমার গ্রামের সবাই ঐক্যবদ্ধ। পরেশটা গেল কই?'

পরেশও ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পালানোর কথা উঠলে, বাংটু তার অভিজ্ঞতা বয়ানের সুযোগ পায়, 'ও বড় আব্বা, মুই তো আগে পালাও নাই। গাড়ি বাঘের মতো ছুটিয়া আইসে দেখি এক লাফে গাছত উঠনু, গাছত চড়িয়া দেখোঁ, আর চিন্তা করোঁ, দেখোঁ আর চিন্তা করোঁ, মিলেটারি যুদিল হয় তে হাতে বন্দুক নাই ক্যানে? মিলিটারি যুদিল হইবে সাথে ফের বেটিছাওয়া থাকে ক্যানে? তার ওপর মুখত বাংলার মতো টাউনি মানুষের বুলি...

বাংটুকে থামিয়ে দিতে মশিয়ার আকন্দ হেসে তাকে সবাসি দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গাছ হইতে হঠাৎ লাফ দেওয়ায় আমি তো ভাবলাম মুক্তিফৌজ। সাহস আছে চ্যাংড়াটার, স্বাধীনতার জন্য আমাদের সবাইকে সাহস দেখাইতে হবে ভাইসব।'

'খালি আমার বাড়ির চাকর নয় স্যার, জয় বাংলা বলতে আমার রতনপুরের মানুষ কীরকম সাহসী আর ঐক্যবদ্ধ, কয়দিন এ গ্রামে থাকলেই বুঝতে পারবেন স্যার। আপনাকে পায়া আমাদের সবার সাহস বাড়ি গেছে স্যার।'

বাবার ভক্তি গদগদ কণ্ঠে নেতাকে বারবার স্যার সম্বোধন মানিকের কানে বড় বাজে। শেখ মুজিবকে পর্যন্ত ছোটখাটো নেতারাও মুজিব ভাই বলে, এ লোকটাকে বাবা এত স্যার স্যার করে কেন? মশিয়ার উকিলের পুরুষ সঙ্গীটি তার আত্মীয় হলেও হয়তো পার্টির লোক, সজব ভুঁইয়ার কানে কানে কী যেন বলে। ভুঁইয়া পরেশকে খবর দেওয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বাংটুকে নির্দেশ দেয়, তারপর নেতার সঙ্গে নিচু গলায় কী কথা যেন বলতে থাকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিড়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল মানিক, চুপচাপ আবার বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

বাড়ির ভেতরেও তখন ফাঁড়া কেটে খাওয়ার উৎসব চলছে যেন। ভুঁইয়াবাড়িতে মিলিটারি আসছে শুনে আশেপাশ বাড়ির বউ-ঝিরা পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল, এখন তারা আসল ঘটনা স্বচক্ষে দেখার জন্য ভুঁইয়াবাড়িতে ভিড় জমিয়েছে। এমেনের পরিবারকে দেখে হাউস মিটছে না তাদের। মানিক বড় ঘরটায় উঁকি দিয়ে মেয়েমানুষের অস্বাভাবিক ভিড় দেখে আর এগোতে পারে না। চেঁচিয়ে বিউটিকে নির্দেশ দেয়, 'এই বিউটি, তোরা মেহমানদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর। ও নয়া মা, আগে চা-টা দেন একটু।'

বিবিসি শোনার জন্য নিজের ঘরে এসে রেডিয়ো ছেড়ে দেয় মানিক। পালাবার সময় রেডিয়োটা তার হাতেই ছিল। বাবা হাত ধরে পালাবার পথ দেখালেও মা, বিউটি ও ছোট ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে পালাতে খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। মানিক বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভিটার গাছপালা পেরিয়ে পেছনের বাঁশঝাড়ের ভেতরে দাঁড়ালে, বিড়বিড় করে অনবরত আল্লা খোদাকে ডাকছিল নয়া মা ও বিউটি। অন্ধকারে ভিটার তেঁতুলগাছের পেত্নী ও সাপখোপের ভয়ও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তখন। মানিক প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছিল মিলিটারির সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ২৫ মার্চের কালরাতের ধ্বংসযজ্ঞ চোখের সামনে এক্ষুনি বুঝি মূর্ত হয়ে উঠবে। বৃষ্টির মতো ঝরবে গোলা-বারুদ, দাউ দাউ আগুনে জ্বলে উঠবে তাদের বাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসময় ছোট ভাই রফিক গুয়ের মধ্যে তার পা পড়ার দুঃসংবাদটি প্রকাশ করলে, তার অস্বস্তি ও দুর্গন্ধ চাপা দিতে ধমক দিয়েছিল মানিক। মিলিটারি গোলাগুলি শুরু করলে মা ও ভাই-বোনকে নিয়ে গু-পাড়ার চেয়েও ভয়ংকর বিপদ-আপদ পেরিয়ে যাওয়ার জন্য রুদ্ধশ্বাসে প্রস্তুত রাখছিল নিজেকে। খানিকক্ষণ পর বাংটুর হাঁকডাক শুনে তারা বাড়ি ফিরে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভয় পাওয়া ভয়ংকরের প্রভাব এখনো ভুলতে পারছে না মানিক।

এমেনে সাহেব পালাবার কারণে ব্যঙ্গ করে মানুষকে যত সাহসই দিক, প্রাণভয়ে সবার পালানোটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। চার-পাঁচ দিন যাবৎ দেশজুড়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন-ধর্ষণের খবর শুনে শুনে মানুষের মনে আতঙ্ক এমন জমাট বেঁধে ছিল যে, একটু আগে তারই চরম প্রকাশ ঘটে গেছে। সত্যি বলতে কি, গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় হঠাৎ মোটরগাড়ির শব্দ শুনে মিলিটারি ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতির কথা ভাবতে পারেনি মানিকও। অনিবার্য মরণকে যেন জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিল। ভাবতেও বুকের ভেতরটা ঝিমঝিম করছে এখনো। মানিক কি ঘটনাটি ডায়েরিতে লিখে রাখবে? নাকি একটি কবিতায় ধরার চেষ্টা করবে চারদিকে হায়েনার মতো হানাদার বাহিনী আক্রান্ত স্বদেশে বিপন্ন মানুষের এই অনুভূতি?

'ও বাজান, বড়বাড়িতে মোটরে চড়িয়া টাউনি মেহমান আসছে, আর ঢোঁড়া কয় মিলিটারি তোমার বাপকে মারি ফেলাইছে। দেখার জন্য ছুটি আসনু বাবা।'

দরজায় দাঁড়ানো বাংটুর মাকে দেখে মানিক বিরক্ত বোধ করলেও ধমক দিয়ে তাড়াতে পারে না।

'হ্যাঁ চাচি, আমরা তো সবাই ভয়ে পালাইছিলাম। তা দেখেন তো মেহমানদের জন্য রান্নাবান্নায় নয়া মাকে সাহায্য করেন একটু, যান।'

বাংটুর মা বড় ঘরে মহিলাদের ভিড়ে মেশার আগে সেই ঘরের ভিড়ের অংশ মানিকের ঘরে ছিটকে আসে যেন। ঘরে ঢোকে বিউটি, সঙ্গে তার সমবয়সী এক কিশোরী ও পেছনে শাড়ি পরা যুবতী — যাকে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখে এমেনে কিংবা তার সঙ্গী লোকটির স্ত্রী ভেবেছিল মানিক।

'আপা, এই যে আমার বড় ভাই মানিক।'

'আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন শুনলাম। এই গণ্ডগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্রের দেখা পাব ভাবতেই পারিনি।'

'ভাইজান, ইনি এমেনে সাহেবের বড় মেয়ে। কারমাইকেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজে পড়ে, এবার আইএ পরীক্ষা দেবে। আর অনিতা, গভ. গার্লস স্কুলে ক্লাস এইটের ছাত্রী। আমাদের রফিকের বয়সী একটি ছোট ভাইও আছে।'

এমেনের বড় মেয়ে গায়েগতরে এবং স্বভাবেও বিউটির কাছাকাছি, বয়সে দু'চার বছরের বড় হলেও লম্বায় বিউটির চেয়েও কম। তারুণ্যকে আড়াল করে পালাবার প্রয়োজনেই মায়ের মতো শাড়ি পরেছে বোধহয়। তুমি না আপনি বলবে — সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে মানিক বিউটির দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, 'এমেনে সাহেবের গাড়ি কি সরাসরি তার টাউনের বাসা থেকে এসেছে?'

'আমরা নিজেদের বাড়ি ছেড়েছি তো ২৫ তারিখ রাতেই। আমরা আসলে ইন্ডিয়া চলে যাব। আব্বু বলে, এদেশে আমরা কেউ আর সেফ নই। পাক আর্মি দেখলেই আমাদের গুলি করবে।'

শাড়ি এবার ফ্রককে ধমকায়, 'এই, এসব ভয়ের কথা এখন রাখ তো। আচ্ছা, এখান থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার কতদূর হবে?'

'বেশ দূর। তিস্তা পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র বা ধরলা নদী পার হতে হবে, তারপর বর্ডার।'

'ওরে বাপ-বা! আপা, আমি ভেবেছিলাম বর্ডারের কাছে চলে এসেছি। এতদূর পথ আমরা কীভাবে যাব?'

'তোমরা কি আজ রাতেই ইন্ডিয়া রওনা দেবে?'

'শেল্টার পেতে না পেতেই তাড়িয়ে দিতে চাইছেন! এ কয়দিন আমাদের জানের ওপর যে ধকল গেছে।'

বিউটি বলে, 'আপা, আপনাদের আমরা যেতে দেব না। আমাদের বাড়িতেই থাকেন। মরি তো সবাই একসঙ্গে মরব, আমরা তো সবাই আওয়ামী লীগ, আপনাদের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।'

বাংটুর মা দরজায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ঘরের কথাবার্তা গিলছিল। আসমাকে জিজ্ঞেস করে, 'ও মা তোমরা এমেনের বড় বেটি! তোমার বিয়া হয় নাই এলাও?'

যুবতী লজ্জা এবং কিছুটা মজা পাওয়ার দৃষ্টিতে মানিকের দিকে তাকায়। মানিক বিউটিকে ধমকের সুরে বলে, 'কি রে বিউটি, এদের তোর ঘরে নিয়া গিয়ে আরাম করার ব্যবস্থা করে দে। দেখ, রান্নাবান্না কতদূর? যান আপনারা, ও ঘরে গিয়ে আরাম করুন।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে মানিক নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোদ্দ

রাতে পাকবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের মুখে সজব ভুঁইয়া বাড়ির কাছারিঘরের সামনে বাঁশের ডগায় বাঁধা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামানোর জন্য জরুরি নির্দেশ দিয়েছিল, মুখে না বললেও পতাকাটি নামিয়ে ফেলার কথা ভেবেছিল অবশ্যই। কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা। জান বাঁচানোর ফরজ দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল সবাই। এমেনের আগমন ঘোষণা ও উপস্থিতি রাতকে আতঙ্কমুক্ত করলেও পতাকা নামানোর কথা কারো মনে হয়নি।

সকালে চা-নাশতা খাওয়ার পর বাড়ির বৈঠকখানার সামনে চেয়ারে বসে মশিয়ার আকন্দ যখন পতাকাটি দেখে, একই সঙ্গে খুশি, ভয় ও বিস্ময় নিয়ে জানতে চায়, 'মই গড! এই পতাকা উড়াইল কে?'

এমেনের সঙ্গে আলাপ করার জন্য খুলিতে তখন সজব ভুঁইয়া ও পরেশ ছাড়াও কয়েকজন কৌতূহলী গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল। রাতে রেডিয়ো শোনা আসরে যারা উপস্থিত ছিল, তারা অনেকেই আসতে পারেনি। আউশ মৌসুমের জমি তৈরির কাজে ব্যস্ত সবাই। তবে এ গাঁয়ের মাঠেঘাটে মানুষের মাঝে যে এখন মশিয়ার আকন্দের আগমনই প্রধান আলোচ্য বিষয়, সেটা যেন পতাকার মৃদুমন্দ ওড়ার আওয়াজেও এমেনে টের পায় এবং ভয়ও পায় খানিকটা।

ভুঁইয়াই সগর্বে ছেলের পরিচয় নতুন করে দিতে থাকে। তার সঙ্গে গলা মেলায় পরেশসহ অন্যরাও। বাজারে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে দলবল নিয়ে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তানপন্থী চেয়ারম্যান আফতাব কাজীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ এবং যুদ্ধে পরাস্ত নানার ইউনিয়ন কাউন্সিল ত্যাগ ইত্যাদি ঘটনার বিশদ বিবরণ দেয়।

এমেনের সঙ্গী রশিদ জানতে চায়, 'আপনার ছেলের সঙ্গে গত রাতে তেমন আলাপ হলো না। ও কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ছাত্রলীগ করে?'

'না, মানে রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এবার শুনলাম শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়াও তার সঙ্গে দেখা করছে, তারপর এখন তো আমাদের চেয়েও সাংঘাতিক মুজিবভক্ত।'

ছেলেকেও ডাকার জন্য ভুঁইয়া চেঁচিয়ে চাকরকে ডাকে, 'এই বাণ্টু দেখ তো তোর ভাইজান কোথায়?'

ভুঁইয়ার ছেলের বীরত্বগাথা শুনে মশিয়ার উকিলের খুশি হওয়াটাই সবার কাছে প্রত্যাশিত, কিন্তু তার মুখে আতঙ্কের ছায়া ও কপালে দুশ্চিন্তার

বলিরেখা কেন? কারণটা সে নিজেই হাসিমুখে ব্যাখ্যা করে, 'ভুঁইয়া, ঢাকা থেকে আপনার ছেলে এসেছে। রংপুর হইতে আমরা আসলাম। আপনার বাড়িতে একসঙ্গে এতগুলো টার্গেট। পাক আর্মি যদি এ খবরটা পায়? খবর দেওয়ার জন্য আপনার নিজেদের মধ্যেও তো শত্রুর অভাব নেই। তার ওপর পতাকা ওড়ানো আপনার বাড়ি চেনাও তো কঠিন হবে না।'

নেতার সঙ্গী পাতিনেতা রশিদও সমর্থন দিতে যোগ করে, 'মশিয়ার ভাই, আমার কিন্তু গতকালের ড্রাইভারটাকেও সন্দেহ হয়। ও যদি ফিরে গিয়ে এনিমিদের কাছে আমাদের হদিস দেয়?'

পাকা রাজনৈতিক ব্রেনে ক্রিয়াশীল এসব সন্দেহকে অমূলক ভাবতে পারে না কেউ। ভুঁইয়া বলে, 'স্যার, আপনি যদি বলেন, পতাকাটা না হয় নামায় ফেলি। নামাব?'

মানিক ডাক শুনে পিতার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাজারের পতাকা নামাতেও সে নরেশকে বাধা দিয়েছিল। খালেক খলিফা পতাকা নামিয়ে গুজব ছড়িয়ে যে হুজুগে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল গত রাতে, সেরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না বলে সে প্রবল আপত্তি জানায়, 'না আব্বা, পতাকা নামানো ঠিক হবে না। তাহলে গ্রামের মানুষ আরো ভয় পাবে, অহেতুক গুজব সৃষ্টি করবে।'

'আর্মি কনভয় যে গ্রামের দিকেও আসবে না, তার নিশ্চয়তা কি আমরা দিতে পারি পাবলিককে?'

'আর্মি আসবে বলে সবাই তো ইন্ডিয়া পালিয়ে যেতে পারবে না চাচা। গ্রামেই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। শত্রুদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলাও করতে হবে।'

'হ্যাঁ, বাবা তুমি তো আমাদের নেতার কথাই বললে। আর তোমরা ছাত্র ও তরুণ সমাজই আমাদের বড় ভরসা। কিন্তু কথা হলো বাবা, এত বড় দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে ইন্ডিয়ার সাপোর্ট ও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের অবশ্যই লাগবে। মুজিব ভাইও সর্বশেষ টেলিফোন আলাপে আমাকে সে কথা বলেছে।'

'শুধু ইন্ডিয়ার সাপোর্ট নয়, অন্যান্য দেশেরও সাপোর্ট সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। তার আগে যুদ্ধের জন্য গ্রামের মানুষকেও প্রস্তুত করা দরকার।'

'কীভাবে?'

সবাই মানিকের দিকে তাকিয়ে, মানিক এ ব্যাপারে নিজেও বড় অপ্রস্তুত। আশা করে নেতাই করণীয় সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দেবে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আগে নজিবর প্রস্তাব দেয়, 'এক কাম করা যায় না বাহে? কুন্ডার বাজারের কাছে কুন্ডার পুলখানা তো অনেকটা ভাঙি গেইছে, আরো খানিকটা ভাঙি দিলে মিলিটারির গাড়ি আর আসতে পারবে না।'

আজিরুদ্দি বলে, 'মিলিটারি যে আস্তা দিয়া আসপে মনে করেন, সেই আস্তার ওপর গাছ কাটিয়া ফেলায় দাও বাহে। আস্তা বন্ধ দেখি মিলিটারির গাড়ি যখন থামবে, তখন চাইরোদিক থাকি ঢিল খাইলে শালারা পালাইবে কোনপাকে? পালাইতে ধরলে লাঠির ডাং।'

প্রতিরোধ যুদ্ধে গেঁয়ো লোকজনের বুদ্ধি ও সাহসের ওপর ভরসা করতে না পেরে এমেনে সাহেব মানিককে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি মনে করো বাবা, রাস্তা ব্লক করে দিলে আমরা আরো সেফ থাকব?'

'হ্যাঁ, অন্তত গ্রামে মিলিটারি আসার আতঙ্কটা কমবে।'

পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'স্যার, আপনি হুকুম দেন, আমরা গ্রামের সবাই মিলিয়া মিছিল করি নেকমামুদে যাব। কুন্ডার পুলখানা আইজকাই ভাঙি দিয়া আসি। ও নজিবর ভাই, ওই আজিরুদ্দি সবাইকে খবর দাও। লাঠি, সড়কি, দাও, কুড়াল নিয়া রেডি হন সবাই। খান সেনার চোদ্দগুষ্টিকে খতম করব আইজ।'

AMARBOI.COM

দুপুরবেলা চাষিরা মাঠের হাল ছেড়ে দেওয়ার পর সাজসাজ রব ওঠে ভুঁইয়াবাড়িতে। লাঠি, বল্লম, টেটা, কুড়াল, শাবল হাতে জড়ো হতে থাকে লোকজন। ভাটিয়াপাড়ায় চরুয়া লাঠিয়াল আছে কয়েকজন। ভুঁইয়া খবর পাঠিয়ে তাদেরও ডেকে এনেছে। হিন্দুটাড়ি থেকে দলবল নিয়ে আসে পরেশ কাকা। তার হাতে বড় একখান টেটা। বাণ্টু চেঁচিয়ে আহ্বান জানায়, 'লাঠি নিয়া আইস বাহে-এ-এ-এ, মিলিটারি পাগলা কুত্তাকে মারমো আইজ।' বাণ্টুর সহকর্মী জহিরও আজ শাবল নিয়ে উপস্থিত। এমেনে ও ভুঁইয়ার সমর্থন থাকায় লড়াকু ভিড়ের উৎসাহ বাড়ে। তাদের প্রতিনিধি হয়ে মানিক থাকবে মিছিলের সামনে। বাণ্টু মানিকের হাতেও একটি লাঠি তুলে দেয়।

ঝগড়াকাজিয়ার উত্তেজনা দেখলে ভিড় জমায় কৌতূহলী লোকজন। মিলিটারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখার কৌতূহলবশে ছুটে আসে যারা, তারাও লড়াকু ভিড়ের অংশ হয়ে যায়। বালক বয়সী চ্যাংড়াদেরও নিবৃত্ত করে না কেউ। শুধু কুন্ডার ব্রিজ ভাঙা নয়, যেন রাস্তায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সত্যি সত্যি যুদ্ধ হতে পারে আজ। পরেশ ঠাট্টার ভঙ্গিতে সতর্ক করে, 'মিলিটারির গাড়ি যদি আসতে দেখেন, গত রাইতের মতো কাঁয়ও দৌড় দেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সড়কের নিচে সগাই পজিশন নেমেন।'

মিলিটারির সম্ভাব্য আক্রমণের কথা ভেবে ভয় পাওয়ার বদলে হাতের লাঠি তুলে সাহস দেখায় সবাই। মানুষের জোশ বাড়াতে পরেশ স্লোগান দেয়, 'জয় বাংলা।' মানিক ঢাকায় মিছিলে শরিক হয়েও স্লোগানের সময় ঠোঁট নাড়িয়েছে কেবল, কিন্তু আজ চিৎকার করে স্লোগান তোলে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, আমার সাথে বলো সবাই — বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'

ঠ্যাংভাঙা হাট পেরিয়ে ডিস্ট্রিক বোর্ড রাস্তার ধারে কুন্ডার বাজার। সেখানে কুন্ডা নদীর ওপর পুরনো ব্রিজ। সেই ব্রিজের দিকে লড়াকু মিছিল যত এগোয়, ততই তার লড়াকু জোশ ও আয়তন ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। হানাদার পাকবাহিনী খতম হবে, হরিপুরে মিলিটারি আসার রাস্তা বন্ধ হবে চিরতরে — মিছিলের এরকম লক্ষ্য শুনে আশপাশের গাঁয়ের লোকজনও যোগ দেয় মিছিলে। রাস্তায় একটি কুকুরকে ইয়াহিয়া খান বলে তাকেও দাবাড়ি দেওয়ার জন্য লাঠি হাতে পিছু ছুটে যায় কয়েকজন। বাজারের খালেক খলিফা যেহেতু পতাকা নামিয়ে ভুয়া খবর ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকেও আজ একটা শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করে একজন। বাণ্টু মানিককে মনে করিয়ে দেয়, 'ও ভাইজান জমির মেম্বার জয় বাংলার আসল শত্রু, তাকেও একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।' মানিক ভেতরে আঁতকে ওঠে। এরপর যদি স্বাধীনতার বড় শত্রু হিসেবে নানাকেই স্মরণ করে দিয়ে চেয়ারম্যানবাড়ি আক্রমণের প্রস্তাব দেয় কেউ? মানিক জোর গলায় সিদ্ধান্ত দেয়, 'এখন আমাদের প্রধান শত্রু পাকিস্তানি মিলিটারি। তারা যাতে আমাদের এলাকায় কখনই ঢুকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আগে চলো কুন্ডার ব্রিজ ভাঙিয়া মিলিটারি আসার রাস্তা বন্ধ করি।'

মিছিলের লড়াকু মেজাজ চাঙ্গা রাখতে পরেশ আবার স্লোগান ধরে। অবশেষে কুন্ডার ব্রিজে পৌঁছে আসল শত্রুর দেখা পাওয়া যায় যেন। ব্রিজের যে অংশটায় ভেঙে খানিকটা গর্ত হয়ে লোহার রড বেরিয়েছিল, সেইখানে গিয়ে হাতের লাঠি-শাবল-বল্লম দিয়ে আঘাত করে সবাই। যারা খালি হাতে ছিল, তারাও খানসেনাদের পাছায় লাথি মারার আক্রোশ নিয়ে ব্রিজে আঘাত করে। ডিনামাইট দিয়ে যে ব্রিজ মুহূর্তেই উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, তার খানিকটা অংশ ভাঙার জন্য বহু মানুষকে মেহনত করতে হয় ঘণ্টাখানেক। ভাঙা দেখে নিশ্চিত হয় সবাই, ব্রিজের ওপর দিয়ে মানুষ ও সাইকেল ছাড়া তিন চাকার রিকশা পর্যন্ত পার হতে পারবে না আর। মিলিটারি গাড়ি কামান নিয়ে এই ব্রিজে উঠলে নিচের নদীতে ডিগবাজি খেতে হবে অবশ্যই। তারপরও আর্মি রতনপুরে যেতে চাইলে অবশ্য সাতদারগা থেকে ঘোরা রাস্তায় নেকমামুদ দিয়ে যেতে পারবে। সেই রাস্তার ওপরে গাছ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁশ ফেলে রাস্তা বন্ধ করার জন্য মিছিলটা এবার নেকমামুদের দিকে এগুতে থাকে।

অপারেশন সফল হওয়ায় পরেশ আত্মসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মানিককে বলে, 'একটা অসাধ্য সাধন হইল মানিক। ভোটের সময়েও গ্রামে আমরা জয় বাংলার পক্ষে এতবড় মিছিল করতে পারি নাই। তোর নানা কয়, ইউনিয়নের মানুষ বেশিরভাগ পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু নিজের চক্ষে দেখলু তো আজকে।'

'আপনাদের নেতা মশিয়ার উকিল আমাদের গ্রামে আসায় লোকজন আরো সাহস পেয়েছে বেশি।'

'মশিয়ার উকিলের চেয়ে ব্রিজ ভাঙা অপারেশনে তোরই নাম ফাটবে বেশি। দেখলি না, আমাদের নেতাও তোর কথাকে কীরকম গুরুত্ব দেয়।'

মানিক মিছিলের সামনে থেকে স্লোগান দিয়েছে বটে, কিন্তু ব্রিজ ভাঙার বুদ্ধিটা তার মাথা থেকে আসেনি। লাঠি দিয়ে ব্রিজের একটি খোয়া পর্যন্ত ভাঙেনি, উপরন্তু ব্রিজ ভাঙাটা ঠিক হলো কি না — এ নিয়ে তার মনে এখনো দ্বিধা আছে। লজ্জা পেয়ে মানিক মিছিলের লোকজনকে শুনিয়ে বলে, 'কী যে বলেন কাকা, সবই তো আপনারা করলেন। এরকম সাহস আর একতা ধরে রাখতে পারলে এই যুদ্ধে জয় আমাদের হবেই।'

AMARBOI.COM

যুদ্ধে জয় মানেই তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া মানে বাণ্টুর মতো চাকরবাকরদের কতটুকু লাভ হওয়া? প্রশ্নটা সরাসরি মানিক ভাইজানকে এখনো করা হয়নি। তবে দেশ নিয়ে বড়বাড়ির সব কাণ্ডকীর্তির মধ্যে এবং রেডিয়োর খবরেও প্রশ্নটার সদুত্তর পাওয়ার চেষ্টা করে বাণ্টু বক্কর। মনিব বা মনিবগিন্নির হুকুম শুনেও প্রশ্নটা অনেক সময় মনে জাগে।

এমেনে এ বাড়িতে আসার রাতেই ঠাট্টা করে বাণ্টুকে মুক্তিফৌজ বলেছিল, তারপর কুন্ডার ব্রিজ ভাঙতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াকু মিছিলে, রেডিয়ো শোনা ভিড়ে কিংবা বাড়ির বাইরে কাজকর্মে যতই সে জয় বাংলার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধার মতো পালোয়ানি দেখাক, বাড়ির অন্দরমহলে সে ফাইফরমাশ-খাটা চাকর ছাড়া তো আর কিছু নয়। এমেনের পরিবার এ বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর তার কাজও বেড়েছে। সবাই যখন জুত করে শুয়েবসে রেডিয়ো শোনে, তখন মানিকের সৎমা তাকে ডেকে কোনো না কাজের আদেশ করবেই। খুব রাগ-বিরক্তি জাগলেও না করতে পারে না। এখন এমেনের স্ত্রী ও মেয়েরাও ডাকে, দোকানে কি বাজারে যেতে বলে, এটা-সেটা কিনতে পাঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন বিউটি তাকে ডেকে এমেনের বড় মেয়ের হয়ে অসম্ভব কাজের ফরমাশ করে, 'এই বক্কর, সাইকেল নিয়া রংপুর টাউনে আপাদের বাড়িতে যেতে পারবি?'

মিলিটারি ঘিরে রাখায় যে বাড়ি থেকে কোনোমতে জানটা নিয়ে সবাই পালিয়ে আসল, বাণ্টু বক্করকে বলে সেই বাড়িতে যেতে! সাইকেল সে ভালো চালাতে পারে বটে, এমনকি এক হাত ছেড়ে দিয়েও পারে, তাই বলে কি সাইকেল নিয়ে রংপুর টাউনে গেছে কোনোদিন? এত আশ্চর্য যে বাণ্টু জবাব দিতে পারে না। বিউটির ঘরে সইয়ের মতো উপস্থিত এমেনের বড় মেয়ে আসমা। সে উৎসাহ দেয়, 'সবাই কয় তোর খুব সাহস। আচ্ছা, আমাদের বাড়ি না যাস আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে যেতে পারবি?'

'যত সাহসই থাকুক, টাউনে একলা যাওয়া কি আমার মতো মাইনষের কাম? তার চাইতে মানিক ভাইজানকে কন, তাঁয় এলায় ব্যবস্থা করবে।'

'ধেৎ, তোদের ভাইজান তো আমার সাথে কথাই বলে না।'

'ভাইজানকে যে সকাল থাকি বাড়িতে দেখি না! আবার নানাবাড়িতে গেছে নাকি রে?

'ও বুড়া জয় বাংলা না কইলে আর জীবনেও তার বাড়ি যাবার নয় ভাইজান।'

'তা হইলে সারাদিন বাইরে কী করে ভাইজান? আগের মতো ঘরেও পড়তে দেখি না।'

দিনের বেলা মানিকের ঘরে না থাকার কারণটি বাণ্টু একটু শরমলাগা হাসির সঙ্গে ফাঁস করে দেয়, 'ভাইজান মনে হয় শরম করে, সেই জন্যে বাড়িতে থাকে না।'

'কেন, কিসের শরম?

'নিজের বিয়ার পাত্রীকে যখন-তখন দেখলে শরম লাগবে না?'

বাণ্টু বিউটি ও আসমার দিকে তাকিয়ে কে বেশি সুন্দর বোঝার চেষ্টা করে। প্রথম দিন শাড়ি পরলেও এখন বিউটির মতো সালোয়ার-কামিজ পরে। বিয়ে না হতেই ননদ-ভাবির মতো গলায় গলায় মিল হয়েছে দুজনের। বাণ্টুর কথা শুনে আসমার দিকে তাকিয়ে নিজেও যেন শরম পায় বিউটি। কিন্তু টাউনে থাকে বলে বোধহয় এমেনের মেয়ের শরম-ভরম কম। বিউটির বিছানায় আধশোয়া হয়ে থাকায় বুকের ওড়না খুলে যাওয়ায় আসমার দিকে তাকাতে বাণ্টুও শরম পায়, কিন্তু মেয়েটি উঠে বসে জানতে চায়, 'কোথায় তোর ভাইজানের পাত্রী?'

বিউটি এবার বাণ্টুকে ধমক দেয়, 'এই, তুই কোথায় কার কাছে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনছিস রে? জানিস না, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল বলে ভাইজান নানার বাড়িতেও যায় না। দেখিস, এখন তোর মুখে এসব কথা শুনলে তোকেও পিটাবে।'

'কথাটা কি আমি তুলছি?'

বিউটি বাংটুকে ধমক দিয়ে তাড়ায়, 'ভাগ হারামজাদা!'

কথাটা বাংটু না তুললেও এর মধ্যে তা অনেকে জেনে গেছে। এমেনের স্ত্রীকে ঠাট্টাচ্ছলে কথাটা প্রথম বলেছিল হেকমতের দাদি। বড়বাড়িতে এমেনের পরিবারকে দেখার জন্য গাঁয়ের বউঝিরা রোজই ভিড় জমায়। আর এমেনের স্ত্রীর যেহেতু কোনো কাজ নেই, বাইরের কাছারিঘরে যেমন স্বামী, তেমনি আঙিনার কোণে গাছতলার ছায়ায় বসে গ্রামের বউঝিদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটায়। আর এমেনের সেয়ানা মেয়ে দুটাও বিউটির সঙ্গে পটের বিবি সেজে সারা বাড়ি, এমনকি বাড়ির বাইরেও ঘুরে বেড়ায়। মানুষের চোখে তো পড়বেই। আর এ গ্রামের বেটিছাওয়াগুলা এমন, দেশের গোলমাল নিয়ে কারো কোনো চিন্তা নেই। শেখ মুজিব রংপুরে এসে মশিয়ার উকিলের বাড়িতে কী বলেছিল, মুজিবকে উকিলের স্ত্রী কী কী রান্না করে খাইয়েছে — এইসব দামি গল্প শোনার চেয়ে এমেনের বউ-বিবিকে নিয়ে গল্প ফাঁদতেই বেআক্কেল বেটিছাওয়াদের বেশি আগ্রহ। হেকমতের দাদির প্রস্তাব শুনে নাকি এমেনের পরিবার চশমায় চোখের পানি মুছে বলেছে, 'আল্লা আমাদের কপালে যে কী লিখে রেখেছে, আল্লাই জানে।' হেকমতের দাদিও ঘটক হিসেবে কম নয়, জবাব দিয়েছে, 'আল্লাহ জোড়া বনে রাখছে দেখিয়াই মনে হয় বিপদের সময় এই বাড়ি পাঠায় দিছে।' হেকমতের দাদি মানিকের নয়া মাকেও রান্নাঘরে বলেছিল কথাটা। সৎমা জবাব দিয়েছে, 'বিয়া হউক আর না হউক, বিয়াবাড়ির রাঁধনবাড়ন মোর ডেইলি চলবে।' হেকমতের দাদি তো সম্পর্কে মানিক-বিউটিরও দাদি, তাদের সামনেও কি এমন রসের ফেদলা না পাড়িয়া চুপ আছে বুড়ি? আসমাকেও বলেছে নিশ্চয়। কথাটা গ্রামের অনেকেই জেনে গেছে বলে নজিবরের বউ আজ বাংটুকে কথার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। বাংটুর মাও বলেছিল বাংটুকে।

ভুঁইয়া বা এমেনের সামনে দাঁড়াবার সাহস অবশ্য গাঁয়ের কোনো মহিলার নাই। এমেনেকে এমন প্রস্তাব দিতে পারে একমাত্র পরেশ কাকা। এমন প্রস্তাবের সম্ভাবনা কতটা, তাও পরেশ কাকার কাছেই সঠিক জানা যাবে। গতকাল এমেনে আর বড় আব্বাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে চা-জলপান খাইয়েছে পরেশ। এমেনের পুরো পরিবারকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাওয়াত করে গেছে। বাবুর বাড়ির দাওয়াতে মানিকও যদি যায়, তার সঙ্গে বাংটুও যাবে। হিন্দুর বাড়ির রান্না খেতে ওদের যদি জাত না যায়, তাহলে বাংটুর যাবে কেন? পরেশ তো এ বাড়িতে একদিন গরুর গোশত দিয়েও ভাত খেয়েছে। নিজের চোখে দেখেছে বাংটু।

বড়বাড়ির অন্দরমহলে মেয়েমানুষের ফাইফরমাশ খাটা কিংবা কথা নাচানো কথায় আগ্রহ না থাকায় বাংটু অবসরে বাইরের খুলিতেই বসে থাকে। কাছারিঘরেও এমেনে ও তার সঙ্গীর আরাম করার জন্য দুটি বিছানা পাতা হয়েছে। এ ঘরে শুয়ে বসেই তারা সারাদিন চা-পান খায়, রেডিয়ো শোনে আর দেশের অবস্থা নিয়ে লোকজনের সঙ্গে গল্প করে। পার্টির লোকজন আসে মেলা। পরেশ কাকা আর ভুঁইয়াকে নিয়ে এদিক-সেদিক হেঁটেও বেড়ায়। এমেনে তাকে কোনো কাজের হুকুম করলে খুশি হয় বাংটু। লোকটাকে যেহেতু বড়আব্বা ও পরেশ কাকাও স্যার বলে, বাংটু তাকে কী সম্বোধন করবে, বুঝতে পারে না। এমেনে মেয়ের সঙ্গে মানিকের যদি সত্যি সত্যি বিয়েটা হয়, তবে মানিক ভাই শ্বশুরকে বাজান বা আব্বাজান ডাকবে। বাংটুও তখন বড়বার বেয়াইকে বড়বা বলেই ডাকবে।

বাংটু অন্দরমহল থেকে খানকা ঘরে এসে দেখে ঘর ফাঁকা। হয়তো পরেশ কাকাদের বাড়িতে কি অন্য কোথাও বেড়াতে গেছে মেহমানরা। আজ কাম পায়নি বলে বাংটুর ঢোঁড়া চাচা ভুঁইয়াবাড়িতে গাছতলায় এসে বসে আছে একা। বাংটুকে দেখে সে জিজ্ঞেস করে, 'ও বাহে বাংটু, একনা খবর শোনার জন্য ছুটি আসনু।'

'যুদ্ধের খবর জানতে সাঁঝত এডিও শুনতে আইসেন এলায়।'

'এডিওর খবর দিয়া হামরা কী করি বাহে! এ বাড়ির আসল খবর তোর মতো আর কাঁয় জানবে। এতি আয়, চুপে চুপে একটা কথা পুছ করোঁ।'

বাংটু এগিয়ে গেলে ঢোঁড়া চাপা স্বরে বলে, 'এমেনে বলে ভুঁইয়ার বেটাকে জামাই করার জন্যে বউবেটি নিয়া আসছে?'

'এসব কথা শুনলে বড়বা তোমার গোয়ায় বাঁশ দেবে চাজি।'

'সেটা তো ঠিকই। বড় মাইনষের বদনামি করা হামাকে মানায় না।'

এ সময় সামনের চষা ভুঁই থেকে ট্যারা জহির চেঁচিয়ে ডাকে, 'ওই বাংটুর বাচ্চা, তোকে বিচন ধান নিয়া ডাকাও নাই?'

জমিতে ধান ছিটানোর জন্য বীজ ধান নিতে বাংটু আবার বাড়িতে গিয়ে ঢোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো

ভুঁইয়াবাড়িতে সারাদিন এত লোকসমাগম আর হই চই যে, বাড়ির বাইরে গ্রামে ঘুরে মানিক নির্জনতা খোঁজে। আগে পিতার ব্যস্ততা কিংবা অনুপস্থিতিতে মানিকই ছিল দেশ নিয়ে কৌতূহলী ও রেডিয়ো-শোনা ভিড়ের মধ্যমণি। এখন তার জায়গা নিয়েছে বিশিষ্ট মেহমান মশিয়ার উকিল ও তার পরিবার। নেতাকে ঘিরে সজব ভুঁইয়ার ও পরেশ কাকার মতো স্থানীয় মোড়ল শ্রেণি তো আছেই, থানার দলীয় কর্মীরাও আসে রোজ। বাপের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলার অভ্যাসে, কাছারিঘরের রাজনৈতিক ভিড় এড়িয়ে চলতেই সচেষ্ট থাকে মানিক।

বাড়িতে থাকলে নিজের ঘরে বই পড়ে বা রেডিয়ো শুনেও অনেকটা সময় কাটে তার। কিন্তু নেতার পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার পর মানিকের ঘরের নিভৃতিও নষ্ট হয়েছে অনেকখানি। এমেনে সাহেবকে অবশ্য বাড়ির বড় ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বিউটির ঘরে থাকে তার দুই মেয়ে। আগে মানিকের পাশের ঘরটায় বিউটি ছোট ভাই-বোন দুটিকে নিয়ে থাকত, সকাল-সন্ধ্যা পড়ার সময় ছাড়া সেই ঘরটা মানিকের ঘরের মতো নিস্তব্ধ থাকত দিনমান। এখন এমেনে কন্যাদের উপস্থিতিতে কলরবমুখর। নিজের ঘরে চুপচাপ থাকলেও তাদের চলাফেরা চোখে পড়ে, কথাবার্তাও কানে আসে। অনেক সময় বিউটিসহ বা বিউটি ছাড়াও নানা ছুতোয় মানিকের ঘরে ঢুকেও ডিস্টার্ব করে তারা।

এমনিতেই এমেনের বড় মেয়ে আসমার সঙ্গে মানিকের জোড় ঘটাবার সম্ভাবনা গ্রামবাসীর চোখেমুখে ঠাট্টা-মস্করার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। তাদেরকে দোষ দিতেও পারে না মানিক। কারণ মিলিটারির ভয়ে বাড়ি পালানো রাতেই মানিকের মনেও তো প্রথম সম্ভাবনাটি উঁকি দিয়েছিল। ভেবেছিল সে, দেশের গোলমালে বিয়ের পাত্রী দেখা ঠেকিয়ে রেখেছে, আজ মিলিটারির ভয়ের ওপর ভর করে সেই মেয়ে কি নিজেই তার ঘরে এসে উপস্থিত হলো? অলস সময়ে নিজের হবু স্ত্রী বা প্রেমিকা কল্পনায় যেভাবে ধরা দেয়, আসমা মোটেও সেরকম মেয়ে নয়। দেখতে ওর ছোট বোনটাই বরং ভালো। স্বভাবের দিক থেকেও স্বার্থপর টাইপের আসমা। রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে, কিন্তু কথাবার্তায় দেশপ্রেম আছে বলে মনে হয় না। অবরুদ্ধ দেশে প্রতিদিনই শত্রুবাহিনীর হাতে মানুষ মরছে, এই অবস্থায় শুধু ইন্ডিয়া পালানো নয়, ইন্ডিয়া ভ্রমণের শখ পূরণটাও অসঙ্গত মনে হয়। দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা নেই, বাবা মন্ত্রী হতে পারল না,

ঢাকায় থাকা হলো না এবং আগামী বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হলো না — এইসব ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় তার কষ্ট বেশি।

সেদিন মানিকের ঘরে এসে বলেছিল, 'জানেন মানিক ভাই, রমনায় যেদিন এমএনএ-এমপিদের শপথ অনুষ্ঠান হয়, আব্বুর সঙ্গে আমরাও তখন ঢাকায় ছিলাম। আপনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে মনে মনে বলেছিলাম, আর এক বছর পর আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়াব। সেই স্বপ্ন বোধহয় আর পূরণ হবে না আমার।'

আসমার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় মানিকের একটুও সহানুভূতি জাগেনি, সান্ত্বনাও দেয়নি। যুদ্ধের সময়েও এমেনের মেয়েরা সেজেগুজে বিউটিকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, পরেশ কাকার বাড়ি হয়ে তিস্তার বাঁধ পর্যন্ত গিয়েছিল সেদিন। হয়তো আসমার এরকম বেশরম শহুরে চালচলন ও কথাবার্তা শুনে গাঁয়ের লোকজন কথা রটাতে শুরু করেছে। মানিক তাই আসমাকে এড়াতেও দিনমান বাড়ির বাইরে থাকারই চেষ্টা করে।

স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো ও কুন্ডার ব্রিজ ভাঙার পর এলাকায় মানিকের খ্যাতি ও প্রভাব বেড়েছে সন্দেহ নেই। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ নানা সমস্যায় মোড়ল-মাতবরদের কাছে যে কারণে ছুটে যায়, মানিকের কাছেও আজকাল অনেকেই আসে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-কাজিয়া, জমির ভেজাল, ছেলের চাকরি কী মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়েও আজকাল মানিকের সঙ্গে কথা বলতে আসে লোকজন। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের মানিক, নানা ও বাবার মতো সামাজিক নয় মোটেও। গ্রামসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিন মামার মতো ঢাকায় বড় চাকরি ও সুন্দরী বউ নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, পরিবারের জন্য দায়দায়িত্ব পালন করবে — মানুষ হওয়ার এরকম স্বপ্নই তো দেখে এসেছে ছোটবেলা থেকে। এখন সে ব্যক্তিগত এসব স্বপ্ন-সংগ্রাম বিসর্জন দিয়ে দেশ ও মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে চাইলেই কি নেতা হতে পারবে? দেশের জন্য কী করতে পারবে? এসব আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজতেও মানিকের একা হওয়া দরকার।

একা হওয়ার জন্য মানিক আজ প্রায় জনশূন্য জগন্নাথের বিলের পাড়ের নিরিবিলি শ্যাওড়া গাছতলার ছায়ায় বসে থাকে। বিল অবশ্য একেবারে নির্জন থাকে না, কেউ না কেউ মাছ ধরছে। বিলের পাড়ের জমিতেও চাষাবাদের আয়োজনে ব্যস্ত চাষিরা, গরু-ছাগলকে ঘাস খাওয়াতে বিলের পাড়ে আসে অনেকেই। তারপরও মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ এড়িয়ে একা হওয়ার মতো নিভৃত স্থান প্রকৃতি অকৃপণভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে রেখেছে এখানে। এরকম এক নিভৃত স্থানে বসে নিজের একাকিত্ব উপভোগ করতে মানিক মনে মনে প্রিয় নারীমুখ খোঁজে কেন? এমন নির্জন পরিবেশে ভালোবাসার মেয়েকে মন খুলে কথা বলতে পারলে ভালো লাগত অবশ্যই। সেরকম কেউ নেই বলেই কি আসমা, তার ছোট বোন অনিতা, বিউটি, ঢাকার সামিয়া মামি, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেবা, গ্রামের মালতী কাকি, নরেশের বউ প্রমুখ চেনা নারীমুখ স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে?

প্রকাশ্য দিবালোকেও নির্জনে হবু স্ত্রীর সঙ্গপিপাসা রক্তে উন্মাদনা জাগালে মানিক নিজের ওপরও বিরক্ত হয়। নারী প্রেম নয়, কাম নয়, মানিক আরো বড় কিছু ভাবতে চায়, মহৎ কিছু উপলব্ধি করতে চায়। হেরা পর্বতের গুহায় প্রিয় নবীজির ধ্যান করার কথা ভেবে নিজেও চোখ বুজে আল্লাহকে স্মরণ করে। বাড়িতে আসার পর নামাজ পড়া হয় না নিয়মিত, কিন্তু তা বলে সর্বশক্তিমানের রহমত কামনা একটুও দুর্বল হয়নি তার, সেটা প্রমাণ করার জন্যও যেন শতভাগ আত্মসমর্পণ করতে চায় সে।

'হায় আল্লা। হামরা সারা দুনিয়ায় তোমাকে উটকায় বেড়াই, আর তোমরা জগন্নাথের ভূতের গাছের তলাত বসিয়া কী করেন বাহে?'

পেছনে পরিচিত গলার বিস্ময়-বিস্ফোরণে মানিকও চমকে ওঠে। বাড়ির বড় চাকর ট্যারা জহির। মানিককে খুঁজতে বাংটু গিয়েছিল বাবুর বাড়ি। হিন্দুটাড়ি তলতলা করে বাঁধের রাস্তার দিকে গেছে। আর সলেমনের কাছে মানিকের বিলের ধারে আসার খবর পেয়ে জহির গোটা বিল তন্নতন্ন করে মানিককে এখানে খুঁজে পেয়েছে। কারণ কী? এমেনে সাহেব খুব জরুরি কারণে খুঁজছে মানিককে। মানিক না যাওয়া পর্যন্ত তারা খাওয়া-দাওয়াও করবে না। মানিকের আর ধ্যান করা হয় না। জহিরের সঙ্গে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে থাকে।

বাইরের খানকা ঘরে নয়, মশিয়ার উকিল তার পারিষদ নিয়ে এখন ভেতরের ঘরে। মেহমানদের দুপুরের খাওয়ার আয়োজন চলছে। ঘরে বাবা ও পরেশ কাকা ছাড়াও যথারীতি এমেনের স্ত্রী এবং সহকর্মী রশিদ। মানিককে দেখে সবাই তাকায় তার দিকে। এমেনে সাহেব বলেন, 'আসো বাবা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।' মানিকের সন্দেহ হয়, সরাসরি মেয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে নাকি? সেরকম হলে নানাকে যেমন করেছে, তার চেয়ে ডবল অপমান করবে লোকটাকে।

একটা টুল টেনে নিয়ে মানিক তাদের পাশে বসে।

'আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মানিক। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন এ নিয়ে আলোচনা না হওয়াই ভালো, কিন্তু তোমাকে জানানো দরকার।'

মানিক যখন এমেনে-কন্যার সঙ্গে সম্ভাব্য মিলনের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের চেতনায় শক্ত, মশিয়ার উকিল চাপা গলায় বলে বিচ্ছেদের কথা। ভুঁইয়া ও পরেশের সঙ্গে আলাপ করে ইন্ডিয়া পালানোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছে সে। দলের দুই কর্মী বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। আর এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ, পাকবাহিনী ক্রমেই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কন্ট্রোল পোক্ত করছে। অন্যদিকে আমাদের বাঙালি আর্মি-ইপিআর-পুলিশ যারা ফাইট দিতে শুরু করেছিল, তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় দলের নেতারা যদি পালিয়ে বেড়ায় এবং নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে দেশ স্বাধীন হবে? পাক-আর্মির সঙ্গে ফাইট দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ার সব রকম সাপোর্ট তাদের দরকার। মুজিব পাকবাহিনীর হাতে অ্যারেস্ট হওয়ার আগে তাদের সব রকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ায় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার যাতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে, এখন এই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করাটাই সবচেয়ে জরুরি। আর দেশের এই জরুরি কাজ ফেলে মানিকদের গ্রামে অলস বসে থেকে কতদিন খাতিরযত্ন ভোগ করবে?

মানিকের মনে হয়, মশিয়ার উকিল বুঝি তাকে নিয়েও ইন্ডিয়া যেতে চায়, এটাই বোধহয় তার জরুরি কথা। কিন্তু বাবার নেতার সঙ্গে তার যাওয়া উচিত কি না — বুঝতে পারে না মানিক। জানতে চায়, 'আপনি কি আমাদের সবাইকে নিয়েই ইন্ডিয়া যাওয়ার কথা ভাবছেন আংকেল?'

আসলে সপরিবার ইন্ডিয়া পালানোর নিয়ত করেই তো শহর ছেড়েছে মশিয়ার আকন্দ। তিস্তা পার হবার আগেই পরিচিত ভুঁইয়াবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল দুই-একদিন থেকে বর্ডার পার হওয়ার রাস্তাঘাট চিনে ইন্ডিয়া যাত্রা শুরু করবে বলে। কিন্তু মানিকরা ও গাঁয়ের লোকজন তাদের এতটা আপন করে নেবে, নেতার পরিবারকে নিরাপদে রাখার জন্য পাক আর্মির সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে ব্রিজ ভেঙে দেবে, রাতে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে — এতটা আশা করেনি সে। মানিকের বাবা ও পরেশসহ সবাই বলছে, এমেনে সাহেব চলে গেলেও তার পরিবার এ গ্রামে নিরাপদে থাকবে। আর এ বাড়িতে থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বুঝে নিজ বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে এমেনের স্ত্রী। অন্যদিকে ইন্ডিয়া গেলে তো শরণার্থীর অনিশ্চিত জীবন। এমেনে সাহেব পরিবার সামলাবে, নাকি দেশের জন্য ছোটাছুটি করবে? এ অবস্থায় এমেনে সাহেব মানিকের মতামত চায়, 'তুমি কি বলো বাবা, আমি চলে গেলেও আমার পরিবার এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে নিরাপদে থাকবে না?'

মানিক কিছু বলার আগে তার বাবা আবারও জোর নিশ্চয়তা দেয়, 'আমার পরিবার যদি নিরাপদে থাকে, আপনার পরিবারও থাকবে স্যার ইনশাআল্লাহ। এ নিয়ে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না তো। ভাবি সাহেবাও এ কয়দিনে আমাদের বাড়ির সবাইকে, এমনকি গ্রামের বউ-বাচ্চাদেরও আপন করে নিয়েছে।'

'হ্যাঁ ভাই, যেরকম খাতির-যত্ন করছেন আপনারা! আপন মানুষরাও এমন করে না। কিন্তু উকিল সাহেব ইন্ডিয়া চলে গেলে কী যে আছে আমাদের কপালে জানি না।'

এমেনে মানিকের কাছে শেষ ভরসা খোঁজে।

'আমার সবচেয়ে বড় ভরসা মানিক তুমি। তুমি বাড়িতে থাকলে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারব। এই ইউনিয়নে আমাদের প্রধান পলিটিক্যাল শত্রু তোমার নানা, তুমি বাড়িতে থাকলে সে আমাদের কোনো অনিষ্টচিন্তা করতে পারবে না। আর আর্মিরা যদি গ্রামের দিকেও আসার চেষ্টা করে, গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে তুমি ভালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। মুক্তিযুদ্ধ যদি লিংগার করে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

রশিদ আশ্বাস দেয়, 'মশিয়ার ভাই যদি আসতে নাও পারে, আমি অবশ্যই ফিরে আসব ভাবি। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না।'

উকিলের স্ত্রী আবার মানিকের কাছে জানতে চায়, 'বাবা তুমি তো কিছু বললে না!'

'আমি কী বলব? দেশে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যতটা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, অবশ্যই করব আমি।'

এরপর শুরু হয় এমেনে সাহেবের বিদায়ী খাওয়ার আয়োজন। মুরগির সঙ্গে পোলাও রান্না হয়েছে। সন্ধ্যার পর মানিকের বাবা ও পরেশ কাকাই তাদের নেতাকে তিস্তা নদীর ঘাটে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে নদী পারের দুই দলীয় কর্মী পথঘাট চিনিয়ে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে তাদের। গ্রামবাসীর কাছে খবরটা আগাম জানাতে নিষেধ করেছে এমেনে স্বয়ং। এমনকি তার ছোট ছেলে সুমনকেও আগাম বলা যাবে না। কিন্তু বাড়িতে যারা জেনেছে, তাদের সকলের মন খারাপ। তাদের বিষণ্ণ চলাফেরায় বড়বাড়ির পরিবেশেও শোকের ছায়া নেমেছে যেন।

রওনা দেওয়ার আগে বাড়ির ভেতরে এমেনের ঘরে ডাক পড়ে আবার। স্ত্রী-সন্তানদের কাছে একান্তে কথাবার্তা বলে বিদায় চাইছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা। আসমা ও অনিতা ফোঁৎ ফোঁৎ করে কাঁদছে। মানিক ঘরে যেতেই আসমা চোখে ওড়নাচাপা দিয়ে বলে, 'আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যাবে আব্বু। মরলে আমরা একসঙ্গে মরব। তোমাকে ছেড়ে এ বাড়িতে আমরা বেশি দিন থাকতে পারব না।'

মশিয়ার উকিল মেয়ের কান্নাকে আমল না দিলেও ভেতরে ভেতরে সংক্রমিত হয়েছে ঠিকই। মানিকের ঘাড়ে হাত রেখে স্নেহাদ্র কণ্ঠে বলে, 'বাবা, এদের ভার আমি তোমার ওপরই দিয়ে গেলাম। তুমি দেখো। আমরা চলি, জয় বাংলা।'

মানিকও আবেগময় সাহসী জবাব দেয়, 'জয় বাংলা আংকেল। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।'

এমেনে সাহেব তার সঙ্গীকে নিয়ে বিদায় নেওয়ার দিন থেকেই সন্ধ্যায় মানিক বাড়িতে রেডিয়ো-শোনা ভিড়ের মধ্যমণি হয়ে ওঠে আবার। প্রথম কয়েকটা দিন এমেনের ইন্ডিয়া পালানোর বিষয়টি গোপন করতে, তার অনুপস্থিতির মিথ্যে ব্যাখ্যা লোকজনকে দিলেও লোকজন আসল খবর ঠিকই জেনে যায়। কারণ মশিয়ার উকিল ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর, রেডিয়োতে ইন্ডিয়াই যেন ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ঘাঁটি হয়ে ওঠে। আকাশবাণী কলকাতায় প্রতিদিনই মৃত্যুভয়ে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ছেড়ে পালানো হাজার হাজার দেশত্যাগী মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ। আওয়ামী লীগের কিছু নেতাদের সাক্ষাৎকার শুনে পরিবারের মাঝে অনুপস্থিত মশিয়ার উকিলেরও ইন্ডিয়ায় অবস্থানের অনুমানটি দৃঢ় হয় সবার মনে। সবাইকে সন্দেহমুক্ত করতে সজব ভুঁইয়াই একদিন রেডিয়ো শুনতে আসা গ্রামবাসীদের ঘোষণা দেয়, 'বউবাচ্চা রাখিয়া আমাদের নেতারা তো এমনি এমনি ইন্ডিয়া বেড়াইতে যায় নাই বাহে। মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য-সহযোগিতা আদায় করার জন্য গেছে। দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে আমাদের উকিল স্যারও আছে। দেশে যে এতবড় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হইছে, কে পরিচালনা করবে এসব? পাকবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র আর ট্রেনিং লাগবে না? ইন্ডিয়ার সাহায্য ছাড়া শুধু লাঠিসোটা নিয়া পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি পারব আমরা?'

সজব ভুঁইয়ার এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন তার রেডিয়োতে ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়ে গেলে, তাজউদ্দীন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্বে অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের খবর ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা শুনে আশ্বস্ত হয় সবাই। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম ও ঘোষণা শুনে ভরসা বাড়ে মানুষের। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনার জন্য স্বাধীনতাকামী মানুষের মাঝেও সৃষ্টি হয় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ।

দিনের বেলা বৈশাখী খররোদে মাঠে মাঠে আউশ ধান ও পাটক্ষেতে কামলা-কিষানদের কাজ, ঘরে-বাইরে দৈনন্দিন গেরস্তালি কামের স্বাভাবিক ব্যস্ততা, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সবাই ছুটে আসে ভুঁইয়াবাড়িতে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুক্তিযুদ্ধের খবর শুনতে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা গাছতলায় বসে লোকজন এমনিতে প্রাকৃতিক বাতাসে গা জুড়াতে চায়, হুঁকো-বিড়ি টানার সঙ্গে অবসর বিনোদনের জন্য গল্পগুজব করে নিজেরা। এখন গ্রামবাসীর সব বিনোদন ও গল্পগুজবের উৎস হয়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। শেখের মামু ছাড়াও আরো অনেকেরই স্বাধীন বাংলার খবর না শুনলে নাকি রাতের ঘুমটাও ঠিকমতো হয় না। রতনপুরে স্বাধীনতাকামী মানুষের আন্দোলন যেন স্বাধীন বাংলার প্রচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলায় প্রথম শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ শুনে নজিবর চেঁচিয়ে ওঠে, 'কোন শালা কয় শেখ মুজিবর নাই? অ্যারেস্ট হইছে তো ভাষণ দেয় কেমন করিয়া?'

ভাষণ যে রেকর্ড করেও বাজানো যায়, এই সামান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে গাঁয়ের সরল মানুষের চেতনায় শেখ মুজিবের বজ্রকণ্ঠ মুক্তিযুদ্ধে নেতার সশরীরে বেঁচে থাকাটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। মানিক তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না। শোনো একটি মজিবরের কণ্ঠস্বরের ঝড়ের ধ্বনি/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি কিংবা জয় বাঙলার জয়/ হবে হবে নিশ্চয় — গানের সঙ্গে অনেককেই গলা মেলাতে দেখে মানিকও গুনগুন করে গানগুলো প্রায় সময় গায়।

ষোলো

ভুঁইয়াবাড়িতে থেকে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগটি অগ্রাহ্য করে মশিয়ার উকিল ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর তার দশ বছরের ছেলে সুমন রতনপুরে বাপের চেয়েও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। উকিলের বেটা বা এমেনের বেটা হিসেবে সবাই চেনে তাকে। সারাদিনই মানিকের ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই রফিকের সঙ্গে গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। শহরে দখলদার বাহিনীর অস্তিত্ব বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এসব ভুলে গিয়ে দিনমান গাঁয়ের চ্যাংড়াদের সাথে খেলাধুলা ও নানারকম অভিযান নিয়েই ব্যস্ত ওরা। এক দুপুরে সে মানিককেও তার অভিযানের সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার প্রস্তাব করে, 'ভাইজান, জগন্নাথের বিলে পিশাচ আপনার পা টেনে ধরেছিল?'

'পিশাচ না সুমন, বড় গজার মাছ।'

'আমিও ওই বিলে মাছ ধরব। জাল নিয়ে চলেন মাছ মারতে যাই।'

'আবার যখন মাছের বাইচ নামবে, তোমাকে নিয়ে যাব।'

'তাহলে আজকে আমাকে হাটে নিয়ে চলেন। আমি তো হাট দেখি নাই।'

'আজ তো আমি হাটে যাব না, পরে একদিন নিয়ে যাব।'

'তার আগে রশিদ চাচা এসে তো আমাদের ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে। তখন আর আপনাদের হাটও দেখা হবে না।'

'ইন্ডিয়া গেলেও কত কিছু দেখতে পাবে।'

রফিক একাই বন্ধুকে আজ হাট দেখানোর সক্ষমতা জানিয়ে এখন জগন্নাথের বিলের মাছ ধরা দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব করে। তারপর দুজনই ছুটতে থাকে বিলের দিকে।

এমেনে পরিবারের মধ্যে এই দুরন্ত ছোট ছেলেটিকেই বেশি ভালো লাগে মানিকের। গাঁয়ের প্রকৃতির সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করার অপার কৌতূহল ছেলেটির। কৌতূহল ভেদ করে আনন্দ লোটার ইচ্ছেটাও অদম্য। মানিকও তার বাল্যকালে তীব্র কৌতূহলী ছিল, কিন্তু সবকিছুতেই আনন্দ লোটার সাহস বা দুরন্তপনা ছিল না। এখন যৌবনে এসে দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করে যখন যে-কোনো আত্মত্যাগের জন্য দুঃসাহসী হয়ে উঠতে চাইছে, অথচ এমেনে কন্যাদের সঙ্গে মিশে একটুখানি আনন্দ-ফুর্তি করার মতো সামান্য সাহসও দেখাতে পারে না কেন? স্বভাবসুলভ সংকোচ তো আছেই। তাছাড়া এমেনে তার পরিবারকে আগলে রাখার ভার মানিকের ওপর অর্পণ করায়, রক্ষক হয়েও ভক্ষক না হওয়ার নৈতিকতাও তুচ্ছ ভাবতে পারে না সে। আসমা বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়া যেতে না পারায় মানিকের সামনেই চোখের জল ফেলেছে। বিউটির সঙ্গে তার ঘোরাফেরাও কমেছে যেন। মানিকদের বাড়িতে তার ভালো না লাগার ভার হয়তো প্রতিদিনই ভারী হয়ে উঠছে, এই অবস্থায় মানিকই-বা তকে ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগানোর চেষ্টা করতে যাবে কেন? তাও ভালোলাগার মতো খুব আকর্ষণীয় মেয়ে হলে না হয় লোকলজ্জা ও সংকোচ জয়ের চেষ্টা করত সে। এমেনে যদি তার পরিবারকে অচিরে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে, মানিক সিদ্ধান্ত নেয়, অবশ্যই তাদের সঙ্গে যাবে না সে।

বাড়ির খুলিতে মানিককে একা বসে থাকতে দেখে মানিকের সৎমা এসেই সাহস জোগায়, 'একলা বসে আছো বাবা, আসমাকে নিয়ে একটু পরেশের বাড়ি থেকে বেড়ায় আসো তো। পরেশের বউ সেদিন নিজে এসে তোমাদের ডেকে গেছে।'

নয়া মার প্রস্তাবটার মধ্যেও যেন কীরকম চাপা ষড়যন্ত্র। বিরক্ত মানিক বলে, 'বিউটির সঙ্গে পাঠায় দেন।' বিউটি ছোটটিকে নিয়ে রাজা মাস্টারের বাড়ি গেছে শুনে মানিক ঝামেলা এড়াতে একাই উঠে দাঁড়ায়।

'ঠিক আছে আমি আগে শুনে আসি কী ব্যাপার।'

পরেশ কাকা বাড়িতে নেই। মানিকের বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে হয়তো। মালতী কাকি ছোট জায়ের মাথা আছড়ে দিচ্ছিল। মানিককে দেখে অভিযোগ করে, 'একা আসলে যে! আসমা কই? সেদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে বলে আসলাম, আসমার মা বলল যে তোমার সঙ্গে মেয়েদের পাঠায় দেবে।'

'এমেনের মেয়েরা তো বিউটির সঙ্গে দিনরাত ফিসফাস করে আর কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়।'

নরেশের বউ হেসে অভিযোগ করে, 'তুমি নাকি এমেনের মেয়ের সঙ্গে তেমন কথাবার্তাই বলো না।'

'কী কথা বলব, রাজনীতি করা বাপের মেয়ে, কিন্তু দেশ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না কাকি। কবে ইন্ডিয়ায় গিয়ে মুক্ত পাখির মতো ঘুরে বেড়াবে সেই ধান্ধায় আছে শুধু।'

'ওরা ইন্ডিয়া গেলে তুমি যাবে না ওদের সঙ্গে?'

মানিকের মনে হয়, কাকি না হয়ে এদের সঙ্গে দেবর-ভাবির সম্পর্ক হলেই বোধহয় প্রশ্নের সঙ্গে চাপা কৌতূহল চোখে-মুখে আরো রসের বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারত।

'আমি ওদের সঙ্গে যাব কেন!'

মালতী কাকি সরাসরি জানায়, 'আমার কিন্তু আসমাকে পছন্দই হয়েছে মানিক। তোমার নানাকে দেখাতে পারলে ভালো হতো। তোমার কাকা বলে, যত ভালো পাত্রী হোক আসমা, তোমার নানা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের কারণেই মত দেবে না।'

'আর আমার মতের কোনো দাম নেই না? আপনাকে বলেছি না কাকি, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিয়েশাদি নিয়ে কোনো কথা বলবেন না। ধেৎ, আপনাদের সঙ্গে বিয়ের প্যাঁচাল পাড়ার চেয়ে দাদির সঙ্গে গল্প করাই ভালো। ও দিদি, কই আপনি?'

'মা বোধহয় দিঘিতে গেছে, তুমি বসো বাবা। আমি চা করে আনি।'

নরেশের বউ খোঁপা বেঁধে রান্নাঘরের দিকে গেলে মালতী কাকি আবার অন্তরঙ্গ গলায় জানতে চায়, 'তোমার আসলে এমেনের মেয়েকে পছন্দ হয়নি মানিক, তাই না?'

'কাকি আবার! আমি উঠলাম।'

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ে। পরেশ কাকা বাড়িতে আসে। অসময়ে পরেশের বাড়িতে উপস্থিতি যে আসন্ন এক ঝড়ের সংকেত, সেটা কেউ বোঝার আগে সাইকেল থেকে নেমে পরেশই খবর জানায়।

'মানিক তুই আমাদের বাড়িতে! ওদিকে তোদের বাড়িতে আজ যে কী আগুন লাগে!'

'কী হয়েছে কাকা?'

'এবার পাকবাহিনী নয়, পাকবাহিনীর বাপ। তোর চেয়ারম্যান নানা কেনবা তোদের বাড়িতে আসিয়া হাজির হইল।'

মানিকসহ বাড়ির লোকের চমক ভাঙাতে গিয়ে পরেশ নিজের পুরনো চমকটাই প্রবল করে তোলে। বাজারে নিজেদের দোকানে মানিকের বাপকে নিয়ে বসে কথা বলছিল তারা। এমন সময় একজন খবর দেয়, চেয়ারম্যান নাকি গরুর গাড়িতে চড়ে রতনপুরে জামাইয়ের বাড়ি রওনা হয়েছে। প্রথমে মিলিটারি আসার মতো ভুয়া খবর ভেবেছিল তারা। পরে মোর্তজা মাস্টার বাজারে এসে খবরটার সত্যতা প্রকাশ করে। সে নিজের চোখে দেখেছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেও এসেছে, চেয়ারম্যান নাকি বলেছে, যাই নাতিটার সঙ্গে একটু লড়াই করি আসি।

এ খবর শোনার পর ভুঁইয়া আর পরেশ বাজারে চুপচাপ বসে থাকে কী করে? চেয়ারম্যান বাড়িতে আসার আগে সাইকেল দাবড়ে বাড়িতে এসেছে এবং সবার আগে পতাকাটাও নামিয়ে ফেলেছে। এখন মানিক গেলেই বোঝা যাবে — চেয়ারম্যানের বাড়িতে আসার উদ্দেশ্যটা কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিককে চা খাওয়ার সময় না দিয়েই পরেশ তাকে নিয়ে আবার রণাঙ্গনের দিকে পা বাড়ায়। বাবার দেওয়া পরামর্শটি নিজের সমর্থনের সঙ্গে বারবার প্রকাশ করে, 'শোন, মোটেও মাথা গরম করা যাবে না। ব্রিজ ভাঙি দেওয়ার পর হইতে বুড়া এমনিতে আমাদের ওপর মহা খাপ্পা। ঠ্যাংভাঙা হইতে টাউনে যাওয়ার বাসখান বন্ধ হইছে, গাড়িঘোড়া চলাচল করতে না পারায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ি যাইতেছে, এ জন্য নাকি আমরাই দায়ী।'

মানিক বাড়িতে ঢোকার আগেই কাছারিঘরের সামনে ছইঘেরা গরুগাড়ি ও গাছতলায় বাঁধা লাল বলদ দুটিকে চিনতে পারে। নানার পড়শী নকু মামার গাড়ি। নানাজি পাঁচ/সাত বছর আগেও মোটরসাইকেলে চলাফেরা করেছে, একবার অ্যাকসিডেন্ট করে পায়ে ব্যথা পাওয়ার পর মোটরসাইকেল দাবড়ানো ছেড়ে দিয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে অন্যের মোটরসাইকেলের পেছনে বসে চলাফেরা করে। অথবা নকু মামার গরুগাড়িতে।

কাছারিঘরের বারান্দায় বাবার পাশে বসা নকু মামাকে দেখে সালাম দেয় মানিক।

'তোমরা তো যান না ভাগিনা, চেয়ারম্যান তাই নিজেই চলি আসিল। নিজের বেটা-বেটিকে বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু নাতি-নাতনিকে ছাড়া ও বুড়া বাঁচপে না।'

মানিকের বাবা ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে বলে, 'কত বছর পর তোর নানাজি এ বাড়িতে আসল। পোলাও-কোরমা রাঁধতে কও মানিক, দিঘি হইতে জহিরকে একটা বড় মাছ তুলতে বল। উত্তম সমাদর না করিয়া তোর নানাজিকে কিছুতেই ছাড়িস না।'

বাড়িতে ঢুকেও টের পায় মানিক, তার নিজের ঘরে নানাজির অস্তিত্ব গোটা বাড়িকেই যেন উৎসবমুখর করে তুলেছে। মানিকের ঘরে একা নানাজি নয়, সতাল দুই ভাই-বোন নিয়ে বিউটি এবং আসমারা তিন ভাই-বোনই উপস্থিত। দরজার কাছে দাঁড়ানো আছে বাণ্টুও।

মানিক যথারীতি নানাকে কদমবুসি করে। শৈশবে মায়ের জীবিতকালে নানাকে এ বাড়িতে দেখার স্মৃতি স্মরণ করে খানিকটা আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে সে।

'আপনি আমাদের বাড়িতে, নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না নানাজি!'

'পাকিস্তান ভাঙলে যেমন তোরা খুশি হবি, তেমনি এ বুড়া মরলেই তোরা বাঁচিস। কিন্তু নাতিবউ না দেখিয়া যেন আমার মরণ না হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহর কাছে সব সময় এই দোয়া করি আমি। সবাই কয় আল্লাহ নাকি আমার প্রার্থনা কবুল করছে। সত্য না মিথ্যা তাই স্বচক্ষে দেখার জন্য ছুটি আসলাম।'

ঘরের ছোটরাও পর্যন্ত আসমার মুখে লজ্জার রং দেখে, আর মানিককেও দেখে চকিতে। বিউটি শাসন করে, 'ও নানাজি, বলছি না, এরকম ঠাট্টা করবেন না। আপার খারাপ লাগে।'

'আমার কী দোষ বল তো। ইউনিয়নের মানুষ সবাই বলাবলি করতেছে — মশিয়ার উকিল তার মেয়েকে ভুঁইয়ার বেটার হাতে তুলি দিয়া নিজে যুদ্ধ করার জন্য ইন্ডিয়া পালায় গেছে। আর মানিক পাকবাহিনীর হাত থেকে এমেনের পরিবারকে রক্ষার জন্য কুন্ডার ব্রিজ ভাঙি দিয়া দিনরাত এখন বাড়ি পাহারা দেয়। তা কাকে পাহারা দেয় নিজের চক্ষে দেখতে আসলাম।'

'আপনি কী জন্য এসেছেন নানাজি বলেন তো?'

'সত্যি কথাটা কইলাম তাও বিশ্বাস হইল না!'

প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়ার জন্য মানিক এবার মামার বাসার কথা ওঠায়।

'ঢাকার খবর কিছু পেয়েছেন? মামারা কেমন আছে?'

'তুই কোনো খবর নিস না বলে আমি কি বসে আছি? ঢাকায় লোক পাঠায় দিছিলাম। আমিনের বাসা আর তার শ্বশুরবাড়ির সবাই এখন নিশ্চিন্ত আর নিরাপদে আছে। আমিন নিয়মিত অফিস করছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ ছাড়া ঢাকার পরিস্থিতি একদম নর্মাল।'

'আপনার চোখে তো নর্মাল হবেই।'

'আমার চোখে কেন? তোর মামা তোর বাপের দল আর নেতাকে সমর্থন করে না? সে পর্যন্ত চিঠিতে লিখেছে, ঢাকার পরিস্থিতি ক্রমে স্বাভাবিক হচ্ছে। মানিক যদি বিয়েশাদি করতে রাজি না হয়, তাহলে তোকে যেন শিগগির ঢাকায় পাঠিয়ে দিই। গ্রামে থাকার চেয়ে মামার বাসাতেই ভালো থাকবে। এখন বল নতুন বউ নিয়া আমার বাড়িতে থাকবি, নাকি ঢাকায় মামার বাসায় চলে যাবি?'

মানিক নিজের করণীয় বা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নানাজির সঙ্গে তর্ক করতে চায় না আর। চুপ করে থাকে। বুড়ো এবার আসমাকে লক্ষ্য করে বলে, 'ও চেংড়ি, বিউটির সাথে তোরাও চল আমার বাড়িতে। গরুর গাড়ি নিয়া আসছি। তার আগে এখানে দাঁড়াও তো দেখি, আমাদের দামড়াটার সাথে কীরকম জোড়া বনে নিজের চোখে দেখি আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংটু সমর্থন করে বলে, 'ফাসকেলাস জোড়া বনবে নানাজি। জয় বাংলা কয়া তোমরাও দোয়া করি দাও।'

বিউটি এবার চোখে-মুখে চাপা খুশি নিয়েও বাংটুকে ধমকায়, 'ওই হারামজাদা, তুই ফের দালালি করতেছিস কেন?'

'ওকে দালাল কইস ক্যান রে? ওই বাংটু হইছে এখন মানিকের এক নম্বর সাগরেদ। সেদিন হাটখোলায় পতাকা উড়ায় দিয়া হামার বাড়িতেও পতাকা উড়াইতে চাইছে।'

'জয় বাংলার পতাকা না উড়াইলে জয় বাংলার চেংড়ি তোমার বাড়িতে যাবার নয় নানাজি, মনে রাখেন কথাটা।'

ঠিক এসময় আঙিনায় সজব ভুঁইয়া বাংটুকে হুংকার দিয়ে নির্দেশ দেয়, 'বাংটু তুই এখানে দাঁড়ায় কী করিস রে? হারামজাদা তোকে জাল নিয়া দিঘি হইতে বড় মাছ তুলতে কই নাই? মোরগটা ধরে দিছিস? যা পরেশের বাড়ি হইতে মুঠা জালখান নিয়া আয়।'

ভুঁইয়ার চাকর ধমকানো হুকুমের মধ্যেও যে অতিথির জন্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ পায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না কারো। বাংটু ছুটে যাওয়ার পর ঘরে কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক নীরবতা নামে। হয়তো আঙিনায় ভুঁইয়ার উপস্থিতির রেশ ঘরেও ঢুকে পড়ার কারণে। আসমা ভুঁইয়ার হুংকারের প্রভাবেই হয়তো নিজেও অভিমানী গলায় অভিযোগ করে, 'আপনার কী রকম কাণ্ডজ্ঞান নানাজি! আমরা বিপদে পড়ে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। আর আপনি নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য ছুটে এসেছেন, আমার আব্বু থাকলে এরকম বলতে পারতেন?'

'আরে চেংড়ি, বিউটির সাথে তুইও এতক্ষণ হাসিঠাট্টা করলি, সেই জন্য আমিও ঠাট্টা করলাম। তা তোর বাপ হাতে তুলি দিলেই তো হবে না, আল্লাহর হুকুম লাগবে। ঠিক আছে, তোর বাপ দেশ স্বাধীন না করা পর্যন্ত যেন তোর বিয়া না হয়, সেই দোয়া করি তা হাইলে?'

'হ্যাঁ, সেই দোয়াই করেন।'

'তা হইলে বোধহয় তোর বিয়া আর কপালে নাই। কারণ তোদের জয়বাংলা স্বাধীন হবে না, তোর আর বিয়াও করা হবে না। অবশ্য তোর বাপ তো ইন্ডিয়া গেছে, চেষ্টাচরিত্র করবে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তত ইন্ডিয়ার করদরাজ্য বানাইতে।'

'পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকার চেয়ে ইন্ডিয়ার প্রদেশ হওয়াও ভালো নানা। আর কিছু না হোক, স্বাধীনভাবে গোটা ইন্ডিয়া তো ঘুরে দেখতে পারব।'

আসমা এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, মানিক আশা করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুই সেদিনের মেয়ে, ইতিহাস তো কিছুই জানিস না। ব্রিটিশ শাসনে ইন্ডিয়ায় মুসলামনদের বঞ্চিত করে হিন্দুরা বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারও তো তোরা দেখিস নাই। মুসলমানদের দুরবস্থা ঘোচাতেই কায়েদে আজম তাদের জন্য আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে অটল ছিল। তোদের শেখ মুজিবের গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও তো মুসলমানদের জন্য গ্রেটার বাংলা, আসাম, বিহার মিলে আলাদা পাকিস্তান করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পরে এই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেও কি কম করেছে? ভুলে যাস না, এদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিছিল। শেখ মুজিবও পাকিস্তানে রাজনীতি করার জন্য কলকাতা থেকে ঢাকায় ছুটে আসে নাই? এখন তোরা বাঙালির রাজত্ব কায়েমের জন্য জয় হিন্দের মতো জয় বাংলা স্লোগান তুলছিস। কিন্তু তোদের শরীরে যে মুসলমানের রক্ত, আল্লা-রসুল কোরানকে কি তোরা অস্বীকার করতে পারবি? কলকাতার হিন্দু বাঙালির মতো ভারতের কংগ্রেসের অধীন হলেই স্বাধীন হইবি মনে করিয়া ইন্ডিয়া পালাইতে চাস তোরা। কিন্তু মুসলমানরা জীবিত থাকতে পাকিস্তান ভাঙা এত সহজ নয় রে চেংড়ি।'

এমেনে কন্যাদের উদ্দেশে বললেও কথাগুলো হয়তো মানিক ও তার বাবাকে শোনাবার জন্যই কাজী চেয়ারম্যান গলা চড়িয়ে বলে। মানিক নানার এসব রাজনৈতিক যুক্তির সঙ্গে পরিচিত। পাল্টা যুক্তি দিয়ে নানার সঙ্গে তর্ক করতে পারে, কিন্তু তাতে নানার পাকিস্তানপ্রীতিতে চির ধরবে বলে মনে হয় না।

ঘরের পরিবেশ আগে যেমন হাসিঠাট্টায় ভরপুর ছিল, তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য মানিকের ছোট ভাই রফিক বলে, 'এসব ফ্যাদলা বাদ দেন তো। ও নানা মিলিটারি আসলে আপনি যে অস্ত্র দিয়া গুলি করবেন, সেই অস্ত্রখান আবার বাইর করেন তো।'

'কিসের অস্ত্রের কথা বলিস তুই!'

'পিছনপাক দিয়া যে বারায়, সেদিনের মতো অজু নষ্ট করা বোমাপাদ ছাড়েন একটা।'

বোমা পাদের আওয়াজ শোনার কল্পনাতেও ছোটরা হাসে, এমনকি অনিতা ও আসমার মুখেও হাসিচাপা উজ্জ্বলতা। বিউটি ছোট ভাইয়ের মাথায় চাটি মারে। মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে মানিক তার শক্ত অবস্থান চেপে রাখতে পারে না আর। গম্ভীর গলায় কথা বলে।

'আমি আর আগের মতো নাই নানাজি। আপনার যুক্তি বিশ্বাসের সঙ্গেও একমত নই। ধর্মের যুক্তি দিয়া পাকিস্তান রক্ষার জন্য আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির এই জাগরণ ঠেকাতে পারবেন না। আমি তো বলেছি, আপনি স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে না আসলে আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমার।'

'তুই সেদিন স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ায় দিছিলি, আমি অর্ডার দেওয়ার আগে মানুষ কিন্তু সেই পতাকা নামায় ফেলেছে। দুই-একটা পতাকা উড়ায় দিয়া, ভাঙা ব্রিজখান আরো ভাঙি দিছিস বলেই পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে গেছিস ভাবছিস? আর্মিদের ক্যাম্পে তোর খবর গেলে ঐ ভাঙা ব্রিজ রিপেয়ার করে আর্মিদের এই এলাকায় আসতেও সময় লাগবে না কইলাম। মশিয়ার উকিলের মতো ফেমিলি আর বাপ-মাকে নিয়া ইন্ডিয়া পালাইতেও সময় পাবি না তখন।'

'ইন্ডিয়া পালাব না নানাজি, দেশের ভেতরে থেকেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ফাইট করব। ঐক্যবদ্ধ বাঙালি পাকবাহিনীকে রুখে দেবে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে অবশ্যই।'

'বাঙালিকে মুক্তির কথা বলে আন্দোলনে নামায় দিয়া তোদের আসল নেতাই পাকবাহিনীর কাছে সারেন্ডার করেছে। অন্যরা ইন্ডিয়া ভাগছে। বাড়াবাড়ি করলে সারেন্ডার তোকেও করতে হবে মানিক, তখন কিন্তু নানাজি তোকে রক্ষা করতে যাবে না।'

ছেলে ও শ্বশুরের বাগ্‌যুদ্ধ দেখার জন্য সজব ভুঁইয়া আবার উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিল। আঙিনায় দাঁড়িয়েই সে শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে ছেলেকে শাসনের সুরে কথা বলে, 'মানিক, মুরব্বিদের সঙ্গে তর্ক করছিস কেন? আব্বাজান এ বাড়িতে আসার আগেই আমিও তোর ওই পতাকা নামায় ফেলেছি। এখন সাইকেলখান নিয়া হরেন ঘোষের বাড়িতে যা তো, দেখ দই-খিস্যা কিছু পাইস নাকি।'

মানিক নানাকে যেমন সমর্থন করতে পারে না, তেমনি পিতার তোয়াজ করাটাও অসহ্য লাগে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে সাইকেলখানা নিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

বাইরে কাছারিঘরের বারান্দায় বসা পরেশ জানতে চায়, 'ও মানিক, কী কইল তোর নানা?'

মানিক কোনো জবাব দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো

কেউ জানে না, চেয়ারম্যান নানার বড় শত্রু জামাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসার পেছনে বাংটুর অবদানও ফেলনা নয়। কারণ বিউটির গোপন দূত হিসেবে গেল হাটের দিন চেয়ারম্যানের বাড়িতে গিয়েছিল সে। বাড়ির সব খবর জানিয়েছে, এমেনের মেয়েকে পাত্রী হিসেবে দেখার জন্য চেয়ারম্যান নানাকে এ বাড়িতে আনতে বিউটির জরুরি আমন্ত্রণ মুখে বারবার জানিয়েছে। উপরন্তু চেয়ারম্যানের আসাটা নিশ্চিত করতে নিজের বুদ্ধিতে এমনও বলেছে বাংটু, 'বিউটি বুবুর তো আপনার বাড়িতে আসা নিষেধ। আপনি গেইলে বিউটি বুকেও আসতে দেবে তার সৎমাও। আর যদি না যান নানাজি, তা হইলে কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে মাওরিয়া চেংড়িটা যদি বিষ খায়া মরে, মোকে দোষ দিবার নন।'

বাংটুর ডাকে তিনদিনের মাথায় চেয়ারম্যান এ বাড়িতে সত্যই এলো, কিন্তু বাংটুকে ওই সময়টা সারাক্ষণ বাড়ির বাইরেই কামেকাজে ব্যস্ত রাখল সবাই। কারো বাড়ির হুকুমের দাস হলে এমনই হয়। অথচ মুক্তিফৌজ না হয়েও মানিকের সঙ্গে পতাকা ওড়ানো, ব্রিজ ভাঙা কিংবা রেডিয়োতে স্বাধীন বাংলা শোনার ভিড়ে থেকে বাংটু কি জয় বাংলার জন্য কারো চেয়ে কম দরদ দেখায়? কিন্তু জয় বাংলা দলের নেতা হয়েও ভুঁইয়া ও তার বউয়ের কাছে সে হুকুমের চাকর ছাড়া কিছু নয়। একমাত্র মানিক ভাইজান তাকে একটু মায়াদয়া দেখায়। দশ বছরের রফিক চেঁচিয়ে বাংটুর নাম ধরে ডাকে, কাজের হুকুম দেয়। অথচ মানিক ভাই তাকে আদরের গলায় এখনো আসল নাম বক্কর বলেই ডাকে। এসব কারণে চেয়ারম্যান নানাজি এ বাড়ি ছেড়ে একা চলে যাওয়ার রাতে তাকে ঠাট্টার সুরে পুছ করেছিল বাংটু, 'ও ভাইজান, নানাজি কি পাত্রী পছন্দ করি গেইছে?'

'ফের যদি এসব কথা বলিস, এক চড়ে তোর দাঁত খুলে দেব হারামজাদা।'

বাপের মতো রাগ দেখে মুহূর্তেই চুপসে গেছে বাংটু। চেয়ারম্যানের বাড়িতে বাংটুর গোপন দূতিয়ালির খবর হয়তো চেয়ারম্যানই জানিয়ে গেছে তাকে। মানিক তাই ঠাণ্ডা গলায় আদেশ দিয়েছিল, 'বিউটি যাইতে কইলেও ওই বুড়ার বাড়িতে আর কোনোদিন যাবি না। নানাজির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই আমাদের। ঠিক আছে?'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিয়েছে বাংটু। স্বাধীনতার পতাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছারিঘর থেকে নামিয়ে ফেলায় বাপের সঙ্গে কী ঝগড়া হয়েছে মানিকের, বাংটু জানে না। তবে এ ঘটনার পর থেকে মানিক বাড়িতে থাকে কম। বাড়িতে যখন থাকে, নিজের ঘর ছেড়ে বেরোয় না সাধারণত। আসমার সঙ্গে ঘরে দিনে কিংবা রাতে গোপন কথাবার্তা এবং আরো কিছু হয় কি না, বাংটু নিজ কানে শোনেনি, স্বচক্ষে দেখেওনি কিছু।

মনিববাড়ির সঙ্গে যখন বাংটুর এরকম নাজুক সম্পর্ক, মা হাটের দিন দুপুরে এসে ছেলের কাছেই মানিকের খোঁজ চায়। আজ হাটে তেল নুন কেনার জন্য মানিকের কাছেই আবার চার আনা পয়সা চাইবে সে। এছাড়া তার উপায় কী? মানিক ছাড়া এ বাড়ির কারো কাছে চেয়ে অবশ্য লাভ হবে না। মানিকভাই না চাইতেই পরনের শাড়ি কেনার জন্য দশ টাকা দিয়েছিল। অন্যদিকে বাংটুর মাকে বাড়ির কাজ না দেওয়ার জন্য চুরনি অপবাদ দিয়ে তাড়িয়েছে তার সৎমা। রাতে বাংটুর নিজের খাওয়াটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়াটাও পছন্দ হয় না। বাংটুর মা ও ভাই-বোনদের পেটে একটু-আধটু ভালো খাদ্য ঢুকুক, ছোট বংশের বউটার তাও সহ্য হয় না। বাবা দেশান্তরী হওয়ার পর মা কোনোমতে চারটা পেটের ভাত যে জোগাড় করে, সেটাই তো বেশি। তেল-নুন কেনার পয়সা সে পাবে কোথায়?

'মাদু মাছ পায় নাই? হারামজাদাটা সারাদিন জগন্নাথে মাছ ধরলে তো মাছ বেচায় সদাই কেনা যায়।'

'সারাদিন মাছ মারলে খেলা খেলাইবে কাঁয়?'

তারপরও ছোট মাদুই আছিমনের সংসারের বড় ভরসা। কিন্তু মাদু গত দুদিন বিলে যে কয়টা মাছ ধরেছে, তাকে তেল ছাড়াই নুন-মরিচ দিয়ে রেঁধে দিয়েছিল। আজ ভর্তা খাওয়ার মতো এক চিমটি নুনও নাই ঘরে। একাব্বরের মা করজ চাইলেও দেয়নি।

'ঠিক আছে মা, ত্যালের শিশি নিয়া মাদুকে হাটত যাইতে কইস। দেখিম কী ব্যবস্থা করা যায়।'

সপ্তাহের দুই হাটবারে দুপুরের পর বাড়িতে কাজ থাকে না তেমন। হাটে যাওয়া এবং সওদাপাতি বোঝাই ব্যাগ-ডালা বাড়িতে বয়ে আনাই হাটবারে চাকরদের বড় কাজ। এমেনের পরিবার আশ্রয় নেওয়ার পর এ কাজটার গুরুত্ব বেড়েছে। প্রতি হাটেই মেলা মাছ-মাংস ও তরিতরকারি কেনে ভুঁইয়া। আর চাকরদের সামনে আড়ালে গজর গজর করে তার স্ত্রী, 'এমেনের বউ গরুর গোশত খাবার নয়। গ্যাস্ট্রিক বলে পেটের ভিতর চিমটায়। ওনার জন্য খাসির গোশত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনতে কইস। ভুঁইয়ার ফকির হইতে আর দেরি নাই রে!'

বড়বাড়ির ধান কি পাট সাধারণত পাইকার এসে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরও প্রায়ই হাটে জহিরের দ্বারা এটা-সেটা বেচতে দেয় রফিকের মা। জহিরও কি মনিবগিন্নির গোপন ব্যবসা থেকে দু'চার পয়সা মারে না? অবশ্যই মারে। বাংটুকে একদিন দোকানে বসিয়ে জিলিপি খাইয়ে দিয়েছে। আজ মানিক ভাইকে যদি না পায়, তবে না হয় জহিরের কাছেই দু'চার আনা করজ নিয়ে মাকে তেল-নুন কিনে দেবে বাংটু।

হাটে গিয়ে সাধারণত নরেশের দোকানে মনিবকে পায় ভুঁইয়াবাড়ির হাটুরেরা। ভুঁইয়া নিজেই চাকরদের মাছ-মাংসসহ মোটা খরচাপাতি করে দেয়। আবার জহিরকেও নগদ পয়সা দিয়ে পান-সুপারির মতো টুকিটাকি জিনিস কেনায়। কিন্তু আজ নরেশের দোকানে ভুঁইয়া নেই। পাটহাটিতেও নেই। পাটের মৌসুমে পরেশের সঙ্গে পাট কিনে গুদাম ভরিয়ে ফেলে ভুঁইয়া। নারায়ণগঞ্জ কি মাহিগঞ্জে পাট চালান করে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাদের পাটের ব্যবসাও বন্ধ। কোথায় গেছে বা কখন আসবে, নরেশও তা জানে না। ওদিকে ভাই ডেকেছে বলে মাদু দড়িতে বাঁধা ছোট তেলের শিশি নিয়ে সকাল সকাল হাটে উপস্থিত। মাথা চুলকে ভাইকে বাড়তি আবদার জানায় সে, 'দুই পইসার বাদাম কিনিয়া দিস ভাই, টেপি চাইছে।'

বাংটু ধমক দেয়, 'হাটোত কি মুই ব্যবসা ফাঁদাইছোঁ হারামজাদা! বাবুর দোকানের কাছে খাড়া হয়া থাক। বড়বা কি মানিক ভাইজান আসুক আগে।'

নরেশের বাসায় জহিরের জিম্মায় ব্যাগ-ডালি রেখে বাংটু যখন মনিবকে খোঁজার নামে হাটের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে, মাছহাটির কাছে আম্বার ও কাসেম জরুরি কথা আছে বলে বাংটুকে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসের কাছে ডেকে নিয়ে যায়। জরুরি কথা মানিক ভাই কিংবা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হবে অনুমান করে বাংটু। কারণ আম্বার ও কাসেম দুজনেই মানিক ভাইয়ের ভক্ত। জয় বাংলা নিয়ে মিটিং করার জন্য গ্রামের যেসব চ্যাংড়াদের বাংটু ডেকে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে এ দুজনও ছিল। পতাকা ওড়ানো ও ব্রিজ ভাঙা যুদ্ধে এরাও ছিল। হাই স্কুল পর্যন্ত কিছু লেখাপড়া করলেও, আম্বার তো আসলে ছোট গেরস্ত গুলুর বেটা, আর কাসেমের বাপ বারাতি কফিল। বাঁকে করে পানের দোকান নিয়ে হাটে আসে। বাংটুর সাথে খাতির থাকলেও চার আনা পয়সা ধার দেওয়ার মতো অবস্থা নয় তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে বিড়ি ধরালে বিড়ির ভাগটা বাণ্টুকেও দেয় তারা।

'মানিক ভাই হাটে আইসে না কেন রে? এমেনের বেটির সাথে দিনেরাইতে বাড়িতে কী করে?'

এমএনএ-কন্যাকে নিয়ে ঠাট্টা করায় বাণ্টুকে সেদিন প্রায় চড় কষেই মেরেছিল মানিক, হাটের মধ্যেও কথা ছড়াচ্ছে শুনলে নির্ঘাৎ লাথি মারবে। বাণ্টু রেগেই জবাব দেয়, 'ফাকসা আলাপ করার জন্য ডাকাইলেন! যাঁও মুই।'

তখন আম্বার বিড়ি ধরিয়ে আসল কথাটা জানায় তাকে। মানিক বা তার বাপের ভরসায় থাকলে তারা কি কস্মিনকালেও মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবে? মুক্তিযোদ্ধা হতে চাইলে ইন্ডিয়া যেতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে। তবেই না তারা হাতে অস্ত্র পাবে, মাসে মাসে কিছু ভাতাও পাবে। আবার দেশ স্বাধীন করতে পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের দাম তো হবে অবশ্যই। কিন্তু মানিকের সঙ্গে গ্রামে থেকে এমেনে পরিবার বা তার চেয়ারম্যান নানাকে পাহারা দিয়ে তাদের লাভ কী? দেশ স্বাধীন হোক আর নাই হোক, ভুঁইয়ারা এমেনের বেটিকে পাবে, কিন্তু আম্বার-কাসেমরা গ্রামে বেকার থেকে কী পাবে? অতএব এমেনের মেয়ের মায়া কাটিয়ে মানিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া যাবে কি না এবং গেলেও কবে যাবে, বাণ্টু যেন আসল খবরটা জোগাড় করে তাদের জানায়। কারণ অনেকেই যাচ্ছে ইন্ডিয়ায়।

আম্বার-কাসেমের কথায় সম্মতি জানিয়ে বাণ্টু যখন আবার নরেশের দোকানে ফিরে যায়, তখন জহির ভুঁইয়াবাড়ির অর্ধেক কেনাকাটা শেষ করে ফেলেছে। দোকানের মধ্যে খরচখালার ব্যাগ ও ডালি রেখে জহিরকে নিয়ে মনিব মাছহাটি গেছে বড় মাছ কিনতে। বাণ্টুকে না দেখে তার ভাই মাদুকেই খরচের ডালি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছে জহির। মাদু অধৈর্য কণ্ঠে জানায়, 'ও ভাই, সদায়পাতি কিনিয়া তোমার দুই ডালি ভরল, মোকে তেল-নুন কিনিয়া দিবু কোনবেলা?'

বাণ্টু ডালা বোঝাই সওদাপাতি দেখে বুঝতে পারে কোন কোন দোকানের কেনাকাটা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। কাগজের কয়েক রকম পোঁটলা এবং প্যাকেট মানেই গফুর দোকানদারের দোকানের চিনি, চা, গরম মসলা। কসের তেলির দোকান থেকে বোতল বোঝাই খাঁটি ছাঁচি তেলও কেনা হয়েছে। আবার কলাপাতায় মোড়ানো পোঁটলাগুলি মানে লবণ ও মাহাম গুড়াতির দোকানের গুড়। এখন মাছ-মাংস কিনে দিলেই বাড়ি রওনা দেবে তারা। নিজ হাতে টাকা নাড়াচাড়া না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেও বাংটু জানে, ডালা বোঝাই সওদাপাতি মানেই নগদ তিরিশ-চল্লিশ টাকা। আর নিজ বাড়িতে নুন-তেল কিনে দেওয়ার জন্য দুটি পয়সা জোগাড় করার সামর্থ্য হলো না তার এত বড় হাটটায়। এই অক্ষমতার চনমনে জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাংটুর মাথায় বুদ্ধি আসে। নরেশের দোকানে সবাই যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত। বাংটু মাদুর কাছে লবণের একটা পোঁটলা হাতে দিয়ে তেলের শিশিটা চেয়ে নেয়। শিশিতে বড় বোতলের ছাঁচি তেল খানিকটা ঢেলে যখন মাদুর হাতে দেয়, ঠিক তখন জহির ও ভুঁইয়া ফিরে আসে। ভুঁইয়ার চোখে পড়লেও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। কিন্তু মাদু ভয়ে দৌড়াতে শুরু কলে ডালা হাতে জহিরই তাকে চোর হিসেবে ধরিয়ে দেয়।

'মাদু কিসের পোঁটলা নিয়া দৌড় মারল রে?'

বাংটু অপরাধী কণ্ঠে জবাব দেয়, 'মাদুর শিশিতে কয় ফোঁটা ছাঁচি তেল দিনু। মাথায় দেবে।'

ভুঁইয়া বাংটুর গালে পাটধোয়া চড় বসিয়ে দেয়, 'হারামজাদা তোর চোদ্দগুষ্টি চোর। বাড়িতে চুরি করিস, এলা ভাইকে নিয়া হাটেও আসছিস চুরি করতে?'

বাংটু এক চড় খেয়েই গাল চেপে বসে পড়েছে। অন্যদিকে নরেশের দোকানে ঢুকেই মোর্তজা মাস্টর ভুঁইয়াকে খবর দেয়, 'ও ভুঁইয়া ভাই, মিলিটারি বলে আইজ বড়দরগা পর্যন্ত আসছিল। কুন্ডার ভাঙা পুল মেরামত করতেও আসপে শুনলাম।'

পিলে চমকানো মিলিটারির টাটকা কথাবার্তার মাঝে বাংটুর চুরির ঘটনাটি চাপা পড়ে। জহিরের নির্দেশে ডালা মাথায় নিয়ে তার পিছে পিছে হাঁটে বাংটু। রাস্তার মেলা হাটফেরতা মানুষের কান বাঁচিয়ে সহকর্মীকে অনুরোধ জানায়, 'তোর পাঁও ধরো জহির ভাই, বাড়িত যায়া কিছু কয়া দিস না।'

মনিবের কিলচড় হজম করতে পারবে বাংটু, কিন্তু মানিক ভাই, বিউটি ও এমেনের পরিবার তাকে চোর ভাবলে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সামান্য একটু তেল-নুন চুরির ঘটনা ও ভুঁইয়ার চড়ের আঘাতে বাংটু এতটাই মুষড়ে পড়ে যে, বড়বাড়িতে কামকাজের দায়িত্ব পালন ছাড়া কারো সঙ্গেই সে তেমন কথা বলে না। রাতে শোয়ার জন্য নিজের বাড়িতেও যায় না আর। সন্ধ্যাবেলা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুরু হলে খুলির টঙে মড়ার মতো চুপচাপ শুয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন শেখের মামু তাকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দেয়, 'বাংটু হামার স্বাধীন বাংলা না শুনিয়া ঘুমায়! ব্যাপার কী বাহে?'

রেডিয়ো শোনা ভিড় ভেঙে সবাই বাড়ি ফিরতে শুরু করলে বাংটুও আজ শেখের মামুর সঙ্গে ঘরে ফিরতে থাকে। রাস্তায় খড়মের চটাস চটাস আওয়াজের সাথে নজিবর মুখেও ফটর ফটর করে, 'বাংটু বাহে চরমপত্র কয় কি সোন্দর! শুনলু না, হামার মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুরা একখান এলগাড়ি বোঝাই হানাদার বাহিনীকে কেমন করি আসমানে উড়ায় দিছে।'

যুদ্ধের খবর পর্যালোচনায় বাংটু আজ উৎসাহ বোধ করে না। বরং বিরক্তি প্রকাশ করে।

'মুক্তিবাহিনীতে ধনী-গরিব ছাত্র-চাষা সবাই নাম লেখাইতেছে। আর তোমরা যাদু শেখের মামু হয়াও খালি মুখেই ফটর ফটর করেন। তার চাইতে চলেন মুক্তিবাহিনীতে গিয়া নাম লেখাই।'

'তোর মতো চ্যাংড়া বয়স হইলে কোনদিনই চলি গেনু হয় রে। হালগেরস্তি মায়া-ছাওয়া ছাড়িয়া কি হামার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব?'

'তা তো ঠিকই। বড়বাড়ির চাকরিতে না ঢুকলে মুইও গেনু হয় যাদু বাহে।'

চাকরি ত্যাগ করেও যে যাওয়া সম্ভব এবং যাওয়াটাই উচিত, এমন কথা খোদ শেখের মামুও যখন বলে না, তখন কে আর বলবে। বাংটু তাই কাউকেই কিছু বলে না। নজিবর তার বাড়িতে ঢোকার পর, ঘরে পৌঁছতে বাংটুকে আরো খানিকটা পথ একা হাঁটতে হয়। তখন ভয় খেদানো অভ্যাসে স্বাধীন বাংলা বেতারে শোনা গানের কলি বেসুরো কণ্ঠে গায় বাংটু। কিন্তু আজ চুপচাপ হাঁটে। মনে মনে ভাবে, আজ যদি ঘরে গিয়ে দেখত, বাবা ফিরে এসেছে! বাবার কথা মনে হলে রাতে ঘরে ফিরে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটি প্রায় দিন মনে জাগে, আর প্রতিদিনই হতাশ হয় বাংটু। এ জীবনে বাবার সঙ্গে বাংটুর আর দেখা হবে কি না একমাত্র আল্লাই জানে।

অন্ধকার ঘরে পা রাখতেই মা গজর গজর করতে থাকে।

'চাইরদিন পর আইজও খালি হাতে ঘরে আসলু বাবা! বড়বাড়িতে ধানচাউলের শুমার নাই। টাকাপইসার অভাব নাই। কুত্তা-বিলাইগুলাও খায়া কেমন মোটাতাজা। আর তুই খালি এক পোঁটলা নুন সরায় ভুঁইয়ার হাতে পাটাধোয়া চড় খালু!'

ছেলের গালের চড়টা কি চারদিন পরও মায়ের গালে পড়ে? মায়ের গলা কান্নারুদ্ধ হয়ে আসে। বাংটুর ছোট ভাই মাদুও জেগে ছিল। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'অল্পের জন্য মুই বাঁচি গেইছোঁ। সারা জীবন না খায়া থাকলেও আর ভুঁইয়াবাড়ি যাবার নো মুই।'

বড়বাড়িতে চাকরি করে নিজের পেটটা ভরানো ছাড়া মা-ভাইবোনের জন্য বাণ্টুর যে কিছু করার ক্ষমতা নেই, আর চাকরিতে থাকলে যে চাকর ছাড়া তার কোনো পরিচয়ও নেই, এই সরল সত্যটা মাকে আজ বোঝাতে চায় সে। কিন্তু কীভাবে আসল কথাটা বলবে, ভেবে পায় না। বিদায় চাওয়ার আগেই মা বোধহয় কাঁদতে শুরু করেছে।

'ও মা, কাঁদিস ক্যানে? মুই যদি মুক্তিফৌজ হনু হয়, সবাই তোকে মুক্তিফৌজের মাও কইত, দেশ স্বাধীন হইত, হামারও দুষ্কুকষ্ট দূর হইত।'

'এডিয়োর গান বাদ দিয়া ঘুমাও।'

'এডিয়োর খবর শুনিয়া মোর মনে হয় মা, বাবাও বোধহয় দিনাজপুর বর্ডার পার হয়া মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাইছে। দেশ স্বাধীন হইলে দেখিস হামার কোনো অভাব থাকপে না।'

'হয়, দ্যাশ স্বাধীন হইলে তোর বাপ টাকার হাঁড়ি নিয়া বাড়িতে আসপে। এমনি পেটে ভোক, তার ওপর অকামের ফেদলা পাড়ি মেজাজ মোর খারাপ করিস না তো।'

বাণ্টু আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। মায়ের মুখখানা তার দেখতে ইচ্ছে করে ভীষণ। মা ও ছোট বোন টেপির মুখখানা একবার দেখে যাবে বলেই তো বাড়িতে আসা। কিন্তু ঘরের কুপি অনেকদিন থেকেই কেরাসিনশূন্য, বাণ্টুর কাছে মেচও নেই। মাদু জেগে আছে বলে তাকেই আদেশ করো বাণ্টু, 'ও মাদু, আয় তো মোর সাথে। দেখং তোমার জন্য কয় সের চাউলের ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

'হয়, চুরি করিবার যাও দোনো ভাই। নুন চুরি করিয়া দেওয়ানির থাপড় খাচিস, চাউল চুরি করিয়া ধরা খাইলে ভুঁইয়া তোকে জেলত দেবে।'

'চুরি করিম ক্যানে মা, বাপের বেটার মতো লড়াই করি মরিম।'

এভাবে গন্তব্যটা বলে হঠাৎ এত কান্না পায় বাণ্টুর! মাদু বিছানা থেকে উঠলে তাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

'কোন্‌ঠে যাইস ভাই?'

মাদুর ঘন ঘন এই প্রশ্নের জবাবে বাণ্টু তাকে পিছু হাঁটতে বলে। নিজে পা চালায় দ্রুত। চাঁদনি রাত। লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। হিন্দুটাড়ি ছেড়ে ভাটিয়াপাড়ার ভেতর দিয়ে বাঁধরাস্তায় উঠতেই চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে, রাস্তার ওপর কয়েকটি ছেলে বসে বসে বিড়ি টানছে। বাণ্টুকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'তোর এত দেরি ক্যানে রে বাণ্টু? সাথে ফের এটা কাঁয়?'

বাণ্টু জবাব দেয়, 'মোর ছোট ভাই মাদু। গ্রামের কাঁয়ও তো টের পায় নাই। খালি মাদুকে আসল কথাটা কয়া যাইম। না হইলে মায়ের ওপর ভুঁইয়া খুব জুলুম করবে।'

ভাইয়ের পিছে ছুটতে ছুটতে 'কোন্‌ঠে যাইস ভাই' প্রশ্নটা অন্তত দশবার করেছিল মাদু। এখন সেই প্রশ্নটাই চেঁচিয়ে আবার করে। জবাব দেয় কাসেম, 'ওই মাদু, চিকরিস না। হামরা যাওয়ার পর কাইল ভুঁইয়াবাড়ি গিয়া সবাইকে কইস, মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য হামরা ইন্ডিয়া গেছি।'

'তুই যে মোক চাউলের ব্যবস্থা করার কথা কয়া ডাকায় আনলু।'

'ইন্ডিয়া থাকি আমরা চাউল আনমো রে মাদু। আর রাইতে যদি খবরটা কাউকে কইস, তা হইলে মুক্তিফৌজ হয়া তোকেই কিন্তু আগে গুলি করিম। এই চলো, হামরা রওনা দিই।'

ভাইয়ের চেয়েও বড় মুখচেনা ছেলেগুলির এরকম ঠাট্টা-মস্করা শুনে মাদু কেঁদে ফেলে। ভাইকে জানায়, 'তুই ইন্ডিয়া গেইলে মাও কাঁদবে না? ভুঁইয়াবাড়ির চাকরির টাকা শোধ হয় নাই এলাও। হামাকে ধরিয়া ডাঙাইবে না?'

ছেলেগুলো হাঁটতে শুরু করেছে। বাণ্টু ছোট ভাইয়ের মাথায় হাত দেয়, জামার পকেট থেকে একটা টাকা বের করে মাদুর হাতে দিয়ে বলে, 'ইয়াকে দিয়া মাকে কাইল এক সের চাউল কিনি দিস। জগন্নাথে বেশি করি মাছটাছ মারিয়া মাকে দেখিস। মুই দেশ স্বাধীন করি ফিরি আসলে হামার আর কোনো অভাব থাকপে না।'

ভাইকে সান্ত্বনা দিতে বাণ্টুর কণ্ঠেও আর কথা সরে না। মাদুকে জোর করে বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিয়ে, হাতের পিঠে চোখ মুছে যুদ্ধযাত্রায় সহযাত্রীদের ধরার জন্য জোর পায়ে হাঁটে বাণ্টু বক্কর।

ভূতগ্রস্ত বালকের মতো মাদু যখন ঘরে একা ফেরে, আছিমনের চোখ লেগে গিয়েছিল। টের পায়নি। মাদুও মাকে ডাকেনি। কিন্তু এত বড় একটা খবর চেপে রাখতে গিয়ে তার শরীরে বিষম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। বুকে, পেটে নাকি মাথায় অসহ্য ব্যথা হয়, বুঝতে পারে না। মাকে চেঁচিয়ে ডাকে, 'ও মা, উহুহুরে, মোর পেট বিষায়! বুকখান কেনবা জ্বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদুর পেটব্যথার আর্তনাদ ঘরের অন্ধকারে তোলপাড় শুরু করলে আছিমন বিছানায় ধড়ফড় করে জেগে ওঠে। বাণ্টুর খবরই জানতে চায় আগে। মায়ের তীব্র জেরার মুখে একটু একটু করে সবটা বলার পর এবং ভাইয়ের দেওয়া টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিলে মাদুর পেটব্যথা কমে। কিন্তু বজ্রাহত মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় আছিমন।

ঘরে কবরের মতো স্তব্ধ অন্ধকার সহ্য হয় না বলে মাদুই মায়ের সঙ্গে কথা বলে আবার।

'ও মা, ভাই দেশ স্বাধীন হইলে ফিরি আসপে। কোনদিন দেশ স্বাধীন হইবে মা?'

আছিমন জবাব দেয় না। বাউদিয়া স্বামীর কথা মনে পড়ে। মসজিদে শিন্নি মেনেছে। কিন্তু এখনো ফিরে এলো না মানুষটা। লোকে বলে, মিলিটারির গুলি খেয়ে কোথাও মরে পড়ে আছে নিশ্চয়। সৈয়দপুরে, রংপুরে, দিনাজপুরে নাকি শয়ে শয়ে মানুষ মেরেছে মিলিটারি। মাটি পায়নি কেউ। মানুষের লাশ খাচ্ছে কুকুর-শেয়ালে। আবার বাণ্টু বলে গেল, বাপও গেছে মুক্তিযুদ্ধে। বাপকে খুঁজতেই কি বাপের পথে ছেলেও অন্ধকারে মাকে দেখা দিয়ে পালিয়ে গেল?

'ও মা, ভাই যে মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করবে, বন্দুক পাইবে কোন্ঠে?'

আছিমন জবাব দেয় না। জয় বাংলার খাস লোক সজব ভুঁইয়া, মানিক, পরেশ কি শেখের মামু কেউ মুক্তিফৌজ হতে ইন্ডিয়া যায়নি! অথচ ভুঁইয়াবাড়ির কামকাজ ফেলে রেখে বাণ্টু গেল পালিয়ে! চাকরির বছর পোরেনি, টাকাও শোধ হয়নি এখনো। শোধ নেওয়ার জন্য ভূঁইয়াই যদি বাণ্টুকে গুলি করার আদেশ দেয়? অবশ্য ইন্ডিয়ায় এমেনে গেছে, একা বাণ্টুকে দেখে কি সে চিনতে পারবে?'

'ও মা, নিঁদ গেলু? ভাই মুক্তিফৌজ হইতে ইন্ডিয়া ভাগছে জানলে কি মিলিটারি হামার বাড়িতেও আসপে?

আছিমন জবাব দেয় না। ঘরের নিকষ আঁধারে যমদূতের মতো মিলিটারির ছায়া দেখে। দিনে ঘরের বাহির হলেও মিলিটারির ভয়। দেশজুড়ে পাকবাহিনী, মানুষের মুখে মুখে পাকবাহিনী, রেডিয়ো খুললে পাকবাহিনী। পথে চলতে আছিমনের অনেক সময় ভয় হয়, এই বুঝি ছুটে আসছে মিলিটারি, এই বুঝি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়বে মিলিটারি। সবার হাতে বন্দুক, বাঙালির জবান বোঝে না, বাঙালি দেখলেই মুক্তিযোদ্ধা ভেবে গুলি করে। কে জানে এ দেশের মানুষ মারার জন্যই আল্লা তাদের পয়দা করেছিল কি না। পড়শী ঢোঁড়াও ভয় দেখায়, 'পুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙি দিছে তো কী হইছে, মিলিটারির ট্যাঙ্ক আসমান দিয়া উড়ি আসিবার পারে।'

'ও মা নিঁদ গেলু? কথা কইস না ক্যা? ভাই যে কইল, দেশ স্বাধীন হইলে হামার অভাব থাকপে না। ভুঁইয়ার বাড়িতে চাকরি না করলে ভাইকে বেতন দেবে কাঁয়?'

'অকামের ফেদলা পাড়িস না তো। বাপ গেইছে, বড়টা গেল, তুইও মিলিটারির গুলি খাইতে চলি যা। ভাতের কষ্টের চাইতে হামার মিলিটারির গুলি খায়া মরাও ভাল।'

আছিমন আবার গোঙানো সুরে কাঁদতে থাকে। আছিমনের ঘরে তোলপাড় ঘটনার ঢেউ পড়শী ঘরের বিছানায় আছড়ে পড়ার কারণেই হয়তো ঢোঁড়া মোহাম্মদের ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় শুয়েই সে হাঁক দেয়, 'আরে কী হইল! ও বাংটুর মাও ভাবি, বাংটু আইসে নাই?'

আছিমন কোনো জবাব দেয় না।

পরদিন হালের বেলা পেরিয়ে গেলে ট্যারা জহির সেরাজ বাউদিয়ার বাড়িতে বাংটুর খোঁজ নিতে এসে তার ইন্ডিয়া পালানোর খবরটি প্রথম জানতে পারে। আছিমনের কান্নার পরোয়া না করে সাফ সাফ জানিয়ে দেয় সে, 'বাপের মতো বাংটুও আর ঘুরি আসপে না বাহে। মুক্তিযুদ্ধে যায়া মিলিটারির গুলি খায়া মরবে। হাল বাওয়া আর বন্দুক চালা কি এক কাম হইল! কাঁদিকাটি করি লাভ নাই। মাদুক নিয়া বড়বাড়িতে আইসো, বড় দেওয়ানি আর খালাকে কয়াবুলি দেখোঁ কী ব্যবস্থা করা যায়।'

AMARBOI.COM

মাদুকে নিয়ে ভুঁইয়াবাড়ি যাওয়ার আগে আছিমন যায় নজিবরের বাড়িতে। পড়শী সুবাদে দেবর ও হাসি-তামাসা করার সম্পর্ক হলেও নজিবরের স্ত্রীর কারণে সে বাড়িতে যাতায়াত কম। কিন্তু আজ ভুঁইয়ার সামনে দাঁড়াবার আগে অন্তত শেখের মামুর সমর্থনটা দরকার। আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছিমন তাই একাব্বরের বাপকে খোঁজে। একাব্বরের মা আছিমনেরই বানিয়ে দেওয়া সুপারি গাছের পাতায় বানানো ঝাঁটা দিয়ে আঙিনা শামটানো শুরু করেছে। ঝাড়ু হাতে কোমর সোজা করে কথা বলে, 'সাত সকালে বাংটুর মা এ বাড়িতে ক্যানেবা! বড় মাইষের বাড়ির কাম ছাড়া ছোট গেরস্তের ঢেঁকির পিছায় তার পাও কি উঠপে?'

'তোর ধান বানার কাম খুঁজতে আইসোঁ নাই মুই। মোর বেটা যে মুক্তিফৌজ হইতে ইন্ডিয়া পালায় গেল, শেখের মামু না জানে কিছু?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগা হাল যে পাকে যায়, পাছা হালও সে পাকে ঘোরবে। বাপ যার বাউদিয়া, তার বেটা আর কদ্দিন মানুষের বাড়িত চাকরি করবে? ভালোই হইল, দেখিশুনিয়া এবার একটা ভাতার ধর, বাড়ির পাশেও তো শুনি একজন রেডি হয়া আছে।'

এ জন্যই নজিবরের বাড়িতে আসে না আছিমন। ঝগড়ার মেজাজে জবাব দেয়, 'কী ছাগলচুদি কথা কইস! দেশে আগুন নাগছে, মোর বেটা গেল মুক্তিযুদ্ধ করতে, মুক্তিফৌজের মাও হয়া মুই নাং-ভাতার খুঁজিম?'

নজিবর বাড়িতে ছিল না, গাইটাকে রাস্তার ধারের ঘাসে বেঁধে দিতে গিয়ে বাংটুর ইন্ডিয়া পালানোর গল্প শুনে এসেছে সে। বাংটুর মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে প্রথমে সমর্থন জোগায়, 'গেইছে ভালই করছে। বাংটু মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মোকেও কইছিল ভাবি, কিন্তু সংসারের জোয়ালখান কার ঘাড়ত দিয়া যাইম?

নজিবরের বউ স্বামীকে খোঁচা দেয়, 'একে তো শেখের মামু, তার ওপর ফির মুক্তিফৌজ হওয়ার শখ! বাংটু মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ায় মুক্তিফৌজের মা এলায় সারা গেরাম দাপে বেড়াইবে। কিন্তু মোর স্বামী মুক্তিযুদ্ধে গেলে কাকে ভাতার ধরিম মুই?'

আছিমন নজিবরের বউয়ের বাহুল্য কথায় কান না দিতে নজিবরকে অনুরোধ জানায়, 'উমরা জহির মাদুকে নিয়া ডাকাইলে। চলো তো মোর সাথে, বড় দেওয়ানিকে একটু বুঝসুঝ দেন এলায়।'

নজিবরের উৎসাহ কমে যায়। বড় দেওয়ানি মানে ভুঁইয়াকে বুঝসুঝ দেওয়ার মতো যোগ্যতা তার শ্বশুর, যে কি না এ তল্লাটের সেরা জ্ঞানী ও মানি মানুষ, সেই কাজী চেয়ারম্যানের পর্যন্ত নেই। আর সে তো সামান্য চাষি। বাপ-দাদার আমল থেকে ভুঁইয়াদের বুঝমতো চলে আসছে। নিজের আবাদি জমি কম বলে ভুঁইয়ার দুই বিঘা জমিও বলেকয়ে আধি নিয়েছে নজিবর। এখন আউশের ভরা মৌসুমে কাম ফেলে বাড়ির চাকরের ইন্ডিয়া পালানো সমর্থন করলে চটবে না? যুদ্ধ লাগছে বলে চাষারা আবাদ বন্ধ করলে দেশের মানুষ খাবে কী?

'এক কাম করো ভাবি, বাংটুর বদলে মাদুই কয়দিন ভুঁইয়ার হাল ধরুক। মুই এলা মানিককে বুঝায় কইম কথাটা।'

মাদুকে নিয়ে আছিমন যখন ভুঁইয়াবাড়িতে উপস্থিত হয়, তখন সকালের নাশতার পর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাংটুর পালানোর গল্পই করছিল বাড়ির লোকজন। আছিমন ভুঁইয়াকে বারান্দায় উপস্থিতি দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোমটা টেনে দেয়। আঁচলে বাঁধা টাকাটা আচলসহ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। আর তাই দেখেই কি না কে জানে, বড় দেওয়ানি গর্জন করে।

'কীসের মুক্তিবাহিনীতে গেইছে বাংটু! এ বাড়ির কারো টাকাপইসা সোনার জিনিসপত্র চুরি করিয়া পালাইছে কি না, ভালো করি খোঁজ করো।'

ভাইয়ের বদলি খাটতে এসে সকালেই পেট পুরে বাসি ভাত খাবে মাদু — এরকম প্রস্তুতি নিয়েই সে মায়ের সঙ্গে এসেছে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ার ভয়ে সে ভুঁইয়াকে বিশ্বাস করানোর ব্যাকুলতা নিয়ে বলে, 'আল্লার কিড়া বড় আব্বা, ভাই কিছু চুরি করি নিয়া যায় নাই। খালি হাতে আম্বার, কাসেম আর ভাটিয়াপাড়ার দুইটা চ্যাংড়ার সাথে গেইছে। যাওয়ার সময় ভাই মোকে কয়া গেইছে। মুক্তিবাহিনীত গিয়া দ্যাশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ভাই ফিরি আসিবার নয়।'

মাদুর দেওয়া খবর উড়িয়ে দিতে পারে না কেউ।

বিউটি হঠাৎ বলে, 'সেই জন্য বাড়ির বিপদের কথা কয়া বাংটু আমার কাছেও ২টা টাকা নিছে। কী বাহে চাচি, সে টাকা কি দিছে তোমাকে?'

আছিমন জবাব দেওয়ার আগে বিউটির সৎমা তার স্বভাবসুলভ বিদ্রূপ করে, 'হয় মা, তুই দুইটা টাকা দিছিস, আর বাজান তো সেদিন কয়া গেইছে, বাংটুই হইছে মানিকের এক নম্বর চেলা। কাজেই এমেনে সাহেবের মতো ইন্ডিয়া না গিয়া হাল বওয়া কাম কি তাকে মানায়?'

এই অবস্থায় আঁচলে লুকানো টাকাটার কথা ফাঁস করা ঠিক হবে কি না, বুঝতে না পেরে আছিমন ফোঁৎ ফোঁৎ করে গত রাতের কান্নাটাই সরব করে তোলে। কিন্তু মাদু আগ বাড়িয়ে সত্যি কথাটা জানায়, 'ও বিউটি বুবু, দুই টাকা কই দিছে হামাকে! মোকে খালি চাউল কেনার জন্য একটা টাকা দিয়া গেইছে।'

বিউটি বলে, 'আর এক টাকা নিয়াই মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ করতে গেছে।'

সজব ভুঁইয়া ধমকে ওঠে আবার, 'কীসের মুক্তিযুদ্ধে গেছে বাংটু! খোঁজ পাইছি আমি, কামকাজের ভয়ে হারামজাদা গ্রামের কয়টা বখাটে চ্যাংড়ার সাথে ইন্ডিয়া পালাইছে।'

এমেনের মেয়ে আসমাও এবার বাংটুর পক্ষেই যেন প্রচ্ছন্ন সমর্থন জোগায়, 'যাই বলেন, ছেলেটার খুব সাহস চাচা মিঞা। আমাদের আসার দিন যেভাবে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমেছিল!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসমার মা আছিমনকে সান্ত্বনা দেয়, 'কাঁদেন না। আমাদের উকিল সাহেবও তো ইন্ডিয়া গেছে, তারও কোনো খোঁজ নাই।'

ভুঁইয়া পলাতক বাংটু বা তার মায়ের উদ্দেশে রাগ দেখাতে পারে না আর। বরং খোশ মেজাজ নিয়েই এমেনের স্ত্রীকে বলে, 'ও ভাবি, আমার বাড়ির চাকররাও কী রকম জয় বাংলার পক্ষে দেখলেন তো। ক্ষেতের কাম ফেলায় রেখে গেল যুদ্ধ করতে! কী রে জহির, তুইও যাবি নাকি?'

বাংটু যুদ্ধে গিয়ে চিরতরে তার হারিয়ে যাওয়ার শোকটাই ট্যারা জহিরের মনে বড় করে তুলেছে। সে আক্ষেপ করে বলে, 'হাল বলদের পাছে ঘুরলে গরু বড়জোর চাইটা দেবে। কিন্তু মিলিটারির সামনে পড়লে তোর রক্ষা আছে? মিলিটারির চোদন খাওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনীত যাওয়ার বদলে দিনরাইত হালবলদের পাছে ঘুরলেই হামার আরাম।'

'আরাম তো এলাও বাড়িত আছিস ক্যানে হারামজাদা। ওই মাদু না পাদু ওকে দিয়াই আজ একখান হাল ধরাও, দেখ ওর দ্বারা কাম হইবে কি না।'

জহির মাদুকে বাসি ভাত খেয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিতেই উৎসাহিত মাদু মাকে বলে, 'মা তুই বাড়ি যা, ভাইয়ের বদলি মুই সউগ কাম করতে পাইম।'

আছিমন তবু বাড়ির বারান্দা ও উঠানে মানিককে খোঁজে। বাংটু কোথায় গেছে, কেন গেছে, আসল খবর নিশ্চয় মানিকই সবচেয়ে ভালো জানে। মানিককে না জানিয়ে সে দূরদূরান্তরের দেশ হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাবে, মাদুর কথা সত্য জেনেও বিশ্বাস হতে চায় না তার।

মানিককে খুঁজে পাওয়ার আগে তার সৎমা হুকুম দেয়, 'ওই মুক্তিফৌজের মা, হামার ফেলানি আইজ নাই, থাল-বাসনগুলা ধুইয়া দিয়া যা তো।'

আছিমন ভরসা পায়, কাজ শুরু করে। মুক্তিফৌজের মা হয়েছে বলেই বোধহয় ভুঁইয়ার বউ আজ অনেকদিন পর তাকে কাজের হুকুম দিলো। আর এ বাড়ির সবচেয়ে ঠোঁটকাটা বউটাই যখন আছিমনকে মুক্তিফৌজের মা ডাকছে, গ্রামের সবাই ডাকতেও বাধ্য। বিদায় নেওয়ার সময়ে বাংটুও তো তাই বলেছিল। গতরাতে ঘরে ছেলের মুখখানা ভালো করে দেখার সুযোগটি নষ্ট হওয়ার দুঃখেও আছিমনের কান্না পায় আবারও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো

রাতের রান্নার জন্য আজ সাঁঝবেলা ছোট্ট উঠানের কোণে চুলা জ্বালে আছিমন। বাংটুর স্থান দখল করেছে মাদু, ফলে আছিমনের ঘরে ভাতের কষ্ট খানিকটা নিশ্চয় কমবে। আর দুই-এক বছর গেলে হেপি আর টেপিও পরের বাড়িতে কামকাজ করে খাওয়ার মতো যোগ্য হবে। তখন একটা পেটের জন্য নিত্য চুলা না জ্বালালেও চলবে আছিমনের। মুক্তিফৌজ বেটার তত্ত্বতালাশ করে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেও তার পেট এমনিতেই ভরবে। এসব ভাবনার সঙ্গে আছিমন যখন চুলার লতাপাতা জ্বালাতে ফুঁ দেয়, তামাক-কল্কে হাতে নিয়ে ঢোঁড়া মোহাম্মদ আসে। বাড়ির মানুষের মতো ভাঙা পিঁড়িখান নিয়ে চুলার ধারে বসে সে।

বউ ছাড়ার পর রান্নাবাড়ি নিজেই করে খায় ঢোঁড়া। মাঝেমধ্যে মাছ-বেগুনের তরকারি খাওয়ার শখ হলে বাংটুর মায়ের সাহায্য নেয়। চাল ফুটিয়ে ভাত রাঁধার কাজটি আছিমনের তিন বছরের টেপিও পারবে, তবু খাতির দেখাতে আছিমনই প্রস্তাব দিয়েছিল একদিন, 'কষ্ট করি রাঁধি খান, তার চাইতে ভাতের চাউল দেও, তোমার সমান চাউল মুইও হাঁড়িতে দিম, এক হাঁড়িতে ভাত হওয়ার পর এলা সমান ভাগ করি নেমো।'

দুজনের আলাদা চাল মিলেমিশে এক হাঁড়িতে ভাত হওয়ার প্রস্তাবটা মন্দ লাগেনি ঢোঁড়ার। তরকারি না হলেও চলে, শুধু লবণ দিয়ে খেলেও আধসের চালের কম ভাত খেলে পেট ভরে না তার। চুক্তির কাম করে যে চাল পেয়েছিল, তা থেকে আজো আধা টালা চাল দিয়েছে ভাবিকে। এখন সেই ভাত পাহারা দেওয়ার জন্য ঠিক নয়, বাংটুর মা ভাবির সঙ্গে গল্প করার লোভেই কল্কেতে আগুন তোলে সে। বাংটুর মা চাল ধুতে গেলে চুলার জ্বালটাও ঠেলে দেয়।

'আজ পরেশের ধান নিড়ানোর কাম করিনো ভাবি। ক্ষেতের কামেও সবার মুখত এক গান। বাংটু বোলে ভুঁইয়াবাড়ির টাকা, সোনা আর কাঁসার জিনিস আরো কত কী চুরি করিয়া ইন্ডিয়া পালায় গেইছে। ভাবি, আসলে ভুঁইয়ারা কয় কী, কয় টাকা চুরি করিছে বাংটু?'

চুলার ধোঁয়া আর চাল ধোয়া ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়াতেও যাকে বলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে আছিমন। ধমক দেয় ঢোঁড়াকে, 'মানুষে তোমার মুক্তিফৌজ ভাতিজাকে চোর কয়, আর তোমরা মুখ বুজিয়া থাকেন!'

'আহা, এক হাতে আর কয়জনের মুখ চিপি ধরিম? তাছাড়া খোদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

ভুঁইয়াই বলে কইছে...

'চুপ করো। তোমরা কামে যান, আর মুই কি ঘরের কোনায় বসি বাল ছেঁড়ো। আইজো ভুঁইয়াবাড়ি হেঁদুটাড়ি কত জায়গায় ঘুরনু। গ্রামের সগাই এলায় মোকে মুক্তিফৌজের মাও ডাকতে শুরু করছে। বড়বাড়ির সবাই জানে, বাণ্টু মোর মুক্তিফৌজ হওয়ার জন্যে ইন্ডিয়া পালায় গেইছে।'

ঢোঁড়া মোহাম্মদ দ্রুত মত পরিবর্তন করে আছিমনকে সমর্থন দেয়, 'সেটা তো ঠিকই, মুক্তিফৌজ হওয়ার জন্যে তো গেইছে।'

ঝগড়া নয়, আসলে ঘনিষ্ঠ পড়শী ভাবির সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। কথাতেও বেশ দরদ উছলায়।

'বাপ বাড়িতে নাই, কী দরকার ছিল মাওকে একলা ফেলায় তোর মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার? তার ওপর মাদুটাও গেল তোর বদলি খাটতে।'

'মুক্তিবাহিনীত গেইছে ভাল হইছে। বাপ-বেটা কারো জন্যে আর চিন্তা নাই মোর।'

'সেটা তো ঠিকই ভাবি। চিন্তা করিয়া কী লাভ?'

'মোর খালি একটাই চিন্তা, কোনদিন দ্যাশ স্বাধীন হইবে।'

'দ্যাশ স্বাধীন হইলেও হামাক কাম করি খাওয়া নাগবে, অধীন থাকলেও হামার কাম করি খাওয়া নাগবে। শেখ মুজিবর বলে কইছে স্বাধীন হইলে ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করি দেবে। হামার কি জমি আছে? চিনির সের হইবে চাইর আনা। হামরা কি চা-চিনি খাই? দ্যাশ স্বাধীন হইলে কী লাভ হইবে হামার কন তো।'

'দ্যাশ স্বাধীন না হইলে মিলিটারির গুলি খায়া সউগ বাঙালিকে মরা লাগবে।'

'সেটা তো ঠিকই। মিলিটারির ভয়ে ভুঁইয়ার মতো মানুষও বলে পালাইতে গিয়া মুতিয়া তবন ভিজাইছে। মানুষে কয়, আইলে উষ্টা খায়া চ্যাটও ভাঙি গেইছে তার।'

ঢোঁড়ার হাসিতে শরিক হতে গিয়েও বেশরম দেবরকে ধমক দেয় আছিমন।

'হাসেন না। দ্যাশ স্বাধীন হইলে খালি ভুঁইয়ার ঘরে লাভ হবার নয়, গরিব মানষেরও লাভ হইবে।'

'সেটা তো ঠিকই, ভুঁইয়ার বেটা যদি চেরম্যান হয় বেশি বেশি ইলিপ হামরাও পামো।'

'খালি ইলিপ! দ্যাশ স্বাধীন হইলে সউগ জিনিসেরই দাম কমবে। স্বাধীন দেশে আকাল থাকপে না। এলায় এত যে খাটিয়া আবাদ করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধান-চাউল-কোষ্টা সউগ যায় কোন্ঠে? বাঙালির টাকা-পয়সা, সোনার জিনিস কাঁয় লুটিয়া নিছে?'

সেদিন এমেনের স্ত্রীর কাছে শোনা দেশের কথাগুলা সব মনে করতে না পারলেও আছিমন ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্নের আকারে ছুড়ে দেয়। কল্কে টানার বিরতি দিয়ে ঢোঁড়া জবাব শোনার জন্য ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে মুগ্ধ চোখে ভাবিকে দেখে। এসব প্রশ্নের জবাবে এমেনের স্ত্রীর বক্তব্য হুবহু মনে করতে না পারলেও আছিমন আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে জবাব দেয়, 'সউগ বিহারি মিলিটারি চুষি খাইছে।'

'সেটা তো ঠিকই, চুষি তো খইছেই।'

এত জোরে সমর্থন জানায় ঢোঁড়া, যেন লুণ্ঠিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ তার মন।

দেশ ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে মুক্তিফৌজ বাংটুর মায়ের তপ্ত কথাবার্তা ঢোঁড়াকে আজ ঘরে বসেও ভুঁইয়াবাড়ির রেডিয়ো শোনার বিনোদন দেয় খানিকটা। একই সঙ্গে চুলার পাড়ে বসে থাকায় হাঁড়িতে ভাত ফোটার আওয়াজ ও সুবাসটাও যেন ভেতরে সুড়সুড়ি দেয়। ভাত নামানোর পর চুলায় হেপি-টেপির তোলা পাটশাক চড়ায় আছিমন। কচি পাটপাতার টাটকা ঘ্রাণও পাটখেতে আছিমনকে দেখার স্মৃতি চাগিয়ে দেয়।

ঘরে কেরোসিন নেই বলে চুলার আভা ঘিরে খেতে বসে আছিমনের দুই মেয়ে। প্রথমেই হাঁড়ির ভাত দুই সানকিতে সমান দুই ভাগ করে আছিমন। এক পোয়া চাল দিয়েও বাংটুর মা আজ প্রায় দেড় পোয়া চালের ভাত পায়। ভাগাভাগি সহজভাবে মেনে নিয়েছে ঢোঁড়া, আছিমনের উঠানেই তার মেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে। গরম ভাতে পাটশাক আর কাঁচা মরিচের কামড় তৃপ্তিতে শুধু পেট নয়, গোটা শরীরমনই ভরিয়ে তোলে যেন। আছিমন ভাবে, ভাতের পরিমাণ দেখে লোকটা কি সন্দেহ করছে কিছু? কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলে, 'পাইজন চাউলের ভাতের বকরত নাই। তোমার আইজ পেট ভরিবার নয়।'

কিন্তু খেতে বসেও ঢোঁড়ার গল্পের নেশা কাটে না।

'বাবুর বাড়ির কামে গেইলে ভোক থাকে না ভাবি। দুপুরের জলপান মুসলমান কামলারা নিজেরই রাঁধি খায়। আইজো দুপুরে ঢিকিয়া পান্তা খাইছি। হেঁদুর ঘরে কাম করাই ভাল ভাবি, পেটও ভরে, ধর্মও থাকে।'

'যুদ্ধের টাইমে এলাও ধর্ম আছে? হিন্দু-মুসলমান এলা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইছে। এমনি কি এলায় মুসলমানরাও আজ হিন্দুস্তানে যাবার ধরছে?'

'সেটা তো ঠিকই ভাবি। মোর ভাগের আরো এক মুঠ ভাত তোমরা নাও তো, গরমে গরমে খায়া নাও তোমরাও।'

আছিমন অবাক দৃষ্টিতে আজ ঢোঁড়াকে দেখে। দুবেলা নিজের পেট ভরানোর পথে বাধা বলে বউ-বাচ্চা ছাড়তেও দ্বিধা করেনি, সে আজ ভাবিকে দরদ দেখায় আছিমন মুক্তিফৌজের মা হয়েছে বলেই কি?

আছিমন খেতে বসলে ঢোঁড়া ফিরে যায় নিজের ঘরে, কিন্তু পান-সুপারি আর তামাক সিলিম হাতে ফিরে আসে চুলার আগুন ছাই হওয়ার আগেই। হেপি ও টেপি বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আছিমনও মাদুর অপেক্ষায় উঠানেই বসে। ঢোঁড়া ফিরে এসে তাকে পান দেয়। আছিমন নিজের পাছা থেকে পিঁড়িখান ঢোঁড়ার দিকে এগিয়ে দিলে ঢোঁড়া তাতে বসে কল্কেয় আগুন তোলে।

বাঁশের চাটাইখানার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছিমন চুলা ফুঁকানো বাঁশের চোঙটি দিয়ে পিঠের ঘামাচি চুলকায়। মুখে বলে, 'মাদু কামকাজ শেষ করিয়া এলাও কেনবা আইসে না! এডিও শোনার নেশায় ধরছে ওটারও।'

ট্যারা জহির মনে হয় মাদুকে আসতে দেবে না। না দিলেই ভালো। বাউদিয়ার বউয়েরও ঘরে পুরুষ মানুষ বলতে কেউ নেই, পাশের ঘরে ঢোঁড়ারও বউ-বাচ্চা নেই। দুজনের ভাত যেমন এক হাঁড়িতে সিদ্ধ হয়, দুজনই আজ তারা এক বিছানায় তেমনি গরমে মিশে থাকলেই বা কার কী ক্ষতি? ডাব্বা নেই বলে শুধু শুধু মাটির সিলিমেই তামাক টানে ঢোঁড়া। দু'হাতে সিলিম ধরে নিজের হাতের ফুটোয় ঠোঁট লাগিয়ে জোর টানে বুক ভরে ধোঁয়াতৃপ্তি নেয় সে। ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'ও ভাবি, ঠিকই কথা কইছেন, যুদ্ধের টাইমে ধর্মসমাজ কোনো পাকে কারো খেয়াল থাকে না।'

কথার পেছনের কথাটা বোঝার জন্য ঢোঁড়ার দিকে তাকায়। চাঁদনি রাত না হলেও আসমানের অসংখ্য তারাবাতি আর আছিমনের ছোট উঠানেও মেলা জোনাকি জ্বলছে। তার উপর চুলার নিভুনিভু আগুন আর কল্কের আগুনের আভায় ঢোঁড়ার তৃপ্তি দেখা যায়।

'ও ভাবি, বড়বাড়িতে এমেনের বেটির সাথে ভুঁইয়ার বেটার এলাও তো বিয়া হয় নাই। কিন্তু বিয়া না হইতেই এক ঘরে থাকা শুরু করছে। যুদ্ধের টাইমে কিসের সমাজ আর কিসের ধর্ম! তার ওপর টাউনি মানষের শরম কম, দিনেও মনে হয় দরজা লাগায় ভুঁইয়ার বেটার সাথে এক বিছানায় শোতে। নয় ভাবি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহুরে মেয়ের পরপুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ার ব্যাপারে ঢোঁড়ার আগ্রহ এবং আনন্দ দেখে আছিমন তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। দুই হাঁটুর মাঝখানে তবনের ফাঁকে লোকটার পৌরুষ জানোয়ারের মতো লাফাচ্ছে যেন। ঢোঁড়ার চোখের বদ হাসিটার মানেও এবার স্পষ্ট বুঝতে পারে। ঝগড়াটে মেজাজ আবার ফিরে পায় সে, 'দ্যাশের মানুষ যুদ্ধে মরিবার নাগছে, আর তোমরা আছেন কাঁয় কোন্ঠে শোতে সেই তালে। বাংটু হামার দ্যাশের জন্যে যুদ্ধ করিবার গেইছে, মাদুও সারাদিন কাম করার পরও বোধকরো বড়বাড়িত স্বাধীন বাংলা এডিও সেন্টার শোনে। ঘরের কোণে মুরগি টোপার বদলে তোমরাও এডিও শুনতে যান না ক্যানে?'

'দেশের গণ্ডগোল এলা ভুঁইয়াবাড়িতে শুরু হইছে। গণ্ডগোলের খবর শুনিয়া হামার কী লাভ? এই যে, শেখের মামু শোনে, কারণ তাঁয় ভুঁইয়ার ভুঁই আধি করে। বাংটুটা যে গণ্ডগোলের ভিতরে পালায় গেল যুদ্ধ করতে, কী ফায়দা হইবে কন তো?'

দেশ ও যুদ্ধ নিয়ে এতক্ষণ কথা বলার পরও বোকাচোদা মানুষটা আবারো মুক্তিফৌজ ছেলেকে নিয়ে খোঁচা দেওয়ায় ঝগড়ু মেজাজখানা খিঁচড়ে ওঠে আছিমনের।

'মোর সাথে ফ্যাদলা পাড়ি কী ফায়দা খোঁজেন?'

ঢোঁড়া মোহাম্মদ ধরা পড়ার লজ্জা ঢাকতে হাসে যেন। ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে, 'বাড়িত পুরুষ মানুষ নাই। তোমাকে পাহারা দেওয়াটা মোর দায়িত্ব নোয়ায় ভাবি?'

'কোনো শিয়াল কুত্তা রাইতে যদি ঘরত সোন্দায়, সেই জন্য শিথানে দাওখান নিয়া শুতি থাকোঁ। স্বামী বাড়িত নাই দেখিয়া মুক্তিফৌজের মায়ের ঘরত ঢোকা এত সোজা!'

আছিমনের কথার তেজ মিলিয়ে না যেতেই মাদুর কণ্ঠে আজ বাংটুর গান শুনতে পায় ঢোঁড়া। জয় বাংলার গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ছুটে আসছে মাদু। মুক্তিফৌজের মাকে দ্রুত সমর্থন দিয়ে বলে সে, 'সেটা তো ঠিকই। কোন শালা ঢুকপে তোমার ঘরত! মুই মানুষটা আছোঁ না তোমার ঘরের পাছত?'

চেঁচিয়ে গান করাটাকে কুত্তার ডাকের সঙ্গে তুলনা করে মাদুকে গাল দেয়, 'কুত্তার মতো ভোকে ক্যানে চ্যাংড়াটা! ও মাদু ভয় লাগে তোর?'

ভাতিজাকে সাহস জোগাতে নিজেও অন্ধকারে অদৃশ্য হয় ঢোঁড়া মোহাম্মদ।

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ

বাংটুর মতো বকলম এবং স্বল্পশিক্ষিত ছেলেগুলো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া পালিয়ে যাওয়ার পর মানিকের অস্থিরতা বাড়ে। পতাকা ওড়ানোর পর থেকে ছেলেগুলো মানিককে নেতা হিসেবে মানতে শুরু করেছিল, আর ওদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বোঝাতে গিয়ে মানিকও যেন নিজের কাছে একটু একটু করে নেতা হয়ে উঠছিল। কুন্ডার ব্রিজভাঙা অপারেশনেও যোগ দিয়েছিল ওরা। বাংটু দু'দিন আগেও বলেছিল, 'ও ভাইজান চলেন তো ইন্ডিয়া যায়া হামরাও মুক্তিবাহিনী হই।' নানার কাছে ইন্ডিয়ার দালাল হিসেবে চিহ্নিত হবার ভয়েই কি না কে জানে, মানিক সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, 'ইন্ডিয়া যেতে হবে না, গ্রামে থেকেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করব।'

মানিকের কথা নিশ্চয় বাংটু বুঝতে পারেনি। আস্থা রাখেনি আম্বার-কাসেমরাও। গাঁয়ের লোকজন, যারা ওদের নাড়িনক্ষত্র মানিকের চেয়েও বেশি জানে, তাদের অনেকেরই সমালোচনায় অবশ্য ইন্ডিয়া পালানো চ্যাংড়াদের দেশপ্রেম মুখ্য হয়ে ওঠে না। বর্ডার খোলা পেয়ে তাদের ইন্ডিয়া দেখার অভিযানটাই আসল কথা। বাংটু হাটের দিন ভুঁইয়ার হাতে চড় খেয়ে কাম ফাঁকি দেওয়ার জন্যই এ পথ নিয়েছে। আম্বার আছে ব্যবসা করার তালে। ইন্ডিয়ায় কাঁসা-পেতলের দাম বেশি হওয়ায় কিছু কাঁসার থালা-বাসনও কিনে নিয়েছে। অন্যদিকে ভাটিয়াপাড়ার আজিজল তো আস্ত চোর একটা। কাজেই এরা গেছে দেশকে মুক্ত করার মহান ব্রত নিয়ে — কে বিশ্বাস করবে? লোকজন এভাবে বললেও ছেলেগুলোর, বিশেষ করে বাংটুর দেশপ্রেমের অগভীর অথচ প্রাণবন্ত আবেগকে মিথ্যে ভাবতে পারে না মানিক। সত্যি সত্যি যদি ওরা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিবাহিনী হতে পারে, অন্যদিকে অবরুদ্ধ দেশে থেকে মানিক যতই দেশপ্রেম দেখাক, কার দাম হবে বেশি? বাড়ির চাকরের কাছেও ছোট হওয়ার ভয়েই কি চিনচিনে হিংসেও জাগে? বড় অস্থির লাগে তার।

বাংটুরা হয়তো ভাবছে এমেনে-কন্যাদের টানে এবং আসমাকে বিয়ে করবে বলেই হয়তো ইন্ডিয়া যেতে আপত্তি মানিকের। কিন্তু এ বিষয়ের সরস ঠাট্টা-মস্করার জবাবেও তো মানিক এমেনে-কন্যাকে বিয়ে না করার কঠিন সিদ্ধান্তটাই প্রকাশ করে আসছে। লোকজনের ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য সে বাড়ির বাইরেই থাকে প্রায় দিনমান। বাড়িতে যখন একা, তখনো ইন্ডিয়া-পলাতকদের চেয়েও দেশের জন্য বড় একটা কিছু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার উত্তেজনা ও অস্থিরতা নিয়ে ছটফট করে।

দুপুরের দিকে অবশ্য কেবল নিষিদ্ধ নারীসঙ্গ রোধের জন্য নয়, গরমে ঘরে টেকা দায় বলেও বাড়ির পেছনের ভিটার গাছতলার ছায়ায় বসে থাকে একা। গাছতলায় বসে, বাণ্টুদের সামরিক ট্রেনিং নেওয়ার কথা ভেবে অস্থিরতা নিয়ে হাতের কাছে পাওয়া মাটির ঢিল দূরের গাছের গুঁড়িকে নিশানা করে ছুড়ে মারছিল খামোখা। পেছনে বড়বাড়ির ছোট বাসিন্দাদের কলতান শুনে ভিটায় ওদের উপস্থিতি টের পায়। কিন্তু ফিরে তাকায় না।

সুমন ও রফিকই কাছে আসে প্রথম। সুমন জানতে চায়, 'ও ভাইজান, আপনাদের ভিটার তেঁতুলগাছে বলে ল্যাংটা পেত্নি আছে? কই, দেখান তো আমাকে।'

'নিজের চোখে দেখো আছে কি নাই।'

ওরা তেঁতুলগাছের দিকে ছুটে গেলে বিউটি তার দুই সখীকে নিয়ে হাজির হয়। ভিটায় নিরিবিলি বৃক্ষছায়া ও আম-লিচুর আকর্ষণে দিনের অনেকটা সময় এখানেই কাটে তাদের। মানিকও কি ওদের দেখার জন্য এখানে বসে আছে? জবাবটা নিশ্চিত করার জন্য সে ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। ওরাই এগিয়ে আসে তার ধ্যান ভাঙাতে।

অনিতা বলে, 'ও মানিক ভাই, আমঝালা খাবেন? আপনাদের ওই গাছের আমের যা ঘ্রাণ আর টেস্ট!'

'তোমরা খাও। আমি কাঁচা আম খাই না।'

মুখে না বললেও ওদের চটাস চটাস আম খাওয়া দেখে জিভে পানি আসে। অনিতা সম্ভাব্য শ্যালিকার অধিকার নিয়ে মানিকের মুখে লোল গড়াতে ওরকম চটাস চটাস করে নাকি?

বিউটি প্রস্তাব দেয়, 'নানাজি সেদিন এত করে ডেকে গেল। তার বাড়িতে বেড়াতে যাব না আমরা?'

'না। ও বুড়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আমাদের।'

'আব্বা, চাচি, সবাই বলছে ওনার সাথে এখন ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত আমাদের। আমরা গরুগাড়িতে যাব, আপনি না হয় সাইকেলে পরে যাবেন।'

মানিক ছোট বোনকে ধমক দেয়, 'বলেছি তো দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত নানাজির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না আমাদের।'

আসমা খোঁচা দেয়, 'তাহলে বাণ্টুর মতো আপনিও যান না মুক্তিযুদ্ধ করতে। বসে আছেন কেন?'

আসমাও কি মানিকের দেশপ্রেম ও বীরত্বকে বিদ্রূপ করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিতা আবদার করে, 'ও মানিক ভাইজান, আমাদেরও নিয়ে ইন্ডিয়া চলেন যাই। আমাদের আব্বুর কাছে অথবা শরণার্থী ক্যাম্পে রেখে আপনি মুক্তিবাহিনীতে যাবেন।'

'মুক্তিযুদ্ধের জন্য কিছু করতে চাইলে দেশের ভেতরে থেকেও অনেক কিছু করা যায়।'

'কী করব বলেন। ইন্ডিয়ায় গেলে আব্বুর পাশাপাশি দেশের জন্য আমরাও হয়তো কিছু করতে পারতাম। কিন্তু গ্রামে থেকে স্বাধীন বাংলা শোনা ছাড়া কী করার আছে?'

আসমা যেন মানিকের আত্মজিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি করে মানিকের দিকে তাকায়। তার মুখেও আমঝালা খাওয়ার তৃপ্তি। হাত পিঠের দিকে নিয়ে ওড়না ঠিক করার সময় মানিক তার বগলে কামিজের ঘামেভেজা দাগটিও দেখে। এই প্রথম আসমাকে কিছুটা ভালো লাগে তার। মানিকের কাছে ওর জবাব পাওয়ার আগ্রহটা আন্তরিক মনে হয়। কিন্তু জবাব দেওয়ার বদলে হঠাৎ জরুরি কোনো কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই যেনবা উঠে দাঁড়ায় মানিক। বাড়িতে নিজের ঘরে একা হয়ে আসমার বুক ও ঘামেভেজা কামিজ মনে পড়ে বটে, কিন্তু তার চেয়েও তার প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়াটাই জরুরি হয়ে ওঠে। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা দরকার। মন খুলে কথা বললে সে হয়তো মানিককে বুঝতে পারবে, মানিকও বুঝতে পারবে খুব স্বার্থপর নয় আসলে, দেশের জন্য কিছুটা দরদ ও দায়িত্ববোধ আসমার ভেতরেও আছে।

ভিটার ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আসমাকে আবারো একান্তে কাছে পাওয়ার তৃষ্ণাটা প্রবল হতে থাকে আসলে ভেতরের জরুরি কথাগুলো বলার প্রয়োজনে। আসমাকে বলার জন্য যে জরুরি বক্তব্য আবেগময় হয়ে ওঠে, তা একা একা মহড়াও দিতে থাকে মানিক। বাণ্টুর মতো সামান্য বকলম গরিব ছেলেও যদি দেশের জন্য কিছু করার তাড়নায় মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে পারে, আর তোমাদের মতো শিক্ষিত মেয়েরা ঘরে বসে শুধু নিজের সুখ-সংসারের কথা ভাববে? দেশ মানেই তো মানুষ, বাংলাদেশ স্বাধীন হতে চায় বাঙালি পরিচয়ে এক জাতিগোষ্ঠী মানুষের জন্য। নিজের বাঙালি জাতিসত্তাকে বুঝতে চেয়ে দেখো এ দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস জানো। শুধু নিজের কথা না ভেবে তাকাও চারপাশের মানুষের দিকে। দেখবে কতরকম সমস্যার নিগড়ে বাঁধা আছে মুক্তিকামী এই জাতির মানুষগুলো। মানুষের মতো বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত এইসব মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করাটাই তো মুক্তিযুদ্ধ। দেশ ও মানুষের জন্য ভালোবাসা ছাড়া খালি কি অস্ত্র হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেই কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয়? মুক্তিযুদ্ধ মানেই তো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের মুক্তির জন্য লড়াই করা। আমাদের এই জেলাতেই জন্ম নিয়েছে মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। বিরুদ্ধ পরিবেশে থেকেও তিনি নিজে স্বশিক্ষিত হন নাই শুধু, নারীমুক্তির আন্দোলনে তার চেতনা ও ভূমিকা আজো দেশের পশ্চাৎপদ নারী সমাজের মুক্তির প্রেরণা। তিনি কি বড় মুক্তিযোদ্ধা নন?

আসমাকে একান্তে দেশপ্রেমের আবেগময় বক্তৃতা শোনানো যথেষ্ট বোধ না হওয়ায়, কাল থেকে বিউটি ও তার সখীদের নিয়ে মানিক গ্রামের পথে ঘোরার কথা ভাবে। গাঁয়ের সংরক্ষণশীল সমাজে একটি ছেলে ও মেয়ের একসঙ্গে ঘোরা ও কথা বলা দেখলেও নিষিদ্ধ রস নিঙড়ে নিতে প্রস্তুত হয় সবাই। লোকজনের ভ্রান্ত ধারণা ভাঙাতেও ওদের নিয়ে গাঁয়ের পথে ঘুরবে মানিক। বাড়ি বাড়ি ঘুরে আসমারা গাঁয়ের মেয়েদের বোঝাবে দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চিত্র। বাড়িতে নতুন করে স্বাধীনতার পতাকাটি উড়িয়ে দেওয়ার সময় মানিকের সঙ্গে আসমা-বিউটিরাও গলা মিলিয়ে বলবে জয় বাংলা। আসমাকে এসব ভাবনা-পরিকল্পনার ভাগী করার জন্য ভেতরে এত চাপ বোধ হয় যে, রাতের খাওয়া ও রেডিয়ো শোনা শেষে বাড়িতে নিস্তব্ধতা নেমে এলেও মানিকের পঞ্চ ইন্দ্রিয় পাশের ঘরের দিকে একাগ্র হয়ে ওঠে।

মানিকের পাশের ঘরটা ছোট ভাই-বোনদের জন্য বরাদ্দ। সেখানে এখন বিউটি আসমা-অনিতাকে নিয়ে শোয়। ঘুমানোর আগে অনেক রাত অবধি পর্যন্ত ওরা গুজগুজ করে। কলতলার বাথরুমে যাওয়ার জন্য হ্যারিকেন হাতে উঠানেও ওদের যৌথ চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসে। একটু আগেও বাথরুমে গিয়েছিল ওরা। এখন হয়তো বিছানায় শুয়ে গল্প-গুজব করছে। দিনের বেলা মানিক যখন বাইরে, তখন বিউটিকে নিয়ে আসমা মানিকের ঘরেও সময় কাটায়। এখন মানিক যদি রেডিয়োর বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান শোনার জন্য বা নিছক গল্প করার জন্য ওদেরকে নিজের ঘরে ডাকে, খুশি হয়েই আসবে ওরা। তাতে বাড়ির কেউ কিছু ভাববে না। গাঁয়ে বাজে কথাও রটবে না।

হঠাৎ আসমাকে কাছে পাওয়ার, দেখার এবং কথা বলার ইচ্ছেটা এত জোরালো হয়ে ওঠে যে, মানিক চুপচাপ শুয়ে থাকতেও পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা ঝুঁকি নিয়ে কত দুঃসাহস দেখায়, আর সে এটুকু সাহস দেখাতে পারবে না? মানিক সশব্দে নিজের ঘরের দরজা খুলে বিউটির ঘরের দিকে যায়।

'বিউটি ঘুমিয়েছিস তোরা? এই বিউটি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনের সাড়া পেতে মানিক ঘরের দরজাও ধাক্কা দেয়। খুলে যায় একটি পাল্লা। হ্যারিকেনের আলো চাগিয়ে দেয় আসমা। আসমা ছাড়া খাটে বিউটি ও অনিতা ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা ঘুমের ভান করে চুপসে গেছে।

মানিক বলে, 'ওরা ঘুমিয়ে গেছে! ভাবলাম আমার ঘরে ডেকে তোমাদের সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলি।'

'কেন? কী হয়েছে?'

খারাপ খবর শোনার ভয় ও উদ্বেগ আসমার চোখে-মুখে।

'না কিছু হয়নি। এমনি গল্প করতাম।'

'এত রাতে!'

আসমা ভয়-বিস্ময় নিয়ে এবার বিউটিকে ডাকে, 'এই বিউটি, বিউটি। দেখ, তোর ভাইজান কী বলে।'

বিউটি বা অনিতার ঘুম সহজে না ভাঙায় মানিক বলে, 'থাক, ওদের ডাকতে হবে না। কালকে বলব।'

নিজের ঘরে ফিরে আসমার অবাক দৃষ্টিতে চাপা খুশির পরিমাণ নির্ণয় করতে করতে ভাবে মানিক, নাকি তাকে ভুল বুঝল মেয়েটা? ভুল বোঝার কিছু নেই। কাল প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে বিলের ধারে ওদের তিনজনকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে দেশের করণীয় সম্পর্কে বক্তৃতা দেবে মানিক। এরকম ভাবলেও নিজের ঘরের দরজাটি খোলা রাখে মানিক, পাছে জরুরি কথা শোনার জন্য মধ্যরাতেও আসমা এসে পড়ে!

পরদিন বিকেলে আসমাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাটি দুপুরের আগেই চিরদিনের জন্য বাতিল করে দেয় মানিক। কারণ দুপুরের আগেই ভুঁইয়াবাড়িতে এসে হাজির হয় মশিয়ার উকিলের সেই সহকর্মী চামচা ও আসমাদের রশিদ চাচা। সঙ্গে আরো দুটি যুবক, হাতে অস্ত্র নেই, তবে ওরাও নাকি মুক্তিফৌজ। তিস্তার ওপারে বাড়ি, এমেনে ইন্ডিয়া থেকে পাঠিয়েছে ওদের। নিজের ফেমিলিকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসমারা মাস দেড়েক আগে ভুঁইয়াবাড়িতে আসার দিনে যেমন সাড়া জেগেছিল, সেরকম না হলেও এমেনের পরিবারকে বিদায় দেওয়ার জন্য ভুঁইয়াবাড়িতে আকস্মিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

দলের এক নামিদামি নেতা বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ায় এলাকায় সজব ভুঁইয়ার সাহস ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এমেনে ইন্ডিয়ায় গেলেও পরিবারকে তার বাড়িতে রাখায় নিজের দল, ইন্ডিয়া ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কও নিবিড় হয়েছে তার। এই সম্পর্কটাকে স্থায়ী করার জন্য এমেনে-কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটিও কার্যকর করা নিয়ে জোর চিন্তাভাবনা শুরু করেছে ভুঁইয়া। এ জন্য বিউটির মাধ্যমে বাংটুকে পাঠিয়ে দিয়ে চেয়ারম্যানকেও পর্যন্ত বাড়িতে ডেকে এনেছে। কিন্তু হঠাৎ করে এমেনে তার পরিবারকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দেওয়ায় সজব ভুঁইয়া দিশেহারা বোধ করে। ভয়ও পায়।

বিষয়টা নিয়ে শলাপরামর্শ করার জন্য পরেশের কাছে নিজেই ছুটে যায় সে। আসলে মুক্তিযুদ্ধ অনেকদিন চলবে এবং গ্রামাঞ্চলে মানুষ বেশিদিন নিরাপদে থাকবে না বলেই যে এমেনে পরিবারকে ইন্ডিয়ায় সরাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নাকি তার মেয়েকে ছেলের বউ বানাবার চিন্তাভাবনা হচ্ছে — এই খবর পেয়েই লোক পাঠিয়েছে? কিন্তু খবরটা সে পাবে কোথায়? হঠাৎ বাংটুর কথা মনে পড়ে। মাত্র তিনদিন আগে বাংটুরা ইন্ডিয়া পালিয়েছে। বাংটুর সঙ্গে দেখা হওয়া ও তার কাছে বিস্তারিত খবর জানাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে রশিদ তার পরিবারের সঙ্গে মানিককেও ইন্ডিয়া যাওয়ার কথা বলে কেন? এমেনে আলাদা করে ভুঁইয়াকে কোনো চিঠি দেয়নি। এদিকে ইন্ডিয়া যাওয়ার খুশিতে এমেনে পরিবার জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু করেছে।

মশিয়ার উকিল পরিবারকে নিরাপদে ভারতে সরিয়ে নেওয়ার খবর শুনে পরেশ ভয় পায় আরো বেশি। দেশ তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে বুঝলে বউ-বাচ্চাকে ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার এত হাঙ্গামা করত কি এমেনে? হতাশ কণ্ঠে পরেশ ঘোষণা দেয়, 'এইবার আমাদেরকেও ইন্ডিয়া পালানোর জন্য তৈরি হইতে হইবে ভাই। এছাড়া উপায় নাই।'

দলেবলে ও কথাবার্তায় যতই ঘনিষ্ঠ হোক, হিন্দুরা যে আলাদা জাত সেটা চেয়ারম্যান শ্বশুরের মতো ভুঁইয়াও মনে মনে জানে ও বিশ্বাসও করে। পরেশের সঙ্গে এত যে খাতির, তবু ছোটখাটো বিরোধে তেলেজলে না মেশার মতো হিন্দু-মুসলমানের ভিন্নতা মনে করিয়ে দেয়। এমেনের পরিবার যেতে না যেতেই পরেশের ইন্ডিয়া পালানোর প্রস্তুতি আবারও সেই সত্যকে মনে করিয়ে দেয় সজব ভুঁইয়াকে। হিন্দুরা পাকিস্তানে থেকেও এতদিন ইন্ডিয়াকে তাদের আসল দেশ ভেবে এসেছে। বিষয়সম্পত্তি বেচে কিংবা অদলবদল করে পালিয়ে গেছে অনেকেই। রতনপুরের ক্ষিতিশ সাহারও সেই ঝোঁক চেপেছিল একবার। মরে যাওয়ার আগে ছেলেদেরও সেই মন্ত্র দিয়ে গেছে বোধহয় সাহা বাবু। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইন্ডিয়ায় যে লাখ লাখ শরণার্থী যাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অধিকাংশই তো হিন্দু। কিন্তু বাপ-দাদার আমলের বাড়িভিটা ও বিষয়সম্পত্তি অরক্ষিত ফেলে দেশান্তরী হওয়ার কথা শুনলেও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের মতো বুক খালি হয়ে যায় সজব ভুঁইয়ার।

'আমাদের মতো মানুষের পক্ষে হালগেরস্তি বাড়িঘর ছাড়িয়া কি ইন্ডিয়া পালানো সম্ভব পরেশ?'

'সেটা তো ঠিকই দাদা, কিন্তু জান বাঁচানো ফরজ যে! আর্মিরা গ্রামে আসলে আগে তো আমাকে আর আপনাকেই খুঁজবে। খুঁজিয়া না পাইলে হয়তো বাড়িতেও আগুন দেবে। তখন?'

'অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা নেব রে পরেশ, এত চিন্তা করিস না। কিন্তু মানিকের কী করি বল তো।'

এমেনে সাহেব রশিদকে বলে দিয়েছে মানিককেও তার পরিবারের সঙ্গে পাঠানোর জন্য। মানিকের জন্য কোচবিহার বা জলপাইগুড়ির জয় বাংলা অফিস অথবা কোনো ইয়ুথ ক্যাম্পে চাকরির ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হলো, মানিকও চলে গেলে ভুঁইয়া-পরেশরা আরো দুর্বল হয়ে যাবে। অন্যদিকে নাতিও ভারতের দালাল হয়েছে শুনলে চেয়ারম্যান তাদের ওপর আরো প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। এমনিতেই বাড়িতে এসে আমন্ত্রণ জানানোর পরও মানিক মশিয়ার উকিলের মেয়েদের নিয়ে নানাবাড়িতে যায়নি। অবশ্য এমেনে-কন্যাকে বিয়ে করার জন্যই মানিক ওদের সঙ্গে ইন্ডিয়া গেছে বললে বুড়া খুশি হতেও পারে।

সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভুঁইয়া ও পরেশ নিজেদের গোপন বৈঠকে মানিককেও ডাকে।

পরিস্থিতির ব্যাখা শুনে মানিক সাফসাফ জানিয়ে দেয়, 'যাক ওরা, আমি ওদের সঙ্গে যাব না।'

'ইন্ডিয়া গেলে তোকে যে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে, এমন নয়। এমেনে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের অন্য কোনো দায়িত্ব দেবে তোকে।'

'মুক্তিযুদ্ধের জন্যই যদি ইন্ডিয়া পালানো একান্ত দরকার, তাহলে তো বাণ্টুদের সঙ্গে আমার যাওয়া ভালো ছিল।'

সজব ভুঁইয়া ছেলের এ যুক্তি মানতে পারে না।

'বাণ্টুর সঙ্গে ইন্ডিয়া যাওয়া আর মশিয়ার উকিলের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করা কি এক কথা হইল?'

'শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য যদি ইন্ডিয়া যেতেই হয়, গ্রামের অন্য ছেলেদের সঙ্গে যাব। এমেনে সাহেবের ফেমিলির সঙ্গে কেন?'

কঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে আসমাদের সহযাত্রী হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মানিক। পরেশও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়ে ভুঁইয়াকে বলে, 'দরকার নাই ভাই মানিককে ওদের সঙ্গে পাঠানোর। পরিস্থিতি সেরকম দেখলে আমরা কাকা-ভাতিজা একসাথে ইন্ডিয়ায় যাব, একসাথে যুদ্ধ করব।'

তারপরও অবশ্য এমেনের স্ত্রী ও কন্যারা মানিককে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলে। কিন্তু আসমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া পালানো বা আসমাকে নিয়ে ইন্ডিয়ায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখার বদলে, একা একা জগন্নাথের বিলের বদ্ধ পানির রহস্যের কথা ভাবতেও ভালো লাগবে মানিকের। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিলের দিকে হাঁটতে থাকে মানিক।

বিশ

গ্রীষ্মের খররোদের মধ্যে রতনপুরের ক্ষেত-প্রান্তরের চষা মাটির ধূসর রং চাপা পড়েছে সুবজ লক্ষ কোটি আউশ ধান আর পাটের সবুজ চারায়। খুব ওপর থেকে বা দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ভিন্নভিন্ন ফসলি জমির আইল আড়াল করে বিশাল এক সবুজ কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি নিজ হাতে। কাছে থেকে দেখায় আরো সুন্দর। বিকেলে ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি ও বাতাসের কাঁপন দেখে মানিকের ভেতরেও শিরশিরে উত্তেজনা। নিধুয়া পাথারে ক্ষেতের আইল ধরে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে সে। একা, তাই রবীন্দ্রনাথ গানে গানে সঙ্গ দেয় — ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা...কিন্তু আজন্ম পরিচিত জন্মভূমির রূপবৈচিত্র্য ভালো লাগার বোধ ছাপিয়েও ভেতরে কাজ করে আজ অস্থিরতা এবং উত্তেজনা।

স্বাধীনতা আন্দোলন শুরুর আগে কমিউনিস্ট রুমমেট আরিফকে একদিন যুক্তি দিয়েছিল মানিক, 'তোর ওই রাজনীতি না করেও দেশকে ভালোবাসা যায়। দেশের জন্য কাজ করা যায়।'

'কীভাবে শুনি।'

'ধর, আমি যদি একজন সিএসপি আমলা হই, তাহলে সরকারি কাজের মাধ্যমে যতটা পারি দেশ ও মানুষের সেবা করব। করতে পারব না?'

মানিকের অ্যাম্বিশনের সরল প্রকাশ দেখে অট্টহাসির সঙ্গে জবাব দিয়েছিল আরিফ, 'সিএসপি হয়ে দেশ ও জনগণের অনেক বাল ছিঁড়ে বোঝা বাঁধবি তুই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সেই হবু-সিএসপিকে আরিফ যদি এই নিধুয়া পাথারে একা একা রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে দেশপ্রেম ফলাতে দেখত, আরো বেশি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত অবশ্যই। আরিফ এবং অন্যান্য দলের কর্মী-সমর্থক রাজনীতিগ্রস্ত ছেলেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে এ মুহূর্তের প্রধান শত্রু দখলদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে সন্দেহ নেই। অনেকেই হয়তো ইতোমধ্যে শহিদ হয়েছে। আর মানিক গাঁয়ের প্রকৃতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা খুঁজে বেড়াচ্ছে এখনো!

কিছু কিছু ধানক্ষেত এরই মধ্যে এতটা ডগমগ হয়ে উঠেছে যে, কামলাদের সেবাযত্ন আর লাগবে না তাদের। তবে দেরিতে বীজ ছিটানো ধানক্ষেতে বা পাটক্ষেতে কমলারা দল বেঁধে নিড়ানি দিচ্ছে এখনো। হালের গাঁথা যেমন, তেমনি ধান রোপা, কাটা ও নিড়ানির কাজ কামলা-কিষানরা দল বেঁধেই করে সাধারণত। ডানদিকের একটি ধানক্ষেতে একদল কামলাকে দেখতে পায় মানিক। কারো কারো মাথায় বাঁধা গামছা, হাতের পাসুন হাত-চোখের ইশারায় মাটি ছেঁচে ঘাস কাটে কিন্তু মুখে গল্প-গুজব। দুপুর থিতিয়ে এলেও রোদের ঝাঁজ মরেনি। নাঙা পিঠের চামড়ায় ধুলা ও ঘামের আস্তর জমে ও গনগনে রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। তবু গল্প-গুজবে ওরা হাস্যরস খোঁজে।

শৈশবেও দেখেছে মানিক, গরমের দিনে আউশের ক্ষেতে নিড়ানি দেওয়ার সময় কামলার দল অনেক সময় সমবেত কণ্ঠে জারি গানও করত। এরকম এক দলে গানে নেতৃত্ব দিত ছেদরা সলেমন, ঘাড়ের গামছা দুলিয়ে ছোকরাদের মতো নাচত, দোহারকি করে লোক হাসাত। শোনার জন্য ছুটে যেত গাঁয়ের চ্যাংড়ার দল। কামলাদের কণ্ঠে শোনা জারি গানের কথা ও সুর স্মৃতিতে জেগে ওঠে — ও রে নাল টিয়া তোর নলের আগালে বাসা/ সেও বাসা দোলে রে পুবাল বাতাসে...। গান ছাড়াও আউশের ধানবাড়ি নিড়ানোর সময় মুঠো মুঠো ঘাস জমা হতো কামলাদের পেছনে। সেই ঘাস কুড়িয়ে নিত অনেক চ্যাংড়া। প্রকৃতির রহস্য ও রূপবৈচিত্র্য আবিষ্কারের নেশা ও ভালোলাগার বয়সে শ্রেণিচেতনা থাকে না বোধহয়। ভুঁইয়ার ছেলে হয়েও মানিক গাঁয়ের ল্যাংটাপোংটা চ্যাংড়াদের সঙ্গে ধানবাড়িতে গান শুনতে ছুটে গেছে, নিজেদের লাল গাইটির জন্য ঘাস কুড়িয়েছে, এমনকি বাড়ির চাকর সেরাজ যাদুর কাছ থেকে লাঙলের মুঠো হাতে ধরে হাল বাওয়াও শেখার চেষ্টা করেছে।

এবারে বাড়ি আসার পর আউশের মৌসুমে ধানক্ষেতে কামলাদের দলবদ্ধ স্বাভাবিক কাজকর্ম চোখে পড়েছে, কিন্তু আগের মতো জারি গান শুনতে পায়নি একদিনও। হয়তো গান গাওয়ার মতো মনের স্বাভাবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা নেই তাদেরও। সবার ভেতরে কমবেশি কাজ করছে শত্রুকবলিত স্বদেশে মৃত্যুভীতি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে আসে এরা অনেকেই। প্রতিদিন রেডিয়োতে হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের যেসব কথাবার্তা শোনে, তার রেশ হয়তো দিনের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও থেকে যায়। যুদ্ধাবস্থায় আগের মতো জারি গান করার কথা মনেও আসে না কারো।

ক্ষেতের মাটিতে বসে বসে কাজ ও এগোনো একসময় আলের কাছে গিয়ে থেমে যায়। তখন কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ায় কামলারা। এরকম উঠে দাঁড়ানো কামলাদের মধ্যে ছেদরা সলেমান মানিককে দূর থেকেও চিনতে পেরে চেঁচিয়ে ডাকে, 'ও বাহে ভুঁইয়ার বেটা, এদিকে আইসো খবর শুনি।'

মানিকের নানা কি বাবাকে কোনো কামলা কিষান এভাবে ডাকার সাহস পাবে না। কিন্তু কামলাদের স্নেহের ডাক শুনে একটুও খারাপ লাগে না তার। লোকগুলোর দিকে হাঁটতে থাকে মানিক। কাজের সাময়িক বিরতিতে হুঁকো টানা ও গল্প করার জন্য ওরা আলের ওপর বসেছে। আলের ওপর রাখা হুঁকো-তামাক ও ধানের খড়ে বানানো ভুতিতে আগুন। মানিক নিশ্চিত ছিল, এমেনে-পরিবার কিংবা বাণ্টুদের সঙ্গে তার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ইন্ডিয়া না-যাওয়া নিয়েও কৌতূহল দেখাবে ওরা। জবাব দেওয়ার জন্যও তৈরি সে। কিন্তু দলে ভেড়ার আগেই ছেদরা সলেমান কথা বলে জমি নিয়েই।

'জমি দেখতে বারাইছেন বাবাজি! কিন্তু চেনেন কি কোনটা কোনটা নিজের জমি?'

হেসে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করলে ওরা পাথারের সব ভুঁই সম্পর্কে নিজেদের বিজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। কোন জমিতে কোন ফসলের ভালো ফলন হয়, তাও ওরা জানে। জমির গুণগান শুনে মানিকই প্রথম দেশের কথা ওঠায়, 'গ্রামের সব জমিই চাষবাস করেন আপনারা, কিন্তু ফসল ওঠে অন্যের গোলায়। নিজেদের তো পেটের ভাতটাও জোটে না সবসময়।'

ফণী বুড়া বলে, 'বারো মাস কামলা দিয়া আল্লাহর তিরিশদিন দুইবেলা খাইতে পারলেও তো কথা ছিল রে দাদা। কাতিমাসী মঙ্গায় না খায়া পেট শুকায় থাকাটাও হামার কপাল।'

'দেশ স্বাধীন হইলে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে দাদা। যে ফসল ফলাবে, জমি তার হবে।'

ছেদরা সলেমান ঠাট্টা করে, 'তার মানে ভুঁইয়ার বেটা তোমার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জমিগুলা হামাকে দিয়া দেবেন? মোকে কিন্তু বাবা তোমার ওই বড় ভুঁইখান দেওয়া লাগবে।'

অন্যরা খুব উপভোগ করে ঠাট্টা, একজন আরেকটি জমির আবদার জানায়। কিন্তু মানিক হাসে না, কথা বলে আত্মবিশ্বাস আর আবেগ নিয়ে।

'দেশ স্বাধীন হলে আইনকানুন নতুন হবে বাহে, লাঙল যার জমি তার হবে। ভুঁইয়া-কাজী চেয়ারম্যান আর জোতদারদের শত শত বিঘা জমি থাকবে, তাদের গোলা ভরা ধান-পাট থাকবে, আপনারা না খায়া থাকবেন — তা হইলে স্বাধীনতা দিয়া কী লাভ হইবে কন?'

নিজস্ব কোনো মতামত আঁকড়ে থাকার জোর না থাকায় অন্যের কথাকে দ্রুত সমর্থন দেওয়ার অভ্যাস ঢোঁড়া মোহাম্মদের। সবার আগে সেই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'সেটা তো ঠিকই বাহে। সেই জন্য তো কঁও, পাকিস্তান থাকলে কি, আর বাংলাদেশ হইলেই বা কি। পরের জমিতে কামলা খাটিয়া খায়া না খায়া দিন যাইবে হামার।'

'এটা ঠিক বললেন না যাদু। পাকিস্তান থাকলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। স্বাধীন আমাদের হতেই হবে। তা না হলে পশ্চিমা মিলিটারিদের শাসনে যে-কোনো সময়ে গুলি খেয়ে মরতে হবে।'

ঢোঁড়া এবার দ্রুত মত পরিবর্তন করে বলে, 'সেটা তো ঠিকই বাহে। জারুয়া শালারা বাঙালি দেখলেই গুলি করে, বাঙালি মারিয়া দেশের সব জমি দখল করার তালে আছে।'

ছেদরা সলেমানই এবার মানিককে ডাকার আসল কারণটি সিরিয়াস আলোচনার ভঙ্গিতে জানায়। গতকাল ঠ্যাংভাঙা হাটে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে শান্তি কমিটির মিটিং হয়েছে। এলাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, এমনকি দোকান ফেলে আমাদের হিন্দুটাড়ির নরেশ সাহাও উপস্থিত ছিল। বাজারে তেল-নুন কিনতে গিয়ে নিজের কানে শুনে এসেছে ছেদরা, চেয়ারম্যান বলেছে, কোথায় মুক্তিযুদ্ধ? দেশে এখন শান্তি, মানুষ নিশ্চিন্ত মনে কামকাজ হাটবাজার করছে। কেবল ইন্ডিয়ার চক্রান্তে ইন্ডিয়া থেকে আসা কিছু দুষ্কৃতকারী ফুটফাট গুলি ফোটায় অশান্তি করতে চায়। তাদের দমনের জন্য বাধ্য হয়ে মিলিটারিরা অপারেশন চালায়। কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত আর দুষ্কৃতকারী দমন শুধু মিলিটারি দিয়া হবে না, তাই বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে শান্তি কমিটি আর রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়েছে। খুব শিগগির ঠ্যাংভাঙা হাটেও নাকি রাজাকার ক্যাম্প বসবে, মানিক কি জানে সে খবর?

ছেদরা সলেমান যেটুকু শুনে এসেছে, মানিক তার চেয়েও বেশি জানে বলেই হয়তো সেই জানার অস্থিরতা ও উত্তেজনা নিয়ে মাঠের মধ্যে একা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটছিল। অসময়ে এক দল শ্রোতা পেয়ে সেও চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'ওই পাকিস্তানি দালাল বুড়ার কথা বলবেন না। সে এই এলাকায় জয় বাংলা আর বাঙালির বড় দুশমন। শোনেন, আমরা সবাই মিলে কুন্ডার পুল যেমন ভেঙে দিয়েছি, তেমনি জয় বাংলার পক্ষের সব লোককে নিয়ে আমি ওই বুড়ার বাড়ি আক্রমণ করব। রাজাকার ক্যাম্প যদি হয়, তাদের মারার জন্য নিজেই মুক্তিবাহিনীর একটা দল করব আমি। থাকবেন না আমার সঙ্গে?'

ছেদরা সলেমান ও ঢোঁড়ার মতো কয়েকজন দ্রুত সমর্থন জানালেও মানিক লক্ষ করে, জমির মালিক হওয়ার কথা শুনে যেমন আগ্রহ জেগেছিল লোকগুলোর মনে, ততটা স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন যেন জাগে না তাদের মধ্যে। ফণী দাদা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে, 'মাথা গরম করিস না রে দাদা। হাজার হউক, চেয়ারম্যান তোর মুরব্বি, আপন নানা। ঘরের মধ্যে কাজিয়া-কাছাল করা কি ভাল হইবে রে দাদা?'

'আমাদের ঘরে ওরা আগুন জ্বালায় দিলে আমরা চুপ করে থাকব?'

আবারও মানিকের দলে থাকার সমর্থন জানিয়ে ওরা কাজ শুরু করলে মানিকও হাঁটতে থাকে। লোকগুলোর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হঠাৎ মনে হয়, ঘর বলতে যে দেশটাকেই বোঝাতে চেয়েছে সে, সেটা হয়তো ওরা ঠিকমতো বোঝেনি। নানার সঙ্গে বিরোধটা পারিবারিক বিরোধ হিসেবেই দেখছে কি? ব্যক্তিগত বা পারিবারিক যে নয়, সেটা বোঝাতে এবার কুন্ডার ব্রিজ ভাঙা অপারেশনের চেয়েও বড় একটা কিছু করার উত্তেজনা মানিককে পেয়ে বসে। পরেশের সঙ্গে আলোচনার জন্য গন্তব্য পালটে বাবু বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে সে।

শুধু বাবুর বাড়িতে নয়, হিন্দুটাড়িতে মানিকের উপস্থিতিতে ছোট-বড় সবাই খুশি হয়। অসময়ে বাড়িতে বসে চা কি পান-সুপারি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায় বাসু দাদা। ছোট-বড় সবাই যুদ্ধের খবর জানতে চায়। মানিক আশার কথা শোনায় সবাইকেই। আজ বাবুবাড়িতে ঢোকার আগেই বাইরে এক ঝোপা ডাব হাতে নরেশের বউকে দেখে, এই প্রথম তার গর্ভবতী দশাটা টের পায় মানিক। তাও পুরো নিশ্চিত নয়, বারো আনা সন্দেহ জাগে। এতদিন অঞ্জনা কাকির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু টের পায়নি। কাকারা কেউ বাড়িতে নেই। অঞ্জনা তবু হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, 'বসো বাবা, ডাবের পানি খেয়ে যাও।'

যুদ্ধের সময়েও বউটির গর্ভবতী হওয়া কিংবা ডাবের জলের বদলে মানিককে পানি খাওয়ানোর আন্তরিক স্বাভাবিকতাটুকু আজ ভালো লাগে না মানিকের। নরেশের শান্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকার খবরটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে তার বউকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। মালতীও মানিকের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে নাম ধরে ডাকে। কাকার সঙ্গে জরুরি কথা আছে বলে মানিক সেই জরুরি কথার ভাগ কাকিদের না দেওয়ার জন্য উল্টোপথে হাঁটতে থাকে।

জগন্নাথের বিলের ধারে নিরিবিলি গাছতলায় বসে একা হয়েও মানিক আজ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কাজী আফতাবের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় সহসা। অতি পরিচিত মানুষটার সঙ্গে ছবিতে দেখা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ছাড়াও জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের গোলাম আযম, ফজলুল কাদের চৌধুরী, নুরুল আমিন, খাজা খয়েরউদ্দিনসহ আরো অনেক নেতা। পেছনে সামরিক বাহিনীর লক্ষাধিক সশস্ত্র সেনা। অবাঙালি সেনাদের পক্ষ নিয়ে রাইফেল হাতে কয়েক হাজার বাঙালি রাজাকার। পেছনে দলবল নিয়ে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানা মানিককে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজী চেয়ারম্যান আজ বিলের ধারে প্রিয় নাতিকে একাকী লুকিয়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠে এবং তার পুরনো ভাষণ শুরু করে।

তুই এখানে কার ভয়ে, কিসের দুঃখে একা বসে আছিস রে মানিক! পাকবাহিনী আমার ইউনিয়নে আসবে না। তোরা চরম বাড়াবাড়ি করেছিস বলেই পাকিস্তান রক্ষার জন্য ২৫ মার্চে কঠোর সামরিক অভিযান না চালিয়ে উপায় ছিল না ইয়াহিয়ার। শেখ মুজিব স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। তার দেশদ্রোহী দলবল দমন করতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর হাতে নিরাপরাধ কিছু মানুষও মারা গিয়েছে সত্য। কিন্তু হুজুগে বাঙালির যেমন স্বভাব, তেমনি তিলকে তাল করে প্রচার করছে ইন্ডিয়া। গণহত্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে, লক্ষ মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছে — তার প্রমাণ আমার এলাকায় খুঁজে পাবি একটাও? তোদের স্বাধীন বাংলা বেতার ও মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্ব কোথায় ও কার দয়ায় টিকে আছে? আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, ইন্ডিয়ার অপপ্রচার সত্ত্বেও দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা। শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরেও মানুষ নিরাপদে অফিস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, রাস্তায় চলাফেরা করছে মেয়েরাও। তোরা কুন্ডার ব্রিজ ভেঙে দেওয়ার পরও শহরে যাতায়াত করছে মানুষ, স্বয়ং নরেশও গিয়েছিল সেদিন দোকানের মাল কিনতে। নুরু মওলানা ঢাকায় গিয়ে তোর মামার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। রাস্তায়, স্টেশনে, ঘাটে আর্মিরা ডিউটি করছে সত্য, কিন্তু বাঙালি দেখামাত্র আর্মিকে গুলি করতে দেখেনি কেউ। সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে মুক্তিবাহিনীর ভেক নিয়ে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের ইন্ধনে কিছু দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী ফুটফাট গুলি চালিয়ে দেশে অশান্তি কায়েম রাখতে চায়। তাদের দমনের জন্য সারাদেশে তৎপর আছে পাকবাহিনী। কিন্তু নিরপরাধ যারা ইন্ডিয়ায় চলে গেছে, তাদের দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানাবে সরকার। মুজিব ও তার দলকে বাদ দিয়ে দেশে বেসমারিক সরকার গঠনের চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে। ছাত্র-যুবকরাও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে শিগগির। কিন্তু তুই এভাবে একা পালিয়ে থেকে অস্বাভাবিক আচরণ করছিস কেন?

তোমার পাকিস্তান আর ইসলামের পক্ষ নিয়ে আগের মতো মসজিদে যাওয়া আর তোমার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করে স্ত্রীসহবাস করাই কি আমার জন্য স্বাভাবিক আচরণ ভাবছ কাজী আফতাব চেয়ারম্যান?

নাম সম্বোধন করে মানিকের রূঢ় ব্যঙ্গ শোনার পরও কাজী চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয় না। বরং স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়।

দেখ রে মানিক, আমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোর কে আছে? আমার চেয়ে ভাল কেউ তোকে জানে না। রাজনীতি করা তোর কাজ নয়, স্বভাবও নয়। আল্লাহ-রসুলের ওপর পূর্ণ ইমান রেখে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়াটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যেমন ফরজ, তেমনি সেটাই স্বাভাবিক আচরণ। আর বয়স হলে বিবাহ করাটাও তো ফরজ। অন্য ছেলেদের মতো নিষিদ্ধ পথে নারীসঙ্গ খোঁজার ছেলে নস বলেই আমি তোর জন্য উপযুক্ত পাত্রী খোঁজা শুরু করেছি। এমেনের মেয়েকে বিয়ে করলেও আমি আপত্তি করতাম না। কিন্তু সে মেয়ে তো বাপের পথ ধরে ইন্ডিয়া ভাগল। বিদায়কালে তোর জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি সেই আসমা। অথচ সে চলে যাওয়ার পর তোর বইপত্রের ভিতর খুঁজে দেখেছিস — তোর জন্য কোনো চিঠি রেখে গেছে কি না। কিছুই পাস নাই তার কাছে। আজ সেই মেয়ের বিরহেই কাতর হয়ে কি এখানে বসে আছিস একা?

মানিক তো একা নয় আসলে। তার পেছনে পিতা ও পরেশ কাকাসহ হানাদার বাহিনীকবলিত স্বদেশের আতঙ্কিত জনতা। প্রতিটি ঝোপঝাড়ে অদৃশ্য অবস্থায় গেরিলা মুক্তিবাহিনী, ইন্ডিয়া সীমান্তের ওপারে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নির্বাচিত সাংসদ, মওলানা ভাসানী ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা, শরণার্থী শিবিরের কয়েক লাখ উদ্বাস্তু মানুষ। সবাই তাকিয়ে আছে যেন সংকটে মানিক কী করে। শত্রুর কারাগারে বন্দি মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নেতা মুজিব যেন মানিকের ভেতরেও গর্জে ওঠে — তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক নানার দাড়ি ধরে তার গালে অন্তত দুই মণ ওজনের চড় কষে দেয় একটা এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, পালিয়ে নিজের সুখ খোঁজার জন্য নয় রে বুড়ো শকুন! তোর মতো ঘরের শত্রু বিভীষণকে বধ করার উপায় খুঁজতেই এখানে বসে আছি আমি। ধর্মকে হাতিয়ার করে পাকিস্তান কায়েম ও টিকিয়ে রাখার জন্য বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিস তোরা। বাঙালি তার ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মুজিবের পেছনে একাট্টা হয়েছে। বুকের রক্ত ঢেলে দেশকে শত্রুমুক্ত করার শপথ নিয়ে বাণ্টুর মতো ছেলেরাও অস্ত্র হাতে নিয়েছে। আর তুই এখনো পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য বর্বর এয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর পক্ষে দালালি করছিস। আমাকেও দালাল হতে বলছিস তুই। তোর সেই নাতি আমি আর নই রে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে গোপনে নয়, প্রকাশ্য জনসমক্ষে তোর মতো দালালের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাটা হবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার প্রথম কাজ।

গাঁয়ের মসজিদ থেকে মগরেবের আজান শুনতে পায় সে। মুয়াজ্জিনের কম্পিত গলার আহ্বান ছাপিয়ে মানিকের নীরব চিৎকারের তেজ যেন আরো বেশি। সান্ধ্য প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা দেয় সে, না, ধর্মের পাঁঠা ও পাকিস্তানি দালাল নানাজির সঙ্গে তো নয়ই, নিজেও আর কোনোদিন মসজিদে যাবে না মানিক। নিজের জন্য ইহকাল-পরকালের সুখ নিশ্চিত করা নয়, বাঙালির মুক্তি ও বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য নিজের এই সামান্য জীবন উৎসর্গ করলাম আমি।

AMARBOI.COM

মানিকের পক্ষের মুক্তিকামী জনতা তুমুল করতালি দেয়। আসমানেও কি জয় বাংলা স্লোগান তোলে কেউ? মানিক তাকিয়ে দেখে, বিলের ওপরে এক ঝাঁক বগা কক কক আওয়াজ তুলে সাঁঝের আঁধার চটকে উড়ে যাচ্ছে। মানিক উঠে দাঁড়ায়। পেশাব চেপেছিল বেশ আগেই, যা মানিকের তেজ দেখেই বাড়তি চাপ প্রয়োগের সাহস পায়নি। মানিক এবার দাঁড়ানো অবস্থান থেকেই লুঙ্গি তুলে শিশ্ন ঘুরিয়ে পেশাব করে। অসময়ে বিলের অশরীরী জীবদের অপবিত্র করলে তারা প্রতিশোধ নেওয়ার পুরনো সংস্কারটি মনে জাগে ঠিকই, কিন্তু মানিক আজ তাদেরকেও পাত্তা দেয় না।

বাড়িতে স্বাধীন বাংলা শোনার ভিড় তৈরির আগেই পিতা ও পরেশ কাকাকে একত্রে পায় মানিক। জরুরি আলাপটা শুরু করে ভূমিকা ছাড়াই।

'ও কাকা, কাজী চেয়ারম্যানকে এবার একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে, যাতে আর পাকিস্তানের পক্ষে দালালি করতে সাহস না পায়।'

আগ্রহে জ্বলে ওঠে দুজনের দৃষ্টি। পরেশ সহাস্যে জানতে চায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবার কী শিক্ষা দিতে চাস বুড়াকে?'

'বুড়া শান্তি কমিটি করে পাকিস্তান রক্ষার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। প্রায় দিন শান্তি কমিটির মিটিং করছে। গতকালের মিটিংয়ে শুনলাম নরেশ কাকাও ছিল। আবার শুনছি হরিপুরে রাজাকার ক্যাম্প বসাবে। আর আপনারা মুক্তিযুদ্ধ খালি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনাতেই সীমাবদ্ধ রাখছেন।'

পরেশ জবাব দেয়, 'মুক্তিবাহিনী তো প্রতিদিনই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা অপারেশন চালাচ্ছে। কাল শুনলাম ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্ব নেতাদের পক্ষে আনতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ শিংকে বিদেশ সফরে পাঠিয়েছে আবার।'

'মুক্তিবাহিনী আর ইন্ডিয়ার ওপর নির্ভর করে দিনমান নিজেদের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকলে দেশ স্বাধীন করতে পারবেন আপনারা? গ্রামের লোকজন মানবে না আপনাদের নেতৃত্ব।'

'কী করতে বলিস আমাদের?'

'এখনো যেসব ছেলে ইন্ডিয়া পালায়নি বা পালাতে চায় না তাদের নিয়ে গ্রামেও একটি বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। গ্রামেই তাদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সামরিক ট্রেনিং দেবে কে? অস্ত্র পাবি কোথায়?'

'সেদিন বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন রিটায়ার্ড আর্মির কথা বলছিলেন না, গত বছর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরেছে। এরকম দু'চারজন আর্মিম্যান জোগাড় করেন। আর অস্ত্রের জন্য আমরা থানা লুট করব।'

নিজের ছেলেকেও অচেনা আর কথাবার্তাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল সজব ভুঁইয়ার। মাথা নিচু করে শুনছিল সে। পরেশ মানিকের দিকে কান ছাড়াও চোখ দুটি একাগ্র রেখেও মতামত দিতে পারে না। ভুঁইয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ও ভাই, কী বলে মানিক!'

ভুঁইয়া ছেলের দিকে তাকায়, 'তোর নানা সেদিন বাড়িতে এসেছিল তোকেও পরীক্ষা করতে। খবর পেয়েছি আমি, টাউনে গিয়ে সে জেলার মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেলের সঙ্গেও মিটিং করেছে। আমাদের নামের লিস্টও তার কাছে দিয়ে এসেছে। তুই ইন্ডিয়া না যাওয়ায় তোকে এখনো আগের মতো নিজের পক্ষে ভাবছে। কিন্তু তোর এসব কাণ্ডকীর্তির খবর পেলে তোকে ছেড়ে দেবে ভেবেছিস? মতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় নিজের ছেলেকেও সে ক্ষমা করে নাই।'

'নানাজি আর পাকবাহিনীর ভয়ে পুতপুত করলে দেশ স্বাধীন হবে না আব্বা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের দুঃসাহস দেখে ভুঁইয়া আরো ভয় পায়, নাকি সাহস বাড়ে, বোঝা যায় না। তবে পূর্ণ আস্থা রেখেই গোপন তথ্য জানায়, 'শোন, আমি খবর পেয়েছি, নদী ওপারেও মুক্তিবাহিনী আসছে। মুক্তিবাহিনী আসলে আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। এমেনের চেলা রশিদ বলে গেছে, মুক্তিবাহিনী আমার কাছে পাঠায় দেবে। মুক্তিবাহিনী আসলে তাদের সাথে বুদ্ধিপরামর্শ করে গোপনে অপারেশন চালাতে হবে।'

পরেশও তার নেতাকে সমর্থন করে বলে, 'তোর বাপ ঠিকই বলেছে মানিক। আমাদের কৌশলে আগাইতে হবে। আর ইন্ডিয়ায় গিয়া যদি তোকে মুক্তিবাহিনীর একজন কমান্ডার বানাইতে পারি, তোর নানাজিই তখন ভয়ে পুতপুত করবে। চল তো, আমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি আগে। বিকালে গিয়া নাকি তোর কাকির সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়েছিস।'

মানিক ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাবার দলবলের ওপর নির্ভর করে নয়, ইন্ডিয়া না গিয়েও নিজস্ব দলবল নিয়ে অন্তত মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় শত্রু শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানাজিকে অবশ্যই পরাস্ত করবে সে।

বাবা ও পরেশ কাকাকে এড়ানোর জন্য বলে সে, 'আপনি যান কাকা, ঘরে আমার একটু কাজ আছে।'

www.amarboi.com

একুশ

মুক্তিফৌজের মা আছিমন প্রতিরাতে ভুঁইয়াবাড়ি বা বাবুবাড়ি গিয়ে স্বাধীন বাংলা শোনার সময়-সুযোগ পায় না। হেপি ও টেপি দু'মেয়েই বড় বাধা। সবখানে সাথে নেওয়া যায় না, ছেড়েও যাওয়া যায় না। সকালে পেটে কিছু পড়লে দু'বোনই স্বাধীন হয়ে যায়। গ্রাম দাপিয়ে খেলাধুলা আর বিলের ধারে শালুক, মাছ-টাছ খুঁজেই সময় কাটে। আছিমনও তখন রাতে স্বাধীন বাংলা শুনতে না পাওয়ার বঞ্চনা পুষিয়ে নিতে স্বাধীনভাবে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। লোকমুখে যুদ্ধের নানা খবর শোনে এবং নিজেও শোনায়। ধান কাটামাড়ির মৌসুমে আগে ধানের কামে কেবল গাঁয়ের গেরস্তবাড়িতেই যাতায়াত করত। ধানের কাম করেও রোজ প্রায় এক কামলার রুজি করত আছিমন। এখন কাম ছাড়াই রতনপুরের সীমানা পেরিয়ে আশপাশের গ্রামেও ফকিরনির মতো ঘুরে বেড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তির মা ফকিরনি নয় অবশ্যই, ভিক্ষা সে কোনোদিন চায়নি এবং চাইবেও না কারো কাছে। কিন্তু মুক্তিফৌজ ছেলের গল্প শুনিয়ে হাত না পেতেও কারো কাছে যদি এটা-সেটা সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তা সে ন্যায্য পাওনা হিসেবেই নেয়। গাঁয়ের আর যে কয়টি বাড়ির ছেলে মুক্তিবাহিনীতে গেছে, সেইসব বাড়ির মা-ঝিদের কাছেও আছিমনের কদর বেড়েছে। আর মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্পর্কহীনরা আছিমনকে খাতির তো করেই, মনে মনে ভয়ও পায় বুঝিবা। শেখ মুজিব থেকে শুরু করে গাঁয়ের মোড়ল-দেওয়ানিরাও মুক্তিবাহিনীর সম্মান করে, গ্রামবাসী সেই মুক্তিফৌজের মাকে হেলা করে কোন আক্কেলে?

রেডিয়োতে যুদ্ধের খবর শুনে সবটা বুঝতে পারে না আছিমন। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় অনেক কিছু। যুদ্ধের খবর মানেই তো এতদিন ছিল পশ্চিমা মিলিটারির মানুষ মারার গল্প। নিত্যনতুন সেই ভয়ের গল্প এখনো বলে মানুষ। একদিন থানাবরের চেনা চৈতার বউও মুক্তিফৌজের মাকে ভয় দেখিয়ে বলে, 'মুক্তির মাও মাথায় কাপড় না দিয়া বেপর্দা ঘোরে! কোনোদিন-বা মিলিটারি ধরি নিয়া যায়! বাঙালি বুড়ি হউক আর চেংড়ি হউক, দেখা পাইলেই ধরি নিয়া যায়া ক্যাম্পে ল্যাংটা করে। একজন মুক্তির বইনকে নাকি পঞ্চাশজন মিলিটারি ঢেঁকির পাড় দিছে, তারপরও জানোয়ারগুলা তার দুধ আর ইয়াখানও কাটিয়া কুত্তাকে খাইতে দিছে। আল্লা রে আল্লা, বাংটু মুক্তির মাকে ধরলে না জানি কী করবে!'

বাংটু মুক্তিবাহিনী হওয়ার পর মিলিটারির ভয় তো আছিমন অনেকটাই জয় করেছে এর মধ্যে। বেপরোয়া জবাব দেয়, 'মোকে যদি ধরি নিয়া যায়, মরার আগে অন্তত বিচি থেঁতলে দিয়া এক হারামজাদাকে মারিম!

মুক্তিফৌজ ছেলের সাহসে আছিমনও এখন জয় বাংলার পক্ষে সাহসের কথা বলে। একা আছিমন নয়, মুক্তিবাহিনী হওয়ার পর মানুষের পাকবাহিনীর ভয়টাও কেটে গেছে অনেকখানি। এখন আজরাইলের মতো মিলিটারির গল্প শুনে মানুষ খালি ভয় পায় না, মুক্তিবাহিনীর হাতে কোথায় কীভাবে তারা জবাই করা মুরগির মতো দপদপিয়ে মরছে, সেসব খবরও গাঁয়ের খবরিয়ালরা উৎসাহভরে বয়ান করে। বিলের ডোবার মধ্যে গলা পর্যন্ত পানিতে নেমে মাথায় কচুরিপানা রেখে মুক্তিরা সেদিন নোয়াখালী না সিলেটে নাকি ঢাকাতেই বোধহয়, এক হাজার ছত্রিশজন মিলিটারিকে গুলি করে মেরেছে। মুক্তিফৌজ ভেবে মিলিটারিরা বিলের পানা, গাছের পাতা, বাঁশঝাড়ের বাঁশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি কুত্তা-বিলাইকেও এলোপাতাড়ি গুলি করে। বগুড়া কি দিনাজপুরে রাস্তায় মুক্তিফৌজরা নাকি কলাগাছের বাকলের নিচে লুকিয়ে ছিল। মিলিটারির ট্যাংক কি ট্যাংকি তাদের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় এমন এক বোমা মেরেছে, মিলিটারিসুদ্ধ সেই ট্যাংক কি ট্যাংকি ছাতু হয়ে বাতাসে মিশে গেছে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুদের একটা বালও ছিঁড়তে পারে নাই মিলিটারিরা। মুক্তিবাহিনীর এরকম বীরত্বগাথার পাশাপাশি মিলিটারি দুশমনদের মরার খবর শুনতে এবং শোনাতেও আছিমন আজকাল সারাদিনই প্রায় বাড়ির বাইরে ঘোরে।

গাঁয়ের পথে ঘুরতে গিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি পড়ার ভয়টাও একদম ছিল না তার। ছইঘেরা গরুগাড়িতে চড়ে নাইয়রিরা যেমন বেড়ানোর আনন্দ পায়, মাথায় ঘোমটা দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানোর সুখটা তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু মুক্তিফৌজের মায়ের এভাবে বেড়ানোর সুখটাও সহ্য হয় না শত্রুদের।

ঠ্যাংভাঙা স্কুলে আর তামাকপুরে রাজাকার ক্যাম্প বসার পর এলাকায় মিলিটারির ভয় ছাপিয়ে রাজাকারদের কাণ্ডকীর্তি প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। ঠ্যাংভাঙায় অবশ্য শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মানিকের নানা হুকুম দিয়েছে, রাজাকাররা কারো কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু তামাকপুরের রাজাকার কমান্ডার খোরশেদের ভয়ে সেখানকার চেয়ারম্যান-মেম্বাররাও কাঁপে। জয় বাংলা বলার অপরাধে চাবুক দিয়ে মেরেছে মেলা মানুষকে। স্বাধীন বাংলার ভুয়া খবর দেওয়ার অপরাধে আছাড় মেরে ভেঙেছে তামাকপুরের এগারোখান রেডিয়ো। ভয়ে খোরশেদ রাজাকারের ক্যাম্পে ভেট পাঠায় সবাই। ঘগেয়ার যাদব বাবুকে এক মণ চাল আর একটা খাসি ভেট পাঠাতে হুকুম দিয়েছিল খোরশেদ। যাদব বাবু হুকুম পালনে দেরি করেছে বলে তার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। ভয়ে ঘগেয়ার সব হিন্দু পালিয়েছে বাড়িঘর ছেড়ে। এক বিধবাকে মিলিটারির ক্যাম্পেও ভেট হিসেবে পাঠিয়েছে খোরশেদ।

রতনপুরে মিলিটারির খবর ছিল এতদিন দূরদূরান্তরের গজব, কিন্তু রাজাকারদের জুলুম যেন স্বচক্ষে দেখা সর্বনাশের আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়ায় মানুষের মনে। পড়শী ঢোঁড়াও একদিন বাণ্টুর মাকে সতর্ক করে, 'ও ভাবি, আজাকাররা হইল মিলিটারির আজা। তামার পাওয়ার বেশি, হুইস্যাল দিলেই মিলিটারি তড়াদ্দম আসিয়া খাড়া হইবে। এই যে, ঠ্যাংভাঙা স্কুলের দিকে ভুলকি দিতে ঠ্যাং বাড়ান না ভুলেও।'

ঠ্যাংভাঙায় না যাক, কিন্তু ঘগেয়ায় যাদব বাবুর বাড়িটা আগুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুড়েছে শুনে আছিমন স্থির থাকতে পারে না। কারণ সেই বাড়ি পেরিয়েই অল্প দূরে তার ছোট বোন ছমিরনের বিয়ে হয়েছে। নিজেদের ১০ শতাংশ জমি ছাড়াও গাই-বাছুর আছে ছমিরনের। রাজাকারদের ভয়ে ঘগেয়ার হিন্দুরা পালিয়েছে, কিন্তু কী হালে আছে ছমিরন — খবরটা কেউ তাকে সঠিক জানাতে পারে না। খবর জানার জন্য এক সকালে আছিমন নিজেই তামাকপুরের ঘগেয়া রওনা দেয়।

ভয়ে ভয়ে যত এগোয়, ততই বেশি জানতে পারে রাজাকারদের কুকীর্তির খবর। যাদব বাবুর সুন্দর বাড়িটার আগুনে পোড়া দশা, মাটিতে পড়ে থাকা ছাই, কাঠ ও টিনও দেখে নিজের চক্ষে। তারপর বোনের বাড়িতে গিয়ে বোনের সংসারের স্বাভাবিক হালচাল দেখে নিজের সংসারের মুক্তিফৌজ ছেলে ও স্বামীর শূন্যতা ভরাতে, সারা দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়েও মেলা কথাবার্তা বলে বোনের সঙ্গে। ছমিরন তামাকপুরে খোরশেদ রাজাকারের কুকীর্তির মেলা গল্প শোনায়, সেই সঙ্গে গরম ভাত ও পোড়া বেগুন ভর্তা খাওয়ায় বোনকে। বাড়িতে নেওয়ার জন্য চালের মিষ্টি কুমড়াও দেয় একটা। বোনের কাছে বিদায় নিয়ে ছহিছালামতে বেলাবেলি রতনপুরে ফিরে আসে আছিমন।

ঘগেয়া বোনের বাড়িতে যেটুকু পান্তাভাত খেয়েছে, তার সবটুকু রস তো শরীর থেকে নিংড়ে নিয়েছে তিন ক্রোশ পথ হাঁটার ক্লান্তি। তারপরও যাদব বাবুর জনমানবশূন্য পোড়াবাড়ি দেখা ও রাজাকার খোরশেদের সন্ত্রাসী খবর জানার অভিজ্ঞতার ভার ও চাপ তাতে কমে না। বরং হিন্দুটাড়ির কাছে চাপটা এত বেড়ে যায় যে, ঘরে ফেরার আগে বাবুবাড়িতে গিয়ে খবরটা জানানো জরুরি কর্তব্য মনে করে আছিমন। কাঁখের কুমড়াটা অবশ্য বেড়ানোর পথে বাড়তি বোঝা, কিন্তু ঘগেয়া যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে সেটাও উৎসাহ জোগায়।

বাবুর বাড়ি ছাড়াও গোটা হিন্দুটাড়িতে মুক্তিফৌজের মা হিসেবে কদর বেড়েছে বাণ্টুর মায়ের। রাস্তায় বাসুর রাঢ়িবুড়ি ছাগল হাতে মুক্তিফৌজের মায়ের কাঁখের কুমড়া সম্পর্কেও কৌতূহল দেখায়। আর কুমড়ার উৎসে যাওয়ার আগে ঘগেয়ার নাম শুনেই আর্তবিলাপ শুরু করে বুড়িটা, 'মুসলমানের পাকিস্তানত হেঁদুরা বুঝি আর থাকিবার না পারে মুক্তির মাও! খোরশেদ আজাকারের চেলারা ঠ্যাংভাঙাতেও ক্যাম্প দিছে। চেয়ারম্যান আর ভুঁইয়ারা কয়দিন তাদের আটকায় রাখপে?'

'তোমার বাড়ির কিছু হবার নয়, আগে সাহা বাবুর বাড়িতে খোরশেদ নিজে আসিয়া আগুন লাগায় দেবে। মোর বইন নিজের কানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনছে, জরুলি খবরটা দিয়া পরেশকে সতর্ক করতে আসনু মুই।'

'বাবুর বাড়িতে আগুন দিলে হামার বাড়িতে লাগতে কতক্ষণ?'

'সবাইকে হুঁশিয়ার থাকা লাগবে। যাঁও, আগে বাবুর বাড়িতে খবরটা দিয়া আইসোঁ।'

আগুন দেওয়ার পর যাদব বাবুর বাড়ির যে দশা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে সাহা বাবুদের বাড়ির অগ্নিদগ্ধ অবস্থা কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না আছিমনের। বড় গাছের নিচে ছোট গাছের মতো বাবুর বাড়ি ঘিরে যেসব ছোটখাটো হিন্দুবাড়ি, সেগুলোও পুড়ে ছাই হবে অবশ্যই। তার চেয়েও বড় কথা, পরেশ না হয় বউবাচ্চা নিয়ে ভুঁইয়াদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে। কিন্তু তার বিধবা পিসি ও বুড়ি মা? আর নরেশের বউ পোয়াতি, তাকে যদি রাজাকাররা দেখে, হয়তো পেটে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে গর্ভের ছেলেকে বের করবে।

বাবুবাড়িতে ঢুকে পরেশের মা-পিসির কাছে আসন্ন বিপদের কথা বলতে বাণ্টুর মা ঘগেয়ার অভিজ্ঞতার বয়ান শুরু করতে না করতেই ঘর থেকে বেরয় স্বয়ং পরেশ। বাণ্টুর মাকে ধমক দিয়ে বলে, 'মুক্তিফৌজের মা হয়াও হামাকে ভয় দেখানোর জন্য এ বাড়িতে ঢুকছিস! ঠিক করিয়া কও তো, কাঁয় তোকে হামার বাড়িতে পাঠায় দিছে?'

'ঘগেয়ায় নিজের চোখে দেখি আসনু মুই। সউগ হিন্দুরা আজাকারের ভয়ে বাড়ি ছাড়ি পালাইছে।'

'হামরা পালাবার নই। সাহাদের বাড়িতে আগুন দেওয়া এত সোজা না। নদীর ওপারে হামার মুক্তিবাহিনী আসি গেইছে, রাখিস সেই খবর? সব রাজাকারের বাচ্চাকে এই খবর দিয়া বেড়াও, যা, ভাগ।'

মুক্তিবাহিনীর খবর অবশ্য আছিমনের চেয়ে পরেশেরই ভালো জানার কথা। কিন্তু নদীর পাড়ে আসা মুক্তিবাহিনীর মধ্যে তার বাণ্টুও আছে কি না, এ কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। বাণ্টু আসলে মুক্তিফৌজ হয় নাই, হয়েও যদি থাকে যুদ্ধ করতে গেলে গুলি খেয়ে মরবে নির্ঘাৎ। স্বয়ং ভুঁইয়া যেখানে এরকম মন্তব্য করে, তার সাথী হয়ে পরেশ কি বাণ্টুর মাকে বাণ্টুর ভালো খবর দেবে? কাজেই মুক্তিবাহিনী আসার আগে খোরশেদ রাজাকার সত্যই যদি সাহাদের বাড়িতে আগুন দেয়, তাতে কি আছিমনের খুশি হওয়া উচিত নয়? বেজার মুখে বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে।

পাকবাহিনীর খাস লোক হয়েও রাজাকাররা সজব ভুঁইয়া, পরেশ বা শেখের মামুর মতো জয় বাংলার আসল লোক ছেড়ে আছিমনের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুচ্ছ মেয়েমানুষকে ধরতে আসবে, কখনো ভাবেনি সে। আগুন জ্বললে তো বড়বাড়িতেই আগে জ্বলার কথা। স্বাধীন বাংলা শোনা নিষিদ্ধ হলে ওদেরই রেডিয়ো ভাঙার কথা। বাণ্টু মুক্তিফৌজ হয়েছে, মুক্তিফৌজের মা আছিমনের এটাই একমাত্র দোষ। কিন্তু এই দোষের জন্য ঘরে লুকিয়ে থাকার মানুষ সে নয়। মুক্তিফৌজ বেটার জন্য গর্ব তো আছেই, যুদ্ধে সে মরে কী বাঁচে — এই দুশ্চিন্তাও কম নয়। মুক্তিবাহিনী নদীর ওপারে এসেছে শুনে মন তাই বড্ড উতলা হয়ে ওঠে। পরেশের কাছে শোনা খবরটার সত্যতা যাচাই করতে নজিবর ছাড়াও মুক্তিফৌজ আম্বার ও কাশেমের বাড়িতেও যায়।

সবার মুখেই এক কথা, পাকবাহিনী ও তাদের দালালদের খতম করাই যেহেতু মুক্তিবাহিনীর কাজ, দুর্ধর্ষ রাজাকার খোরশেদ ও তার দলবলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনী অবশ্যই একদিন আসবে। কিন্তু মুক্তিরা তো পাকবাহিনীর মতো গাড়ি, কামান-ট্যাংক বা উড়োজাহাজ নিয়া চলাফেরা করে না। শেখ মুজিবর মুক্তিবাহিনীকে পুলিশ-মিলিটারির মতো ড্রেসও দিতে পারে নাই। ক্ষেতের কামে যাওয়ার মতো লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে, হাতে রাইফেল-বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটেই যুদ্ধ করতে যায় ওরা। লোকেরা চট করে দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। কারণ ওরা ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ঝোপঝাড়, কি পানিতে মিশে থাকে। খাওয়ার ঠিক নাই, রাতেও ঘুমায় না, দিনেরাতে খালি অপারেশন করে শত্রুকে মারার তালে আছে। এরকম দুজন মুক্তিফৌজকে নদীর পাড়ে আম্বারের বড় ভাই আনসার নিজের চোখে দেখেছে এবং কথাবার্তাও বলেছে শুনে আছিমন নিজেও একদিন নদীপাড়ের দিকে হাঁটতে থাকে।

যাওয়ার পথে ভুঁইয়াবাড়ির খুলিতে মানিককে গাঁয়ের আরো দুটি চেনা ছেলের সঙ্গে গল্প করতে দেখে। মানিক যদি বাণ্টুদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীতে যেত, দুশ্চিন্তা কম হতো আছিমনের। কিন্তু ছেলেটা হবু শ্বশুর-শাশুড়ি, কি বউয়ের সাথেও যায় নাই পর্যন্ত। বসে বসে বাড়ি পাহারা দেয় কি না কে জানে। তবে দিনেরাতে রেডিয়ো শোনে বলে যুদ্ধের খবর মানিকই সবচেয়ে বেশি জানে। মুক্তিবাহিনীর আসার খবরটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাণ্টুর মা তাকেও জিজ্ঞেস করে।

মানিকও জোর দিয়ে একই কথা বলে, শত্রু যেখানে মুক্তিবাহিনী সেখানে আসবেই চাচি।

গ্রামে আসা মুক্তিবাহিনীর মধ্যে বাণ্টু থাকবে কি না — প্রশ্নটা জোর দিয়ে কাউকে সে করতে পারে না, নিশ্চিত করে কাউকে বলতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। না থাকুক বাংটু, অচেনা মুক্তিবাহিনীকে নিজের চোখে দেখলেও মনটা ভরে যেত, হয়তো বাংটুর খোঁজখবরও পেত তাদের কাছে।

'মুক্তিবাহিনীকে দেখার খুব হাউস মোর বাবা।

'অবশ্যই দেখতে পাবেন। এখন যাও চাচি, আমরা একটা জরুরি আলাপ করছি।'

ভুঁইয়াবাড়ির সামন দিয়ে বাংটুর মা আজ নদীপাড়ের বাঁধ সড়কের দিকে হাঁটতে থাকে। বড় রাস্তায় ওঠার আগে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা একটি ছেলে সতর্ক করে, 'ও বাহে, উতিকোনা যান না। কোনবেলা-বা যুদ্ধ লাগে!'

মুক্তিবাহিনী এসেছে কি না — খবরটা তাকেও জিজ্ঞেস করলে, জবাব না দিয়েই ছেলেটি ছুটে পালায়। আস্তে আস্তে বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠে আছিমন। নদীর দিক থেকে আসা দশ-বারোজন যুবকের একটি দলকে দেখে চমকে ওঠে সে। সবার হাতে রাইফেল। লাইন ধরেই হেঁটে আসছে ওরা।

জীবনে একবার মাত্র পুলিশ দেখেছে বাংটুর মা, তাও সে ঘটনা বাংটুরও জন্মের আগে। দূর থেকে খাকি রঙের পুলিশ ও তার হাতে বন্দুক দেখে ভয়ে পাটক্ষেতে গিয়ে লুকিয়েছিল। রিলিফের জামা গায়ে দিয়ে বাউদিয়া স্বামী পুলিশ সেজে একবার তাকে ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু মিলিটারি, রাজাকার, কি মুক্তিবাহিনীকে স্বচক্ষে দেখেনি এখনো। অস্ত্রধারী দলটিকে মুক্তিবাহিনী ভেবেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে। মুক্তিবাহিনী ভেবে বাংটুর মা তাদের মধ্যে বাংটুকে খোঁজে। কাছাকাছি আসলে সে দেখতে পায়, মুক্তিবাহিনীর মতো চেহারাসুরত হলেও চারজনের পরনে পুলিশের মতো খাকি পোশাক আর তিনজনের মাথায় টুপি, থুতনিতে দাড়িও আছে।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চায় বাংটুর মা, 'বাবা তোমরা কি মুক্তিবাহিনী না হন?'

'ও বাহে ফকিরনির বেটি, এই গ্রামের কেউ কি মুক্তিবাহিনীতে গেছে জানেন? ইন্ডিয়ায় যায় নাই কেউ?'

বাংটুর মা প্রায় নিশ্চিত হয়েই গর্বের সঙ্গে পরিচয় দেয়, 'মুই ফকিরনি না হঁও বাবা, মুই মুক্তিফৌজ বাংটু বক্করের মাও। অতনপুরের আরো চারটা চ্যাংড়ার সাথে বাংটু মুক্তিবাহিনীতে গেছে, তারপর যুদ্ধ করি বাঁচি আছে না মরি গেইছে আল্লায় জানে।'

সশস্ত্র দলটি থামে। বাংটুর খবর দেওয়ার বদলে একজন অবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে বলে, 'তুই মুক্তিফৌজের মা! পাইছি একজনকে, এই, এটারে নিয়ে চলো ক্যাম্পে। এই বেটির কাছে আরো খবর পাওয়া যাবে। এই মাগি, পালাইতে চেষ্টা করলে কিন্তু গুলি করব।'

গাঁয়ের পরিচিত যুবকদের চেহারাসুরত নিয়ে সশস্ত্র দলটি যে আসলে ঠ্যাংভাঙা স্কুলের রাজাকার বাহিনী, সেটা আবিষ্কার করে বাণ্টুর মা হকচকিয়ে যায় বটে, কিন্তু ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় না। বরং দুর্ধর্ষ রাজাকারদের কণ্ঠে গাঁয়ের বুলি শুনে তার ঝগড়ার মেজাজ বুকের ধকধ্ক উত্তেজনায় আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

'মুক্তিফৌজের মাকে মারা এত সোজা! মোর বেটা কার বাড়িতে চাকরি করছে জানেন না? মানিকের চেয়ারম্যান নানাজি পর্যন্ত বাণ্টুকে নিজের নাতির মতো গণ্য করে। চেয়ারম্যানের বাড়ির সবাই চেনে তাকে।'

'তোর বেটা কত বড় মুক্তিফৌজ আমরা দেখব। এখন চল ক্যাম্পে, চল, আগে আগে হাঁট, না হইলে কিন্তু হাত-পা বাঁধি নিয়া যাব।'

একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিঠে গুঁতো মেরে বাণ্টুর মাকে তাদের সাথে হাঁটতে বাধ্য করে। রাইফেলের নলের মুখে বাণ্টুর মা হাঁটে বটে, ভেতরের চমক-রাগ-ক্ষোভ-আতঙ্কের মিশ্রণ গলে পানি না হওয়া পর্যন্ত কণ্ঠের বিলাপ চলতেই থাকে।

AMARBOI.COM

মুক্তিফৌজ বাণ্টুর মাকে রাজাকার বাহিনীর হাতে বন্দি এবং ঠ্যাংভাঙা স্কুলের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবরটা দুই কান থেকে দশ কান হয়ে রতনপুরে পৌঁছতে সময় লাগে না তেমন। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় বাণ্টুর মায়ের গালে রাজাকার কমান্ডারের পাটধোয়া চড়, পাছায় রাইফেলের বাড়ি, থানার আর্মিক্যাম্পে চালান করে দেওয়া এবং কোনো কোনো সূত্রে স্কুলের পেছনের ডোবায় গুলি করে মারার ঘটনাও যুক্ত হয়ে টাটকা খবরটা রতনপুরে বেশ আলোড়ন জাগায়। মাদু বড়বাড়ির গরুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য যখন বলদ দুটির দড়ি ধরে বিলের দিকে যাচ্ছিল, তখন একাব্বরের কাছে প্রথম খবরটা জানতে পারে। বিশ্বাস না করায় গরুকে আলের মধ্যে বেঁধে রেখেই বাড়ির দিকে ছোটে। ঘরে মা এবং হেপি-টেপিকেও দেখতে না পেয়ে, ধানকাটার কাম শেষে সদ্য বাড়িতে আসা ঢোঁড়া চাচাকেও বেশ চেঁচিয়ে খবরটা দেয়, 'ও চাজি, হামার মাকে যে আজাকাররা ধরি নিয়া গেল!'

ঢোঁড়াও খবরটা শুনে এসেছে, ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় সে, 'খবর তো ঠিকই। ধরি যখন নিয়া গেইছে, তখন মুক্তিফৌজের মাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোরশেদ আজাকার এমন চোদন দেবে, জিন্দেগিতেও ভুলবার নয়। আজাকার হইল মিলিটারির আজা।'

মাদু চাচার সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে মনিববাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

খবরটার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর মানিক নির্বিকার বসে থাকতে পারে না। ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাণ্টুর মায়ের মুক্তিফৌজের মা হিসেবে অহেতুক গর্ব ফলনো এবং তার বেপর্দা গায়ে ঘোরাফেরা ও ঝগড়ু স্বভাবকে দায়ী করেও কথা বলে অনেকে। কিন্তু মানিকের স্বাধীনতার শত্রুবিনাশী ক্রোধ ও উত্তেজনা তাতে বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় না। বাবা বা পরেশের সঙ্গে আলোচনা না করে, এমনকি সাথীসমর্থক ছাড়াই সে চুপচাপ সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে একাই বেরিয়ে যায়।

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানা কিংবা স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর মুখ দর্শনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না মানিকের। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী স্থানীয় ও দেশি শত্রু দমনের জন্য নানারকম অভিযানের ভাবনা-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়ে গাঁয়ের কিছু ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছে আজো। কোনো সশস্ত্র বাহিনীকেই একা বা নিরস্ত্র অবস্থায় মোকাবিলা করা যায় না। এরকম প্রস্তুতিও ছিল না তার। একা রাজাকার ক্যাম্পে যাওয়ার দুঃসাহসিক পরিণতিতে মুক্তিফৌজের মায়ের সঙ্গে আজ মানিকও হয়তো গুলিবিদ্ধ কিংবা নিকটস্থ আর্মি ক্যাম্পে চালান হবে। এরকম আশঙ্কা জাগলেও মানিকের সাইকেলের গতি কমে না। বরং সকল আশঙ্কা ও ভাবনা-চিন্তা ছাপিয়ে ভেতরে পুষে রাখা শত্রুবিনাশী ঘৃণা ও ক্রোধ শরীরের ভেতরে এতটাই চনমন করে জাগে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তা ফোঁস ফোঁস করে নির্গত হয়। চকিতে মানিক আরো দেখতে পায়, ইয়াহিয়া খানের সামরিক কারাগারে শেখ মুজিব অনিবার্য মৃত্যুর মুখেও জয় বাংলা জপ করছে, অগণিত মুক্তিযোদ্ধার শরীরের রক্ত বাংলার মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও মুক্তিবাহিনী চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক অপারেশন, আর একান্ত আপনজন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের অনুগত বাহিনীর বর্বরতা নিঃশব্দে মেনে নেবে সে?

ঠ্যাংভাঙা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে রাজাকার ক্যাম্প হওয়ায় জায়গাটায় নতুন করে তেমন আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। রাজাকারদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে হাটবাজারও প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলছিল। স্কুলে ঢোকার নির্দিষ্ট কোনো গেট নেই, তবু রাজাকার ক্যাম্পের দুজন সশস্ত্র সেন্ট্রি ডিউটিতে ছিল। মাঠে বসে গল্প করছিল ওরা। একজনের থুতনিতে দাড়ি ও মাথায় টুপিও আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিককে দেখে ওরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

মানিক সাইকেল থেকে নামলে ওরাও এগিয়ে আসে। নানাজির প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও মানিক তাকে স্মরণ করেই রাজাকার দুটিকেও সালাম দিয়ে আত্মপরিচয় দেয়, 'আমি মানিক। কাজী চেয়ারম্যান আমার নানা।'

পরিচয় পেয়ে খুশি হয় রাজাকার দুটি। দাড়িঅলাটি বলে, 'আপনি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের নাতি! আপনার বাবা আওয়ামী লীগের নেতা না, রতনপুরের?'

'হ্যাঁ।'

অন্য রাজাকারটি আরো বেশি আন্তরিক কণ্ঠে বলে, 'আমি আপনাকে চিনি মানিক ভাই। স্টেশনে দেখা হছিল একবার। স্টেশনের পশ্চিমে পারুলে আমার বাড়ি। রাজাকারের চাকরি নিয়া কী বিপদে যে পড়ি — খুব চিন্তায় আছি মানিক ভাই।'

'তোমাদের কমান্ডার কে? ডাক তো তাকে।'

ওরা মানিককে স্কুলঘরে নিয়ে যায়। ওস্তাদকে ডেকে মানিকের পরিচয়ও সবিস্তার জানায়।

রাজাকার কমান্ডারটি মানিকের চেয়েও বয়সে পাঁচ-সাত বছরের বড় হবে, পুলিশের মতো খাকি পরনে। মানিককে সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়, 'আপনার কথা চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে অনেক শুনেছি। শত প্রলোভন সত্ত্বেও ইন্ডিয়া পালান নাই আপনি। কিন্তু আপনাদের গ্রামে তো অনেক দুষ্কৃতকারী আছে।'

একজন স্কুলের একটি হাতল ভাঙা চেয়ার এগিয়ে দেয় মানিককে বসার জন্য। কিন্তু মানিক দাঁড়িয়ে সরাসরি জানতে চায়, 'দুষ্কৃতকারী ধরার বদলে আপনারা আমাদের গ্রামের এক গরিব মহিলা বাণ্টুর মাকে ধরে এনেছেন কেন?'

'হ্যাঁ, ওই খতরনাক আওরাত তো নিজেই নিজেকে মুক্তিফৌজের মা দাবি করছে।'

স্কুলঘরের কোণে টিউবওয়েল আছে, সেইখানে বাণ্টুর মা রাজাকারদের হাঁড়িপাতিল ধোয়ার কাজ করছিল। একটা হাঁড়ি হাতেই সে ছুটে এসে মানিককে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'ও বাবাজান, মোকে আজাকাররা ধরি আনছে বাহে। এমার কাম না করলে বলে মিলিটারির ক্যাম্পোত চালান করি দেবে।'

'একে ছেড়ে দাও এক্ষুনি। এলাকায় শান্তি স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তোমরা এখানে এসেছ। কিন্তু এরকম গরিব মেয়েমানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে ক্যাম্পে আনলে গাঁয়ের লোকজন রাজাকারকে আরো খারাপ ভাববে।'

কমান্ডারটি ভয় পায়, আবার নাখোশও। বলে, 'আপনি শিক্ষিত যুবক। মুক্তিফৌজ মানে দুষ্কৃতকারী, আর দুষ্কৃতকারীদের দমনে পাকবাহিনীকে সাহায্য করা আমাদের কাজ। আমাদের ওপর অর্ডার আছে।'

'এই গরিব মহিলা কি দুষ্কৃতকারী?'

অন্য একজন কৈফিয়ত দেয়, 'ও মানিক ভাই, ক্যাম্পে আমরা নিজেরাই রান্নাবান্না করি খাই তো। চেয়ারম্যান সাহেবসহ অনেকেই চাল-ডাল দিয়া আমাদের সহযোগিতা করছে। ওই মহিলাকে আনছি রান্নাবান্নায় সাহায্য করার জন্য।'

'না, ওকে এখনই ছাড়তে হবে। এটা ঠিক করো নাই তোমরা। মেয়েমানুষকে এভাবে ধরে আনা ঠিক না। হাদিস-কোরানেও এটা অ্যালাউ করবে না।'

মানিকের দৃঢ়তায় রাজাকার কমান্ডারটিও যেন ভয় পেয়ে যায়। কৈফিয়তের সুরে বলে, 'ওর কাছে কথা আদায়ের জন্য এমনি একটু ডর দেখাইছি। ছেড়ে দিচ্ছি এখনই, এই বেটি, যা বাড়িতে, বেপর্দা আর রাস্তায় ঘোরাফেরা করবি না।'

ছাড়া পেয়ে বাংটুর মা হাঁড়ি ফেলে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। মানিকও রাজাকারদের সঙ্গে বাড়তি আলাপ করার আগ্রহ ও সাহস খুঁজে পায় না নিজের ভেতরে। ওদের চায়ের দাওয়াত অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়ায়। শিগগির আবার দেখা হওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিদায়ী সালাম না দিয়েই দ্রুত সাইকেলে উঠে বসে।

বাংটুর মাকে মুক্ত করার সহজ সাফল্যের পর মানিক নিশ্চিত ছিল, তার সাহস ও বীরত্ব নিয়েও গাঁয়ের লোকজন এবার মেলা অতিশয়োক্তি করবে। কুন্ডার ব্রিজ ভেঙে দেওয়ার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি এলাকায় তার জনসমর্থন আরো ব্যাপক হবে। কিন্তু মানিক নিজের সস্তা বীরত্ব বা কৃতিত্বের জন্য কোনোরকম অহংকার দেখাবে না। বরং কয়েক গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করে রাজাকার ক্যাম্প নির্মূল করা এবং সবাইকে সম্ভব না হলেও বেশ কিছু রাজাকারকে তার মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনা-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

মুক্তিফৌজের মায়ের ধরা পড়া ও মুক্তির ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যায় ভুঁইয়াবাড়ির স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে ভিড় জমে উঠবে ভেবেছিল মানিক। কিন্তু ঘটে তার উল্টোটা। পরেশ ও নজিবর ছাড়া রেডিয়ো শুনতে তাদের বাড়িতে কেউ আসে না। সজব ভুঁইয়া ছেলের বীরত্বে খুশি হওয়ার বদলে নতুন শঙ্কা প্রকাশ করে, 'বাণ্টুর মায়ের জন্য তোর ওই রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি। রাজাকার কমান্ডার সাইকেল নিয়ে রিপোর্ট করতে আর্মি ক্যাম্পে গেছে শুনলাম।'

'লাঠিবল্লম নিয়ে কয়েকশ লোক ক্যাম্প ঘেরাও করলে ওরা ছুটে পালাবার পথ পাবে না।'

কিন্তু মানিকের এরূপ পরিকল্পনাকেও শতকরা এক ভাগ সমর্থন দেয় না তার বাবা কিংবা পরেশ কাকা। স্বাধীন বাংলার চরমপত্র না শুনেই পরেশ মানিককে চুপিচুপি সতর্ক করে, 'আজকের রাতটা আমাদের কারোরই বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। ও মানিক, তোর বাপের মতো রাতটা তুই কারো বাড়িতে গিয়া থাকিস।'

বাইশ

AMARBOI.COM

অবশেষে বর্ষাকালে, আগস্টের এক বিকেলে পরেশ কাকার সঙ্গে ইন্ডিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয় মানিকের। বলা চলে, গাঁয়ের পরিস্থিতি ও বাবাই তাকে ঠেলে পাঠায়। আর পরেশ তাকে টেনে নিয়ে যায়। পরেশ একা নয়, সঙ্গে তার বউ-বাচ্চাও। ছোট ভাই নরেশ ও মা-পিসির জিম্মায় ব্যবসা এবং ঘরগেরস্তালি রেখে ইন্ডিয়া পালানোর পারিবারিক প্রস্তুতি তার অনেকদিন ধরেই চলছিল। মানিক ঘনিষ্ঠ হয়েও তেমন টের পায়নি। গ্রামবাসীদের টের পেতেও দেয়নি পরেশ। মিলিটারি-আতঙ্ক তো ছিলই, তার ওপর এলাকায় রাজাকার ক্যাম্প হওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা সাহাদের পালানোর খবর দিয়ে আরো নাজুক করতে চায় না সে। পাড়া-পড়শীকে কাছাকাছি বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে হাসিমুখে বিকেলে গরুগাড়িতে চেপে বসে তারা।

তিস্তা নদীর ভাঙা ঘাটের কাছাকাছি একটি নালার পাড়ে গিয়ে গরুগাড়ির যাত্রা শেষ হয়। বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে মাইলখানেক পথ হেঁটে চরের পরিচিত সুহা বর্মণের বাড়িতে গিয়ে ওঠে তারা। সেখানে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জড়ো হয়েছে আর পাঁচটি পরিবার। রাজাকার খোরশেদের ভয়ে ঘগেয়ার উদ্বাস্তু দুটি পরিবার ছাড়াও পরেশের পরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো তিনটি পরিবার। সবার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছে পরেশ কাকা, পালাবার পথঘাট ও সাহায্যকারী লোকজনও ঠিক করে রেখেছে। সব মিলিয়ে ছয়জন মহিলা আর তাদের বাচ্চা-কাচ্চাসহ একুশজনের একটি শরণার্থী দল। তিন-চারজন পুরুষ মানিকের মুখচেনা। নামধাম না জানলেও একজনকে ধুতি পরা অবস্থায় ঠ্যাংভাঙা বাজারে দেখেছে অনেকবার, আজ তার পরনে লুঙ্গি। অন্য যাত্রীদেরও, বিশেষ করে মহিলাদেরও হিন্দু হিসেবে চেনার উপায় নেই। হাতে শাঁখা বা সিঁথিতে সিঁদুর নেই কারো। মিলিটারি-রাজাকার ছাড়াও ইন্ডিয়া পলাতক শরণার্থীদের সর্বস্ব লুটে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ডাকাতদলের খবর কারো অজানা নয়। মালতী একটুও সাজগোজ করেনি, তারপরও দলের মধ্যে সেই একমাত্র যুবতী বধূ ও সুন্দরও। অবশ্য সেজেগুজে শাড়ি-পরা একটি কিশোরীও আছে।

নদীপাড়ের সাময়িক আশ্রয়দাতা সুহা বর্মণ যাবে না। না যাওয়ার কারণও সে হাসিমুখে জানায়, তিস্তার ভাঙনে বিষয়সম্পত্তি সবই গেছে, বাকি যেটুকু আছে তাও যদি মুসলমানরা কেড়ে নেয় এবং মুখাগ্নি করার জন্য কেউ পাশে না থাকে, নাও ছাড়াই তিস্তায় নিজেকে ভাসিয়ে দেবে। নিজে না গেলেও ইন্ডিয়া যাওয়ার বড় নৌকা ও বিশ্বস্ত মাঝিমাল্লা সুহা বর্মণই ঠিক করে দিয়েছে। নৌকার একটানা যাত্রায় অভিজ্ঞ মাঝি সরাসরি নিরাপদ ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছে দেবে। নিরাপত্তার কথা ভেবেই সহজ স্থলপথ এড়াতে দীর্ঘ নৌযাত্রাকে বেছে নিয়েছে সবাই। স্রোতের টানে, কখনোবা স্রোত উজিয়ে ঘুরপথে তিনটি নদী অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে গন্তব্যে। আজ সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করলে পরদিন রাতের মধ্যেই বর্ডারের কাছাকাছি মুক্ত এলাকায় পৌঁছার আশা সবার। দীর্ঘ নৌযাত্রায় সান্ত্বনা এই যে, অচেনা বিপদসংকুল পথ আর পায়ে হাঁটতে হবে না। রাস্তায় কে যায়, কোথায় যায় — ইত্যাকার কৌতূহলী প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হবে না যাত্রীদের। বিপদ-আপদের যেটুকু আশঙ্কা, তা অভিজ্ঞ মাঝিরাই সামলে নেবে। এ জন্য তারা যাত্রীপ্রতি ভাড়া দাবি করেছে অনেক বেশি।

যাত্রা শুরুর আগে নৌকার মালিক মাঝবয়সী মাঝি ও তার দুই জোয়ান সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনজনই যাবে তারা। বয়স্ক মাঝিটির মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, মাথায় টুপি, পেশিতে এখনো যৌবনের বলিষ্ঠতা। কথায় ভাটি অঞ্চলের টান, 'ও বাবু, আমার পাওনা টেকা সব মিটায় দেন আগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে অর্ধেক অ্যাডভান্স তো দিয়েছি। বাকিটা পৌঁছে দেওয়ার পর পাবে।'

'পৌঁছায় দিবার আগেই যদি গাঙে বিপদ-আপদ হয়, তখন আপনাগোরে টাকা আমার পরিবারের কোনো কামে লাগব না। পরানডাও হারামু। না বাবু, নাও ছাড়ার আগেই আমার ষোলোআনা পাওনাপাতি বুঝায় দেওন লাগব।'

বিপদের কথা শুনে পরেশ ও অন্য যাত্রীরা মানিকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। একমাত্র মানিকই দলের মধ্যে একা এবং নির্ঝঞ্ঝাট। সবাই যেখানে প্রাণ বাঁচাতে সপরিবারে ইন্ডিয়া পালাচ্ছে, সেখানে মানিক যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে। বিখ্যাত নানা ও বাবার কারণেও বিপন্ন হিন্দু পরিবারগুলোর মাঝে নেতৃত্বের আসন পেয়ে যায় যেন।

মানিক জিজ্ঞেস করে, 'পথে কি বিপদ-আপদের ভয় আছে?'

'বিপদ তো বাবু এহন দেশ জুইড়া। একদিকে পাকবাহিনী, আরেক দিকে মুক্তিবাহিনী। তাবাদে অহন হইছে রাজাকার, ভয় না থাকলি আপনারা দ্যাশ ছাইড়া পালাইতেছেন ক্যান?'

পরেশ মানিককে আড়ালে ডেকে কানে কানে বলে, 'লোকটাকে সুবিধার মনে হচ্ছে না মানিক। তখন বলল এক কথা, এখন শালা আবার ভয় দেখাচ্ছে। এই চরুয়া মাঝিরা ডাকাতিও করে, ডাকাতদলের সঙ্গে লিংক আছে এদের। তাছাড়া সুহা বর্মণও মনে হয় নাও ভাড়ার দালালি খাবে।'

'ও বাবু, ভয় করেন না গো। এই নায়ে আমি চোদ্দ ক্ষেপ শরণার্থী ইন্ডিয়া চালান কইরা দিছি। হায়াত-মউতের মালিক হইল ওপরআলা, আপনেরা কন ভগমান, আমরা কই আল্লা। তিনি নিলে আমি তোমাগো সোনার নায়েও আটকে রাখতে পারুম না। আর তিনি রাখলে মিলিটারির গুলিতেও তোমাগো মরণ হইব না।'

মাঝির খাঁটি কথা বলার আত্মবিশ্বাসী হাসিতে কোনো দ্বিধা-ভয় নেই। মানিক ভাবে, ডাকাত-বদমাশ নয়, আসলে ধার্মিক স্বভাবের মানুষ, এভাবে কথাবার্তা বলাটা তার অভ্যাস বোধহয়।

বৃদ্ধের জোয়ান সঙ্গী দুটি নির্বিকার। যেন বিপদ-আপদ মোকাবিলা করে বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে ডাল-ভাতের মতো সহজ ব্যাপার। মানিক মাঝির প্রাপ্য পুরো টাকাটাই শোধ করে দেওয়ার পক্ষে মত দেয়।

টাকা পেয়ে মাঝিরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলে নৌকা আনতে যায়। পরেশ সহযাত্রীদের চাপা কণ্ঠে সতর্ক করে, 'মাঝিটার ভাবগতি ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেকছে না বাহে। হুঁশিয়ার থাকবেন সবাই।' ভয় দূর করতে সুহা বর্মণকেও হুঁশিয়ার করে পরেশ — 'ও সুহাদা, মাঝি যদি নিরাপদে পৌঁছাইতে না পারে, তা হইলে এই মানিকের নানা-বাবারা তোকেও কিন্তু ছাড়ি দেবে না।'

সুহা বর্মণ দলিল মাঝি সম্পর্কে আশ্বস্ত করে। এর আগেও দূরদূরান্তের কিছু হিন্দু পরিবার তার বাড়ি থেকেই দলিল মাঝির নৌকায় নিরাপদে ইন্ডিয়ায় গেছে। সুহা বর্মণ নৌকায় তুলে দেওয়ার আগে সবাইকে নদীর ছোট মাছ দিয়ে গরম ভাত খাওয়ায়।

সন্ধ্যার পর নৌকায় উঠে বসে সবাই। নৌকাটি বেশ বড়ই, কিন্তু যাত্রী অনুপাতে মাঝখানের ছই তত বড় নয়। ছইয়ের ভেতরে মালপত্র ও বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বসে মেয়েরা। ছইয়ের দুই দিকের পাটাতনে পুরুষ যাত্রীরা। বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ ছিল। সন্ধ্যায় আকাশের সব নক্ষত্র ঢেকে দিয়ে মেঘ বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি হলে পুরুষ যাত্রীদের ভিজতে হবে। অবশ্য বৃষ্টিবর্ষা ঠেকানো ছাতাও আছে কয়েকটি। স্রোতের টানে নৌকা ভাটির দিকে দ্রুতই ভেসে চলে।

হাল ধরে থাকা দলিল মাঝির আসলে বাচাল স্বভাব, পাটাতনে বসে থাকা পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে অনর্গল।

'তা বুঝলেন গো বাবু, এ দ্যাশে হিন্দুরা মনে হয় কেউই থাকব না। কারণটা কী কন তো। ইন্ডিয়া আপনাগো লাইগা বোর্ডার খুইলা দিছে, কেউ খালি পরানডা হাতে লইয়া ধর্ম রাখতে ইন্ডিয়ায় যাইতেছে, আবার কেউ যাইতেছে বস্তাভরা টাকা, কাঁসা-পিতল-সোনাদানা লইয়া। পাকিস্তান আর জয় বাংলা না, ইন্ডিয়াই হইল সারা দুনিয়ার হিন্দুগোরে আসল দেশ। ঠিক কি না কন?'

এসব কথার মারফতি ধরতে না পেরে দলের বয়োজ্যেষ্ঠ গেরস্ত লোকটি মানিকের কানে কানে শুধায়, 'রাজাকার নাকি ডাকাত বাহে মাঝিটা?'

পরেশ মাঝিকে পাল্টা ভয় দেখানোর জন্যে বলে, 'ও ভাই, হরিপুরের কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের নাম শুনছিস তো?'

'হ বাবু চিনি, খুব ভালা লোক। আমাগো চরেও একবার আইছিল।'

'সেই চেয়ারম্যানের নাতিও আছে আমাদের সাথে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই যে, মোহাম্মদ আলী মানিক।'

মানিকের বুঝতে দেরি হয় না, স্ত্রী-সন্তানকে কোচবিহারে মামার বাসায় রেখে মানিকের সঙ্গে পরেশের মুক্তিবাহিনীতে যোগদানটা মূল লক্ষ্য হলেও পথের বিপদ-আপদ ঠেকাতেও মানিককে জোর করে যাত্রাসঙ্গী করেছে পরেশ কাকা। কিন্তু মানিকের পরিচয় পেয়েও মাঝির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবান্তর ঘটে না। নিজের ভয় ধরানো রহস্যময় গল্প অব্যাহত রাখে সে, 'তা এই গণ্ডগোলে কত ছাত্র আর হিন্দু শরণার্থী যে পার কইরা দিলাম বাবু। আগের ক্ষেপে টাউনের এক চাকরানদার বাবু মুসলমান সাইজা পরিবার নিয়া আমার নায়ে উঠল। তার ব্যাগভরা টাকা আর ছালাভরা দামি জিনিসপত্রের কথা আমারেও কয় নাই। কাসিমবাজারে ডাকাইতারা কেমনে যে খবর পাইল, নাও ঘিরল আমার। ডাকাইতের হাতে আইফেল, আমরা লগি-বৈঠা দিয়া কী করুম কন। তা ডাকাইতে শুধু মালছামানা...'

এ সময় নৌকার অন্য গলুই থেকে যুবক মাঝি বাপের কাছে এগিয়ে আসতে থাকলে নাও টালমাটাল করে, সেই সঙ্গে ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপে যাত্রীদের। যেন ডাকাতরা তাদের অভিযান শুরু করেছে, আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে একজন, 'এই চ্যাংড়া, তুই এদিকে আসছিস কেন?'

ছেলেটি বাপকে ধমকায়, 'ও বাজান, তোমার প্যাঁচাল থামাও দেহি। বিড়ির প্যাকেট দাও আমাগো, মেঘ নামব কইলাম। ও বাবুরা, রাইতে ডাকাতির ভয় কইরেন না। কাসিমবাজার হইয়া আমরা যামু না আইজ।'

মাঝির জোয়ান সঙ্গীর দেওয়া এইটুকু সাহসে আর্তচিৎকার তোলা লোকটি এবার হুংকার তোলে, 'ডাকাতি করা এত সোজা। আমরা এতগুলি পুরুষ মানুষ আছি কী বাল ছেঁড়ার জন্য?'

'তাছাড়া আমাদের কাছে আছে কী, নেবেই বা কী বাহে? কোনোমতে নায়ের ভাড়া জোগাড় করিয়া যাইতেছি।'

ছইয়ের ভেতর থেকে নারী-শিশুর গুঞ্জন শুনে পরেশ ধমকায়, 'চুপ থাকেন বাহে সবাই। ছইয়ের ভেতর ছাওয়াছোটকে ঘুমাইতে দেন।'

পরেশের এক ধমকে নীরবতা নামে নৌকায়। নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর বাসনায় সবার মন এত একাগ্র যে, অহেতুক সাহস কিংবা ভয় ধরানোর গল্প-গুজবে আর কেউ উৎসাহ বোধ করে না। বরং যাত্রাকে বিপদমুক্ত রাখার প্রার্থনায় বসে যেন ধ্যানস্থ হয়ে যায় সবাই। নৌকার নীরবতা আদিগন্ত অন্ধকার নীরবতার সঙ্গে একাত্ম হলে ঢেউয়ের কলকল ও বাতাসের শনশন আওয়াজ কানে আসে। আকাশে মেঘের ফাঁক-ফোকরে হঠাৎ জেগে ওঠে কয়েকটি মাত্র তারা। নদীর দুই পাশের অন্ধকারে মগ্ন গ্রাম, ফসলের মাঠ ও ঝোপঝাড় সশস্ত্র অবস্থায় ঘাপটি মেরে আছে যেন। নৌকায় মানুষের অস্তিত্ব টের পেলেই হুংকার ছুড়বে।

মানিক নৌকা ভ্রমণের কথা ভাবে। হাই স্কুলে পরীক্ষার খাতায় নৌকা ভ্রমণ বিষয়ে রচনায় মুখস্থ বিদ্যার সঙ্গে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছিল কত কী! নদীমাতৃক এই দেশে নদীতে ভেসে যাওয়ার আনন্দ জোগায় নৌকা ভ্রমণ। বাস্তবে এর আগে তিস্তা ও আরো কিছু নদীনালা এপার-ওপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য নৌকায় চড়েছে মাত্র কয়েকবার। ট্রেনে ঢাকা যেতে যমুনা পেরোতে হয় স্টিমারে। সড়কপথের নদীতেও চলে ইঞ্জিনচালিত নৌকা কি ফেরি-ইস্টিমার। কিন্তু এরকম দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে সারারাত নৌকায় ভেসে কোন আলোকিত জগতে পৌঁছবে — তা নিয়ে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয় সংশয়। বিপদের গন্ধ একা পরেশ কাকা পায়নি, অন্য যাত্রীরাও ভয়ে মুহ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে যারা দলে দলে শরণার্থী হয়ে ইন্ডিয়া গেছে, তখন পালাবার পথেঘাটে বিপদ-আপদের ঝুঁকি ছিল কম। পাক আর্মির নিয়ন্ত্রণের বাইরেই ছিল বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চল। কিন্তু এখন পাকবাহিনী ভারতীয় সীমান্তের কাছেও শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে। তাদের অনুগত রাজাকার বাহিনী পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। সীমান্তের ওপারে যাওয়া শরণার্থীদের ক্ষমা ঘোষণা করে দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হচ্ছে প্রতিদিন। অনেকে নাকি ফিরেও আসছে। আর্মি জেনারেলদের বদলে ডা. এম এ মালেককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে উপনির্বাচন ও বেসমারিক সরকার গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সামরিক জান্তা। এ অবস্থায় স্বাধীনতা নিয়ে হতাশ হয়েই কি হিন্দু পরিবারগুলো পথের ঝুঁকি তুচ্ছ করে ইন্ডিয়া যাচ্ছে আর ফিরে না আসার মতলব নিয়েই? অন্যদের কথা জানে না, তবে পরেশ কাকা নিজ পরিবারের জন্য ইন্ডিয়ায় একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করার ইচ্ছে নিয়েও যাচ্ছে। মানিকের বাবাও ছেলেকে এরকম ধারণা দিয়েছে। কিন্তু ইন্ডিয়ায় গিয়ে পরেশ কাকার সঙ্গে নিরাপদ জীবন নয়, বরং বর্ডারে পৌঁছেই শরণার্থী দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পাকা সিদ্ধান্ত নেয় মানিক।

ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দ ছাপিয়ে নদীর বুকে শীতল বাতাস চলার শোঁ-শোঁ আওয়াজটা কমে গেলে হঠাৎ শুরু হয় ঝিরঝিরে বৃষ্টি। নড়েচড়ে বসে ঝিমুনিগ্রস্ত যাত্রীরা। মাঝির কণ্ঠ শোনে সবাই, 'ও বাবুরা এই মেঘ মনে হয় সহজে থামব না। রাইতের মধ্যে বালাবাড়ি চিলমারী পার না হইলে ডাকাইত আর রাজাকারদের নজরে পড়ার ভয় আছে। ছইয়ের ভিতরা বইসা সবাই আল্লা-ভগবানরে ডাকেন গো। লাইট জ্বালায়েন না কইলাম।'

বৃষ্টির সঙ্গে মাঝির হুঁশিয়ারি নৌকায় আবার প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ছইয়ের ভেতরে বসার জায়গা অবশিষ্ট নেই। ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে গেলে মহিলা ও শিশুদের আরামে ব্যাঘাত ঘটবে। তাছাড়া মাঝি ও তার সঙ্গীদের ওপর চোখ রাখা যাবে না। মাঝিদের মাথায় বাঁশের তৈরি মাথাল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে একজনের ঠোঁটে বিড়ির আগুন। ছইয়ের বাইরে সাতজন বাবুর জন্য মাত্র তিনটি ছাতা। ছাতার নিচে মাথা রেখেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমবেশি ভিজতে থাকে সবাই।

পরেশ বলে, 'মানিক, তুই ছইয়ের ভেতরে গিয়া বস।'

বউ-বাচ্চার মালিকরা ভিজবে, আর সে অন্ধকারে অনধিকার সুবিধা লুটবে — এমন স্বার্থপর হওয়ার কথা ভাবতে পারে না মানিক। বলে, 'কাকা আপনি বরং যান, শিবুকে দেখেন।'

কিন্তু পরেশ একা নয়, অন্যরাও মানিককে বৃষ্টির আক্রমণ থেকে বাঁচাতে ছইয়ের ভেতরে যাওয়ার জন্য জোর করে। এ সময় ছইয়ের ভেতর থেকে মালতীর আহ্বান আসে, 'ও মানিক, এখানে জায়গা হবে বাবা, তুমি ভেতরে এসে বসো।'

মানিক ছইয়ের ভেতরে মাথা গলাতেই একটি শিশু কেঁদে ওঠে। 'সরি বইসো বাহে, ছাওয়াটাকে সরান' মহিলাদের নড়েচড়ে বসা আওয়াজের মধ্যে মানিকের কাঁধ স্পর্শ করে কেউ, 'এই যে, এখানে বসো বাবা। দিদি একটু সরেন তো, সুটকেসটা এদিকে দেন।'

মহিলারা নড়েচড়ে বসে মানিককে জায়গা করে দেয়। মালতীর নির্দেশ মতো তার পাশের খালি জায়গাটুকুতে পা গুটিয়ে বসে মানিক। কাকির কোলে তার ঘুমন্ত শিশু। তার সামনে সেই কিশোরী কি তার মা — চিনতে পারে না মানিক। তবে কীরকম যেন এক গুমোট গন্ধ পেয়ে অস্বস্তি হয়। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে গরুগাড়ির বদ্ধ ছইয়ের ভেতরে যেমন গন্ধ ছিল, এ গন্ধটা সেরকম নয়। মহিলা ও শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, হয়তো-বা তাদের গোপন প্রাকৃতিক নির্গমন পথ দিয়ে শরীর থেকেই বিশ্রী গন্ধটা বেরিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে মিশছে বৃষ্টি-বাতাসের সোঁদা গন্ধও। বাইরে খোলা আকাশের নিচে বাতাসের মধ্যে বিড়ির বিশ্রী গন্ধটা পেয়ে যেমন হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি অস্বস্তি হয় মানিকের।

সামনে পান মুখে নিয়ে মহিলাটি চাপা কণ্ঠে কথা বলে আবার, 'ও সরস্বতী, মোর আলোয়ার পাতার ডিব্বাটা কোন্‌ঠে থুছিস?'

'আনা হয় নাই বোধ হয়।' পানের অনিবার্য অনুষঙ্গ আলোয়ার পাতার অভাবে আর্তনাদ করে বউটি, 'হায় ভগমান, করছিস কী! ইন্ডিয়ায় এই আলোয়ার পাতা মুই পাইম কোন্‌ঠে? তুই তোর স্নো-পাউডারের কৌটা নিবার পালু, আর মোর আলোয়ার পাতার ডিব্বাটা নিস নাই?'

'আহা, চুপ করো তো মা।'

'ছি, ছি! কার ছাওয়া এঠে হাগছে বাহে! নদীতে ছুড়ি দাও।

'আর একনা সরিয়া বইস। হায়, কাপড়খান মোর ভিজি গেল।'

'ভিজুক। মানুষগুলা যে ঝরিতে ভিজবার লাগছে।'

'তোকে হাজারবার কয়া থুনু, আলোয়ার পাতার কৌটা নিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে থোন বাহে তোমার আলোয়ার পাতা, মানুষের জীবন বাঁচে না।'

ছইয়ের ভেতরের নীরবতা ছিন্নভিন্ন করে এইসব চাপা মেয়েলি কথাবার্তার মাঝে মানিক অনুভব করে, মালতী কাকি শাড়ির আঁচল দিয়ে তার ভেজা মাথা মুছে দিচ্ছে। নিকট বা দূরসম্পর্কের কোনো যুবতী মেয়ের পাশে এতটা নিবিড়ভাবে বসেনি কখনো মানিক। পড়শী সুবাদে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও মালতীও এমন বেপরোয়া স্নেহের প্রকাশ দেখায়নি। রক্ষা যে কেউ দেখতে পাচ্ছে না দৃশ্যটি। তারপরও অন্ধকারে অস্বস্তি ও লজ্জার পীড়ন সইতে না পেরে মানিক তার সমবয়সী গুরুজনের কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করে। হঠাৎ আসমার কথা মনে পড়ে যায়।

মালতীর জায়গায় এখন যদি আসমা থাকত! এমেনের পরিবার তাদের বাড়ি ছেড়ে ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভরিয়ে তুলতেই যেন কয়েকটা দিন এবং রাতেও আসমার কথা খুব মনে পড়ত। আসমাদের ইন্ডিয়া পালানো এমন দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ নৌযাত্রা ছিল না। তারপরও পথে, বিশেষ করে সঙ্গী যুবকদের সঙ্গে আসমার সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে মানিক কত কী ভেবেছে! ইন্ডিয়ায় গিয়ে মানিক কি আসমাদের ঠিকানা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে প্রথম?

বাইরে জোয়ান মাঝির কণ্ঠে সতর্কবার্তায় চমকে ওঠে সবাই।

'ও বাজান, সামনের ঘাটে রাজাকার ক্যাম্প বসার খবর পাইছি। ও বাবুরা, চুপচাপ বইসা থাকেন। অহন বিড়ি জ্বালাইবেন না কিন্তু।'

নৌকায় নিরেট স্তব্ধতা দখল করে নেয় আবার বাইরের বৃষ্টি-বাতাসের শনশন আওয়াজ। আওয়াজটার মধ্যে কী ভয়ংকর বিপদের বার্তা লুকানো আছে, পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রেখে তা বোঝার চেষ্টা করে আতঙ্কিত যাত্রীরা। বিপদের সময়েও মানিক শুধু অনুভব করে, ভয়ে মালতী তার গা ঘেঁষে বসেছে আরো এবং মালতীর একটা হাত, রাখার মতো জায়গার অভাবেই যেনবা তার ডান পায়ের ওপর এসে পড়ে। মুখে যখন কোনো ভাষা নেই, দৃষ্টিতে ছবি নেই, তখন যুবকের শরীরে একটি আতঙ্কিত নারী-হাত কী প্রকাশ করে? ভয়, স্নেহ, নাকি ভালোবাসা? ঠিক বুঝতে না পারায় মানিকের বুক কাঁপে। নিজের হাতটি মালতীর ঘাড়ে কি বুকের কাছে রাখতে পারলে তার অন্তরাত্মার খবরও হয়তো কিছুটা বোঝা যেত। কিন্তু এতটা সাহস হয় না মানিকের। যদি টর্চ বা দেশলাইকাঠি জ্বলে ওঠে হঠাৎ? কিংবা অন্ধকারেও দেখে খারাপ ভাবে কেউ? ছি ছি! বাইরে নয়, মানিকের ভেতরে কেউ যেন তাকে ধিক্কার দেয়। মৃত্যুভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ত্রস্ত মানুষ, আর সে একটি নারী হাতের স্পর্শের ভাষা বোঝার জন্যে এসব কি ভাবছে। ছি! কিন্তু চুপচাপ ধ্বংস বা মৃত্যুর বিভীষিকা মেনে নেওয়ার চেয়ে এরকম পলায়নই কি মধুর নয়? দেহমনের দ্বন্দ্বে ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ে শরীর। এবং ঘুমের ঘোরেই যেনবা মাথাটা একসময় টলে পড়ে মালতীর কাঁধের ওপর।

কতক্ষণ পর, মানিক ঠিক জানে না, তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নঘোর কেটে যায় মালতীর জোর ধাক্কায়। তখন নিজের পরিচিত বিছানায় মালতীকে নিয়েই পা ছড়িয়ে শোয়ার ইচ্ছেটি জাগতে না জাগতেই সেই ইচ্ছেটিকেই কেউ গুলি করে যেন। একবার নয়, পরপর বেশ কয়েকবার। মানিকের আগেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনে তটস্থ হয়ে উঠেছে সবাই, কারণটাও যেন জেনে গেছে। ছইয়ের বাইরে পাটাতনে গিয়ে বসে, 'ও কাকা, গুলির আওয়াজ হচ্ছে কোথায়?'

'বড় বিপদের জায়গায় আইছি, চুপচাপ আল্লা-ভগবানরে স্মরণ করেন। ও বাসেদ, রাজাকার না মুক্তি মনে লয়?'

গোলাগুলির আওয়াজকে আরো বেশি শব্দময় করে তোলার জন্য সবাই নীরব হলে এবার মেশিন কি স্টেনগানের ঠাঠাঠা-দ্রিম-দ্রিম আওয়াজ, জবাবে রাইফেল কি শেল আরার বুমবুম আওয়াজ কাছেপিঠেই যেন গর্জে ওঠে।

'হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হলো কোথায়? এটা কোন জায়গা?'

মানিকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সবাই চারদিকের আদিগন্ত নিস্তব্ধ আঁধারে গুলির উৎস খোঁজে। মাঝির ছেলে বাসেদ চেঁচিয়ে বাপকে জানায়, 'ও বাজান, চিলমারী-বালাবাড়িতে পাকবাহিনী ক্যাম্প বসাইছে হুনছিলাম। মুক্তিরা মনে হয় হানা দিছে। আমরা কিন্তু বালাবাড়ির কাছে আইয়া পড়ছি।'

'মিলিটারি না রাজাকার?'

'মিলিটারি গো! গোলাগুলির তেজ শুইনা বোঝো না?'

এ অবস্থায় কি সামনে এগোনো উচিত? পিছিয়েও বা যাবে কোথায়? বর্ডার পার হতে হলে ব্রহ্মপুত্রের এই চ্যানেল পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাঝি সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় নৌকাখানাও কি ভয়ে বেশি দুলছে? মনে মনে এবং ছইয়ের ভেতর মেয়েরা সরবেও ভগবান ও দেবদেবীকে স্মরণ করে। ঠিক এ সময় দূরে নদীর বুকে সার্চলাইটের মতো তীব্র এক ঝলক আলো দেখা যায়। ইঞ্জিনের আওয়াজও কি কানে আসছে। মানিক বলে, 'সামনে কোনো লঞ্চ ইস্টিমার আসছে নাকি?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও বাজান, হারুণ আগে কইছিল মিলিটারি নদীতে গানবুট নামাইছে, মনে হয় সত্যি। তাড়াতাড়ি কিনারে নাও ভিড়াও গো। মিলিটারি শরণার্থী বুঝলেই গুলি চালাইব কইলাম।'

এ তো নিছক লোকমুখে বা স্বাধীন বাংলা বেতারে শোনা যুদ্ধের গল্প-গুজব নয়, নিজের চোখে দেখা গানবোটের আলো, হয়তো এদিকেই ধেয়ে আসছে। কানে বিঁধছে এখনো গোলাগুলির আওয়াজ। মাঝি কি ইচ্ছে করেই তাদের যুদ্ধের ময়দানে এনে ফেলল? সত্যিই যদি মিলিটারির গানবোট হয়, তাহলে নদীতে লাফিয়েও আত্মরক্ষা হবে না। ডাঙায় থাকলে তবু ছোটাছুটি করে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে আত্মরক্ষা সম্ভব। নৌকা দ্রুত কিনারে নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় সবাই। বয়স্ক মাঝিটি সান্ত্বনা দেয়, 'উতালা হইবেন না বাবুরা। রাখে আল্লা মারে কে? ভগবানরে ডাকেন।'

নৌকা একদম কিনারে নেওয়া সম্ভব হয় না। অল্প পানির খরস্রোতে নৌকা বালুতে আটকে গেলে যুবক মাঝিরা লাফিয়ে পানিতে নামে। নৌকা টেনে কিনারের কাছে নিয়ে তাড়া দেয়, 'জলদি নাইমা যান। এই গ্রামে কোনো জায়গায় পলায় গিয়া পরানডা বাঁচান। মিলিটারি রাজাকার দেখলেই গুলি করব। তয় আবার আপনেরা হিন্দু শরণার্থী।

বয়স্ক মাঝি চাপা গলাতেও চেঁচিয়ে আশ্বাস দেয়, 'ও বাবু, নাও এইখানেই বাঁধা থাকব। বিপদ কাইটা গেলে সবাই ফিইরা আসেন।'

দূরে নদীতে আবার আলোর ঝলক দেখে গুলিবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাটাই যেন জীবনের একমাত্র চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। নদীর অল্প পানিতে লাফ দিতে থাকে যাত্রীরা। কে কার আগে নামবে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হলে টালমাটাল করতে থাকে নৌকাখানি। একটি ছোট মেয়ে পানিতে পড়ে মরাকান্না শুরু করলে, মাঝি নিজেই লাফ দিয়ে তাকে ধরে পাড়ে তুলে দেয়। অন্য মহিলা ও বাচ্চাদেরও নামতে সাহায্য করে। পাড়ে উঠেই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকে সবাই। পরেশ তার ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে, অন্য হাতে মালতীর হাত চেপে ধরে পানি ভেঙে নেমে যায়। মানিক তার ব্যাগটি হাতে নিয়ে নামে, জুতা-প্যান্ট ভেজার ভয়ে জোরে লাফ দেয়, কিন্তু পা পিছলে পানিতে পড়ে পুরো শরীরই ভিজে যায়। কেউ ফিরে তাকায় না, উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে পলায়নপর মানুষগুলোর মাঝে পরেশকে খোঁজে, 'ও কাকা কোথায় আপনি?'

'মানিক, এদিকে আয়, দৌড় দে।'

মাথার ওপরে একটিও নক্ষত্র নেই। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা থেমেছে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে আদিগন্ত অন্ধকার ডাঙায় আরো বেশি গাঢ়। থমথমে রহস্যময় রাত্রির বুক চিরে গুলির শব্দ হয় আবার ঠা-ঠা, ব্রুম-ব্রুম! ছুটে পালানো শরণার্থীরা কেউ কাউকে দেখতে পায় না, কারো কারো দিশেহারা কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা, 'ও বাহে কোনপাকে গেইলেন তোমরা...সোজা দৌড়ান...কার ছাওয়া কাঁদে...মুখ চিপি ধরো...ও ভগবান... ভগবানের নাম মুখে নিস না হারামজাদি...

এইসব আর্তশব্দ অনুসরণ করেই যেন পরেশ-মালতীর পিছে মানিকও দৌড়ায়। বালুক্ষেতের বদলে পায়ের নিচে শক্ত ভেজা ঘাস-মাটি অনুভব করে, রাস্তা না হলেও শক্ত আল বোধহয়, দু পাশের বিরান মাঠে শুধু অন্ধকার। ছুটতে গিয়ে নিচে পতনের শব্দ ছাপিয়ে মালতীর গলায় আর্তচিৎকার, 'ও মা গো!'

মানিক ভাবে, কাকির গায়ে কি গুলি লাগল। পরেশ ঝুঁকে পড়ে জানতে চায়, কী হলো রে! মানিক বলে, 'কাকা শিবুকে আমার কোলে দিয়ে আপনি দেখেন, কাকিকে ধরেন।'

গুলি লাগেনি, আছাড় খেয়ে পড়েছিল মালতী। এটুকু সান্ত্বনায় স্থির হয়ে ওরা মুহূর্তের জন্য পরস্পরের ছায়ামূর্তি দেখার সুযোগ পায় যেন। পরেশ মানিককে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের লেদার সুটকেস! ও মানিক, তুই হামার সুটকেটসটা নিস নাই বাহে?'

'না তো। কাকী নেয় নাই?'

'আমি তো খালি আমার হাতব্যাগ আর শিবুকে নিছিলাম।'

'সর্বনাশ! তোকে যে বলে দিলাম মানিক, হামার সুটকেসটাও নেওয়ার জন্যে।'

'হায় ভগবান! আমার সোনার জিনিস, টাকা-পয়সা সব যে ওই সুটকেসে। মাঝিরা নিয়ে পালায় যদি?'

'মানিক, নদী দেখা যায়। ওই মাঝিদের বিশ্বাস নাই। তুই এক দৌড়ে ছুটে গিয়া সুটকেসটা নিয়া আয়। কোন বিপদের মুখে আনি ছাড়ি দিল শালারা!'

'এই অন্ধকারে নৌকা খুঁজে পাওয়া যাবে না কাকা। আর মানুষগুলা কোথায় গেল?'

'যাউক। তুই শিবুকে নিয়া তোর কাকির হাত ধরি এই আইলের ওপর একটু দাঁড়া, আমি দেখছি।'

ঘুমন্ত শিবুকে মানিকের বুকে দিয়ে পরেশ আবার উল্টোমুখ হয়ে নদীর দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু কোথায় নদী? বামদিকে দূরে নদীর সাদা বুক আবছা অনুমান হয় বটে, কিন্তু ওরা ডান দিক থেকে ছুটে আসল না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টির আলোয় নদী, নৌকা ও পরেশের অস্তিত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে আবার গোলাগুলির শব্দ শোনে তারা। মালতী মানিকের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, 'দরকার নেই সুটকেসের! তোমার কাকাকে ডাকো।'

গুলির শব্দ শুনে মানিকের গলা দিয়ে শব্দ সরে না। মনে হয়, শক্রদের অস্ত্র নদীতে নয়, কাছেপিঠে এই ডাঙার কোথাও গর্জে উঠছে। এইভাবে ফাঁকা চরে দাঁড়িয়ে থাকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। সঙ্গের লোকগুলি কে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে।

'ও মানিক, তোমার কাকা এখনো আসে কই? জোরে ডাক দাও। থাক, সুটকেস।'

'ও কাকা, কাকা! কা-কা!

মানিক ভেজা কাকের মতো কা-কা করে কয়েকবার, কিন্তু কোনো সাড়া আসে না। সাড়া দেওয়ার জন্য আশপাশে কোনো জনপ্রাণী নেই ভেবে শিরদাঁড়া বেয়ে হিমেল ভয়ের স্রোত বইছে কি? ঘুমন্ত শিবুর উষ্ণ অস্তিত্ব অনুভব করে। নদীতে যে আলোর ঝলক দেখে নৌকা থেকে লাফ দিয়েছিল যাত্রীরা, সেই আলোকরেখা ডান দিকের অন্ধকার বিদ্যুতের মতো চিরে দেয়, তারপর সেই জলযান থেকেই ঠা-ঠা-ব্রিম-ব্রিম গুলির আওয়াজ ওঠে যেন।

'এখানে থাকলে আমরা মরব নাকি। কাকাকে পরে পাওয়া যাবে, আসেন।'

মালতীর হাত ধরে মানিক দৌড়াতে থাকে। অন্ধের মতো অনেকগুলো আইল, কাটা ধানের ক্ষেত, জলাভুঁই পেরিয়ে একটি পাটক্ষেত ডিঙানোর পর পায়ের নিচে ভেজা মেঠো সড়ক চিনতে পারে। সেই মেঠো সড়ক ধরে কিছুদূর হাঁটতেই একটি গাছকেও মানুষ ভেবে যখন থমকে দাঁড়ায়, তখন সেই ভয় দেখানো গাছের পিছে একটি গেরস্ত বাড়ি আবিষ্কার করে সে। অচেনা নির্জন রণাঙ্গন কিংবা প্রেতপুরীতে এই প্রথম মানুষের একটি পরিচিত ঠিকানা। দ্বিধা না করে মালতীকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকে মানিক। উঠানে দুটি খড়ের ঘর ছাড়াও একটি টিনের ঘরও আছে। টিনের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মানিক কথা বলে।

'কে আছেন বাড়িতে? আমরা বিপদে পড়েছি, ও ভাই, একটু আশ্রয় দেন। কে আছেন, দরজা খোলেন। বাঁচান আমাদেরকে।'

বিপদে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবেও মানুষ মানুষের সাহায্য পাওয়ার জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠতে পারে, মানিকের জানা ছিল না। কোনো জনপ্রাণীর সাড়া না পেয়ে সে দরজা ধাক্কাতে থাকে। এ সময় তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকে ঘুমন্ত শিবুর ঘুম ভেঙে যায়, মা, মা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

শিবুকে তার মায়ের কোলে দিলে ঘরের ভেতর থেকে মনুষ্য কণ্ঠে সাড়া আসে, 'কাঁয় বাবা তোমরা? এতো রাইতে কোন্‌ঠে থাকি আসিলেন?'

'তাড়াতাড়ি দরজাটা খোলেন। আমরা চোর-ডাকাত না, খুব বিপদে পড়েছি।'

ঘরে আলো জ্বালার পর দরজা খুলে দেয় এক বৃদ্ধ। সে ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। বৃদ্ধের মাথায় ময়লা টুপি, হাতে তসবি, চোখেমুখে উপচানো আতঙ্ক। তার অনুমতির অপেক্ষা না করে মালতীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে মানিক। সংক্ষেপে সত্যি কথা বলে বৃদ্ধকে বিপদের ভাগী করতে চায়।

সাহস বা সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে আরো ভয়ের কথা বলে অচেনা বৃদ্ধ।

'সর্বনাশ! চিলমারীতে মিলিটারি ক্যাম্প হইছে। মুক্তিবাহিনীকে খতম করার জন্য নদী দিয়া বালারহাটেও আসছে মিলিটারি। মুক্তিবাহিনী কোন্‌ঠে বা লুকায় থাকি ফুটফাট করে, আর মিলিটারিরা সামনে যাকে পায় তাকেই মারতেছে। পুবের গ্রামটায় ওদিনকা জ্বালায় দিছে। এ গ্রামের মানুষ, মোর বেটা-বউ সবায় পলায়া গেইছে বাবা। মুই বুড়া মানুষ, একলাই বাড়ি পাহারা দিবার নাগছি। সকালে রাজাকাররা মোর বাড়ি তল্লাশি করছে। বাঁচতে চাইলে তোমরা এই গ্রাম ছাড়ি পালায় যাও সকাল।'

অন্ধকারে ডোবা অচেনা পথঘাট। বিরতি দিয়ে গোলাগুলির শব্দ চলছে। কোথায় পালাবে তারা? ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করাটাই শ্রেয় মনে হয়। মিলিটারি-রাজাকারের ভয় নিয়েও যদি তারা জন্মভূমির চেনা গ্রামে লুকিয়ে-চুরিয়ে থাকত, তাহলে আজকের এই ভয়ংকর বিপদে পড়ত না। তেমনি এই ঘর থেকে বেরোলেই হয়তো নতুন কোনো বিপদের মুখোমুখি হবে। তাছাড়া পালানোর আগে শিবুর কান্না থামানো দরকার। শিবুকে কোলে নিয়ে মালতী নিজেও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, 'তোমার কাকা মানিক?'

'কাকাকে পরে খোঁজা যাবে। এখন শিবুকে চুপ করান তো।'

'হ্যাঁ মা, ছাওয়টাকে চুপ করান। দুধ দাও। আল্লাহ-খোদার নাম নাও মা। মুরগা ডাকার সময় হইলে গ্রাম ছাড়ি পালায় যাবেন।'

একটা খালি চৌকির ওপর বৃদ্ধ ময়লা কাঁথা বিছিয়ে দেয়। মালতী ছেলের মুখে মাই দিয়ে ঘুমিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজে কাঁত হয়ে শোয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানায়। মানিক হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়, রাত চারটা বিশ। নিজের ব্যাগ খুলে লুঙ্গি-গামছা বের করে পরনের ভেজা কাপড় পাল্টায়। মালতীর শাড়িও ভেজা। কিন্তু উপায় নেই কোনো। মালতীর ওই সুটকেস এবং কাকাকে কোথায় খুঁজবে — ভেবে কূল পায় না মানিক। মানিক ব্যাগ থেকে নিজের চাদরখানা বের করে ছুড়ে দেয়, 'গায়ে দেন কাকি, ঠাণ্ডা লাগবে।'

বুড়ো প্রায় নিঃশব্দ কণ্ঠে কথাবার্তা না বলার মিনতি জানিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে কুপিটি নিভিয়ে দেয়। অন্ধকার চৌকির ওপর বসে মানিক শীত বোধ করে। একটু আগে ভেজা জামা-প্যান্ট পাল্টানোর সময় চকিতে মনে হয়েছিল, সে যেন নিজেই কাফনের কাপড় পরে নিচ্ছে। এ কথাটা মনে হওয়ায় ব্যাগ থেকে সাদা জামাটা বের করেও গায়ে দেয়নি। বাইরে গুলির শব্দ ও উৎস বোঝার জন্যে ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। বিছানায় মালতীর ফোঁপানো কান্না শুরু হয় আবার, 'মানিক, তোমার কাকা আমাদের বোধহয় খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

ভোর হলে কাকিকে এখানে রেখেই মানিক কি প্রথমে পরেশ কাকা ও নৌকার সন্ধানে বেরোবে? নাকি শিবুসহ কাকিকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে সহযাত্রীদের খোঁজখবর করাটা উচিত হবে? এ ঘর থেকে বেরোলে কোথায় পাবে নিরাপদ আশ্রয়? মানিক ভেবে কূল পায় না। অবশ্য ভোরের আলো ফুটলে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাবে। এখন কি মানিক পরেশ কাকার স্ত্রীর পাশে বসে জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে?

'মানিক তুমি কই বাবা! তুমি কোথায়?'

'কী হলো কাকি? এই তো আমি।'

মালতী মানিকের হাত চেপে ধরে, 'তোমার কাকার মতো আমাকে ছেড়ে পালিও না। মরলে একসঙ্গে মরব।'

অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবারই জীবনতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে বোধহয়। মালতীর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয় মানিক, 'কাঁদেন না কাকি, বিপদের সময় ভেঙে পড়তে নাই। মন শক্ত করেন। আমি আপনাকে ছেড়ে পালাব না। কাকাকেও খুঁজে বের করব।'

বাইরে গোলাগুলি ও বৃষ্টির শব্দ অনেকক্ষণ কান পেতেও আর শুনতে পায় না তারা। কাছাকছি কোথাও রাত পোহাবার সংকেত দিতে মোরগ ডেকে ওঠে। আবারো লম্ফ জ্বালিয়ে অতিথিদের সামনে এগিয়ে আসে বৃদ্ধটি।

'মুই উজু করিয়া আযান দিম বাবা। তোমরাও ভগবানের নাম নিয়া বেলা ওঠার আগেই এ গ্রাম ছাড়িয়া পালায় যাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাস্তাঘাট যে কিছুই চিনি না বাবা! কোথায় পালাব?'

'আল্লাহই তোমাক ঘাটা দেখাইবে বাবা। সোজা নদীর পাড় ধরিয়া ছুটতে থাকো। তিন-চারটা গ্রাম পার হইলে ফের নদী পার হয়া ইন্ডিয়া গেইলে শরণার্থী ক্যাম্পে ওঠেন।'

মানিক তবু দ্বিধা করে। বৃদ্ধ ধমক দেয়, 'বেলা উঠলে মিলিটারি-রাজাকাররা মুক্তিবাহিনীর খোঁজে ফের মোর বাড়ি তল্লাশি করবে। হেঁদু শরণার্থীকে জায়গা দেওয়ার জন্য বাড়ি জ্বালায় দেবে মোর।'

ভয় পাওয়া সরল বৃদ্ধ লোকটির প্রতি সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জাগে মানিকের। পিঠে হাত দিয়ে বলে, 'আমাদের জন্য দোয়া করেন চাচা।'

তারপর ঘুমন্ত শিবুকে তোয়ালেতে জড়িয়ে বুকে তুলে নেয় মানিক। এক হাতে নিজের ব্যাগটা নিয়ে মালতীকে বলে, 'চলেন কাকি। আমার পিছে পিছে আসেন।' মালতীর হাতে নিজের হাতব্যাগটি, মানিকের দেওয়া চাদরখানা মাথা পর্যন্ত জড়িয়ে মানিককে অনুসরণ করে।

বাড়ির বাইরে এনে বৃদ্ধ আবার পরামর্শ দেয়, 'ঘাটা দিয়া হাঁটেন না বাবা। সোজা গেইলে নদী, তারপর নদীর পাড় দিয়া দৌড় দেন। আল্লাহ তোমাকে বাঁচাইবে।'

আল্লাহর হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দিয়ে আবার হাঁটতে থাকে তারা। বৃষ্টি নেই। জমাট আঁধার ও মেঘ কেটে গিয়ে চরাচর ফর্সা হয়ে এসেছে অনেকটা। রাতের মতো চোখের সামনে এখন আর কালো দেয়াল নেই। এখন পথঘাট চিনেই যেদিকে ইচ্ছে ছুটে পালানো যায়। মানিক দৌড়ানোর বদলে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বৃদ্ধের কথামতো মেঠো পথটা ধরে সোজা হাঁটতে থাকে। একটি পাটক্ষেত পার হতেই বাম দিকে নদীর খালি বুক চোখ পড়ে। নদীর পাড়ে যাওয়ার জন্য ক্ষেতের আল ধরে হাঁটে তারা।

নদীটা চোখের সামনে পষ্ট হয়ে উঠলে মানিক রাতের নৌযাত্রার স্মৃতি স্মরণে রেখে পাড়ের সামনে-পেছনে তাকায়। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে নৌকা থেকে নেমে খুব বেশি দূরে পালাতে পারেনি তারা। পরেশকাকা ও অন্যরাও কি কাছাকাছি পালিয়ে আছে? ভেজা বালুজমি পার হতেই পাড়ে বাঁধা নিজেদের নৌকাটি দেখে থমকে দাঁড়ায় দুজনেই।

'ও মানিক আমাদের নৌকাটি না? দেখো, ওখানে তোমার কাকা বা আমাদের সুটকেসটা আছে কি না?'

চারদিকে তাকিয়ে পা টিপে টিপে নৌকার কাছে এগিয়ে যায় তারা। মাথায় বৃষ্টি ঠেকানো টাপর নিয়ে বয়স্ক মাঝিটি ওভাবে হালের ওপর শুয়ে আছে কেন? তার একটি পা নিচে ঝুলে আছে স্থির। নৌকায় ছইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে কোনো জনপ্রাণী কি জিনিসপত্র কিছুই চোখে পড়ে না। শূন্য নৌকাটি দুলছে।

'এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে কাকি। আমার পেছনে দৌড়ান।'

এবার জোর পায়ে হাঁটা নয়, কোলে শিবু ও ব্যাগ নিয়ে মানিক নদীর পাড় ধরে দৌড়াতে থাকে। ফলে মালতীও দৌড়ায়। ভোরের আলো ফুটে উঠছে। নদীর পাড় নাকি জনবসতির মাঝ দিয়ে ছুটে পালানো নিরাপদ হবে? নদী ও চরের ধু-ধু শূন্যতায় শত্রু-মিত্র কাউকে চোখে পড়ে না, কিন্তু বামদিকের গ্রামে ঢুকে পড়লেই যদি ওদের মুখোমুখি হতে হয়? মালতী মানিকের জামা টেনে ধরলে থামতে হয়। মালতী নদী থেকে খানিকটা দূরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফাঁকা মাঠের ওপর শুয়ে আছে কতগুলো মানুষ। কিন্তু শোয়ার ভঙ্গি ওরকম কেন? যুদ্ধের সিনেমায় লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে মানিক, কিন্তু নদীর পাড়ের ফাঁকা মাঠে মাত্র পাঁচ-ছয়টি রক্তাক্ত মনুষ্য শরীর দেখে ভয়ে পাথুরে মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি লাশের ওপর উবু হয়ে পড়া আর একটি শরীরে পরেশ কাকার মতো জামা ও লুঙ্গি। লাইন করিয়ে মানুষগুলোকে কেউ গুলি করেছে বোধহয়। বেঁচে আছে কি এখনো?

মালতীর আর্তনাদ শুনে সংবিৎ ফিরে পায় মানিক।

'ও কাকি, আশেপাশে মিলিটারি আছে, দৌড়ান, আমার পিছে দৌড়ান।'

মানিক আগের চেয়েও জোরে দৌড়াতে থাকে। লাশগুলোকে এড়ানোর জন্য নদীর পাড় থেকে এবার ক্ষেতের আল ধরে আবার মানুষের বসতি খোঁজে। নদীঘেঁষা হলেও চরুয়া জায়গা নয়, কায়েমি গ্রামের মতো গাছপালা, ক্ষেত ও ঘরবাড়ির চিহ্ন চোখে পড়ে। একটি বাঁশঝাড় পেরোতেই চোখে পড়ে পোড়া ঘরবাড়ির চিহ্ন। এই রাতের আগেই বাড়িটাতে আগুন দিয়েছিল কেউ, ভিটাতে ভেজা ছাই, পোড়া বাঁশকাঠ। পোড়া বাড়ি পেরোলেই স্কুলের মতো লম্বা একটি টিনের ঘর এবং কয়েকটি চালাঘর নিয়ে জায়গাটা বাজার সম্ভবত। এখানেই কি মিলটারির ক্যাম্প? মানিক রাস্তা ছেড়ে ক্ষেতের আল ধরে, পাটক্ষেতের আড়াল দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে।

সামনে কিছু গরিব ও মাঝারি গেরস্তবাড়ির অস্তিত্ব চোখে পড়ে। কিন্তু কোনো বাড়িতেই জনমানুষের সাড়া নেই। মিলিটারির ভয়ে সবাই পালিয়ে গেছে নাকি? অচেনা বাড়িতে ঢুকে সাহায্য চাওয়ার বদলে যতদূর সম্ভব বিপজ্জনক এলাকাটি থেকে তাড়াতাড়ি সরে যেতে চায় মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীকে জোরে হাঁটার তাড়া দিলেও ক্রমে তার হাঁটার গতি মন্থর হয়ে যায়। অচেনা গেঁয়ো পথ ধরে একটানা ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আবারও নদীর তীরে গিয়ে ওঠে তারা। এই প্রথম নদীর পাড়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল ছাড়াই হাগতে বসা একটি মানুষ সাহস জোগায়। কিন্তু ওই অবস্থায় মানুষটার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় না, কথা বলাও যায় না। লোকটাও তাদের দেখে কাজটি স্থগিত রাখার বদলে ভয়েলজ্জায় মাথা হাঁটুতে লুকায়। লোকটাকে পাশ কেটে নদীর পাড় ধরেই হাঁটতে থাকে।

শিবুর ঘুম ভেঙে আবার কান্নার উপক্রম করলে তাকে মায়ের কোলে দিতে হয়। তারপর আস্তেধীরে বেলা ওঠা পর্যন্ত নদীর পাড় ধরে হাঁটে তারা। নদীতে এই প্রথম যাত্রীভরা একটি বড় নৌকা দেখে থমকে দাঁড়ায় মানিক। যাত্রীরা মিলিটারি নয়, সাধারণ বেশভূষার কতগুলি গেঁয়ো পুরুষ। মানিক দ্বিধা-ভয় জয় করে সহসা, আপনজনকে ফিরে পাওয়ার আকুলতায় চেঁচিয়ে ডাকে, 'ও ভাই, আমাদের বাঁচান। বড় বিপদে পড়ে গেছি আমরা, আমাদের বাঁচান। ও মাঝি ভাই, পার করে দেন আমাদের....

নৌকার আরোহীরা শুনতে পেয়েছে মানিকের ডাক। আরো পারের দিকে এগিয়ে আসছে নৌকাটি। কিন্তু পাড়ে ঘেঁষার আগে নদী থেকে চেঁচিয়ে পরিচয় জানতে চায়। যাত্রীদের প্রায় সকলকে যুবকশ্রেণির দেখে রাজাকার সন্দেহে মানিকের বুক কাঁপে। নানাজির কথা ভেবে সাহসী হওয়ার চেষ্টা করে। নৌকার যুবক যাত্রী দাঁড়িয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করে, 'কে আপনারা?'

AMARBOI.COM

'আমাদের নৌকার মাঝি বালারহাটের কাছে মিলিটারির গান বোটের গুলিতে মারা গেছে। নৌকার যাত্রীরা কে কোথায় পালিয়ে গেছে জানি না। আমরা কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি।'

'কোথায় যাবেন?'

'আপাতত যে-কোনো নিরাপদ স্থানে আমাদের নামায় দেন।'

এবার নৌকাটি পাড়ে আসে। নৌকা থেকে নেমে আসে একটি যুবক।

'আর ভয় নাই, আমাদের নৌকায় ওঠেন জলদি।'

নৌকায় উঠে নৌকার খোলে রাখা অনেকগুলো রাইফেল স্টেনগান চোখে পড়ে। নৌকায় বসা ও আধাশোয়া যুবকগুলোর দিকে তাকায় মানিক। সরে বসে তারা মালতী ও মানিককে জায়গা দেয়। রাজাকার না মুক্তিবাহিনী নিশ্চিত হতে পারে না সে। একজনের চেহারা বাণ্টুর মতো ছোটখাটো, তবে থুতনিতে কচি গোঁফদাড়ি।

'আপনারা রাজাকার না মুক্তি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন শুনে যুবকগুলোও সন্দেহের চোখে তাকায় মানিকের দিকে। নেতা গোছের যুবকটি স্টেনগান হাতে নিয়ে জানতে চায়, 'কোনটা হইলে আপনার সুবিধা?'

মানিক জবাব দেওয়ার আগে শিবুর কান্না শুরু হয়। কান্নার সঙ্গে বাবাকে খোঁজে সে, 'বাবা কই? মা বাবার কাছে যাব।'

মালতী ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করে। মানিকের ভেতরে রুদ্ধ আবেগ প্রবল ঢেউ হয়ে জাগে। এতদিন হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের খবর শুনে শুনে যে কান্নাটা ভেতরে জমা হয়েছিল, আজ স্বচক্ষে নৌকার হালে এবং নদীর পাড়ে লাশ দেখে যে কান্নাটা জোঁকের মতো হৃৎপিণ্ড খামচে ধরে আছে এখনো, শিবু ও মালতী কাকির কান্নার ছোঁয়ায় তাই যেন নদী হয়ে বইতে চায়। কান্না লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে চেঁচিয়ে বলে, 'আপনারা যদি হানাদারবাহিনীর দালাল মানে রাজাকার হন, তাহালে আমাদেরকেও গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেন।'

'ভয় নাই ভাই, আমরা মুক্তি। চিলমারী অপারেশনে আসছিলাম। আপনাদের মুক্ত এলাকায় নিয়ে যাব আমরা।'

এই প্রথম মুক্তিবাহিনী দেখা এবং মুক্তিবাহিনী কর্তৃক উদ্ধার হওয়ার সৌভাগ্যেও সম্ভবত মানিকের চোখে অশ্রু গড়ায়।

AMARBOI.COM

তেইশ

নৌকা থেকে নেমে, মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে নিরাপদ মুক্ত অঞ্চলে পা রাখার পরও মুক্তির আনন্দ মানিকের মনে বিন্দুমাত্র সাড়া জাগায় না। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। কান্নার ক্লান্তিতেই হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে শিবু। দীর্ঘ নৌযাত্রার ধকল ছাড়াও স্বামী ও সুটকেস হারানো শোকভারে মালতীরও বিধ্বস্ত দশা। উদ্ধারকারী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে নৌকায় আলাপ-পরিচয় তাদের সঙ্গে একাত্মতার যে বোধ জাগিয়েছে, তাই যেন এখন দেহেরও একমাত্র রসদ। মানিক শিবুকে আবার কোলে তুলে নেয়।

মুক্তিবাহিনী যে যার অস্ত্র হাতে নৌকা থেকে নামার পর ঘাটে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। সীমান্তবর্তী এ থানাটি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ঘাট থেকে মাত্র দু'তিন মাইল দূরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। রাতব্যাপী অপরেশন চালানো ও যুদ্ধ করার ক্লান্তি নিয়ে ওরা এখন ক্যাম্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরবে। বাহিনীর সবাইকে ফলইন করার নির্দেশ দিয়ে কমান্ডার আনোয়ার বলে, 'মানিক ভাই, অপারেশনে বেরিয়ে আমরা সাধারণত অচেনা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলি না। কিন্তু আপনিও তো আমাদেরই একজন, কাকি না থাকলে আপনাকে আমাদের ক্যাম্পেই নিয়ে যেতাম।'

'আপনারা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন। যতদিন বেঁচে আছি ভোলা যাবে না আপনাদের কথা। কাকিকে ইন্ডিয়ার একটা শেল্টারে রেখে আমিও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেব।'

'এখন আমাদের পিছে পিছে বাজার পর্যন্ত চলেন, আমরাই এখন বর্ডারে যাওয়ার রাস্তাঘাট আপনাকে চিনিয়ে দেব।'

মানিক ও মালতীকেও সঙ্গে রাখার জন্য মুক্তিবাহিনী দুই লাইন হয়ে ধীরপায়ে ক্যাম্পের দিকে হাঁটে।

কমান্ডার এলাহি কারমাইকেলের ছাত্র, মানিকের দু'বছরের জুনিয়র। তাছাড়া মানিকদের পাশের থানার দুইটি ছেলেও আছে, যারা মানিকের বাবা ও নানাকে চেনে। তার চেয়ে বড় কথা, রতনপুরের বাংটু বক্কর, কাসেম ও আম্বারকেও চেনে ছেলেটি, একসঙ্গেই ট্রেনিং নিয়েছে তারা। ট্রেনিংয়ের পর ওরা আলাদা সেক্টরে, সম্ভবত এখন দিনাজপুর-পঞ্চগড়ের দিকে অপারেশন চালাচ্ছে।

মানিক ও মালতীকে হাঁটার উৎসাহ জোগাতে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা মাঝেমধ্যেই ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখে, কথা বলে উৎসাহ জোগায়, 'আর মাত্র মাইলখানেক দূরে আমাদের ক্যাম্প। তারপর ধরেন আর দু'মাইল গেইলে পাইবেন বর্ডার। বর্ডারের কাছেই একটা স্কুলে শরণার্থী ক্যাম্প আছে। সামনের বাজারে চা-নাশতার দোকানও আছে।'

বাজারের কাছে স্কুলঘরে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পটিতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে কমান্ডার এলাহি ও অন্য মুক্তিযোদ্ধারা মালতী ও মানিকের কাছে বিদায় নেয়। রাতভর যুদ্ধ করে অবসন্ন সবাই। এখন ক্যাম্পে ফিরে গোসল-খাওয়া সারবে, তারপর ঘুমাবে দিনভর। কিন্তু নিজেদের আহার-নিদ্রার চেয়েও মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধারকৃত মানুষগুলোর জন্য দায়িত্ববোধটাই যেন বড় হয়ে ওঠে কারো কারো কাছে। পড়শী থানার মুক্তিযোদ্ধাটি কমান্ডারের কাছে আবেদন জানায়, 'ওস্তাদ আপনি বললে আমি মানিক ভাইকে বর্ডার পার করি দিয়া একেবারে কোচবিহারে এমএনএ মশিয়ার সাহেবের কাছেও পৌঁছে দিয়া আসতে পারব।'

'হারামজাদা পালাবার মতলব? ফের ইন্ডিয়া পালাবার চেষ্টা করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোকে নিজ হাতে গুলি করব। তোমরা ক্যাম্পে যাও, মানিক ভাই, আপনারা ওই চায়ের দোকানটায় বসে একটু বিশ্রাম নেন, চাটা খান, আমি দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়।'

চায়ের দোকানে উপস্থিত লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি ও জেরা অগ্রাহ্য করে মানিক আগে খাদ্য খোঁজে। নিজেদের পরিচয় ও গন্তব্য নিয়ে কথা বলার মতো তাগদ দেহে একটুও অবশিষ্ট নেই। মানিক সংক্ষেপে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার এলাহির মেহমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে দোকানের সুলভ বিস্কুট, গজা ও মিষ্টির অর্ডার দেয়। খেতে খেতে মনে হয় তার, মুক্তিবাহিনীর দলটি যেমন, তেমনি এই টিস্টলের অমৃত খাবারের স্মৃতিও মনে থাকবে আজীবন। দু'গেলাস পানি খাওয়ার পর, দু কাপ চায়েরও অর্ডার দেয় সে। মালতী কাকি বাড়িতে তাকে অনেকবার চা করে খাইয়েছে, কিন্তু সীমান্তের এই অচেনা টিস্টলে বসে মালতীকে চা খাওয়ানোর কথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। জীবনে অভাবিত কত কিছু যে ঘটে, সামনে যে আরো কী ঘটবে — তা জানাটা মানিকের ভাবনার অসাধ্য বলেই হয়তো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

মায়ের কোল থেকে শিবুও গজা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ায়। গজা ও বিস্কুট দুটাই একসঙ্গে মুখে পোরে। গেলাসে জল খাওয়ারও বায়না ধরে। শিবুর জন্য উপযুক্ত খাদ্যের সন্ধানে মানিক পাশের দোকানগুলোতে যায়। একটা ইন্ডিয়ান বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে ফিরে আসে, তখন কমান্ডার এলাহিও নতুন পোশাকে ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর কিংবা নবীন যুবক, ঠোঁটে গোঁফের রেখা।

এলাহি পরিচয় করিয়ে দেয়, 'মানিক ভাই, এই ছেলের নাম জিয়াদ। আমার কোম্পানিতে সবচেয়ে কম বয়সী মুক্তি। অসম্ভব সাহসী। এ মাসেই নাগেশ্বরী অপারেশনে গিয়া জিয়াদ খানসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। তারপর কী মন্ত্রবলে বেঁচে গেছে, সেটা ওর কাছেই শুনবেন। খবরটা জয় বাংলা পেপার ও রেডিয়োতেই প্রচার হয়েছে। এখানকার লোকজনও জানে।'

উপস্থিত লোকজনও যে জানে, সেটা 'জয় বাংলা' জিয়াদ বলে তাকে স্বাগত জানানো দেখেও বুঝতে পারে। জিয়াদকে এলাহি ক্যাম্প থেকে নিয়ে এসেছে মানিকদের সাহায্য করার জন্যই। স্থানীয় এক গেরস্তবাড়িতে নিয়ে যাবে সে, সেখানে খাওয়া ও বিশ্রাম নেওয়ার পর মানিকরা কোনপথে বর্ডার পার হবে, তাও দেখিয়ে দেবে। বিদায় নেওয়ার আগে এলাহি আরো জানায়, শিগগিরই মুক্ত এলাকার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাম্প গুটিয়ে নদীর ওপারের হাইডআউটে চলে যাবে তারা। ইন্ডিয়ার বিএসএফ মেজরের সঙ্গে অপারেশনের প্ল্যান নিয়ে আজ মিটিং করবে সে। কাজেই আর দেখা হবে না হয়তো, তবে বেঁচে থাকলে মুক্ত ও স্বাধীন দেশের রাজধানীতে আবারও মানিকের সঙ্গে দেখা হবে ইনশাল্লাহ।

আবেগপ্রবণ হয়ে মানিক তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায়। মালতী ও তার ছেলের কাছেও বিদায় নিয়ে চলে যায় এলাহি। জিয়াদ বলে, 'আপনারা আসেন দাদা আমার সাথে, আর চিন্তা নাই। আমাদের এই মুক্ত অঞ্চলে আপনারা মনে করেন এখন পুরাপুরি স্বাধীন।'

জিয়াদের কথা শুনে মানিকের বাণ্টুকে মনে পড়ে। দুজনই গাঁয়ের সহজ-সরল টাইপের ছেলে। বাণ্টুর তুলনায় কিছুটা লম্বা হলেও বয়স হয়তো আরো কম। মুখখানায় কৈশোরের মায়া মাখানো।

দোকানের বিল মিটিয়ে জিয়াদের পিছু ওরা হাঁটতে থাকে। শিবুকে মানিক কোলে নিতে চাইলেও মায়ের কোল ছাড়ে না সে। তবে রক্ষা যে, বাবাকে খুঁজছে না আর। নতুন জায়গা ও মানুষ দেখছে। মালতী রাতে মানিকের দেওয়া চাদরটি শরীরে জড়িয়ে রেখেছে এখনো। চোখেমুখেও গাঢ় ছায়া ফেলেছে রাতের দুর্ঘটনা।

হাঁটতে হাঁটতেই মানিক জানতে চায়, 'ও জিয়াদ, তোমার ধরা পড়ার গল্প তো শুনলাম না।'

'শুনমেন দাদা। এই গ্রামের সবাই জানে। চলেন আপনাদের এক চেনা বাড়িতে নিয়া যাই আগে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরেসুস্থে বর্ডার পার হইমেন।'

নিজের বাড়িতে ঢোকার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে জিয়াদ অচেনা এক গৃহস্থবাড়িতে তাদের নিয়ে ঢোকে। বাড়িটি যে হিন্দুবাড়ি তা গৃহকর্তার খালি গায়ে পৈতা ও গৃহকর্ত্রীর মাথায় সিঁদুর দেখে মুহূর্তেই বুঝতে পারে মানিক। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদ ও তার অতিথিদের দেখার জন্যে বাড়ির ছোট-বড় সবাই ছুটে আসে। জিয়াদ পরিচিত বাড়িওয়ালির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, 'ও দিদি, এমরা হামার কমান্ডার ওস্তাদের চেনাজানা মানুষ। শরণার্থী হবার জন্য ইন্ডিয়া রওনা দিয়া নদীতে সবকিছু হারাইছে। কোনোমতে জান হাতে নিয়া মুক্তিবাহিনীর নৌকায় আসল, এখন এনাদের তাড়াতাড়ি একটু গরম ভাত রাঁধি খাওয়ান। আমি চাউল-ডাইল কিনিয়া আনি দিচ্ছি। টাকা আপনি দেবেন দাদা, নাকি ওস্তাদের কথা কয়া বাকি আনব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক পকেটে হাত ঢোকায়, বাড়িওয়ালা তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'মুক্তিযোদ্ধার সাগাই মানে হামারও সাগাই। গত চার-পাঁচ মাসে নদীর ওপার হইতে আসা কত শরণার্থীকে এ বাড়িতে জলপান করাইছি, আর আপনাদের একমুঠ অন্ন দিতে পারব না? তোর চাউল-ডাইল লাগবে না জিয়াদ। বইসেন আপনারা।'

বাড়িঅলা লোকটি খুদে কৃষকশ্রেণির। মুক্ত এলাকা এবং বর্ডারের নিকটবর্তী বলেই বোধহয় টেনশনমুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। মুক্তিবাহিনী কাছেই ক্যাম্প করেছে বলে মুক্তিফৌজের প্রতি এদের দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতাও বেশি। বাড়িঅলি মহিলা একটা মাদুর বের করে বসার জন্য ঘরের ছায়ায় বিছিয়ে দেয়। বাড়িঅলা জানতে চায়, 'গত কাইল অপারেশনে যায়া কয়টা খানসেনা খতম করলু জিয়াদ?'

'গতকালের অপারেশনে আমি যাই নাই দাদা, কমান্ডার আমাকে নেয় নাই। গতকালও ওরা অল্পের জন্য পাকবাহিনীর শেলের মুখে পড়ে নাই। সহিসালামতে ফিরিয়া আসছে সবাই। হামার পেছনে ইন্ডিয়ান আর্মি ব্যাককভার না দিলে খানসেনাদের সাথে পারা মুশকিল। কারণ নিজের চক্ষে তো দেখিয়া আসনু, শালাদের কত যে অস্ত্র!'

'কাইল কোন্‌ঠে যুদ্ধ হইছে রে? গোলাগুলির আওয়াজ মনে হয় রাইতে আমার কানেও আসল। বর্ডারে না নদীর ওপারে কে জানে।'

'অপারেশনের গল্প পরে শোনেন দাদা, আগে হামার সাগাইকে খাতিরযত্ন করেন। ও বউদি, বাচ্চাটাকে নিয়া আপনি কুয়াতলায় গিয়া হাতমুখ ধোন, নিজের বাড়ির মতো ঘরে গিয়া আরাম করেন একটু। বর্ডার কিন্তু আরো দু'তিন মাইল হাঁটা লাগবে।'

বাড়িঅলি মহিলার সঙ্গে শিবুকে নিয়ে কুয়াতলায় যায় মালতী। ক্লান্তি ও শোকভারে যতই বিপর্যস্ত হোক, মালতীর যে পেচ্ছাব-পায়খানা পেতে পারে, এ কথা একবারও মনে হয়নি মানিকের। অথচ মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার এলাহি, এমনকি কিশোর মুক্তিযোদ্ধাটিও বিপদগ্রস্ত মহিলার এসব প্রয়োজনের কথা ভেবেই হয়তো এ বাড়িতে এনেছে। নিজে ওদের মতো মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার হীনমন্যতা তো ছিলই, তার ওপর উদ্ধারের পর থেকে মুক্তিবাহিনীর উদারতার পাশে নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হয় যে, তুচ্ছ এ জীবন সত্যি সত্যি নদীবক্ষে বিসর্জন দিলেও মানিকের খুব একটা আফসোস হতো না বোধহয়।

'দাদা কি বউদিকে নিয়া ইন্ডিয়ায় কোনো কুটুমবাড়িতে উঠবেন, নাকি শরণার্থী ক্যাম্পে?'

মানিক এতক্ষণে বুঝতে পারে, নৌকার মুক্তিবাহিনী রাস্তার বিপদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বললেও মালতীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি জিয়াদকে জানায়নি। নাকি হিন্দু বুঝলেই দাদা ও বউদি বলা তার অভ্যাস? মানিক বাড়িঅলা ও জিয়াদকেও ভুলটা ভাঙিয়ে দিয়ে বলে, 'উনি সম্পর্কে আমার কাকি হন। পাশাপাশি বাড়ি। গত রাতে কাকা ও অন্য আরো ছয়টি পরিবারের শরণার্থী আমরা একই নৌকায় আসছিলাম। চিলমারী বন্দরের কাছে এসে গোলাগুলির আওয়াজ পাই। তারপর...

নৌকার মুক্তিবাহিনীর কাছে যেমন, তেমনি পুরো ঘটনাটা বয়ান করলেও কাকিকে নিয়ে স্বার্থপরের মতো বাঁচার চেষ্টা করার জন্য এবার যেন লজ্জা ও খেদও হয়। উপসংহারে বলে, 'জানি না, আমার হয়তো ওই গ্রামে থেকেই বাকি সবাইকে আরো খোঁজা উচিত ছিল।'

জিয়াদ সান্ত্বনা দেয়, 'ওস্তাদ কইল, গতকালও হানাদাররা বালাবাড়িতে অনেক মানুষকে মারিছে দাদা। আল্লা আপনাদের বাঁচাইছে। আমাদের ধর্মেও একটা কথা আছে না, হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ। তা না হইলে পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়াও মরার জন্য শেষ কলেমা পড়িয়াও আমি বাঁচি আছি কেমনে কন?'

মানিক এবার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদের বাঁচার গল্পটি শুনতে চায়। এ বাড়ির সবাই আগেই শুনেছে। তবু নতুন করে শোনার আগ্রহ নিয়ে বলে, 'তোমার চাইতেও মস্ত বড় ফাঁড়া গেইছে এই চ্যাংড়ার ওপর দিয়া।'

জিয়াদ বলে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে রেখে ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটিয়ে তার বিশ্বাসযোগ্যতা যেন যাচাই করে মানিক।

মাত্র ১৭ দিন আগের ঘটনা। নাগেশ্বরী অপারেশনে গিয়ে রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর ঘাঁটির খুব কাছে গিয়েছিল মুক্তিবাহিনী। ক্রলিং করে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে একটা উঁচু আইলের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল সবাই। জিয়াদ ছিল অন্য মুক্তিদের চেয়েও বেশ কিছুটা এগিয়ে। কারণ ধানবাড়ি পাটবাড়ি ধরেন তার নিজের বাড়ির মতো। ক্রলিং করে সাপের মতো আগাইতে পারে সে। তারপর, আইলের আড়ালে ধানক্ষেতে শুয়ে অপেক্ষা করছিল সবাই কমান্ডারের নির্দেশ শোনার জন্যে। ফায়ার — সংকেত শুনেই গুলিবর্ষণ শুরু করেছিল জিয়াদের হাতের থ্রি নট থ্রি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, ভুল খবর দিয়েছিল স্থানীয় ইনফরমার। যেমন ভেবেছিল কমান্ডার ওস্তাদ, তার তুলনায় শত্রুরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। মুক্তিদের ফায়ারিংয়ের জবাব দিতে ওরা চারদিকে গুলির বৃষ্টি নামিয়েছিল। তার ওপর মর্টারের শেল বর্ষণ। অবস্থা বেগতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে কমান্ডার দলের সবাইকে পিছু হঠার সিগন্যাল দিয়েছে। কিন্তু বোকা জিয়াদ শত্রু খতমের নেশায় এমনই বিভোর যে, কমান্ডারের নির্দেশ শুনতে পায়নি। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পরও সে রাইফেলের ট্রিগার টানছিল।

তারপর ভোরের আলো ফুটলে জিয়াদ হঠাৎ টের পায় — সে একা, সাথীরা কেউ নেই, চারদিকে তার শত্রু সৈন্য। সংকটকালের একমাত্র সঙ্গী রাইফেলটিও অচল হয়ে যাওয়ায় সেটি ছুড়ে দিয়ে সে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। সামনে দাঁড়ানো অস্ত্রহাতে ভূতের মতো খানসেনাদের দেখে হাত তুলে সারেন্ডার করেছিল।

তারপর জিয়াদকে খানসেনারা বেঁধে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। চোখ ও হাত বাঁধা। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর একটা শক্ত খুঁটির সঙ্গে তার হাত-পা বেঁধে চোখ খুলে দিয়েছিল অবশ্য। অনিবার্য মৃত্যুকে মেনে নিয়ে জিয়াদের তখন একটাই আফসোস, এতগুলো খানসেনাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে একজনকেও সে আর মারতে পারবে না।

তারপর পশ্চিমা মিলিটারি অফিসাররা তাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। জিয়াদ নিজের দেশের নোয়াখালী কি সিলেটী ভাষাই ভালো বুঝতে পারে না, ভিনদেশী উর্দু, বালুচি কি ইংরেজি ভাষা বুঝবে কী করে। তারপরও বুঝেছে, ইন্ডিয়া ও মুক্তিফৌজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চেয়েছে ওরা। জবাব দিয়ে লাভ কী? প্রাণ ভিক্ষা চেয়েও লাভ নেই এবং ভয় পেয়েও লাভ নেই, কারণ জিয়াদ জানত মরণ তার সামনে। আর মরতে যখন হবেই, তখন শালাদের সাথে বেহুদা প্যাঁচাল পারিয়া লাভ আছে কোনো? জিয়াদ তাই এক মিলিটারির চড় খেয়ে, ওদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আবেগময় কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলেছিল — জয় বাংলা।

যেমন ধরেন, তেরা নাম কেয়া হায়? — জয় বাংলা। ঘর কাঁহা গায়? — জয় বাংলা। তোম মুক্তি ফৌজ হ্যায় কি নাহি? — জয় বাংলা। তোমহারা ক্যাম্প কীধার? — জয় বাংলা। সাঁচ বাতাও তোম মোসলমান আছো আউর হিন্দু হ্যায়? — জয় বাংলা। কোনো প্রশ্নেরই সঠিক জবাব না পেয়ে এক সময় যখন চোর পেটানোর মতো রুলের বাড়ি দিতে শুরু করেছিল একজন, তখনো চেঁচিয়ে আল্লাহ খোদা বা ও বাবাগো-মাগো বলে কাঁদার বদলে আকাশ ফাটা চিৎকার দিয়ে বলেছিল জিয়াদ, জয় বাংলা।

১৫-১৬ বছরের কিশোর সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও উন্মত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কণ্ঠে এভাবে জয় বাংলা ধ্বনি দেওয়ায়, শত্রু সেনারাও অবাক হয়ে গিয়েছিল কি? নিজেদের মধ্যে কী সব কথাবার্তা বলে এক ক্যাপ্টেন কি মেজরের হুকুমে জিয়াদকে হত্যা করার বদলে সারাদিন এবং রাত পর্যন্ত ওইভাবেই বেঁধে রেখেছিল। খেতেও দেয়নি কিছু। কেউ জিজ্ঞাসাও করতে আসেনি।

মাঝরাতে লম্বা গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবি মিলিটারিটি জিয়াদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একা। মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে জিয়াদ বাড়িতে ছেড়ে আসা বাপ-মার মুখ স্মরণ করে মনে কলেমা পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু খানসেনাটি টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজেছে তার মুখে। গুলি করার বদলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছে। তারপর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছে। ঘাড়ে আদুরে চাপড় দিয়ে ক্যাম্পের গেটের বাইরে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে বলেছে, 'যাও বেটা জয় বাংলা, জলদি ভাগ যা হিয়াসে।'

জিয়াদ ভেবেছিল দৌড়াতে বলে পেছন থেকে গুলি করবে নিশ্চয়। কিন্তু অস্ত্র তাক করার আগেই যদি অন্ধকারে অদৃশ্য হতে পারে, এই আশায় এবং পালাবার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল বলেই ভোঁদৌড় শুরু করেছিল। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, ভূতের ভয় নাই, ক্ষুধার্ত শরীরে বল নাই, জিয়াদ তবু কিসের শক্তিতে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল, তা সে নিজেও বলতে পারবে না।

প্রতিটি অপারেশনের পরপরই তো ক্যাম্পে ফেরার সময় সাথীদের খোঁজ পড়ে। কেউ হতাহত হলে তাকে সঙ্গে নেওয়ারও চেষ্টা করে মুক্তিরা। লাশ সঙ্গে না নেওয়া গেলে তাকে অন্তত অচেনা গ্রামের মাটিতেই কবর দিয়ে যায়। কিন্তু সেই অপারেশনের পর একমাত্র জিয়াদকে না পেয়ে তার লাশটাও না পাওয়ার জন্য অপারেশনের সব মুক্তিই কেঁদেছিল। কমান্ডার এলাহি ওস্তাদ নাকি ক্যাম্পে ফিরেও সেদিন কিছুই খেতে পারেনি। সাথীদের সামনে হু হু করে কেঁদেছিল পর্যন্ত। তাই তিনদিন পর জিয়াদ ক্যাম্পে ফিরে আসায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল সবাই।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদের জীবনের স্মরণীয় ঘটনাটির বয়ান শুনে বাণ্টুর কথা মনে হয় মানিকের। জিয়াদের জায়গায় জয় বাংলা-পাগল বাণ্টু হলেও এরকমই ঘটত সম্ভবত। রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপারেশনে বেরিয়ে বাণ্টুর জীবনেও হয়তো স্মরণীয় বিপদ-আপদের ঘটনা কত ঘটছে। বেঁচে আছে কি মরে গেছে বাণ্টু, তাই বা কে জানে। স্বাধীন শত্রুমুক্ত দেশে বাণ্টুকে ছাড়াই যদি ফিরতে পারে মানিক, তাহলে বীর মুক্তিফৌজের মায়ের স্বামী-সন্তান হারানো শোক পুষিয়ে দেওয়ার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজে মানিক ফিরতে পারবে কোনোদিন, তার নিশ্চয়তাই বা দেবে কে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ঘটনা দুর্ঘটনা কত কী ঘটতে পারে মানিকের জীবনেও।

কাঁসার বড় থালে গরম ভাত আর আলুর ডাল খেতে দেয় সীমান্তের সাময়িক আশ্রয়দাতা। ডালের মধ্যে ভাজা ডিমের মোড়ানো টুকরাও আছে। জিয়াদও খেতে বসে তাদের সঙ্গে। মালতী নিজে খাওয়ার আগে শিবুকে খাওয়ায়। খাওয়ার পর জিয়াদ পান-সুপারি মুখে দিয়ে বাড়িঅলার কাছে ইন্ডিয়ান বিড়ি চেয়ে নেয় একটা।

এইটুকু ছেলেকে বিড়ি টানতে দেখলে খারাপ লাগে মানিকের। বাড়িতে থেকেও বাণ্টুর এই বদভ্যাস ছাড়াতে পারেনি, জিয়াদের ইন্ডিয়ান বিড়ির ধোঁয়ার দুর্গন্ধ সহজভাবেই মেনে না নিয়ে উপায় কী? মালতীর খাওয়া দেখে মনে হয়, ছেলেসহ তাকে এরকম কোনো গেরস্ত বাড়িতে রাখতে পারলে সে হয়তো ভালো থাকত। মানিকও নিশ্চিন্তে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাতে পারত। কিন্তু মালতীর স্বামী হারানো ঘটনা শোনার পরও নিজ সম্প্রদায়ের মেয়েটার প্রতি বাড়ির লোকজনের তেমন সহানুভূতি লক্ষ করে না মানিক। যেন এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থী দেখে অভ্যস্ত তারা। মানিকের ব্যাগটির দিকে দৃষ্টি রেখে গৃহকর্তা এবার চাপা গলায় জানতে চায়, 'ইন্ডিয়ায় বেচার জন্য কিছু আনি থাকলে আমাকেও দিতে পারেন, ন্যায্য দাম দেব।'

'হয় দাদা, গয়াদা তো পাকিস্তানি জিনিস কিনিয়া বর্ডারে বেচার ব্যবসা করে, কিছু থাকলে দেন। উচিত দাম দেবে এলায়।'

'না, না, সেরকম কিছুই নেই আমার সঙ্গে।'

অতিথি বাৎসল্যের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভালো লাগে না মানিকের। যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদকে কয়টা টাকা দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে, কিন্তু মালতী কাকির কথা ভেবে গোপন ইচ্ছেটিও বাতিল করে দেয়। মালতীর খাওয়া শেষ হলে আর দেরি করে না মানিক। দিনের মধ্যেই বর্ডার পার হয়ে শরণার্থী ক্যাম্পে কাকির জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িঅলা ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদই তাকে যাওয়ার সহজ রাস্তা চিনিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চব্বিশ

কখন, ঠিক কোন মুহূর্তে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ঢুকে পড়েছে তা টের পায়নি মানিক। কারণ সীমান্ত আর সীমান্ত-প্রহরী বলে কিছু চোখে পড়েনি। তাছাড়া পায়ের নিচে একই রকম মাটি, রাস্তার ধারে ফসলের মাঠ, ঘরবাড়ি ও মানুষজনও নিজের দেশগ্রামের মতোই। দেখা হলে শুধায়, 'কী বাহে জয় বাংলার কী খবর? বাড়ি কোন জায়গায়?'

মানিক বিপদের খবর ভারতবাসীকে নতুন করে জানাতে চায় না আর। জীবনে প্রথমবার একটি নতুন দেশে এসেও, নতুন কোনো অনুভূতি জন্ম নেয় না মানিকের মনে। ইন্ডিয়ায় পৌঁছেও ইন্ডিয়া দেখার আগ্রহ বা আনন্দ জাগে না। কারণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে, পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে না আর। পথে মুক্তিবাহিনীর সংস্পর্শে এসে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মানিকেরও মানসিক প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছে যেন। এখন দেশকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মৃত্যুভয়কে সে জয় করেছে, মরতে যদি হয় বীরের মতো লড়াই করেই মরবে। এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছে মানিক। সন্তানসহ মালতীকে নিকটস্থ কোনো শরণার্থী শিবিরে পৌঁছে দিয়েই ট্রেনিং নেওয়ার জন্য নিজে কোনো যুবশিবিরে নাম লেখাবে।

মালতীও এখন অন্য মানুষ। প্রতিবেশী পরেশ কাকার সচ্ছল ঘরগেরস্তালির মাঝে সুখী ও সুশ্রী গৃহবধূ যে মালতীকে মানিক চিনত, নৌকায় ওঠার পরও যে মালতীকে দেখেছে, এখন তাকে আর চেনা যায় না। সদ্য বিধবার থেকেও করুণ দশা হয়েছে তার। প্রাণবন্ত শিশু শিবুও বেশ নেতিয়ে পড়েছে। খাওয়ার সময়েও বাবা কই বাবা কই বলে কান্না জুড়েছিল। বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সীমান্তের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে তারা। মায়ের কোলে থেকে শিবু অচেনা দেশ-জায়গায় কী দেখছে আর কাকে খুঁজছে কে জানে। আবার বাবার কাছে যাওয়ার বায়না ধরে কান্না জুড়লে মালতী তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে? একমাত্র সন্তানটিকে নিয়ে মেয়েটি এখনই হাঁটতে পারছে না, বিদেশ-বিভুঁইয়ে সামনের অনিশ্চিত দীর্ঘ ভবিষ্যৎ, একা একা কি করে পাড়ি দেবে সে?

'কাকি, এখন শিবুকে আমার কোলে দিন তো। আসো শিবু, আমার কোলে চড়লে ইন্ডিয়া ভালো করে দেখতে পাবে।

শিবু এবার হাত বাড়ায়, 'ইন্ডি কই? দেখব।'

'এই তো ইন্ডিয়া, ওই যে ইন্ডিয়ার গরু, দেখো কী সুন্দর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

শিবুকে নিজের বুকে তুলে নেওয়ার সময়, মানিকের সহানুভূতিমাখা করুণ দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ পেয়েই বোধহয় মালতীর চোখে আবার জল আসে, 'শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে তোমার কাকাকে যদি খুঁজে না পাই?'

মানিক জবাব দেয় না। পাকবাহিনী আক্রান্ত নদীপাড়ের গ্রামটি ছেড়ে পালাবার সময় ভোরের আবছা আলোয় যে লাশ কয়টিকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেছে, মানিকের দৃঢ় বিশ্বাস, ওইসব লাশের মধ্যে পরেশ কাকাও ছিল। কিন্তু রক্তাক্ত লাশের মধ্যে পরেশ কাকাকে খোঁজার সময় ছিল না, সাহসও হয়নি। মালতীও দেখেছে। কিন্তু আপন বৈধব্যকে মেনে নিতে নারাজ সে। মেনে নেওয়ার জন্য মানিকও কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না। মনে মনে ভাবে, পরেশ কাকার হদিস না মিলুক, শরণার্থী শিবিরে এলাকার কোনো হিন্দু পরিবারের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে। না হোক চেনাজানা, একই রকম দুর্ভাগ্যের শিকার শত শত মানুষ যেখানে আশ্রয় নিয়েছে, মালতীও নিশ্চয় ছেলে নিয়ে সেখানে থাকতে পারবে। আর স্বামী-সম্পদ হারা বিপদগ্রস্ত পড়শী মহিলাটিকে শরণার্থী শিবিরে রেখে আজই মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কোনো ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি হবে মানিক।

বাজারের কাছে শরণার্থী ক্যাম্প খোঁজার জন্য কাউকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। ক্যাম্পের চেহারা দেখে ভেতরে হতাশা বাড়তে থাকে।

একটি স্কুলঘরের পাশে মাঠে তৈরি হয়েছে একটি লম্বা টিনের চালা। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ঢোকার আর উপায় নেই। স্কুলঘর ছাড়াও টিনের চালার খোপের বাসিন্দারা ভেতরে-বাইরে গাদাগাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। একটি খোপের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে মরাকান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। কান্নার ভাষা থেকে বুঝতে পারে মানিক, কেউ মারা গেছে কিংবা মরে যাবে এক্ষুনি। দেখার জন্য শিবিরের বউ-বাচ্চারা ভিড় জমিয়েছে ঘরটির সামনে। অন্যদিকে কলতলায় পানির জন্য মেয়েদের ভিড় এবং কী নিয়ে যেন ঝগড়াঝাঁটির উত্তেজনা। পায়খানায় যাওয়ার জন্য জলের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে ধুতিপরা এক বৃদ্ধ। তর সয়নি বলে মাঠে বসেই কাজ সারছে বেশরম এক বালক। মাঠের কোণে মাটির চুলায় রান্না বসিয়ে গৃহহীন একটি বউ নিবিষ্ট মনে জ্বাল ঠেলছে। চেহারা-পোশাক ও কথাবার্তা শুনে সহজেই অনুমান হয় — উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসা দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সবাই। অনেকের খালি গায়ে প্রকট চর্মরোগ কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ ওঠার ব্যারাম। সব মিলে এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবার মৃত্যু-যন্ত্রণায় সারাক্ষণ কাতরাচ্ছে যেন।

পরিচিত মানুষজন খুঁজতে গিয়ে মানিক-মালতী যেমন শরণার্থী শিবিরের নানা চিত্র ও উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে, তেমনি তাদের পরিচয় জানার জন্যও ছেঁকে ধরে অনেকেই। বাড়ি কোথায়, কোন গ্রাম, পাক আর্মি হানা দিয়েছে কি না, রাজাকাররা কেমন উৎপাত করছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নে দেশের ভেতরের পরিস্থিতি জানতে চায়। সাদা থান পরা বয়স্কা এক মহিলা গা চুলকানোর জ্বালার সঙ্গে নবাগতদের বিদ্রূপ করে, 'শাঁখা-সিন্দুর আর ধুতি খুলিয়া স্বর্গে আইলেন না নরকে, দুইদিন পরে বুঝমেন। জায়গার ঠাকুর, ভিনদেশে আসিয়া হইনো কুকুর।'

মাঠে বসে বিড়ি টানা লোকদের একজন মন্তব্য করে, 'ক্যাম্পে কুত্তাবিলাইয়ের মতো মরার চাইতে বাপ-দাদার ভিটায় মিলিটারির গুলি খায়া মরাও ভাল বাহে। এয়াহিয়া শরণার্থীরঘরক পাকিস্তানে ফেরত নিতেছে। দ্যাশ স্বাধীন হউক আর না হউক, আগামী মাসে মুই দ্যাশে ফিরি যাইম।'

মালতী প্রথমে কান্নার গলায় বলে, 'এ কোথায় নিয়ে এলে মানিক! আমি এখানে থাকতে পারব না।'

পারতেই হবে কাকি। একা তো নও, অবরুদ্ধ স্বদেশে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে পালিয়ে আসা ৮০ লক্ষ মানুষ আছে পাশে, তোমার মতো অনেকেই আপনজন হারিয়েছে। হরিপুরের অভ্যস্ত সুখী সুন্দর জীবন এখানে খোঁজো না তুমি। কয়েকটা মাস উদ্বাস্তু বাঙালির দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হয়ে বাঁচো, আমরা তোমাদের স্বাধীন স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আবার।

মানিকের ভেতরে এ ধরনের একটা বক্তব্য আগেময় হয়ে ওঠে। কিন্তু মালতীকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না সে। মালতীর মতো সচ্ছল ঘরের যুবতী গৃহবধূ এবং একা শরণার্থী যেন এ শিবিরে মালতীই প্রথম। কার জিম্মায় তাকে রেখে যাবে সে? হঠাৎ আসমার কথা মনে পড়ে তার। এমএনএ মশিয়ার উকিলের পরিবারও কি এ ধরনের কোনো শরণার্থী শিবিরে কষ্টকর জীবন যাপন করছে? বিশ্বাস হতে চায় না। এমেনে কন্যা আসমা-অনিতাকে এ ধরনের শিবিরে মোটেই মানায় না। যেখানেই থাক, আসমাদের সাথে মালতীকে রেখে দিতে পারলে মানিক আরো বেশি নিশ্চিন্তবোধ করত। কিন্তু এত বড় এক অচেনা দেশে আসমাদের কোথায় খুঁজে পাবে সে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তার চাইতে আমাকে কোচবিহারে আমার মামার বাসায় নিয়া চলো মানিক। আমাদের নিয়ে তোমার কাকারও তো সেখানেই প্রথম ওঠার কথা ছিল। তোমার কাকাকেও সেখানে খুঁজে পাব হয়তো।'

'কিন্তু ঠিকানা তো বলতে পারেন না। আন্দাজে কোথায় খুঁজব?'

'টাউনে বাজারে মামার দোকান আছে। রাজবাড়ি থেকে তার বাসা বেশি দূরে নয়। খুঁজলেই পাওয়া যাবে।'

ক্যাম্পের পরিচালনকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা স্বেচ্ছাসেবকদের একজন যুবক সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, 'দাদা কি নতুন এলেন? এই ক্যাম্পে তো আর একটা ফেমিলিকেও শেল্টার দেওয়ার মতো জায়গা নেই। তবু আসেন দেখি আপনাদের জন্য কী করা যায়।'

মানিকের দ্বিধা দেখে মালতী এবার জোর গলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে, 'আমি এখানে থাকতে পারব না। আমাকে কোচবিহারে নিয়া চলো মানিক।'

উদ্বাস্তুদের একজন মালতীকে সমর্থন জানিয়ে বলে, 'আত্মীয়স্বজন থাকতে এই ক্যাম্পে ভর্তি হবার জন্য আসছেন কোন দুঃখে? জয় বাংলা অফিস হইতে কার্ড করি নেন, রিলিফ পাবেন, আরামেই থাকবেন।'

'আপনারা ভদ্র ফেমিলি দাদা, শহরে রিলেটিভ থাকলে সেখানেই চলে যান। আসেন আপনাদের কোচবিহারে যাওয়ার রাস্তা আমি চিনিয়ে দেই।'

মানিক সিদ্ধান্ত পাল্টায়। কোচবিহারে গিয়ে মালতীর মামার বাসা কিংবা পরেশ কাকাকে খুঁজে না পাক, এমেনে সাহেবকে খুঁজে পেলে মালতীর জন্যে হয়তো আরো ভালো ব্যবস্থা করতে পারবে।

'টাকা এক্সচেঞ্জ করবেন দাদা? এখন তো রেট কমে গেছে, তবু সমান সমান পাবেন।'

মানিকের কাছে পাকিস্তানি টাকা রয়েছে এক হাজার। পথে পরেশ কাকাকে টাকাটা রাখতে দেওয়ার কথা ভেবেছিল সে। ভাগ্যিস দেয়নি। টাকা এক্সচেঞ্জের কথা শুনে কয়েকজন ছেঁকে ধরে মানিককে।

'আমাকে দিন দাদা... আমি শতকরা দু'টাকা বেশি দেব।... আসেন তো আমার সঙ্গে।...

'কত আছে দাদা? বেশি থাকলে আমাকে দিন...

মালতীর কাছে আলাদা কোনো টাকাপয়সা আছে কিনা, মনে আসা এ প্রশ্ন মুখে আনতে পারে না মানিক। দরদাম করে নিজের পাকিস্তানি টাকা বদলে ইন্ডিয়ান রুপি হাতে আসায় অসহায় দশাটাও অনেকখানি কমে যায়। শিবু বিস্কুট খাওয়ার বায়না ধরে। বাজারে একটি চায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানে মালতীকে নিয়ে বসে মানিক। শিবুর জন্য জিলিপি ছাড়াও এক কাপ গাইয়ের দুধের অর্ডার দেয়। শিঙ্গাড়া-কচুরি ও চা খেয়ে নিজে চাঙ্গা বোধ করে, মালতীকেও চাঙ্গা করার চেষ্টা করে, 'এত চিন্তা করবেন না তো কাকি। আমি সঙ্গে আছি, যেখানে সেখানে আপনাকে ফেলে দিয়ে পালাব না। শিবুকে পেট ভরে খাইয়ে দেন।'

মানিকের সান্ত্বনার চেয়ে শিবুর কৌতূহলই ইন্ডিয়া ও বর্তমানের দিকে বেশি বেশি তাকাতে বাধ্য করে মানিক ও মালতীকে। বাবার অভাব বোধ ভুলে ছেলেটা জুলজুল চোখে এটা কি ওটা কি করছে সারাক্ষণ। কিন্তু মালতী বা মানিক তবু শিশুর মতো হয়ে উঠতে পারে না। একেবারেই যে পারে না, তাও বোধহয় নয়। নৌকা থেকে নামার পরই মালতীকে যেমন বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল, সে তুলনায় এখন তাকে কিছুটা সতেজ দেখাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেও।

প্রথমে রিকশায় এবং পরে দিনহাটা থেকে কোচবিহারগামী বাসে উঠে বসেও মানিকের ভেতরে পরস্ত্রীর সান্নিধ্য ভেতরে নতুন ধরনের অনুভূতি জাগায়। নৌকায় পাশে বসে যেমন হয়েছিল, সেরকম কি? দেশে কিংবা বিদেশেও মালতীকে এভাবে কাছে পাওয়ার কথা জীবনেও কল্পনা করেনি মানিক। আসমার সঙ্গে ইন্ডিয়া পালানোর সুযোগ এলেও ইন্ডিয়া বেড়ানোর কল্পনা মনে তেমন রোমাঞ্চ জাগায়নি। কিন্তু বাস্তবে নিজের পাশে মালতী কেমন স্বপ্নের মতো মনে হয়। অপ্রত্যাশিত সকল দুর্ঘটনার পরও মালতী তরুণী এক গৃহবধূ — মানিকের ভেতরে অবাঞ্ছিত অনুভূতি জাগতেই পারে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াকে ভালোলাগা নয়, বরং নানারকম ভয় ও অস্বস্তিকর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে মানিক। একা মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদ নয়, শরণার্থী শিবিরে ও পথে অনেকেই তাদের দেখে স্বামী-স্ত্রী ভাবছে হয়তো। কাকি ডাকলেও, বিষণ্ন ও বিধ্বস্ত চেহারার মধ্যেও মালতীকে তার চেয়ে বেশি বয়স্কা ভাবে না কেউ।

পরেশ কাকা সঙ্গে থাকলে ভয়-ভাবনার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকত না। স্বভাবগুণেই লোকটা সারাক্ষণ স্ত্রী-সন্তান ছাড়াও মানিককে আপন ভাইপোর মতো আগলে রাখত। কিন্তু এখন এই বিদেশবিভুঁইয়ে এসব স্বাভাবিকতা কে আগলে রাখবে? কোচবিহারে পৌঁছতে রাত নয়টা হয়ে যাবে। মালতীর মামার বাসা খুঁজে না পাওয়া গেলে রাতটা হয়তো তাকে নিয়ে কোনো হোটেলেই কাটাতে হবে। আর কিছু না হোক, মালতীকে অন্তত একখানা শাড়ি কিনে দিতে হবে। তারপর কী ঘটবে মানিক জানে না। তবু সেই অনিশ্চিত গন্তব্যে এখন এগিয়ে চলাই তার নিয়তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোচবিহার শহরে পৌঁছে মানিক আবারও ক্লান্ত ও দিশেহারা বোধ করে। শিবু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটার গা গরম, জ্বর এসেছে বোধহয়। ঠাণ্ডা পড়েনি এখনো, মানিক ব্যাগ থেকে চাদরখানা বের করে শিবুকে ঢেকে নিয়েছে।

'কাকি, রাতে আপনার মামার বাসা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। রাতটা কোনো হোটেলে কাটাতে হবে মনে হচ্ছে।'

'না। তুমি বাজারে গিয়ে খোঁজো আগে। তোমার কাকা হয়তো আমাদের খোঁজে মামার বাসায় গিয়ে উঠেছে। ভগবান, তাই যেন হয়।'

অনাত্মীয় ও ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী যুবকের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটানোর বদলে, প্রয়োজনে রাতভর স্বজনদের খোঁজার ব্যাপারে মালতীর আগ্রহের গভীরতা দেখে মানিক চুপসে যায়। কিছুটা অভিমানও জাগে হয়তো। কিন্তু প্রতিবাদ করে না। শহরের প্রধান বাজারকে গন্তব্য করে রিকশায় উঠে বসে আবার।

বাজারে হরেক রকমের কত শত দোকান। তার ওপর কাঁচা তরকারি, মাছ-মাংস বিক্রেতা। অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। মালতী শুধু জানে, কোচবিহার বাজারে তার মামার দোকান আছে। কী রকম দোকান, কিসের ব্যবসা — কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মামার জীবনেতিহাস বলতে পারে বিস্তারিত। অগত্যা মালতীর মামার অতীতকে ভিত্তি করেই মানিক বিভিন্ন দোকানের মালিক-কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করতে থাকে।

AMARBOI.COM

বলতে পারেন দাদা, ধীরেন দত্ত যার নাম, রংপুরের গাইবান্ধা মহকুমায় যার আদি নিবাস ছিল, '৫৪-এর রায়টের পর যিনি এই শহরে এসেছেন এবং এই শহরের বাজারে যার একটি দোকান এবং রাজবাড়ির কাছাকাছি কী এক মহল্লায় ছোট বাড়িও আছে একটা, দোকান কি বাসার ঠিকানা বলতে পারব না, তবু তাকে না পেলে আমরা বড় বিপদগ্রস্ত হব।

একে জয় বাংলা থেকে আগত, সঙ্গে মেয়েমানুষ, তার ওপর এদের আত্মীয় এ শহরেরেই অধিবাসী এবং এ বাজারেরেই একজন — মানিককে সাহায্য করার জন্য বাজারের লোকজনের মধ্যে সাড়া জাগে। ডেকে নিয়ে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসতে দেয় একজন, চায়ের অর্ডার দেয়। আশপাশ বহু দোকানের মালিক-কর্মচারী ঘিরে দাঁড়ায় তাদের। ধীরেন দাস, ধীরেন চন্দ্র বর্মণকে খারিজ করে অবশেষে আসল ধীরেন দত্তের সন্ধান দেয় একজন। বাজারে লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে তার বন্ধ দোকান ও বাসার ঠিকানাও জোগাড় হয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনায়াসে। এক দোকান মালিক আজ রাতের জন্য নিজের বাড়িতে আতিথ্য নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাইড হিসেবে একজন লোকও এগিয়ে আসে, 'আসেন দাদা, ধীরেনদার বাসায় আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

যুদ্ধরত দেশের বিপন্ন বাঙালি প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এপার বাংলার লোকগুলোর আন্তরিক সাহায্য-সহানুভূতি দেখে অভিভূত বোধ করে মানিক।

রাজবাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে না হলেও ধীরেন দত্তের ঘরবাড়ির চেহারা রাজবাড়ির সম্পূর্ণ বিপরীত। মামার বাড়ি দেখে মালতীও নিশ্চয় হতাশ বোধ করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের আধাপাকা ছোট্ট একটি বাসা। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে গাইড লোকটি চেঁচায়, 'ও ধীরেন দা, জয় বাংলা থেকে তোমার ভাগ্নি আর ভাগ্নিজামাই এসেছে গো। বেরোও শিগগির।'

বাড়ির ভেতর থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসে পরিবারের সবাই। আপন মামাকেও চেনে না মালতী। মামাও চেনে না ভাগ্নিকে। মধ্যবয়সী বেটেখাটো চেহারার লোকটির সঙ্গে মালতীর চেহারায় মিল নেই। তবে ধীরেন দত্তের স্ত্রীর চেহারা মোটাসোটা ধাঁচের হলেও সুশ্রী, মহিলা বেশ হাসিখুশিও। সেই প্রথম স্বামীর কাছে জানতে চায়, 'কে গো, তোমার কোন বোনের মেয়ে? জয় বাংলার কোথায় বাড়ি?'

মালতী কান্নার গলায় পরিচয় দেয়, 'মামা, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি আপনার বড়দিদি হৈমন্তীর মেয়ে মালতী। দিনাজপুরে আমাদের বাড়ি।'

তুমি হৈমন্তীদির মেয়ে মালতী! সেই যে একবার গিয়ে তোমাকে ছোট্ট খুকিটি দেখে এলাম। তোমার বিয়েও হয়েছে শুনেছি হরিপুরে। তা আসো, আসো, আগে ভেতরে আসো। '

ঘরের ভেতরে ঢুকেই মালতী শিবুকে মানিকের কোলে দিয়ে, প্রণামের সাথে তার দুঃসহ শোকের বোঝাও মামা-মামির চরণে নিবেদন করে যেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে কোনোরকমে বলতে পারে সে, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে মামা।'

মালতীর সর্বনাশের স্বরূপ বুঝতে মানিকের দিকে তাকায় সবাই। তখন মানিককে মুখ খুলতে হয়। অবসাদ আর ক্লান্তিতে বুজে আসে মানিকের কণ্ঠ। তবু তাকে জামাই ভাবার ভুলটা নির্মূল করতেই যেনবা ছেড়ে আসা রাক্ষসপুরীতে ফিরে যেতে হয়। আগুনলাগা দেশের প্রকৃত বাস্তবতা জানতে ব্যাকুল ধীরেন দত্ত ও তার নিকট পড়শীরা ঘিরে ধরে মানিককে। স্বামীর অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা শুনে মালতী গেঁয়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ের মতোই গলা ছেড়ে কাঁদে। মায়ের কান্না দেখে শিবুও কাঁদে। তখন ঘরে সান্ত্বনার বৃষ্টি নামে।

অনাত্মীয় ভিড়ের কৌতূহল ও সহানুভূতির বর্ষণ ক্লান্তি বাড়ায় মানিকের। এইসব ঝুটঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে এখন একা হতে চায়, ঘুমানোর কথা ভাবে। কিন্তু ধীরেন দত্তের এই ছোট ঘরসংসারে শান্তিতে ঘুমানোর জায়গা না হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় সে। ভিড় পাতলা হলে ঘরের ভেতর মালতীর মামাকে একা পেয়ে মানিক তার হাতে ৫০০ টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই টাকাটা আপনি রেখে দিন দাদা। কাকির হাতে তো কিছুই নেই। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাকে একটু দেখেশুনে রাখবেন। আর আমাকে বিদায় দিন, আমি এখনই চলে যাব।'

'আসতে না আসতেই চলে যাবে মানে! কোথায় যাবে তুমি?'

ঘুমানোর জন্য আপাতত একটি হোটেলে যাব বলা যায় না। আবার এত রাতে মুক্তিযুদ্ধে যাব বলে বীরত্ব দেখানোর সাহসও সে খুঁজে পায় না। ধীরেন দত্ত চেঁচিয়ে ভাগ্নিকে ডাকে, 'ও মা মালতী, এ চ্যাংড়া যে তোকে রেখেই পালাতে চাইছে? এখানে কি তোমার অন্য কোনো আত্মীয় আছে?'

'না। আমি আসলে কাকা-কাকির সঙ্গে ইন্ডিয়ায় এসেছি মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানোর জন্য। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার। আসার সময় চেনা কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে কথা দিয়ে এসেছি আমি। এখন যাই। কাকিকে বুঝিয়ে বলবেন।'

যে ভয়ে মানিক মালতীর কাছে বিদায় নিতে চায়নি, তাই আরো নাটকীয়ভাবে ঘটে যায়। সবার সামনে মানিকের হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে বলে মালতী, 'আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচায় এনে নিজে আবার মরতে যাবে? না, আমি তোমাকে যেতে দেব না বাবা। তোমার কাকা নেই, বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না, তুমিও গেলে তোমার বাবা-মাকে আমি কী জবাব দেব?'

যুদ্ধ মানেই যে মৃত্যু নয়, আর মৃত্যু যদি আসেও, কিছু মানুষের মৃত্যুর চেয়েও যে সবার জন্য স্বাধীনতা অনেক বেশি মূল্যবান, মানিক এই মৃত্যুঞ্জয়ী অনুভব বোঝানোর মতো জোরালো ভাষা খুঁজে পায় না। মিনমিনে গলায় বলে, 'আমি তো যুদ্ধে যাওয়ার জন্যই এসেছি কাকি। পথে আমরা নিজেরাই তো দেখলাম, দেশের মানুষকে ওরা কীভাবে হত্যা করছে। এরপরও আমার মতো ছেলের চুপচাপ বসে থাকাটা অন্যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, তোমার কাকা না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দেব না। গেলে শিবু আর আমাকেও নিয়ে যাও। তুমি গেলে এখানে একা আমি থাকতে পারব না।'

ধীরেন দত্তের স্ত্রী স্বামীর হাতে ধরা টাকা আর মানিকের দিকে অবাক মুগ্ধ চোখে তাকায়। অপরিচয়ের দ্বিধাসংকোচ কাটিয়ে মানিকের হাত ধরে বলে, 'গরিব আত্মীয়ের বাড়ি যখন এসেছ, তোমাকে যমের মুখে এখনই ফেরত পাঠাতে পারি রে দাদা। আসো তো আমার সাথে, আগে হাতমুখ ধুয়ে একটু জলখাবার খাও, তারপর অন্য কথা।'

মানিকের আর যাওয়া হয় না।

পঁচিশ

পরদিন শহর দেখতে বেরিয়ে মানিক এমএনএ মশিয়ার আকন্দ ও তার পরিবারের কথা ভাবে। এই শহরের কোথাও ওরা আছে নিশ্চয়। মালতীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলে সে সান্ত্বনা যেমন পাবে, মানিকেরও যুদ্ধে যাওয়া সহজ হবে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে আসমা-অনিতার সাথে আর একবার দেখা হলে ক্ষতি কী? মালতী অন্ধ স্নেহের আবেগে, কিংবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে মানিককে যেভাবে আটকে রাখতে চায়, আসমা তা করবে না। ব্যক্তিগত সুখ-স্বপ্নের জন্য মানিককে সে অপরিহার্য ভাবেনি বলেই বোধহয় ইন্ডিয়ায় আসার সঙ্গী হওয়ার জন্য তেমন জোর-জবরদস্তি করেনি। নাকি ব্যক্তিগত ভালোবাসার চেয়ে দেশে থেকেই দেশের জন্য মানিকের কিছু করার দেশপ্রেমকে বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছে?

যেটাই সত্য হোক, দেখা হলে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য হয়তো হাসিমুখে মানিককে বিদায় জানাবে সে। আসমার সেই হাসিমুখ দেখার ইচ্ছে জাগে। অনিতা ও সুমনও মানিককে দেখলে খুশি হবে অবশ্যই। কিন্তু কোথায় খুঁজে পাবে তাদের? শহরে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যাওয়াই আপাতত একমাত্র সম্ভাবনা। এটুকু প্রেরণা নিয়ে মানিক রংপুরের মতো ছোট জেলা শহরটায় গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়ায়। তাতে অবশ্য শহরটাও দেখা হয়।

স্টেশনের দিকে হাঁটার সময় রাজবাড়ির কাছাকাছি রিকশায় হঠাৎ একটি চেনাচেনা মুখ দেখে, তাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিতে ছোট একটি ঘটনাকেও জীবন্ত করে তুলতে হয়। কারমাইকেল কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় কলেজে যাওয়ার জন্য এই ছেলেটি একদিন মানিকের সাইকেলের সামনে রডে চেপে বসেছিল। রেললাইনের কাছে হঠাৎ ব্রেক কষে ধরায় দু'জনই উল্টে পড়েছিল মাঝ রাস্তায়। মানিক পায়ে তীব্র ব্যথা পেলেও হেসে উঠেছিল সঙ্গীটি। সেই হাসি দেখে সহপাঠীকে সহজেই শনাক্ত করে মানিক, 'পঙ্কজ না তুই!'

পঙ্কজও চিনতে পেরেছে মানিককে, রিকশা থামিয়ে নেমে আসে, 'তোর নাম মোহাম্মদ আলী না?

ডাক নাম জানার মতো ঘনিষ্ঠতা গড়ে না উঠলেও বিদেশ-বিভূঁইয়ে পরিচিত কলেজের সহপাঠীকে খুঁজে পেয়ে মানিক আনন্দে জড়িয়ে ধরে। পঙ্কজ জলপাইগুড়ি যাবে, মানিককে রিকশায় তুলে নিয়ে স্টেশনে যায়। ট্রেনের দেরি আছে দেখে চা খেতে এক রেস্টুরেন্টে ঢোকে তারা। বাইরে মাইকে হরিয়ানা রাজ্য লটারির প্রচারণা। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এক লাখ টাকা।

'জলপাইগুড়ি যাচ্ছিস কেন?'

'তেমন কোনো দরকার নেই। ট্রেনে জয় বাংলা পরিচয় দিলে টিকেট লাগে না। সে জন্য ইন্ডিয়া চষে বেড়াচ্ছি। গত মাসে গিয়েছিলাম গৌহাটি। তিনদিন ছিলাম মাত্র। শালা অসমীয়রা বাঙালিকে একদম দেখতে পায় না। জলপাইগুড়িতে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় আছে, খাতিরযত্ন পেলে সেখানে কিছুদিন থাকব, না হয়তো দার্জিলিং মেলে কলকাতা চলে যাব।'

'বেশ আরামেই আছিস মনে হচ্ছে।'

'আরাম? বাড়ির সবাইকে নিয়ে কোচবিহারে কাকার বাসায় উঠেছি। থাকার জায়গা নেই, চৌকির নিচে ঘুমাতে হয় আমাকে, খেতে বসে প্রতিদিন খোঁটা, জয় বাংলার শরণার্থীরা নাকি শুধু কাকাকে নয়, গোটা ইন্ডিয়াকে ডুবিয়ে ছাড়বে। টোটো কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছি কি সাধে?'

'মুক্তিবাহিনীতে যাস নাই কেন?'

'তুই যাস নাই কেন?'

'আমি তো সবে কাল এসেছি। আচ্ছা, কোচবিহারে কি এমএনএ মশিয়ার আকন্দের দেখা পাওয়া যাবে?'

'ও বেটারা তো রাজার হালেই আছে। সেদিন ট্রেনে দেখলাম এক নেতাকে, দুই মেয়েকে নিয়ে শিলিগুড়িতে গানের প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে। এইসব লীলা করে শালারা ইন্ডিয়ায় মৌজ করে ফ্রি খাচ্ছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরছে, আবার বেতনও পাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের। যত সমস্যা শালা আমার মতো হিন্দুদের। তুইও তো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গে জানাশোনা থাকলে তোরও একটা ভালো ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বছর দুয়েক এক ক্লাসে পড়লেও পঙ্কজ কখনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না তার। সাইকেল অ্যাকসিডেন্টের ঘটনায় হাসি দেখে যেমন খারাপ লেগেছিল, আজ তার কথা শুনে সেদিনের চেয়েও বেশি খারাপ লাগে মানিকের। তাকে নিজের বিপদের কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে মানিক বলে, 'আমার ব্যবস্থা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। এমেনে সাহেবকে কোচবিহারে কোথায় পাব, সেটাই তোর কাছে জানতে চেয়েছিলাম।'

'সোজা জয় বাংলা অফিসে চলে যা। সেখানে সব শালার খোঁজ পাবি।'

জয় বাংলা অফিসে যাওয়ার ঠিকানা বুঝে নিয়ে মানিক উঠে দাঁড়ায়। পঙ্কজ এবার খাতির জমানো সুরে আর্জি জানায়, 'মোহাম্মদ আলী, তুই তো ভাই দেশ থেকে নতুন এলি, পারলে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যা, দেশ স্বাধীন হলে সুদে-আসলে দিয়ে দেব রে। আর বাংলা স্বাধীন না হলে তোরা পাকিস্তানে ফিরে যাবি, কিন্তু আমাদের বাকি জীবন এ দেশে রিফুজি হয়ে থাকতে হবে রে মোহাম্মদ!'

পঙ্কজের প্রতি বিরাগ প্রকাশের মোক্ষম সুযোগটি মানিক কাজে লাগায়। চায়ের দাম পরিশোধের পর ভাঙতি টাকা মুঠোয় চেপে বলে, 'টাকা আছে, কিন্তু তোকে দেব না। চলি।'

স্বাধীন বাংলাদেশ সাইনবোর্ডযুক্ত অফিসটিতে ঢুকে মানিক যেন দেশের মাটিতে পা রাখার অনুভূতি পায়। ভেতরে জনা আষ্টেক লোক, এলোমেলোভাবে চেয়ার-বেঞ্চিতে বসে গল্প করছে। এদের মধ্যে কে যে অফিসের প্রধান কর্তা, বুঝতে পারে না মানিক। তাকে দেখেও কৌতূহল প্রকাশ করে না কেউ। চেয়ারে বসা একজনের মুখ থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার আড়াল সরে যেতে মানিকের ভেতরে খুশি চলকে ওঠে। এমেনে মশিয়ার উকিলের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং আসমাদের রশিদ চাচা অফিসের প্রধান চেয়ারটি আগলে বসে আছে। মাস তিনেক আগেও এমেনের পরিবারকে আনতে গিয়ে মানিকদের বাড়িতে মুরগি-পোলাও খেয়ে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি আসমার খোঁজ পাবে সে, আশা করেনি। আসমার সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথা ভেবেও খুশিতে বুক ধকধক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আশ্চর্য যে, রশিদ মানিককে দেখেও হঠাৎ চিনতে পারে না। অফিসে এলোমেলোভাবে বসে থাকা অন্য লোকগুলোও যুদ্ধরত বাংলাদেশের, সম্ভবত আওয়ামী লীগের খুচরো নেতা ও কর্মী। ইন্দিরা গান্ধীর পারিবারিক জীবন নিয়ে একজন তার জ্ঞানগরিমা প্রকাশে ব্যস্ত, অন্য সবাই শ্রোতা। গল্প ও পেপার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে মানিকও রশিদকে চেনার গুরুত্ব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, এমএনএ মশিয়ার আকন্দকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'তার কাছে কী দরকার?'

জবাব দেওয়ার আগেই অবশ্য রশিদ মানিককে চিনতে পারে এবার, 'আরে! তুমি সেই হরিপুরের আমাদের সজব ভুঁইয়ার ছেলে না? খবর কী তোমাদের? কবে এসেছ ইন্ডিয়ায়? বসো, বসো।'

'এই তো গতকাল।'

পথের দুর্ভোগ-দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে লোকগুলোর সহানুভূতি ভিক্ষা করার ইচ্ছে হয় না। মালতীকেই বা এরা কী সাহায্য করবে? আসমার হদিস জানতে মানিক জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের বাড়ি থেকে এমেনে সাহেবের ফেমিলিকে নিয়ে বর্ডার পার হতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

'নদী পার না হওয়া পর্যন্ত ভয় একটু ছিল, সঙ্গে স্থানীয় ছেলেরা ছিল বলে অসুবিধা হয়নি। গত সপ্তাহে কলকাতা গিয়েছিলাম, ভাবি তোমাদের বাড়ির কথা বলেছিলেন। খুব নাকি খাতিরযত্ন করে রেখেছিলে তাদের।'

'এমেনে সাহেবের ফেমিলি এখন কোথায়?'

'ঠিকানা দিচ্ছি। ইন্ডিয়া এসেছ যখন, কলকাতা নিশ্চয় বেড়াতে যাবে। গেলে দেখা করতে পারো।'

রশিদ মুজিব কোটের পকেট থেকে কলম ও ড্রয়ার থেকে প্যাড বের করে ঠিকানা লেখে। আসমার সঙ্গে সাক্ষাতের গোপন বাসনা পূরণ করতে কলকাতা পর্যন্ত যাবে কি না মানিক বুঝতে পারে না। ঠিকানা হাতে নিয়ে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, 'মশিয়ার চাচার সঙ্গে অবশ্য দেখা করা দরকার ছিল।'

'মশিয়ার ভাইকে তো কলকাতায় পাবে না। এখন তিনি কোচবিহারেই আছেন। রাত দশটার পর অশোক হোটেলে গেলে দেখা পাবে। তা তুমি উঠেছ কোথায় বলো তো?'

'আমাদের গাঁয়ের পরেশ সাহা, আওয়ামী লীগের কর্মী, পাকবাহিনী তাকে মেরেই ফেলেছে বোধহয়। তার ফেমিলিকে ওদের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি। আমিও আপাতত ওখানে উঠেছি।'

'তা তোমার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান রাজাকার নানার খবর কী? আমাদের মুক্তিবাহিনী তাকে খতম করেনি এখনো?'

মানিককে যেন হঠাৎ ন্যাংটো করে দেওয়া হয়, অস্বস্তি ও লজ্জায় চুপসে যায় সে। রশিদ তখন উপস্থিত লোকজনকেও তার পরিচয় জানায়, 'এর বাবা আমাদের দলের থানা কমিটির সভাপতি, কিন্তু নানা মুসলিম লীগার, কট্টর পাকিস্তানি। তা তুমিও নাকি গোপনে নানার সঙ্গেই ভিড়েছ শুনেছিলাম।'

'নানার সঙ্গে ভিড়লে তো আর ইন্ডিয়ায় আসতাম না। চলি।'

আসমার ঠিকানা ও কলকাতা যাওয়ার সম্ভাবনা মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো যে প্রাপ্তি সুখ জাগিয়েছিল, নানার প্রসঙ্গ তুলে রশিদ তাতে কামান দাগিয়েছে যেন। এমনিতে বাবা কিংবা নানার পরিচয়ে পরিচিত হতে কখনো গর্ব বোধ করে না মানিক। তার ওপর দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করার নিয়ত নিয়েই যখন দেশ ছেড়েছে, তখন তার রাজাকারের আত্মীয় পরিচয়টাই জয় বাংলা অফিসে প্রধান হয়ে ওঠায় মানিক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংটুর মতো মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় থাকলে এমেনে-চামচার টিটকারির উচিত জবাব দিতে পারত তৎক্ষণাৎ। কিন্তু মুক্তিবাহিনীতে যায়নি বলেই তো আর বাঙালি জাতি ও আত্মমুক্তির পথ দু'রকম হয়ে যায়নি। বরং দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও আপন মুক্তির পথ অভিন্ন ভাবছে বলেই তো দেশপ্রেমের আবেগে মানিক আজ পরিপূর্ণ, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে মৃত্যুবরণ করতেও বিন্দুমাত্র ভয় নেই আর। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে হঠাৎ আসমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ইচ্ছেকে কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? মানিক ঠিক বুঝতে পারে না।

আত্মপরিচয়ের সংকট ও অস্থিরতা নিয়ে মানিক অচেনা শহরের পথে আবার উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকে। অস্তিত্বের মূলে যুদ্ধরত দেশ ও দেশপ্রেম থাকলেও, স্বাধীন ভারতকে দেখার ও বোঝার কৌতূহলটাও একেবারে মিথ্যে নয়। পঙ্কজের মতো বিনা পয়সায় ইন্ডিয়া চষে বেড়াতে পারলে ভ্রমণের আনন্দ মানিকও পেত নিশ্চয়। কিন্তু রোম আগুনে পোড়ার সময় নিরোর বাঁশি বাজানোর মতো আচরণ বরদাশত করতে পারে না মানিকের দেশপ্রেমিক চেতনা। ইচ্ছে করলে সে আজই কলকাতা যেতে পারে, আসমার সঙ্গে দেখা হলে দু'জন মিলে স্বাধীনভাবে ঘুরে ভারতে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে কিছুটা, কিন্তু মানিকের দেশপ্রেমিক মন তা মেনে নিতে পারবে না সহজে। পঙ্কজকে সে ঘৃণা করেছে, কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণা আর বাড়াবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলকাতা দেখার শখ বা আসমার সঙ্গে সাময়িক মিলনের সুখ-তৃষ্ণাকে নিজের ভেতরে আর ঠাঁই দেবে না মানিক। বরং মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং নিতে কোনো ইয়ুথ ক্যাম্পেই ভর্তি হবে দু'একদিনের মধ্যে।

দেশে থাকতেই মানিক শুনেছিল, মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাতেও এখন আওয়ামী লীগের সার্টিফিকেট লাগে। পরেশ কাকা মানিকের আব্বার কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছিল। সুটকেস ও মানুষটার সঙ্গে সেই সার্টিফিকেটও হারিয়ে গেছে। মানিক কি তবে সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্যে জয় বাংলা অফিসে যাবে? কিন্তু আসমার রশিদ চাচার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় না আর, তার চাইতে রাতে সরাসরি আসমার বাবার সঙ্গে দেখা করাই ভালো। রাত পর্যন্ত সময় কাটানোর জন্য মানিক শহরে ঘুরেফিরে ইন্ডিয়া দেখার সাধ মেটায়। একটা সিনেমা হলে সত্যজিৎ রায়ের *সীমাবদ্ধ* ছবি চলছে। এই বিখ্যাত পরিচালকের নাম শুনেছে মানিক, ছবি দেখেনি। টিকেট কেটে হলের ভেতরে ঢোকে সে। হল প্রায় ফাঁকা।

সিনেমা দেখে, হোটেলে খেয়ে, রাজবাড়িসহ কোচবিহার শহরের পুরোটাই দেখে বেড়িয়ে, রাত দশটার দিকে মানিক যখন অশোক হোটেলে আসে, হোটেলটাও তার বেশ পরিচিত মনে হয়। কারণ দিনের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে হোটেলটা চিনে খোঁজখবর জোগাড় করেছিল সে। তিনতলার নির্দিষ্ট রুমে নক করতেই দরজা খুলে যায়। অ্যাডভোকেট মশিয়ার আকন্দের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, গায়ে যথারীতি মুজিব কোট, চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

'তোমরা কি রাতের বেলাটাও শান্তিতে আমায় একটু রেস্ট নিতে দেবে না? এই মাত্র ফিরেছি আমি। কোনো কথা থাকলে সকালে এসো।'

মানিক ভাবে, তাকে চিনতে পারেনি কিংবা ভুল পরিচয়ে চিনছে। ভুলটা ভেঙে দেওয়ার জন্য সে নিজের পরিচয় দেয়, 'আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি চাচা। আমি হরিপুরের সজব ভুঁইয়ার ছেলে মানিক। দেশ থেকে কাল এসেছি।'

'ও আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানিক। তা কী করব বাবা বলো — প্রাইম মিনিস্টার গোটা নর্থ জোনের ইয়ুথ ক্যাম্পের দায়িত্ব দিয়েছে আমায়। প্রতিদিন তোমার মতো হাজার হাজার তরুণকে সামাল দিতে হয়। কজনকে মনে রাখি আর কজনের জন্যই বা কী করতে পারি। তা তোমার কী প্রব্লেম বাবা?'

'আমার একটা সার্টিফিকেট দরকার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা এসো, ভেতরে এসো।'

রুমের ভেতরে ঢুকে মানিক হঠাৎ আসমাকে দেখার বিস্ময়ে চমকে ওঠে। আসমা নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি বয়সের একটি মেয়ে, চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছে। টেবিলের ওপর একটি বোতল ও গ্লাস। অচেনা যুবতীর মতো রুমের ভেতরে অচেনা রহস্যময় গন্ধ। এমএনএ সাহেব মানিককে মেয়েটার পরিচয় দেয় এভাবে, 'ও সুরভি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করছে। সুরভি তুমি বসো, আমি এ ছেলেকে বিদায় করে তোমার কথা শুনব।'

ড্রয়ার থেকে প্যাড ও কলম বের করে মশিয়ার আকন্দ মানিক ও তার পিতার নাম, ঠিকানা জেনে নিয়ে খসখস করে লিখতে থাকে। যেন এ ধরনের সার্টিফিকেট রোজই তাকে হাজার হাজার দিতে হয়। লিখতে লিখতেই জিজ্ঞেস করে, 'তা তুমি কবে এলে? উঠেছ কোথায় মানিক?'

'আমি গতকাল কোচবিহারে এসেছি চাচা। আর্মস ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কোনো ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি হতে চাই।'

'কিন্তু তোমাদের বোধহয় আর দরকার হবে না মানিক। ট্রেনিং নেওয়ার অপেক্ষায় বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্পে লাখের ওপর আমাদের ছেলেরা অপেক্ষা করছে। এদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তার প্রয়োজনও হয়তো হবে না।'

'কেন? এ পর্যন্ত যত ছেলে মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধ করছে, দেশ স্বাধীন করার জন্যে তারাই কি যথেষ্ট মনে করছেন?'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! শুধু মুক্তিবাহিনীর ওপর নির্ভর করলে আমাদের জয়ের মুখ দেখতে হবে না। আমরা আশা করছি নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্ডিয়া আমাদের স্বীকৃতি দেবে। তারপর ওপেনলি ইন্ডিয়ান আর্মি পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ফাইট করবে। ইন্ডিয়ান আর্মি ত্রিমুখী আক্রমণ না চালালে একটা শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেরা ফুটফাট গুলি ছুড়ে দেশ স্বাধীন করবে ভেবেছ?'

মানিকের হঠাৎ নানাজির কথা মনে পড়ে, যার একান্ত বিশ্বাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আসলে ইন্ডিয়ার পাকিস্তান ভাঙার একটা ষড়যন্ত্র। মশিয়ার আকন্দের কথাও কি এরকম কোনো ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত?

'চাচা, ইন্ডিয়ার আর্মি আমাদের দেশের ভেতরে ঢুকে পড়লে কি সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে?'

'শোনো, তুমি নিজের লোক বলেই বলছি। যে-কোনো অ্যাগ্রিমেন্টে আমরা ইন্ডিয়ার স্বীকৃতি যত সম্ভব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব। ইন্ডিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের হয়ে যুদ্ধ না করলে আমরা কি দেশে ফিরতে পারব ভেবেছ? ওদিকে আমাদের মুক্তিফৌজ আর মুজিববাহিনীর পাশাপাশি পিপলের মাঝে অনেক ব্যাড এলিমেন্ট প্রভাব বিস্তার করছে। এই যুদ্ধ অনেকদিন কনটিনিউ করলে আবারও আমাদের ক্ষমতা ফিরে পাওয়াটা হবে অনিশ্চিত। থাক এসব কথা — বাইরে আলোচনা করো না। তোমার বাবাকে গিয়ে বলবে চিন্তা না করতে। তোমাদের এলাকা তো সেফ আছে শুনলাম।'

'মাসখানেক হলো, রাজাকার ক্যাম্প হয়েছে। ওরাই অনেক জায়গায় ডাকাতের মতো অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট করছে। বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। আপনি আমাদের গ্রামের পরেশ সাহা, আপনাদের দলের একজন কর্মীকে দেখেছেন, তার বাড়িতেও গেছেন। সেই পরেশ কাকা তার ফেমিলিসহ ইন্ডিয়ার আসার পথে পাক আর্মি...

ব্যস্ত ও ক্লান্ত এমেনে সাহেব পাকবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনি শোনার উৎসাহ দেখান না। অধৈর্য কণ্ঠে বলে, 'বললাম তো বাবা পাকবাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকারদের দিন শেষ হলো বলে। ইন্দিরা গান্ধী রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। শোনো, আমরা আশা করছি, খুব শিগগির যে-কোনো সময় আমরা স্বাধীন দেশে ফিরে যাব। এখন ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে কষ্ট করার বদলে তুমি বরং গ্রামেই ফিরে যাও। দেশে থেকেই মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার চেষ্টা করো। তা তোমার আব্বার কী খবর?'

'ভালো।'

'এই কটা মাস তোমার বাবাকে একটু সাবধানে থাকতে বলো। আমার ফেমিলির জন্য অনেক করেছ তোমরা, ওরা ইন্ডিয়ায় আসার পরও আমি তো ওদের খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় পাই না। আজকেও তিনটা ক্যাম্প পরিদর্শন করে আসতে হলো। কাল আবার ছুটতে হবে কলকাতায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে।'

মানিক এত হতাশ বোধ করে যে, কথা বলতে ইচ্ছে হয় না আর। মশিয়ার রহমান কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'সার্টিফিকেটটা তবু রাখো, কাজে লাগতে পারে। তোমার বাবার কথাও ভালো করে লিখে দিয়েছি। আগে এলে অবশ্য আমাদের প্রবাসী সরকারি অফিসে তোমাকে একটা ভালো কাজে লাগাতে পারতাম। তোমার আব্বাকে বলো, শিগগির দেখা হবে আমাদের।

মানিককে বিদায় দেওয়ার জন্য এমএনএ সাহেব দরজা পর্যন্ত উঠে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশিয়ার আকন্দকে গ্রামের লোকজন মানিকের হবু শ্বশুরের স্থানে বসিয়েছিল বলেই কি অবচেতনে তার কাছে অনেক প্রত্যাশাও জেগেছিল? এই লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সারাদিন অপেক্ষা করেছে মানিক। কত কী ভেবেছে। এখন নিজের ওপরই বেজায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে। এরকম একজন মানুষ তার বাবার নেতা ও স্যার হতে পারে, মানিকের হবু শ্বশুর হতে পারে না, হবেও না। আসমা ও মানিককে জড়িয়ে গ্রামে বিয়ের গুজব স্ত্রী-কন্যাদের মাধ্যমে এমেনে হয়তো বিস্তারিত শুনেছে। প্রত্যাখ্যান বোঝাতেই কি মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুযোগ না দিয়ে মানিককে আবার অবরুদ্ধ স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলো সে? কিন্তু নেতার আচরণ ও পরামর্শ সহজভাবে নিতে পারে না মানিক। সিদ্ধান্ত নেয় সে, এই লোক ও তার মেয়ের সাথে কস্মিনকালেও সম্পর্ক রাখবে না আর, দু'মাস পর সত্যই যদি দেশ স্বাধীন হয়, তারপরেও না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কি শুধু মশিয়ার উকিলের বাপের, নাকি তার দলের সম্পত্তি যে, লোকটা না করে দিলেই মানিকের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে? বেঁচে থাকলে মানিকও দেখিয়ে দেবে একদিন।

সম্পর্ক তো তেমন হয়নি, তারপরও আসমার সঙ্গে পরিচয়ের সকল সূত্র চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য মানিকের ভেতরে ঝড় বয় কেন। বাসায় ফিরতে প্রায় বারোটা বাজে।

AMARBOI.COM

মালতী কাকির টেনশন হওয়া স্বাভাবিক। শিবুর জ্বর হয়েছে। অসুস্থ বাচ্চাটার কথা ভুলে মানিক এত রাত অবধি বাইরে থেকে স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভেবেছে শুধু। জ্বর না কমলে কালকে ছেলেটাকে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। বাসায় ফিরলে মালতী কিছু বলার আগে, দরজা খুলে দিয়ে তার মামা ও মামি হইচই বাধিয়ে নানা সন্দেহ ও অনুযোগ প্রকাশ করে।

'কোথায় ছিলে গো দাদা এত রাত পর্যন্ত? এদিকে তোমার কাকি কেঁদেকেটে অস্থির। বলে যে ব্যাগট্যাগ রেখেই পালিয়েছে। না, না, এত রাত পর্যন্ত না বলেকয়ে বাইরে থেকো না।'

মালতীর মামি গলা নামিয়ে চাপা কণ্ঠে ভয় দেখায়, 'যুদ্ধ আমাদের দেশেও আছে মানিক। নকশালদের কথা শোনো নাই? এই তো কিছুদিন আগেও পাড়ার এক ছেলে গুলি খেয়ে মরল। সাবধানে চরাফেরা করো।'

মানিক ফিরে আসায় মালতীর চোখে চকচক খুশি।

'শিবুর কী খবর কাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বরটা এখন নাই। কিন্তু আমাশা হয়েছে মনে হয়।'

'কাল ওকে ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

মালতী তার মামা-মামির কান বাঁচিয়ে মৃদুস্বরে জানতে চায়, 'এমএনএ সাহেবের বাসায় গেছিলে বুঝি? আসমার সঙ্গে গল্প করলে এতক্ষণ?'

মানিক চমকে ওঠে। আসমাকে সে আজ খুঁজবে এ কথা কাউকে বলা দূর থাক, বাসা ছাড়ার সময় মানিক নিজেও ঠিক জানত না। আসমার ওপর বিতৃষ্ণা দেখাতে সে জবাব দেয়, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে কাকি? আমি কি আসমাকে খুঁজতে ইন্ডিয়া এসেছি? যান, ঘুমিয়ে পড়েন আপনারা। আমি রাতের খাবার খেয়ে এসেছি।'

ছাব্বিশ

ধীরেন দত্ত লোকটা হাড়ে হাড়ে সাম্প্রদায়িক, প্রচণ্ড মুসলমানবিদ্বেষী। জাত বলতে সে আগে বোঝে হিন্দু বা মুসলমান, তারপর বাঙালি বা অবাঙালি। জন্মভূমি, জয় বাংলা বা যুদ্ধরত বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে সেটা টের পায় মানিক। ১৯৪৭-এ বাংলা ভাগ হয়ে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের দুই প্রদেশ হওয়ার পরপরই তো পূর্ব বাংলার অনেক হিন্দু বাসিন্দাই ভিটেমাটি বেচে বা এক্সচেঞ্জ করে ভারতে এসেছে। ধীরেনের বাবাও প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু বড় ছেলের কারণে পারেনি। '৫৬ সালের রায়টের পর বাবাই জোর করে মাত্র পনেরো হাজার টাকাসহ ধীরেনকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেয়। কথা ছিল সব সম্পত্তি বিক্রি বা এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা হলে তার বাপ-দাদারাও চলে আসবে। ধীরেন অনেক ছোটাছুটির পর দীনহাটায় এক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির পুরোটাই গ্রাস করার মতলব ছিল তার বড় ভাই নরেনের। তাই মুসলমানদের সমাজেই নিজের শিকড়-বাকড় বাড়াবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেটা কি সহ্য করবে মুসলমানরা? দাদাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে ধীরেন। বাজারে দোকান আর বাড়িটা করার পরও দু'বার গিয়েছিল দেশে, চিঠি লিখেছিল অনেকগুলো, কিন্তু দাদা এখানে আসেনি, ধীরেনের প্রাপ্য ভাগও বুঝিয়ে দেয়নি। এখন আগুন-জ্বলা বাংলাদেশে ভাই ও অন্য জ্ঞাতিগোষ্ঠী কি হালে আছে ধীরেন জানে না। গভীর উদ্বেগ ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমানের সঙ্গে জানায় সে, 'ছোট ভাইকে ঠকিয়ে মুসলমানদের দেশে সুখে থাকতে চেয়েছিলে। থাকো এখন।'

খেতে বসে ধীরেন তার দেশত্যাগের কাহিনি শোনায় মানিককে। মানিক সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'আপনার ভাইয়েরা হয়তো নিরাপদেই আছে।'

'মুসলমানের শাসনে হিন্দুরা এ-দেশে কোনোদিন শান্তিতে থাকেনি, থাকতেও পারবে না। মালতীর বাবাকেও কতবার লিখলাম, জামাইবাবু, আমি সব বন্দোবস্ত করি, বিষয়-সম্পত্তি বেচে দিয়ে ইন্ডিয়া চলে আসেন। কারণ পাকিস্তান আমাদের জন্য হয়নি। তা আমার কথা কেউ শুনল না। এখন হিন্দুরা ভিটেমাটি ছেড়ে ইঁদুরের মতো ইন্ডিয়ায় দৌড়ে আসছে কেন?'

এই অবস্থায় মানিক নিজের ধর্ম পরিচয় নিয়ে গর্ব করা দূরে থাক, প্রকাশ করতেও ভয় পায়। আবার লোকটার সাম্প্রদায়িক বোধ-বিবেচনাও সহজে মেনে নিতে পারে না। প্রচলিত যুক্তিটাই নতুন করে শোনায়, 'হিন্দু-মুসলমান এখন বড় কথা নয় দাদা, আসল পরিচয় তো আমরা সবাই বাঙালি। বাঙালি জাতির ওপরে এই আঘাত এসেছে।'

'আরে রাখো, বাঙালির মুখেই যত বড় বুলি। দু'তিন মাসে আগে দাদার খোঁজে বর্ডারের কাছে তিন-চারটা শরণার্থী শিবির ঘুরে এসেছি। কয়টা মুসলমান বাঙালি পরিবার অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে এবং ভয়ে এপারে পালিয়ে এসেছে? তোমাদের গ্রামের কথাই ধরো, তোমরা ছাড়া কোনো মুসলমান ফেমিলি পালিয়ে ইন্ডিয়া এসেছে?'

'আমার মতো অনেক ছাত্র, আওয়ামী লীগ ছাড়াও অনেক দলের নেতাকর্মীরা আসেনি? ইয়ুথ ক্যাম্পে ও মুক্তিবাহিনীতে যারা গেছে, তারাও তো প্রায় সবাই মুসলমান।'

'শোনো মানিক, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। শেখ মুজিবও তো শেখের বাচ্চা। বাংলাদেশ স্বাধীন করে তার দল আওয়ামী লীগ পাওয়ারে গেলেই কি তোমরা দেশে বুক ফুলিয়ে চলতে পারবে ভেবেছ? কোনোদিনও না।'

প্রথম দর্শনে লোকটা মানিককে ভাগ্নিজামাই ভেবে ভুল করেছিল। মানিক নাম শুনেই হয়তো জামাইয়ের আপন ভাইপো, অতএব হিন্দু ধরে নিয়েছে। তার স্ত্রীরও নিঃসন্দেহে একই ধারণা। কারণ খেতে দিয়ে মন্তব্য করে সে, 'এক কোটি শরণার্থীকে ইন্ডিয়া বসিয়ে বসিয়ে আর কতদিন খাওয়াবে? তার চেয়ে গুর্খা সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়া জয় বাংলাটা দখল করে নিতে পারে না? দুই বাংলা এক হলে আমাদের কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধা হতো। কি বলো দাদা?'

মানিক এ-ধরনের আলোচনায় উৎসাহ বোধ করে না। মাথা নিচু করে খেতে থাকে। এমনিতেই ধীরেন দত্তের সঙ্গে খেতে বসলে তার অস্বস্তি বাড়ে। আসন পেতে বসতে হয়। বাম হাতটা কোথায় রাখবে, কোন হাতে গ্লাস ধরবে — ভুল এড়াতে সতর্ক থাকতে হয় সারাক্ষণ। বড় কাঁসার থালে ভাত সাজিয়ে দেয় ধীরেন দত্তের স্ত্রী। খাওয়ার পদ্ধতিও যথাযথ রাখতে লোকটার খাওয়া অনুসরণ করে মানিক। এর আগেও প্রতিবেশী পরেশ কাকাদের বাড়িতে অনেকবার খেয়েছে মানিক। এরকম অস্বস্তি হয়নি। পরেশ কাকারা হিন্দু হলেও যে মানিকদের পর ভাবে না — সেটা বোঝাতেই যেন ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ। জলকে পানি বলত, কিন্তু এখানে উল্টো মানিককে হিন্দু সাজতে হচ্ছে। মালতী কাকি কি তবে এখনো তার আসল পরিচয় জানায়নি? মানিক মুসলমানের ছেলে জানলে এরা হয়তো তাকে আর আটকানোর চেষ্টা করবে না। কিন্তু মালতীর কী হবে?

ধীরেন দত্তের এমন সচ্ছল অবস্থা নয় যে, দুঃসময়ে ভাগ্নিকে আদরযত্নে অনিশ্চিকাল রাখতে পারবে। ছোট্ট এক মনোহারি দোকানের আয়ের ওপর সংসার চালাতে হয়। ছোট বাড়িটির অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েছে, বাকি দুটা মাত্র রুম আর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে নিম্নবিত্তের শহুরে সংসার। মানিকের থাকার জায়গা হয়েছে ছোট্ট রুমটায়, ধীরেন দত্তের দশ বছরের বড় ছেলে প্রদীপের সঙ্গে, এক বিছানায়। মালতী মামির সঙ্গে খাটে, তার মামা মেঝেতে বিছানা পাতে। ধীরেন দত্তের টানাপড়েনের সংসারে মানিক নিজেকে ভাবে বাড়তি বোঝা। অবশ্য এসেই পাঁচশ টাকা হাতে তুলে দিয়েছিল বলেই মালতীর চেয়েও এ বাড়িতে তার কদরটাই যেন বেশি। মানিক থেকে যাওয়ার পরও টাকাটা আর ফেরত দেয়নি। মালতীর একটা শাড়ি এনে দিয়েছে। নতুন শাড়ি পরেও মালতীর বৈধব্য শোক কাটেনি। এ বাসায় ওঠার পর থেকে তার মুখে হাসি দেখেনি মানিক।

রাতে খাওয়ার পর সে মামা-মামির সামনেই মানিককে ডেকে নেয়, 'মানিক আসো তো বাবা, রাস্তার ওই দোকানটা থেকে একটু ঘুরে আসি।'

মানিককে বাসার বাইরে রাস্তার নির্জনে ডেকে আনা আসলে গোপন কথা বলার জন্য। চাপা স্বরে বলে সে, 'একটা কাণ্ড হয়েছে মানিক। তোমাকেও এরা হিন্দু মানে আমাদের আপন ভাতিজা ভেবেছে।'

'ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত কাকি। পরে জানলে খারাপ লাগবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না। কিসের ভুল। এই ভিনদেশে তুমি ছাড়া আমার আপন আর কে আছে বলো। আমিও মামিকে বলে দিয়েছি।'

'কী বলেছেন?'

'মামা-মামি অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল তোমার সম্পর্কে। আমি শুধু ডাকনামের সঙ্গে তোমার পদবিটা মিথ্যে বলেছি। বলেছি, মানিক সাহা, ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, ছোটকালে মা মারা গেছে, সৎমা দেখতে পারে না, তাই বাড়িতে থাকা-খাওয়া চলাফেরা সব আমাদের সঙ্গে। বেশি তো আর মিথ্যে বলিনি। জানো, মামা-মামিও তোমাকে খুব পছন্দ করেছে।'

'সত্যি পরিচয়টাই দেওয়া উচিত ছিল কাকি। মিথ্যে অভিনয় আমি করতে পারি না।'

'বলতাম, কিন্তু এদেশে এসে মামা গোঁড়া বামুনের মতো হয়েছে, কথাবার্তা শুনে বোঝো না — মুসলমানদের একদম দেখতে পায় না। তোমার কাকা থাকলেও তোমাকে নিজের ভাতিজাই বলত, বলতো না, বলো?'

মানিক পরেশ কাকার প্রসঙ্গ তুলে মালতীকে কাঁদাতে চায় না আর। মালতীর গলা তবু অভিমানে গাঢ় হয়ে আসে, 'আমাকে ফেলে তুমি সারাটা দিন বাইরে কাটালে। অনেক কেঁদেছি আমি, শিবুও কেঁদেছে।'

'কাকি গতকাল এমএনএ মশিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ওনার ফেমিলি এখন কলকাতায়। উনি বললেন দু'এক মাসের মধ্যেই নাকি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। আমাকে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।'

'তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'মাথা খারাপ! দেশ স্বাধীন না হলে কিছুতেই ফেরা যাবে না।'

'তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ, তোমার কাকা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে পালাবে না। এখানে একা আমি থাকতে পারব না।'

'ঠিক আছে, এখন চলেন। শিবুর ঘুম ভাঙলে আবার কান্নাকাটি করবে।'

'আরেকটা কথা শোনো, মামা-মামি চাইলেও কিন্তু ওদের হাতে আর টাকা-পয়সা দিও না।'

শিবু পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। পরদিনও মানিকের যাওয়া হয় না।

দিনে বাসায় কিছু করার থাকে না বলে মানিক বাজারে ধীরেন দত্তের দোকানেও যাতায়াত শুরু করে। কাঁচা বাজারের পাশে সার বাঁধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদি দোকানের একটি দত্ত স্টোর। ছোট দোকান, একাই চালায় দত্ত বাবু। মানিক গেলে নিজের পাশে বসার জায়গা করে দেয়। মানিক দোকানে বসে সাজিয়ে রাখা মালপত্র দেখে কোনটা কোথায় এবং কী দামে বেচা হয় জানতে পারে, কিন্তু দোকানে সাজিয়ে রাখা যে প্রতিমা মূর্তিকে দোকান খুলেই ধূপধুনা দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানায়, তার পরিচয়টা পর্যন্ত জানে না।

ধর্মীয় গোঁড়ামি সত্ত্বেও মানিককে স্নেহ করতে শুরু করেছে লোকটা। পরিচিতজনদের সগর্বে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়, 'এটা আমার জয় বাংলার নাতি গো, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পালাবার তালে আছে দেখে শালাকে দোকানে নিয়ে এলাম। আসার সময় আমার ভাগ্নিজামাই মানে এর আপন কাকাকে হারিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা নৌকার মাঝি ডাকাতি করে নিয়েছে সব। শুধু অবাঙালি আর্মি না, বাঙালি মুসলমান ডাকাত-রাজাকাররা ওপারের সব হিন্দুকে নিঃস্ব করে এপারে পাঠাচ্ছে। আহা, আমার ভাগ্নিটার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না।'

ধীরেন দত্তের জয় বাংলার আত্মীয়স্বজনের খবর, এমনকি ভাগ্নিজামাইয়ের ট্র্যাজিক ঘটনাটিও বাজারের ব্যবসায়ী-দোকানদার অনেকেই জেনে গেছে। সময় পেলেই তারা মানিককে ঘিরে জয় বাংলা ও যুদ্ধের আলোচনায় নতুন করে উত্তাপ ছড়ায়। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাকে। প্রশ্নকারীদের চোখে-মুখে অকৃত্রিম দরদ। অনেকেই মানিককে চা-নাশতা করায়, কেউ কেউ বাসাতেও নেমন্তন্ন করে। প্রতিবেশী দেশের অচেনা বাঙালিদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েও মানিক ধীরেন দত্তের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের বন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না মোটেও। নিজেকে মনে হয় অপরাধী। এখানে পদে পদে মৃত্যুর ভয় নেই। কিন্তু বাঁচার আনন্দও সে খুঁজে পায় না। এভাবে ভুল পরিচয় নিয়ে ধীরেনের টানাপড়েনের সংসারে কতদিন থাকবে মানিক? তার যে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কথা।

মানিককে সঙ্গে নিয়ে বাসার জন্য সকালের বাজারও করে ধীরেন। সঙ্গ লাভ নয় শুধু, ধীরেনের প্রত্যাশা যে আরো বেশি কিছু — সেটা আভাস-ইঙ্গিতে বোঝানোর পরেও একদিন সরাসরি প্রকাশ করে, 'মাছটা খুব ভালো ছিল হে, কিন্তু সঙ্গে যে টাকা নেই। তোমার কাছে কি বিশটা টাকা হবে?'

মানিক না করতে পারে না। তবে এভাবে বেশি দিন হ্যাঁ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাসায় ফিরে মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীকে একলা পেয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে।

'কাকি, মুক্তিবাহিনী দেশ শত্রুমুক্ত করার জন্য জীবন হাতে নিয়ে কী রকম যুদ্ধ করছে নিজের চোখেই তো দেখে এলেন। আমাদের বাড়ির বাণ্টুও যুদ্ধে গিয়ে বেঁচে আছে কি মরে গেছে জানি না। সব দেখেশুনেও এ বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না।'

'বাণ্টুর জীবন আর তোমার জীবনের দাম কি এক হলো। তাছাড়া সবাই বলছে ইন্ডিয়ার মিলিটারি গিয়ে যুদ্ধ করবে। এসব রক্তারক্তি যুদ্ধের মধ্যে আমি তোমাকে যেতে দেব না। একজন তো যুদ্ধে যাওয়ার আগেই হারিয়ে গেল। আজ নিয়ে দশ দিন কাটল, বেঁচে থাকলে আমাদের খুঁজতে এখানে এতদিনে আসত না তোমার কাকা?'

মালতী আবার চোখে আঁচল চাপা দেয়। কী সান্ত্বনা দেবে মানিক? পরেশ কাকা যে বেঁচে আছে — এমন সান্ত্বনা নিজের মনেও খুঁজে পায় না। স্বামী ফিরে আসবে না বুঝেও মালতী তবু সান্ত্বনা খোঁজে। আসার সময় পথে শাঁখা-সিঁদুর পরেনি ডাকাতের ভয়ে। আর এখন হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিঁদুর পরছে বোধহয় বৈধব্যকে মেনে নেওয়ার ভয়ে।

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে মালতীকে কাঁদতে দেখলে মানিক আজকাল বিরক্ত বোধ করে। রেগে জবাব দেয় সে, 'কাকি, আপনি সবসময় এরকম কান্নাকাটি করলে আমি কিন্তু সত্যিই থাকব না। কেন বোঝেন না, যুদ্ধ শুধু আপনার একার ক্ষতি করেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে এই রকম যন্ত্রণা দিচ্ছে। শরণার্থী ক্যাম্পে তো দেখলেন, যারা পালিয়ে এসেছে বর্ডার পার হয়ে তারাও কত দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। আমরা তো যথেষ্ট আরামেই আছি।'

'আমি যে ভুলতে পারি না মানিক। ঘুমের মধ্যেও সেই রাতের কথা মনে হয়। পালাবার সময় নদীর পাড়ে যে লাশগুলো দেখেছিলাম, তার ভেতরে স্বপ্নে একদিন তোমার কাকার রক্তমাখা মুখ দেখেছি আমি।'

মালতীর মামি পাশের বাসা থেকে ফিরে এসে মালতীকে কাঁদতে দেখে শাসন করে, 'ফের জামাইয়ের কথা ভেবে কান্নাকাটি করছিস? ভগবান বাঁচিয়ে রাখলে তার দেখা একদিন পাবি। এমনিতে নাতি আমার থাকতে চায় না, তার ওপর তোকে এরকম কান্নাকাটি করতে দেখলে ও কাকিকে রেখেই মুক্তিযুদ্ধে পালিয়ে যাবে বললাম।'

'ঠিকই বলেছেন দিদি। কাকিকেও আমি এ কথা বলছিলাম।'

'না কেঁদেই বা কী করবে। মামার অবস্থা তো এমন নয় যে এখানে এসে কটা দিন আরামে থাকবে। তুমি পুরুষ মানুষ, সারাদিন টো টো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ঘুরে বেড়াতে পার। কাকিকেও সঙ্গে নিয়ে একটু এদিক-সেদিক ঘুরতে পার দাদা।'

'কোথায় ঘুরব? আপনাদের এ ছোট শহরে দেখার মতো আর কী আছে?'

'নাই মানে! ওহ! দেখার জিনিস তাহলে এখনো চোখে পড়েনি নাগরের? রাজেশ খান্না, জিনাত আমানের বই দেখেছ? চলো, আজ দেখে আসি, দীপালিতে নতুন এসেছে। এখনই গৌতমের মায়ের কাছে গল্প শুনে এলাম সিনেমাটার। চলো সবাই মিলে মেটিনি শো দেখে আসি, মালতী তুইও চল।'

সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য ধীরেন দত্তের স্ত্রী, দুই সন্তানের জননী স্থূলাঙ্গী মহিলাটি প্রচুর সাজগোজ করে। অনেক বেশি রূপ নিয়েও তার পাশে মালতীকে বিধবার মতো ম্লান দেখায়। সাজতে না পেরে নতুন করে কি তার হারানো শাড়ি-গহনার কথা মনে পড়ে? বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেও তাকে এত বিষণ্ন দেখায় কেন?

'বললাম, আমার ওই শাড়িটা পর মালতী।'

'মামি, শিবুর শরীরটা ভালো না। আমার শরীরটাও খারাপ লাগছে। মাথা ধরেছে। আমি আর যাব না। মানিককে নিয়ে আপনারা যান।'

'সে কি কথা! তোর জন্যই তো যাওয়া। ইন্ডিয়ায় এসে যদি হিন্দি সিনেমাই না দেখলি, তবে আর কী দেখবি লো?'

'না মামি। গ্রামের মেয়ে আমি, আপনাদের মতো সিনেমা-বায়োস্কোপ দেখার নেশা নাই। আপনি মানিককে নিয়ে যান।'

আনন্দযাত্রার মুখে সহসা এরকম বাগড়া দেওয়ায় ভাগ্নির দিকে দত্তগিন্নি অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকায়। যেন সামান্য এই ব্যাপার নিয়ে মামি-ভাগ্নির মধ্যে তুমুল একটা ঝগড়া বাধবে, কিংবা ঝগড়া যদি নাও বাধে, গোপন মন কষাকষি বাড়তে থাকবে। সিনেমা দেখার জন্য মালতীর মামাতো ভাইবোন দুটিও সেজেগুজে রেডি। মানিক তাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে দিদি, কাকিকে জোর করার দরকার নেই। সুস্থ হলে আর একদিন তাকে নিয়ে যাব। চলুন, আজ আমরা যাই।'

রাস্তায় বেরিয়ে মানিক দুটি রিকশা খোঁজে, কিন্তু প্রদীপের মা বাধা দিয়ে বলে, 'খামোখা বেশি পয়সা খরচ করবে কেন! একটাতে হয়ে যাবে, প্রদীপ-অচলা এখন আমাদের কোলে বসবে।

মানিক প্রস্তাবটি ঠাট্টাচ্ছলে উড়িয়ে দিতে চায়, 'এত সুন্দর স্বাস্থ্যশরীর আপনার একটাতে জায়গা আটবে না দিদি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বোঝে, রসিকতাটি মাঠে মারা গেছে, মহিলা হাসে না। শরীর নিয়ে খোঁচা কারই বা ভালো লাগে। দুটি রিকশাই ঠিক করে সে, প্রদীপকে নিয়ে একটিতে উঠে বসে। পাঁচ-ছয় বছরের চপলাকে নিয়ে চপলার মা অন্য রিকশায় ওঠার সময় শাড়ি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠলে, আসার দিন একইভাবে মালতীরও নগ্ন পায়ের গোছা দেখার স্মৃতি মনে করে ভাবে, মুখমণ্ডলের কথা বাদ দিলেও মামির মোটা পায়ের তুলনায় মালতীর সুডৌল পা অনেক বেশি সুন্দর এবং ফর্সাও।

সাতাশ

কোচবিহারে আসার প্রথম রাতেই হোটেলে থাকার প্রস্তাব এবং পরে মামির সঙ্গে সিনেমা দেখার প্রস্তাব নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে মালতী তার স্বামীভক্তি ও স্বামীহারানো শোককেই বড় করে তুলেছিল সবার কাছে। সমবয়সী মেয়েটার অন্তরে মানিকও নিজের জন্য স্নেহমমতার প্রশ্রয় ছাড়া অন্য কিছু খোঁজেনি। মনে যাই ভাবুক, খারাপ ভাবার মতো আচরণ করেনি। মামাবাড়িতে তার মুসলমান পরিচয়টা চেপে রাখার মতো কাকির সঙ্গে সম্পর্কের মাঝে সন্দেহজনক কিছু প্রকাশ না পাওয়ার ব্যাপারে দু'জনেই ছিল বেশ সতর্ক। কিন্তু মালতীর খাপছাড়া আচরণ মানিকের মনেই নানারকম সন্দেহ ও কৌতূহল জাগায়।

মামার পরিবারের সবার কান বাঁচিয়ে মানিকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথাবার্তা বলতে চায় মালতী। কিন্তু ছোট্ট বাসায় দুই বাচ্চা নিয়ে সারাক্ষণ মামির সরব অস্তিত্ব ছাড়াও, পড়শী বাসার মহিলারাও ধীরেন বাবুর জয় বাংলার ভাগ্নির সঙ্গে গল্প করতে আসে যখন-তখন। মানিক এ কারণেও বাসার বাইরে ঘুরফিরে সময় কাটাতে চায়। কিন্তু তার একা বাইরে ঘোরাটাও যেন পছন্দ নয় মালতীর। আজ বাইরে বেরোনোর সময় মামির সামনেই প্রস্তাব করে, 'মানিক আজ আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। শিবুর জন্য দুটি জামা-প্যান্ট কিনব।'

মানিক গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকায়। সহাস্য সম্মতি দিয়ে মালতীর মামি বলে, 'যাও না দাদা, কাকিকে সঙ্গে নিয়ে রোজ টাউনে ঘোরো, মার্কেটিং করো কেউ কিছু বলবে না। শিবু এখন অচলার সঙ্গে খেলবে।'

'কান্নাকাটি করলে একটু দেখবেন মামি, তাড়াতাড়ি ফিরব।'

'তোর শিবু অচলা মাসির যে ভক্ত হয়েছে, কাঁদবে না। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরনের শাড়ি পরেই বাইরে যাবি! আমার শাড়ি তো পরবি না, ও মানিক, পারলে কাকিকে আর একটা ভালো শাড়ি কিনে দিও।'

শিবুকে ছাড়া মালতীকে রিকশায় পাশে বসিয়ে বাইরে বেরোলে মানিকের একাকিত্ব ও অস্থিরতা আজ থাকে না ঠিকই, তবে নতুন ভয় ও সন্দেহ জাগে। আশ্রয়দাত্রীর উৎসাহদান ভালো লাগেনি। তার ওপর রাস্তায় আসমার বাবা, রশিদ চাচা, পঙ্কজ কিংবা পরিচিত অন্য কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে? সত্যি কথা বললেও মন্তব্য করতে পারে — যুদ্ধ করতে এসে পরের বউ নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে শালা!

'আমার সঙ্গে এভাবে না বেরোলেই বোধহয় ভালো হতো কাকি। আপনার মামিটা যেন কেমন!'

'রাস্তায় এত বড় বিপদ গেল। আসার পর থেকে শিবু এক জামা-প্যান্ট পরে আছে, কই, কিনে দেওয়ার কথা তো মনে হয়নি মামির। শুধু তোমার টাকা-পয়সা খসানোর তালে আছে।'

শিবুর জন্য নতুন জামা-প্যান্ট কেনার কথা মানিকের অবশ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু কাকির জন্য তার মামাকে নগদে পাঁচশ টাকা দেওয়ার পর হিসাবি না হয়েও তার উপায় নেই। অবশিষ্ট যে টাকা আছে, তা মালতী ও তার সন্তানের জন্য খরচ করলেই হয়তো অনিবার্য দুর্ভোগ-দুর্গতি বাড়বে। তারপরও আজ কাপড়ের মার্কেটে গিয়ে মানিক শিবুর জন্য নতুন জামা-প্যান্ট কেনে। মালতীর শাড়ি কেনার জন্য একটা বড় শাড়ির দোকানে ঢুকে গেলে মালতী তাকে হাত ধরেও বাধা দেয়, 'আমার শাড়ি লাগবে না। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। বাসায় তো বলতে পারি না। নিরিবিলি কোথাও বসে বলব।'

'তোষ্যা নদীর বাঁধে যাবেন। কাল গিয়েছিলাম, জায়গাটা ভালোই।'

'চলো।'

অস্বস্তিকর ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল ও অভূতপূর্ব এক ভালোলাগার শিহরণও অস্বীকার করতে পারে না মানিক। কিন্তু মালতী পাশে থাকলে কেবল স্নিগ্ধ এক তরুণীই তো পাশে থাকে না, তার স্বামী, সন্তান, আত্মীয়স্বজনসহ পরিচিত গ্রামসমাজ ও মৃত্যুর বিভীষিকাময় অন্ধকার দেশখানাও যেন সঙ্গে থাকে। এতসব সম্পর্কের গেরো ও পিছুটান বাদ দিয়ে মালতী কিংবা তার মতো কেউ যদি একান্ত মানিকের হয়ে পাশে থাকত! শহরের প্রান্তে তোষ্যা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে মানিক গতকাল বাঁধের ওপর একলা বসে একাকিত্ব ও অস্থিরতা ভুলতে আসমা ও মালতীর কথা ভেবেছিল। মানিকের একাকিত্ব ঘোচাতে মালতী আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেও একা হয়ে তার পাশে দাঁড়াবে, ভাবতেও ভালোলাগা মন দোলাতে চায়। কিন্তু মন শক্ত করে মানিক, মালতীর জরুরি কথাবার্তা আগে শোনা দরকার।

নিরিবিলি বসার আগেই মালতী অবশ্য রিকশায় বসেই তার কথাবার্তা শুরু করেছে, এর মধ্যে কোনটা একান্তে বলার মতো জরুরি — বোঝার চেষ্টা করে মানিক।

'আমার চোখের এত জল দেখেও মামা-মামি মনে হয় আমাদের রাস্তার বিপদের কথা পুরো বিশ্বাস করে নাই মানিক। ভাবছে, তোমার সঙ্গে ইন্ডিয়া পালিয়ে আসার জন্যই বোধহয় বানিয়ে বানিয়ে এসব গল্প করেছি।'

'সেই রাতের কথা ভাবলে তো আমারও মনে হয়, অবিশ্বাস্য ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

'দুঃস্বপ্ন আমার জীবনটাকে এমন তছনছ করে দিলো কেন মানিক?'

মালতীর কণ্ঠে পুরনো শোকের আবেগ দেশ নিয়ে মানিকের সকল সঞ্চিত আবেগ-অনুভবের চৈতন্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে সে।

'আবারও খালি স্বার্থপরের মতো নিজের কথা ভাবছেন! খালি কি আপনার জীবন তছনছ হয়েছে খালি, বর্বর পাক আর্মি গত মাসে কয়েকে অন্তত সাত লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, মা-বোনের ইজ্জত লুটছে, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে — কোন হারামজাদা বলবে এসব বানানো গল্প? পেপার পড়লে ও রেডিয়ো শুনলেই বুঝতে পারতেন, বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে শুধু ইন্ডিয়ায় নয়, সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে। ৮০ লক্ষের বেশি শরণার্থী ইন্ডিয়ায় কী হালে দিন কাটাচ্ছে, নিজেও তার কিছুটা বুঝতে পারছেন।'

রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে জানতে চায়, 'বাবু, আপনারা কি জয় বাংলা? ওইপার হইতে আমারও এক ভাই শরণার্থী হইয়া আসছে, ভাইয়ের শ্বশুর-শাশুড়ি দুইজনকেই মেরেছে মিলিটারিরা।'

মালতী আর কথা বলে না। বাকি পথটুকু রিকশাওয়ালার সঙ্গেই কথা বলতে হয় মানিককে। রিকশায় ওঠার পর ভাড়া নিয়ে বেশ দরকষাকষি করেছে রিকশাঅলা, কিন্তু রিকশা থেকে নামার পর মানিকের কাছে পয়সা নেয় না। বলে, 'বাবু নিজে তো আপন ভাইয়ের জন্য তেমন কিছু করতে পারি না, জয় বাংলার লোককে মাঝেমধ্যে বিনা ভাড়ায় রিকশায় চড়াইয়া সান্ত্বনা পাই। আমারে এইটুকু সান্ত্বনা পাইতে দেন গো বাবু!'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে রিকশাঅলাটির দিকে।

তোষ্যার পাড় মালতীরও ভালো লাগে, নিজেদের নদী তিস্তা ও বাঁধরাস্তাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ার কারণে। তবে গাঁয়ের বাঁধরাস্তায় যেমন ধু-ধু নির্জনতা, তোষ্যার বাঁধ তা নয়। নিচে বাড়িঘর, লোকজন চলাচল করে, বাঁধের ঢালে দুই জোড়া যুবক-যুবতী প্রেম করার জন্যই বসে আছে হয়তো। বসার আগে নির্জনে এসেই মানিক জানতে চায়, 'কাকি বলুন এবার আপনার জরুরি কথা শুনি। শিবু একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'চলো আগে ওখানটায় একটু বসি।'

পাশাপাশি বসে মুখ ঘুরিয়ে মানিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে, 'আজ আমাকে সত্যি কথাটা বলো তো মানিক, তোমার কাকা কি বেঁচে আছে?'

'আসার সময় নৌকায় মাঝিটির লাশ আর নদীর পাড়ে অনেকগুলো লাশ তো নিজের চোখে দেখেছেন কাকি। ভোরের আবছা আলোয় দূর থেকে লাশগুলো দেখে ভালো চিনতে পারি নাই, কিন্তু একজনের লুঙ্গি ও কেরোলিনের জামাটা কাকার মতো মনে হয়েছিল। কাঁকা বেঁচে থাকলে ইন্ডিয়ায় আসত না এতদিনে?'

'আমারও মন বলছে, তোমার কাকা আর কোনোদিন আসবে না।'

মালতী আর কাঁদে না। দূরে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মালতীর মনটাকে শক্ত করার জন্য মিথ্যে সান্ত্বনার বদলে নিজের অনুমানটি আজ সরাসরি বলেছে মানিক। কিন্তু মালতীর চোখ থেকে নিঃশব্দে জলের ধারা গড়াতে দেখে ভাবে, মিথ্যে বলেই মেয়েদের মন ভালো রাখাটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ।

'আপনি সবসময় কাকার জন্য কান্নাকাটি করলে আমি কিন্তু থাকব না। কাঁদার জন্য আপনাকে বাইরে নিয়ে এলাম?'

মালতী চোখ মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

'ঠিক আছে আর কাঁদব না। আর একটা সত্য কথা বলো তো, আমি জোর করে কোচবিহারে আটকে না রাখলে তুমি কলকাতায় এমএনএ সাহেবের ফেমিলির সঙ্গে মানে আসমার কাছে গিয়ে উঠতে, না?'

গ্রামে আসমার সঙ্গে মানিকের বিয়ের সম্ভাবনা বা প্রেমের গুজব যারা রটিয়েছিল, তাদের মধ্যে মালতীও ছিল অন্যতম। আজ সুযোগ পেয়ে উচিত জবাব দেয় সে, 'আসমার প্রতি আমার কোনো ভালোলাগা ভালোবাসা নেই কাকি। এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখাও হবে না হয়তো।'

'কেন? আসমাকে বিয়ে করবে না তুমি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক আবারও বিরক্ত বোধ করে। ম্যাট্রিক পাশ করলেও মালতী ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সংসারের ছোটখাটো বিষয়গুলো যত গুরুত্ব দেয়, দেশ ও সমষ্টির দুরবস্থা তার চেতনায় সেভাবে কাজ করে না বোধহয়। মানিকও নিজের ভাবনা এবং উদ্বেগ-অস্থিরতার কারণ মালতীকে ঠিক বোঝাতে পারে না ।

'এসব কি এখন ভাবার সময় কাকি? আর দু'এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আমাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে কে জানে। আমার কাছে যে কয়টা টাকা ছিল তাও তো শেষ হয়ে আসছে।'

'শোনো মানিক, যে কথাটা বলার জন্য বাইরে তোমকে ডেকে এনেছি।'

মালতী এতক্ষণে আসল কথাটা বুকের ভেতর থেকে টেনে বের করার জন্যই যেনবা ইতিউতি তাকায়, নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে দুই স্তনের মাঝে হাত নামায়, একটু ঘুরেও বসে, তারপর ব্লাউজের ভেতর থেকে ছোট্ট একটি থলে বের করে এবং তা হাতে নিয়ে কথা বলে।

'তোমার কাকা পথে বিপদ-আপদের কথা ভেবেই আমাকে আলাদা করে পাঁচ হাজার টাকা রাখতে দিয়েছিল। টাকাটা আর আমার গলার হারটি এই ব্যাগের মধ্যে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটা তোমার কাছে রাখো।'

'এটা নিয়ে আমি কী করব?'

'সবসময় আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। মামা-মামি জানলে সব খসিয়ে নেবে। নিজের মামা হলে হবে কী, এরকম ছোটলোক লোভী মানুষ আমি দেখিনি। আমার নানা এ জন্য তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, বড় মামাও কোনো সম্পর্ক রাখেনি। এ কয়দিনেই আমাকে যে কত রকম কথা শোনাচ্ছে।'

'টাকার কথা ওদের না বলাই ভালো।'

'তোমার কাকার তো ইচ্ছে ছিল, দেশ স্বাধীন হোক আর না হোক ইন্ডিয়ায় মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করার চেষ্টা করবে এবার। তোমার আব্বা ও নরেশের সঙ্গেও সব আলাপ করেছে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে আরো কী দুঃখ লেখা আছে ভগবানই জানে।'

মালতীর কণ্ঠ আবার ভারী হয়ে এলে মানিক সান্ত্বনা দেয়, 'দেশ স্বাধীন হলে আবার সবকিছুই ফিরে পাবেন কাকি।'

'হিন্দু মেয়েরা বিধবা হলে আর কিছু থাকে তার জীবনে? স্বাধীন দেশে আমি কী নিয়ে ফিরব মানিক বলতে পারো?'

'ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন লাভ নেই কাকি। এখন কোনোমতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিকে থাকাটাই বড় সমস্যা। টাকাটা লুকিয়ে রেখে ভালো করেছেন। ওরা যত্ন না নিলেও আপনার ও শিবুর তেমন সমস্যা হবে না আর।'

'এগুলো তো পাকিস্তানি টাকা। টাকাটা বদলে আর আমার হারখানা বেচে যা পাও, সব নিজের কাছে রেখে দিও। আমাদের যা দরকার, তুমি এর থেকে কিনে দিও। আমি মামা-মামিকে বলব তোমার টাকা থেকে কিনে দিয়েছ। মামির ছোটলোকী ব্যবহার যেমন বাড়ছে, তাতে মনে হয় এদের কাছে বেশিদিন থাকতেও পারব না। তোমাকে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে রেখেছি জানলে হয়তো ঘাড় ধরেই বের করে দেবে।'

'মিথ্যে পরিচয় কেন? আমার নিজের চাচা নেই, পরেশ কাকা কি আমার নিজের কাকার মতো ছিল না কাকি?'

'সে আমি জানি। কিন্তু তুমি আসলে মুসলমান জানলে জাত মারার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে না।'

মানিক চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। মালতী যেমন তার বুকের ভেতর থেকে আসল কথা টেনে বের করে, তেমনি নিজের হৃদয়ের গভীর সত্যটি একান্তে মালতীকে শোনাতে বলে সে, 'আজ আপনাকেও আমার একটা আসল কথা বলি কাকি। আমাকে আর কক্ষনো নানার মতো মুসলমান ভাববেন না, আমি আসলে হিন্দু-মুসলমান এসব ধর্মের ভেদাভেদ বিশ্বাস করি না আর। জাতির পরিচয়ে আমরা সবাই বাঙালি অবশ্যই, কিন্তু মানবতা ও মানুষকে ভালোবাসাই হবে আমার একমাত্র ধর্ম।'

'মামারা তে এসব জানবে না, বুঝবেও না। ওরা জানার আগে আমাকে তুমি অন্য কোথাও নিয়ে চলো মানিক।'

মানিক আবার চমকে উঠে জানতে চায়, 'অন্য কোথায় নিয়ে যাব আপনাকে?'

'ইন্ডিয়ায় কোনো বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে কষ্ট করে থাকলেও মামার বাসার চাইতেও অনেক স্বাধীনভাবে থাকতে পারব আমরা।'

মানিক জবাব দিতে পারে না, মালতীর কথার অর্থ কী দাঁড়ায় সে নিজেও বোধহয় জানে না। অর্থটা স্পষ্ট হওয়ার ভয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, 'চলেন, শিবু মনে হয় এতক্ষণে কান্নাকাটি শুরু করেছে।'

'এটা রাখো তোমার কাছে।'

'সোনার হারটা আপাতত বেচার দরকার নেই। টাকাগুলো দেন, আমি বদলায় এনে দেব।'

মানিক পরিচিত চেহারার পাকিস্তানি নোটগুলো নিজের কাছে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ব্যাগটি কাকির হাতে ফিরিয়ে দেয় আবার। কাকি ব্যাগটি মানিককে আড়াল করে ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করেছিল, রাখার সময় তেমন আড়াল সৃষ্টির প্রয়োজনও বোধ করে না যেন। ফলে মালতীর স্তনের গঠন ও উপরি ভাগের কিছু অংশ দেখে মানিক নিজেই চোখ সরিয়ে নেয়।

মরা-বাঁচার সংকটে নিজের একান্ত পাশে মালতীকে পাওয়া এবং মালতীর অস্তিত্ব-অনুভব অভূতপূর্ব এক ভালোলাগার বোধ জন্ম দিয়ে মানিককে আচ্ছন্ন করে রাখে। হঠাৎ করে পাঁচ হাজার টাকা ও সোনার হার পড়ে পেলে যে আনন্দ, এ প্রাপ্তিযোগের মূল্য যেন তার চেয়েও অনেক বেশি। মালতীকে নিয়ে যদি মানিক এখন ট্রেনে উঠে বসে বিশাল ভারতভূমির দূরে কোথাও যেতে চায়, মালতী বাধা দেবে না। মালতীকে নিয়ে যদি সে আজ অশোক হোটেলের রুমে রাত কাটাতে চায়, মালতী হয়তো তেমন আপত্তি করবে না। অশোক হোটেলে উঠতে পারলে এমেনে সাহেবকে অবশ্য সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারত, নিজের দেশ যখন মৃত্যুপুরী, বিলাসবহুল হোটেলে থেকে সুখ ভোগের স্বাধীনতা একা এমেনের নয়, মানিকেরও আছে। এবং তার মেয়ে আসমাকে নয়, মালতীকেই ভালোবাসে মানিক।

ফেরার পথে নিজের পাশে মালতীর স্পর্শ অনুভব ভেতরে এরকম বেপরোয়া কল্পনা জাগালেও বাস্তবে কাকির বদলে তাকে একবারও নাম ধরে ডাকার সাহস পায় না। মালতী গ্রামে থাকতে তাকে মানিক ছাড়াও অনেক সময় বাবা সম্বোধন করেছে, আজো অনেক কথা বলার সময়ে বাবা একবারও বলেছে কি না স্মরণ করার চেষ্টা করে। তবে একান্ত মানিকের হওয়ার বদলে মালতী ফেরার সময়েও দেশের প্রসঙ্গে কথা তোলে।

'আমাদের গ্রামের কোনো খবর পেয়েছ মানিক?'

'না। কীভাবে পাব?'

'তোমার কাকা কিন্তু খবর পেয়েছিল মিলিটারি-রাজাকাররা আমাদের বাড়িতে আগুন দেবেই। এতদিনে হয়তো আগুন দিয়ে সব পুড়িয়ে দিয়েছে।'

'আপনাদের বাড়িতে আগুন দিলে আমাদের বাড়িতেও দেবে।'

'হ্যাঁ, তোমার কাকা বলতো তুমি ইন্ডিয়ায় আসলে তোমার আব্বার ওপর তোমার নানার রাগ আরো বাড়বে।'

এ কথা জেনেও পরেশ কেন মানিককে সঙ্গে আনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, সেটা জানার জন্য পরেশ কাকার সঙ্গে হয়তো আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিনই দেখা হবে না।

'নরেশের বউয়ের দিন হয়েছে। কী যে হলো ভগবান জানে।'

মালতীর সন্তান ও মামাতো ভাইবোন দুটির জন্য চকোলেট মিষ্টি জাতীয় কিছু কেনার জন্য মোড়ের দোকানের কাছে আবার রিকশা থামায় মানিক।

আটাশ

সীমান্ত পেরিয়ে মানিকের আবারো দেশের মুক্ত অঞ্চলে ফেরার ইচ্ছেটি জোরালো হয়ে ওঠে অনেকগুলো কারণে।

মালতীর বুকের ধন পাকিস্তানি টাকা পাঁচ হাজার বদলে নেওয়া দরকার। খুঁজলে কোচবিহার টাউনেই এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী মেলা খুঁজে পাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ডারে নিজের টাকা বদলে নেওয়ার অভিজ্ঞতা, সীমান্ত ওপারের মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পটির কথাও মনে করিয়ে দেয়। টাকা এক্সচেঞ্জের অজুহাতে বর্ডারে গেলে পায়ে হেঁটেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পটিতে যেতে পারবে মানিক। পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলে সরাসরি তাদের দলে যোগদানের বিষয়টিও পাকা করতে পারবে। তাছাড়া বর্ডারে গেলে এলাকা থেকে পালিয়ে আসা নতুন ছেলেদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, যাদের মাধ্যমে গ্রামের খবর জানতে পারবে মানিক। সাতপাঁচ ভেবে এক সকালে মালতীকে না বলেই যে পথে এসেছিল কোচবিহারে, সেই পথেই আবার ফিরে যেতে থাকে স্বদেশের মাটিতে।

বালারহাট অপারেশনে মুক্তিবাহিনীর দলটি শুধু তার জীবন রক্ষা করেনি, পথও দেখিয়ে দিয়েছে। কোচবিহারে বেকার সময় কাটানোর অস্থিরতায় ওদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। নৌকায় কমান্ডার এলাহি একবার বলেছিল, প্রতিবেশীর অসহায় বউ-বাচ্চার দায় না থাকলে মানিককে সে নিজেদের ক্যাম্পেই রেখে দিত। তার মানে প্রয়োজনীয় অস্ত্র চালানো ও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ওরাই শিখিয়ে দিত তাকে। তার মানে মানিকও এতদিনে ওদের সঙ্গে একাধিক অপারেশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেত। হয়তো-বা এলাহির দলবল নিয়ে মানিক নিজের এলাকার রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়ে যেত এতোদিনে। এই নিশ্চিত সম্ভাবনার বিপরীতে ভারতের মাটিতে যুব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবিরে ভর্তি হয়েও মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার অনিশ্চয়তা মানিকের ভালো লাগে না।

একা এমএনএ কিংবা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার নয়, স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দানের দাবিতে ভারতীয় নাগরিকরা সোচ্চার। ধীরেন বাবুর বাড়িতে রেডিয়ো শোনা ছাড়াও মানিক স্টেশনের বুকস্টলে দাঁড়িয়ে রোজই ভারতীয় সংবাদপত্রে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ খোঁজে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানিয়ে আবার চিঠি দিয়েছে। সবাই আশা করছে, এ মাসে ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ-আমেরিকা সফর শেষ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। স্বীকৃতি দিলেই ভারতীয় সৈন্যরা সর্বাত্মক লড়াই শুরু করবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের নাক গলানোর অভিযোগ বহির্বিশ্বে প্রমাণিত হোক, ভারত তা চায় না। তাছাড়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দামামায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম চাপা পড়ুক, ইন্দিরা গান্ধী তা চায় না বলেই এতদিন স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু প্রায় এক কোটি শরণার্থীর সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের না জড়িয়ে উপায় কী? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শরণার্থীদের সাধারণ ক্ষমা ও প্রত্যাবর্তন ক্যাম্প করলেও কেউ ফিরে যায়নি সেখানে, যাবেও না। লক্ষ লক্ষ মানুষের গৃহত্যাগী উদ্বাস্তু জীবনের দুর্ভোগ ও বাস্তবতাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাশাসক টিক্কা খানের বদলে গভর্নর ও কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক বেসমারিক প্রশাসন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সামরিক জান্তারা। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিত এমএনএ-এমপিদের আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও স্বাভাবিক অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মুক্তিবাহিনী দখলদার বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করে মুক্ত অঞ্চলের আওতা বাড়িয়েই চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও গণহত্যা এখন সারাবিশ্বেই গরম খবর।

এই অবস্থায়, শরণার্থীদের স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুল আশা পূরণের জন্য ভারতের স্বীকৃতি ও যুদ্ধজয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরতা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে মানিকের জন্য। মনে হয় ভারতের মাটিতে শরণার্থী জীবনের দুর্ভোগ ও অস্বাভাবিক দশার চেয়ে স্বদেশের মাটিতে ট্রেনিং ছাড়াই মুক্তিবাহিনীর সাথে থেকে পদে পদে মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ জীবনই উত্তম। এরকম মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়াটা প্রবল করে তোলার জন্য মালতীর ভূমিকাই প্রধান। ধীরেন দত্তের ছোট্ট বাসায় আশ্রিত জীবন দুর্বিষহ ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মূলত মালতীর কারণেই। রাতে ভালো ঘুম হয় না তার।

এ বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার দিন থেকে মানিকের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল দশ বছরের প্রদীপের সঙ্গে। বড় ঘরটায় খাটে মামির সঙ্গে বাচ্চাকে নিয়ে মালতী, আর ধীরেন দত্ত নিজের জায়গায় ভাগ্নিকে আশ্রয় দিয়ে মেঝেতে শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছোট অচলা মা-বাবা কোনোদিন বা মানিক ও দাদার সঙ্গে। এই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল মানিক। কিন্তু ব্যবস্থাটা পাল্টে দিয়ে নতুন টেনশন সৃষ্টির জন্য মালতীই মূলত দায়ী।

তোষ্যা নদীর পাড়ে গোপন বোঝাপড়ার পর, সেদিনই বাসায় ফিরে মালতী রাতে মানিকের সামনেই মামা-মামিকে প্রস্তাব দিয়েছে, 'মামা, মেঝেতে বিছানা করে থেকে ঠাণ্ডায় আপনার কাঁশি ধরে গেছে। আমাদের জন্য আর কত কষ্ট করবেন? আপনি খাটে শোন। আমি ছোট রুমে মেঝেতে বিছানা করে শিবুকে নিয়ে ঘুমাতে পারব। মানিক প্রদীপকে নিয়ে চৌকিতে শোবে, ও তো আমাদের নিজের ছেলের মতোই, অসুবিধা হবে না।'

ধীরেন দত্ত চোখে-মুখে মৃদু আপত্তি দেখালেও তার স্ত্রী হেসে উৎসাহ জুগিয়েছে, 'মানিক সোনা কি আমাদের পর? ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের সঙ্গে এ রুমেও থাকতে পার।'

মালতীর প্রস্তাব শুনে মানিক বিব্রত, তার ওপর গৃহকর্ত্রীর স্থূল ঠাট্টা শুনে লজ্জা ঢাকতে জবাব দিয়েছিল, 'আমি তো জয় বাংলার কোনো যুবশিবিরে গিয়েও থাকতে পারি। কত ছেলে আছে।'

'তুমি যাতে পালাতে না পারো, সেই জন্যই তো কাকি তোমাকে রাতেও চোখে চোখে রাখতে চায়।'

অস্বস্তিকর সমস্যাটি চাপা দিতে ধীরেন দত্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, 'আর কিছুদিন দেখো, ইন্দিরা গান্ধী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে এই সুযোগে জয় বাংলা যদি নিজের কন্ট্রোলে আনতে না পারে, তাহলে কিন্তু শরণার্থী সমস্যাই কংগ্রেসকে ডুবিয়ে ছাড়বে।'

সেদিন থেকে মামাকে আগের মতোই মামির পাশে শোয়ার সুযোগ করে দিয়ে মালতী ছোট ঘরের চৌকি ঘেঁষে, চেয়ার-টেবিল সরিয়ে মেঝেতে বিছানা পাতা শুরু করেছে। টেবিলের পায়া ও চৌকির মশারির রশি ব্যবহার করে তালিমারা মশারিখানাও খাটিয়ে নেয়। নিচে মালতী এভাবে ঘুমালে মানিক ওপরে নিশ্চিন্তে ঘুমায় কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোচবিহার থেকে বাসে এবং বাস থেকে নেমে রিকশায় বর্ডারের দিকে যাওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নেয়, এলাহির অনুগত মুক্তিযোদ্ধারা মানিককে যদি নিজেদের মতো একজন ভাবতে না পারে, নিজেদের ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়ার আশ্বাস দিলেও আগামীকালই ব্যাগ নিয়ে মুক্ত অঞ্চলে ফিরে আসবে সে। মানিক সরাসরি বর্ডার পেরিয়ে চেনা বাজারটার দিকে এগিয়ে যায়। যাওয়ার পথে মুক্ত অঞ্চলের সাময়িক আশ্রয়দাতা গেরস্ত গয়াদার বাড়িটাও চোখে পড়ে। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢোকার বদলে সরাসরি বাজারে চায়ের দোকানে গিয়েই জানতে পারে, মুক্তবাহিনীর ক্যাম্পটি সেখানে আর নেই। পনের-বিশ দিন আগেই ক্যাম্প গুটিয়ে মুক্তিবাহিনীরা নদীর ওপারে গেছে যুদ্ধ করতে।

মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করায় মানিকের পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে স্থানীয় দু'জন লোক। অচেনা বিদেশি লোকদের পরিচয় ভালো করে খতিয়ে দেখাই যেন ওদের কাজ। কমান্ডার এলাহি ও মুক্তিফৌজ জিয়াদের সঙ্গে চেনাজানা সম্পর্কের উল্লেখ করেও নিস্তার পায় না মানিক। নিজের প্রকৃত পরিচয়, এই ক্যাম্পের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পরিচয় থেকে শুরু করে কোচবিহার থেকে তার আসার উদ্দেশ্যটিও ভেঙে বলতে হয়।

একজন পরামর্শ দেয়, 'মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চাইলে সরাসরি শিলিগুড়ি অথবা তুরা পাহাড়ে চলি যান।'

অন্যজন বলে, 'দেশে ফিরতে চাইলে বলেন আপনাকে নৌকা ঠিক করি দেই।'

তৃতীয়জন ভয় দেখায়, 'আপনাদের এলাকায় এখন হেভি যুদ্ধ শুরু হইছে। কালকেও মুক্তিরা ১০০ জন রাজাকারকে মেরেছে শুনলাম। তার চাইতে শরণার্থী ক্যাম্পে যান।'

মুক্ত এলাকার অলস লোকগুলোর মুক্ত কথাবার্তা শুনে ইচ্ছে হয় ধমক দিতে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। কিছু না বলেই সীমান্তের দিকে হাঁটতে থাকে সে।

ভারতের চেনা বাজারটায় টাকা বদলে নিতে গিয়ে আগের চেয়েও শতকরা ১০ টাকা কম রেট পেয়ে হতাশা বাড়ে। প্রথম যাত্রায় মালতী সঙ্গে ছিল, গন্তব্য অনিশ্চিত, তা সত্ত্বেও ক্লান্তি ও হতাশা তেমন ছিল না। কিন্তু আজ ঝামেলামুক্ত একা হয়েও মানিকের ক্লান্তি ও হতাশা যেন অনেক বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার এই হতাশা মেনে না নিয়েই বা তার উপায় কী? মালতীর সঙ্গে ভাগ্যবিধাতা তাকে জড়াবে বলেই কি পরেশ কাকা অপঘাতে মরেছে এবং মালতীকে ছেড়ে মানিকও তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারছে না? প্রশ্নটা মালতীকে করতে পারলেই ভালো হতো।

রাতে বাসায় ফিরে সারাদিন বাইরে থাকার কারণ হিসেবে ধীরেন দাদাকে গ্রামের খোঁজখবর নেওয়ার কথা বলে মানিক।

মালতী জানতে চায়, 'কোনো খবর পেলে বাবা?'

'না, যুদ্ধের সময় সঠিক খবর পাওয়াও মুশকিল কাকি।'

দিনে বা রাতে মালতীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পাওয়া সমস্যা। এমনকি মাঝরাতে কাকির সঙ্গে যত চাপা স্বরেই অন্তরঙ্গ কথা বলুক, পাশের ঘরে তার মামা-মামির কানে পৌঁছে যাবার ভয় জাগে। কারণ টিনের ঘরের দু'রুমের মাঝখানের পার্টিশনটি বাঁশের বেড়ার। তায় আবার মাঝের দরজা নেই। ও ঘরের কথা কিংবা এ ঘরের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার ভয়েই মানিক যথারীতি আজো কানের কাছে রেডিয়ো নিয়ে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমা, ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনে।

আজ রাতে কলকাতা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রেডিয়ো বন্ধ করলে ঘরের স্তব্ধতা ফুঁড়ে নিচে মশারির ভেতরে জেগে থাকা মালতীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায় মানিক। ও ঘরের খাট থেকে ভেসে আসে অদ্ভুত শব্দ। মালতীর কারণে মামা-মামির দাম্পত্য সম্পর্ক বন্ধ ছিল এতদিন। প্রতিবেশীদের গভীর ঘুম পর্যন্ত আজ আর ধৈর্য ধরেনি তারা। শব্দের উৎস ধরে ওদের রতিক্রিয়া কল্পনা করে মানিকের বুক ধকধক করে। গভীর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই। নিচে মালতীও জেগে আছে নিশ্চয়। একটু আগে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার জেগে থাকা ঘোষণা করেছে।

পাশের রুমে হঠাৎ লাইট জ্বলে উঠলে এ ঘরেও আলোর ঝলক ভেসে আসে। মালতীর বিছানার দিকে তাকায় মানিক। গায়ের ওপর একটি কাঁথা টেনে দিয়েছে, মুখখানা খোলা। মেঝের সংকীর্ণ পরিসর ও সিঙ্গেল মশারির কারণে মালতীর বিছানাও হয়েছে কোনোরকমে একজন ঘুমানোর মতো। তার মধ্যে শিবুকে একপাশে নিয়ে মালতী অন্য পাশে একটু জায়গা খালি করে রেখেছে কি? পাশের ঘরে আলো নিভে যাওয়ায় মানিক আর কিছু দেখতে পায় না। বাইরে বেড়াতে গিয়ে মালতীর গোপন সম্পদ মানিকের হাতে তুলে দেওয়া, মামার আশ্রয় ছেড়ে মানিকের হাত ধরে অন্য কোথাও চলে যেতে চাওয়া এবং শরণার্থী ক্যাম্পে কিংবা বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকার ইচ্ছেটি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, মামি মানিক-মালতীর সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করছে জেনেও একই ঘরে মানিকের পাশে সে বিছানা পেতেছে কেন? কেউ যাতে তাদের সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যে সন্দেহ না করে, সে জন্য মানিক মালতীকে নিয়ে আর বাইরে বেড়াতে যায়নি পর্যন্ত। অথচ বিছানায় জায়গা না থাকলেও মালতী তার শোকার্ত এবং শূন্য বুকে মানিককে ঠাঁই দেওয়ার জন্য হয়তো-বা জেগে অপেক্ষা করছে এখনো। এসব ভাবনা মানিকের মগজে এবং রক্তেও আজ বড় বেশি আলোড়ন জাগায়।

মালতীর শূন্য বুকে আশ্রয় নেওয়া এবং মালতীকে নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ভালোবাসা প্রকাশের জরুরি দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে মানিক আজ ঘুমাতেও পারে না। শরীরের ভেতরে অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ে। অস্বীকার করতে পারে না সে, গত রাতেও মালতীর পাশে শোয়ার কথা ভেবে তন্দ্রার ঘোরে শয্যাসঙ্গী বালককে জড়িয়ে ধরেছিল। প্রদীপ হয়তো তাকে খারাপ ভেবেছে। কিন্তু এরকম খারাপ হওয়ার প্ররোচনা মালতী তাকে নানাভাবে জোগায়নি কি? উত্তেজিত মানিক বিছানায় উঠে বসে। পুরো বাড়িতে মধ্যরাতের স্তব্ধতা। স্ত্রীসঙ্গমের পর ঘুমন্ত ধীরেন দত্তের প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে আসছে। মানিকের বিছানায় প্রহরী প্রদীপ এবং মালতীর বিছানায় শিবুও এখন ঘুমে কাদা। মালতীর বুকের ধন এক্সচেঞ্জ করে যে ইন্ডিয়ান টাকা পেয়েছে, সেটা আগের মতোই বুকে আগলে রাখার গোপন অনুরোধ জানানোটা জরুরি। দিনে বাসায় এরকম সুযোগ না পেলে মধ্যরাতে মালতীর বিছানায় না গিয়ে মানিকের উপায় আছে? বালিশের তলায় রাখা টাকাটা হাতে নেয় মানিক। বেড়ালের মতো সতর্ক পায়ে বিছানা থেকে নামে। বুকে দুরুদুরু কম্পন।

অন্ধকারেও মালতীর মশারির খোপটাই শুধু আবছা চোখে পড়ে। ভেতরে মালতী ও তার সন্তান কোথায় কীভাবে শুয়ে আছে কিছুই চোখে পড়ে না। চাপা কণ্ঠেও মালতীকে ডাকার সাহস হয় না, তাতে যে কারো ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তার চেয়ে বাথরুমে যাওয়ার জন্য মানিক ঘরের লাইট জ্বালতে পারে। মশারির ভেতরে ঢোকার আগে দেখে নিতে পারে ভেতরের বাসিন্দাদের বাস্তব অবস্থান। আলোর আঘাতে যদি মালতী চোখ মেলে তাকায়, ইশারায় তাকেও ঘরের বাইরে বাথরুমে ডেকে নিয়ে যেতে পারে মানিক। তারপর ঘুমাতে না পারার কষ্ট লাঘব করার জন্য দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে না হয় কেঁদে নেবে অনেকক্ষণ। অন্ধকারে হাতড়ে সুইচটা খুঁজে পেয়েও মানিক টিপতে ভয় পায়। কারণ মধ্যরাতে আলো লাফাতে দেখে মালতীর আগে তার মামা-মামির ঘুম ভেঙে যায় যদি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীর মশারি ঘেঁষে তার শিয়রের কাছে বসে পড়ে মানিক। মশারির প্রান্ত তুলে ভেতরে হাত ঢোকায়। হাত মাথার চুল খুঁজে পায় প্রথম, চুল ধরে মাথায় উঠে যায় সন্তর্পণে। মাথা টিপে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই যেন হাতখানা মাথাতেই নড়াচড়া করে কিছুক্ষণ। মালতীর ঘুম তবু ভাঙে না। মাথার চুল থেকে হাতখানা এবার মালতীর কপালে, গালে, মুখে স্পর্শ দিতে থাকে। মানিক হাতে মালতীর অস্বাভাবিক উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করে, কিন্তু মুখে অবৈধ স্পর্শ পেয়েও মালতীর ঘুম ভাঙে না। মানিক একটু সরে বসে এবং হাতখানা এবার মুখ থেকে সরাসরি মালতীর বুকে নেমে আসে। গলা থেকে কাঁথাখানা সরিয়ে দুঃসাহসী হাত ব্লাউজসহ মালতীর বুক স্পর্শ করে। ব্লাউজের বোতাম খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই মালতী দু'হাতে দস্যুহাত চেপে ধরে এবং চাপা কম্পিত কণ্ঠে একই সঙ্গে জানতে চায়, কে?

ধরা পড়ে চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলায় জবাব দেয় মানিক, 'আমি, টাকাটা বদলে এনেছি। আগের মতোই বুকে লুকিয়ে রাখা ভালো।'

কিন্তু মালতীর স্তন স্পর্শকারী হাতখানা মালতীর হাত ঠেকিয়ে রাখায় অন্য হাতে ধরা টাকাটা মানিক মালতীর বালিশের নিচে রেখে দেয়। অন্ধকারেও মালতী বোধহয় পাশ ফেরে কিন্তু মানিকের হাত ছাড়ে না। হাতখানার ওপর মুখ রেখে কাঁদতে থাকে। হাতে চোখের জলের স্পর্শ পেয়ে মানিক এবার অন্য হাতখানাও তার শরীরে রাখে। মালতীকে সাহস ও সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্ব দু'হাতও যেন কুলিয়ে উঠতে পারে না, মালতীর শরীরকে একটু সরিয়ে দিয়ে বিছানায় জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টায় বিছানা ও মেঝে একাকার করে মানিক মালতীর পাশে শুয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ স্বদেশের জন্য মানিকের ভেতরে যত দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার হতাশা, স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, স্বামীহারা মালতীর জন্য যত সহানুভূতি এবং পরেশ কাকাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার যত প্রতিহিংসা — তার সবই যেন মানিকের শরীরে মহা আলোড়ন জাগায়। নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে মানিক সমস্ত শরীর দিয়ে মালতীকে জড়িয়ে ধরে। মালতীর অস্ফুট কণ্ঠে 'ছি মানিক! না' আওয়াজটিও দু'ঠোঁটে চেপে রাখে।

দুটি শরীরের এক ও একাকার হওয়ার লড়াই শিবুই বোধহয় টের পায় প্রথম। ঘুমের ঘোরে উহ্ আর্তনাদ করে কয়েকবার, মালতী বা মানিক কর্ণপাত না করার অভিমানে কিংবা ঘুমন্ত শরীরে হঠাৎ ব্যথা পেয়েই হয়তো তীব্র স্বরে কেঁদে ওঠে। তখন মালতীকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মশারির বাইরে আসতে গিয়ে মানিক মশারির এক কোণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশি ছিঁড়ে দেয়। মানিক মশারির রশি বাঁধার সময় পায় না, কারণ শিবুর কান্না তখন ঘরে ডাকাত-পরা আতঙ্ক যন্ত্রণায় মালতীর মামা-মামিরও ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

'ও মালতী, কী হলো! তোর ছেলে অমন কাঁদছে কেন? মালতী!'

ঘুম ভেঙে গেছে প্রদীপেরও। বিছানায় উঠে বসে সে মানিককে বিছানায় উঠতে দেখে শুধায়, 'মামা, আপনি কোথায় ছিলেন?'

'পেচ্ছাব করতে গেছিলাম। ঘুমাও।'

সঙ্গীকে ঘুমানোর নির্দেশ দিয়ে মানিক তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে লাইট জ্বলে উঠলে এবং মালতীর মামির উপস্থিতি টের পেয়েও মানিকের ঘুম ভাঙে না। মালতীর কোনো জবাব শুনতে পায় না সে। প্রদীপ মায়ের প্রশ্নের জবাব দেয়, 'মামা পেচ্ছাব করতে গিয়ে দিদির বিছানায় উল্টে পড়েছিল বোধহয়।'

প্রদীপের মা আর কোনো কথা বলে না। মশারির রশি আবার বেঁধে দিয়ে, ঘরের লাইট নিভিয়ে দিয়ে চলে যায়। শিবুর কান্নাও থিতিয়ে আসতে থাকে।

ঘরবাড়ি আবার নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আসার পরও মানিক ঘুমাতে পারে না। লাইটের আলোয় চোখ বুজে ছিল, কিন্তু কাল দিনের আলোয় সে এ মুখ দেখাবে কী করে? অবরুদ্ধ স্বদেশ যখন মুক্তিসংগ্রামে প্রতিদিনই রক্ত ঢালছে, মানিক তখন প্রবাসে স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজছে ব্যক্তিগত ভোগ-লালসার মধ্যে। স্বজন হারানোর শোক, পরাশ্রয়ের দুর্ভোগ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘেরাটোপে বন্দি অসহায় নারীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানিক মুক্তিযুদ্ধে যায়নি, বরং বর্বর পাকবাহিনীর মতো নিজেও তার শরীরে হামলা চালিয়েছে। ছি! মৃত পরেশ কাকা মানিককে ধিক্কার দেয়, ছি! মুক্তিযোদ্ধা এলাহি, জিয়াদ, বাণ্টু মানিককে ধিক্কার দেয়, ছি! আসমাও মানিককে ধিক্কার দেয়, ছি! যে অসহ্য যন্ত্রণা আর হতাশার জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মালতীর শরীরে প্রেমের আশ্রয় খুঁজেছে মানিক, তা আরো হাজার গুণ বেড়ে যাবে সকালে যখন এ বাড়ির সবার চোখ-মুখ থেকে ছি ধ্বনি ঝরে পড়বে। তখন মালতীকে নিয়ে কোথায় পালাবে মানিক? সারারাত ভেবেও মানিক এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পায় না।

খুব ভোরে, কেউ জেগে ওঠার আগেই তার জামা-কাপড় ব্যাগে ঢোকায়, তারপর ব্যাগটি নিয়ে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। মালতী তখন সবে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুই টের পায় না। কিংবা জেগে থাকলেও বাধা দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊনত্রিশ

কোচবিহার শহরে মানিক নিরাপদ বোধ করে না আর। ছোট শহর। ধীরেন দত্ত বা তার পরিচিতজনদের সঙ্গে যে-কোনো সময় দেখা হয়ে যেতে পারে। মানিকের পালানো টের পেয়ে ইতোমধ্যে মালতী হয়তো কাঁদতে শুরু করেছে। মাঝরাতে ঘরে ঢুকে মানিক-মালতীকে দেখে সবই টের পেয়েছে গৃহকর্ত্রী। মালতীর কান্নায় এবং আশ্রয়দাতার নীরব ও সরব প্রতিক্রিয়ায় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হতে থাকবে মানিকের আসল পরিচয়। কুলটা ভাগ্নির বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে সকালে ধীরেন দত্ত অপরাধীকে খুঁজতেও শুরু করবে বোধহয়। তার আগে, স্বদেশি বা বিদেশি পরিচিত কারো সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আগেই মানিক তাই এ শহর ছেড়ে পালাতে চায়।

কোচবিহার স্টেশনে এসে মানিক লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরে। ব্যাগ থেকে চাদরখানা বের করে গায়ে জড়ায়। শীতকাল তার আগমনী ঠাণ্ডাবার্তা ভোরের বাতাসে একটু একটু ছড়াতে শুরু করেছে। আজ মানিক হালকা কুয়াশাও দেখতে পায়। ভোরের কুয়াশাচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মে ময়লা কাঁথা-কম্বলে আত্মপরিচয় ঢেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে অনেকগুলো মানুষ। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত নিরাশ্রিত মানিককে অতঃপর এভাবেই কি ইন্ডিয়ায় থাকতে হবে? মালতীর জন্য নগদে ও টুকিটাকি কেনাকাটায় ব্যয় করে পকেটের টাকা প্রায় শেষ। মালতীর গোপন সঞ্চয় ইন্ডিয়ান টাকায় ফিরিয়ে দেওয়ার সময় নিজের জন্য একটি টাকাও সরায়নি মানিক। ভেবেছিল, প্রয়োজন হলে বলেকয়েই নেবে। কিন্তু সেই সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করতে এখন মালতীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ছুটতে হবে, কে জানত!

পকেটে অবশিষ্ট যে টাকা আছে, তা দিয়ে মানিক বেশিদূর যেতে পারবেও না হয়তো। এই বিশাল দেশটায় একটিমাত্র ঠিকানা আছে মানিকের ব্যাগে, এমেনে পরিবার কলকাতার যে ঠিকানায় আশ্রয় পেয়েছে, সেই ঠিকানাটি রশিদ চাচা মানিককে দ্বিধাহীন দিয়েছিল কেন কে জানে! কিন্তু এমেনে মানিককে সেখানে বেড়াতে যাওয়ার কথা একবারও বলেনি। তারপরও ঠিকানাটিকে আপাতত গন্তব্য ধরে কলকাতা গেলে আসমাদের সঙ্গে দেখা না হোক, কলকাতা শহর তো কিছুটা দেখা হবে। পুরনো সহপাঠী পঙ্কজ বলেছে, জয় বাংলার পরিচয় দিলে ট্রেনে টিকেট ছাড়াই ভ্রমণ করা যাবে। থাকার জায়গা না থাকলে কয়েকটা দিন ট্রেনে আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাসীর মতো ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়াবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক। সকালে যে ট্রেন আসবে, সেই ট্রেনে উঠে বসার জন্য মানিক প্ল্যাটফর্মের একটি ফাঁকা বেঞ্চে বসে থাকে।

কাপড়ের ঝোলা কাঁধে একটি প্যান্ট-শার্ট পরা যুবক মানিকের সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার পায়চারি করার পর, মানিকের পাশেই বসে পড়ে হঠাৎ। কথা বলে প্রথম।

'দাদা, আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। শিলিগুড়িতে পার্টি অফিসে দেখা হয়েছিল কি?'

'জি না, আমি এখানকার কেউ না।'

'কোথায় যাবেন জানতে পারি?'

'আমি মানে জয় বাংলা থেকে নতুন এসেছি। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে।'

'ওহ! জয় বাংলা!'

ধারণার সাথে না মেলার জন্যই যেনবা সমবয়সী বাঙালি যুবকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে। মানিকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

'আচ্ছা, মুক্তির জন্য আপনারা সব ইন্দিরা গান্ধীর পোঁদে মাথা ঢোকাতে এসেছেন কেন বলুন তো?'

যুবকটির আক্রমণাত্মক প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে মানিক কিছুটা ভড়কে যায়। তার পরচিয় নিয়েও কৌতূহল জাগে।

'দেশে কি করতেন আপনি?'

'আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ইকোনিমকস সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম।'

'তা কোন পার্টির সঙ্গে ছিলেন — শেখ মুজিবের পার্টি?'

'আমি ঠিক কোনো পার্টিতে ছিলাম না। এখন তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একক কোনো পার্টির ব্যাপার নয়। জনগণ, মানে জাতীয় মুক্তির যুদ্ধ।'

'তা জনযুদ্ধে শরিক না হয়ে মা দুর্গার দেশে এসেছেন কেন — বেড়াতে?'

'আপনি বোধহয় জয় বাংলার লাখ লাখ শরণার্থীর ওপর বিরক্ত হয়ে এভাবে বলছেন। প্রাণ বাঁচাতে এ দেশে পালিয়ে না এসে তো আমাদের উপায় ছিল না।'

'এখন ইন্দিরা ঠাকরুণ ছিকৃতি দিয়ে সোলজার পাঠিয়ে দেশ স্বাধীন করে না দিলে আপনাদের আর ফেরার উপায় নেই, তাই না? শরণার্থীদের পুঁজি করে বিদেশের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি অবশ্য একুশ দিনের বিদেশ সফরে গেছেন। ফিরে এসে ইন্দিরা সরকার পাকিস্তান ভাঙার জন্য আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু এতে কি বাংলাদেশের পিপলের মুক্তি আসবে?'

কোন পথে পিপলের মুক্তি আসবে, তা জানার চেয়ে এ মুহূর্তে রহস্যময় ছেলেটিকে চেনার আগ্রহই মানিকের বেশি। সাতসকালে মানিকের কাছে এসে কেনই-বা সে গায়ে পড়ে রাজনৈতিক তর্ক করে, তাও রহস্যময়। ভীরু কৌতূহল বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করে বলে, 'আপনার পরিচয় তো পেলাম না। আপনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এভাবে বিদ্রূপ করছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'কোথায় মুক্তিযুদ্ধ মশাই? কার মুক্তি? এ তো দুই কুকুরের লড়াই। আর আপনাদের মতো ইয়ংম্যান ইন্দিরার পোঁদে মাথা ঢুকিয়ে মুক্তি খুঁজছেন! দেশে ফিরে পিপলকে সঙ্গে নিয়ে দুই কুকুরের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে ফাইট করুন।'

প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে তাকিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় যুবকটি। বিদায় নেওয়ার আগে বলে, 'কিছু মনে করবেন না দাদা, আমি দেখি কখন ট্রেন আসবে।'

যুবকটি স্টেশন ঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর মানিক প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিক থেকে দুজন পুলিশকে আসতে দেখে। পুলিশ দেখেই কি যুবকটি হঠাৎ পালিয়ে গেল? ধীরেন দত্তের কাছে শোনা নকশালদের গল্প মনে পড়ে। কংগ্রেসি সরকারের বিরুদ্ধে তারা নাকি সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছে। পুলিশের সঙ্গে ওরা যুদ্ধ করে পালিয়ে গেছে ধীরেন দত্তের মহল্লা থেকেও। এসব গল্প করে লোকটা মানিককে সতর্ক করেছিল তার স্বাধীনভাবে বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধ করার জন্য। যুবকটি নকশাল কি না কে জানে। যেই হোক, মানিকের ভেতরে ভয় ডুগডুগি বাজায়।

চেনা স্টেশনেই বিপদের গন্ধ, আর ট্রেনে লক্ষ্যহীন যাত্রায় বড় কোনো বিপদ আসবে না, তার গ্যারান্টি কি? দেশ ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে থাকাটা মানিক নিজেই যেখানে সমর্থন করতে পারে না, অন্যরা তো সন্দেহ করবেই। দেশে গ্রামের লোকজনকে নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবার সময় মানিকের ভেতরে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। কোচবিহারে কোনো যুবশিবিরে ভর্তি হয়ে মুক্তিযোদ্ধা না হোক, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ছেলেদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকলে অন্তত বিপদ-আপদের ভয় থাকবে না। মালতীও খুঁজে পাবে না তাকে। পুলিশ দুটি কাছে আসার আগেই মানিক তড়িৎ সিদ্ধান্ত পাল্টে স্টেশন পেরিয়ে রাস্তায় নামে। রিকশা নিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত বাসটার্মিনাল, তারপর সীমান্তের যে-কোনো যুবশিবির খুঁজে ভর্তি হওয়াটা মানিকের জন্য কঠিন হবে না। পকেটে এমেনের দেওয়া সার্টিফিকেটখানা সাহস জোগায়।

শহরের সীমানার বাইরে সাহেবগঞ্জ বাজারে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে মানিক। এখানকার যুবশিবিরটিতে নাম লেখাবে সে। ক্যাম্পের ধরাবাঁধা জীবনে বন্দি হওয়ার আগে, মালতীর কাছে শেষ বিদায় নেওয়ার জন্যই যেনবা একটি রেস্টুরেন্টে বসে নিজের মুখোমুখি হয় সে। ক্যাম্পের ফ্রি খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আগে নিজের টাকায় নাশতা করে। চায়ের পর আজ একটি চার্মিনার সিগারেটও ধরায়। বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ তার সহ্য হয় না, কিন্তু গত রাতের নিষিদ্ধ সম্পর্কের নোনা গন্ধে শরীর-মন এখনো যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার চেয়ে তামাকের কটু গন্ধ আর কতটা খারাপ হবে? সিগারেটের বিস্বাদ ধোঁয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মালতীকেও ভেতর থেকে মুক্ত করে দিতে চায় মানিক।

সাহেবগঞ্জ যুবশিবিরটি আসলে ওপার থেকে আসা বাংলাদেশি যুবকদের জন্য প্রাথমিক অভ্যর্থনা কেন্দ্র। এখান থেকে মুক্তিযোদ্ধা হতে ইচ্ছুক যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্য ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মানিকের পরিচয় জেনে এবং সার্টিফিকেট দেখে বলে, তুমি এখানে এলে কেন? এমএনএ সাহেব তোমাকে কোচবিহার ক্যাম্পেই ব্যবস্থা করে দিতে পারত।

'আমি আসলে ট্রেনিং নিতে চাই।'

'আমরা দু'এক দিনের মধ্যে টাপুরহাট ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব, সেখান থেকে আর্মস ট্রেনিংয়ে পাঠাবে কি না বুঝতে পারছি না।'

ক্যাম্পে দুই বেলা পিটি-প্যারেড করা এবং লাইন ধরে খিচুড়ি-রুটি খাওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। একটা লম্বা চালাঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে যুবকদের। মানিক এখানে একটি কম্বল পায়। অচেনা ছেলেদের মাঝে পরিচিত মুখ ও সম্ভাব্য বন্ধুকে খোঁজে। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া ছাত্র একজনও খুঁজে পায় না। সবাই নিজ গ্রামের যুবকদের মতো, রংপুর কড়িগ্রামের বিভিন্ন গ্রাম থেকে গত এক সপ্তাহের মধ্যে জড়ো হয়েছে এখানে। প্রতিদিনই আসছে। আগে যারা এসেছিল তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য ক্যাম্পে।

দুজন যুবক এগিয়ে আসে মানিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে।

'আপনার বাড়ি হরিপুর না? সজব ভুঁইয়ার ছেলে না আপনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রতনপুরে আমার খালুর বাড়ি, রহমান পানাতি আমার নানা, চিনছেন আমাকে?'

মানিক চিনতে পারে না, কিন্তু ওরা বিশদ পরিচয় দিয়ে অল্প সময়েই ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। পাশের ইউনিয়নে ওদের বাড়ি। মানিকের বাবার দেওয়া সার্টিফিকেট নিয়েই ওরা গতকাল ইন্ডিয়ায় এসেছে। সজব ভুঁইয়ার কাছেই জেনেছে ওরা, তার ইউনিভার্সিটি-পড়া ছেলে ইন্ডিয়ায় গিয়ে মুক্তিবাহিনীর বড় কমান্ডার হয়েছে, এমনকি বাড়ির চাকরও মুক্তিবাহিনীতে গেছে। কিন্তু মানিক এই ক্যাম্পে কেন?

গাঁয়ের খবর জানার জন্য মানিক ছেলে দুটিকে নিয়ে ক্যাম্পের মাঠে দাঁড়ায়। গতকালই বর্ডার পার হয়ে এই ক্যাম্পে ভর্তি হয়েছে তারা, সঙ্গে আরো দুজন ছিল, ওরা বেড়ানোর শখ মিটিয়ে কোচবিহার থেকে কেনাকাটা করে দেশে ফিরবে। কিন্তু বারী ও আকবর মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় বা সার্টিফিকেট নিয়েই দেশে ফেরার প্রতিজ্ঞা করে এই ক্যাম্পে ভর্তি হয়েছে। বারী ও আকবরের কাছে এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। দিন পনেরো আগে হরিপুর স্কুলের রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল মুক্তিবাহিনী। রাজাকাররা রাইফেল রেখেই ভয়ে ইঁদুরের মতো পালিয়ে গেছে। দুজনকে ধরে নিয়ে মুক্তিরা মেরে তিস্তায় ভাসিয়ে দিয়েছে, কেউ বলে বেঁধে ইন্ডিয়ায় নিয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে তামাকপুরের সন্ত্রাস রাজাকার খোরশেদও নাকি আর্মি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। দলবল বাড়িয়ে এলাকায় সে আবার ক্যাম্প করবে বলে শোনা যায়। মুক্তিবাহিনী তাই এখন রাজাকারের খোঁজে অনেক বাড়িতেই অপারেশন চালাতে শুরু করেছে।

'শুধু রাজাকার? শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে বাদ দেয় কেন?'

প্রথমেই যার খবর জানার ধুকপুক কৌতূহল কাজ করছিল ভেতরে, বারী সরাসরি হেসে জানায় তার খবর, 'আপনার নানার বাড়িতেও গিয়েছিল মুক্তিরা, কিন্তু তাকে বাড়িতে খুঁজে পায় নাই। চিন্তা করেন, কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের মতো মানুষও এখন মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুদের ভয়ে পালায় থাকে।'

'পালিয়েও বাঁচতে পারবে না ওরা। যাক, তোমাদের পেয়ে ভালোই হলো, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই দেশে ফিরব আমরা।'

এলাকার অচেনা সরল যুবক দুটিকে ভালো লাগে মানিকের। দখলদারমুক্ত স্বদেশের মাটিতে পা রাখার আগেই পরিচিত স্বদেশকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ ও সাহস জোগায় ওরা। একলা থেকে মানিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে জ্বালা ও অপরাধবোধ, তাও যেন অনেকটা চাপা পড়ে যুবশিবিরের নানা-বয়সী এসব যুবকের সান্নিধ্যে।

সাহেবগঞ্জ ক্যাম্পে তিনদিন কাটানোর পর টাপুরহাট ক্যাম্পে চালান করা হয় যুবকদের। সকালে পাকা রাস্তায় লাইন ধরে মাইল পাঁচেক পথ হাঁটতে হয়। রাস্তার ধারে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বিশাল এক কাঁশবন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত জায়গা। ভেতরে অনেকগুলো কাশক্ষেত উজাড় করে লম্বা লম্বা বাঁশের চালাঘর করা হয়েছে। সাহেবগঞ্জ যুবশিবিরের তুলনায় বহুগুণ বড় ক্যাম্পটি, যুবকদের সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজার। এখান থেকে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর অস্ত্র ট্রেনিং নেওয়ার জন্য যুবকদের চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে শিলাগুড়ির পাহাড়চূড়ায়, ইন্ডিয়ান আর্মির ট্রেনিং ক্যাম্পে। অস্ত্র প্রশিক্ষণ পাওয়ার আগেই মানিক নবাগত বাইশজন যুবকের সেকশন কমান্ডার মনোনীত হয়েছে। সেকশনের সবাইকে নিয়ে বাঁশের ব্যারাকের একটা ঘরে ঢোকে, ঢালাও বাঁশের মাচানে তাদের থাকার ব্যবস্থা, তবে প্রত্যেকের জন্য একটি করে মোটা অস্ট্রেলিয়ান কম্বল। এছাড়া লালরঙা গরম জামা এবং পিটি-প্যারেড করার জন্য একজোড়া কেডসও বরাদ্দ পায় সবাই। দেরিতে এসেছে বলে পায়ের সাইজ মতো কেডস পায় না অনেকেই, বিশেষ ব্যবস্থা করে পরবে, বেঢপ সাইজের জুতা নিতেও আপত্তি করে না কেউ। ক্যাম্পের পুরনো বাসিন্দাদের কাছে আলাপ করে সবাই জানতে পারে, পনেরো দিন থেকে দু'মাস যাবৎ অপেক্ষা করছে চারটা কোম্পানির চার হাজার যুবক, কিন্তু ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য দেশে কবে তাদের পাঠানো হবে, কি আদৌ হবে না — কেউ তা জানে না।

টাপুরহাট ক্যাম্পটিও আসলে ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যাম্প, ক্যাপ্টেন জগমোহন সিংয়ের দায়িত্বে পরিচালিত। ক্যাপ্টেন ও ইন্ডিয়ান আর্মিদের জন্য আলাদা তাঁবু রয়েছে। ইন্ডিয়ান আর্মিরা দায়িত্বে আছে বলেই বোধহয় এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলাও বেশ কড়া। বাঁশি বাজলে ব্যারাকের ভেতর থাকা চলবে না। মাঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ক্যাম্পের চৌহদ্দির মধ্যে পায়খানা করতে পারবে না কেউ, আমাশয় হলেও না। তিন বেলা লাইন ধরে ক্যান্টিনে রুটি খেতে হবে এবং রুটির সঙ্গে শুধু বিস্বাদ ডালই থাকবে। তবে দুপুরে মাঝেমধ্যে শক্ত ভাত ও ডাল-ভাজি। ইচ্ছে হলেই কখনো ক্যাম্পের বাইরে বেড়াতে যাওয়া চলবে না, গেটে সেন্ট্রি। এই ক্যাম্পে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে একবার করে হলেও প্রত্যেককে আমাশয় ও চোখ ওঠা রোগে ভুগতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই, কিন্তু ক্যাম্পে কোনো ওষুধ পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, অসুখ-বিসুখ-আলসেমি ও প্রাকৃতিক বাধা উপেক্ষা করেও খুব সকালে হুইসেল শুনেই মাঠে ফলইন হতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পিটি করার পর লাইন বেঁধে ক্যাম্পের পাশের পাকা রাস্তা ধরে শুরু হবে ডবল মার্চ।

ভেড়ার পালের মতো দু'মাইল রাস্তা দাবড়ে নেওয়ার পর তোষ্যা নদীর চরে পনেরো মিনিটের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যুবকদের। প্রাতঃক্রিয়া এই সময়ের মধ্যে সারতে হবে যুবকদের। কেননা ক্যাম্পের ভেতর পায়খানার ব্যবস্থা নেই। আবার হাজার হাজার ছেলের জন্য তোষ্যা নদীর বালুচরে যথেষ্ট আড়াল-সংকট। ফলে নতুন যারা এই ক্যাম্পে আসে, এ ব্যবস্থায় প্রকৃতি যেন তাদের ডাকতেও লজ্জা পায়। দু'একদিনের মধ্যে অবশ্য তারা শিখে ফেলে, কীভাবে আগে আগে ছুটে গিয়ে পজিশন নিতে হয় এবং চোখ দুটি বন্ধ করে, মাথাটি দু'হাঁটুর মাঝখানে ঢুকিয়ে কীভাবে মুহূর্তেই খোলা আকাশের নিচে কোনো উপকরণ ছাড়াই নিভৃত-নির্জন টয়লেট তৈরি করে নেওয়া সম্ভব। ধৌত কর্মের জন্য আবার নদী পর্যন্ত ছুটতে হয়। সকাল-বিকেলের পিটি-প্যারেড ছাড়াও ইন্ডিয়ান গুর্খা সেনাদের সঙ্গে কাশবন পরিষ্কার করা এবং রাতে ক্যাপ্টেনের তাঁবুসহ বেশ কিছু পয়েন্টে সেন্ট্রির ডিউটি পালন করতে হয় ক্যাম্পের যুবকদেরই।

ক্যাম্পের ধরাবাঁধা জীবনের দুর্ভোগ ও খাওয়ার কষ্ট এমনিতেই ছেলেদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অনিশ্চয়তা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা উপাধি না পাওয়ার হতাশায় তাদের মনোবল ভেঙে পড়তে থাকে দিন দিন। প্রতিদিন ডবল মার্চ করে নদীর ধারে যতজন পায়খানা করতে যায়, ততজন আর ফিরে আসে না। ক্যাম্পের নিকটবর্তী বিলে গোসল করার কথা বলে জামাকাপড় হাতে নিয়ে খালি পায়েও পালায় অনেকেই। দুপুরে খাওয়ার পর মাঠে রোদ পোহাতে বসে সেকশনের সঙ্গী যুবকরা মানিককেও পরামর্শ দেয়, 'ওস্তাদ, চলেন হামরাও পালায় দেশে যাই। বাঁধা গরুর মতো এ ক্যাম্পে থাকলে কোনো ফায়দা নাই। হামারও ভবিষ্যৎ নাই। মাঝখান থাকি ইন্ডিয়ার আমাশায় হামাকে খাইবে।'

অবসরে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির খবর, ফেলে আসা দেশের নানাস্মৃতি নিয়ে গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টা করে ক্যাম্পজীবনের দুর্ভোগ ভুলে থাকার চেষ্টা করে ছেলেরা। সুযোগ পেলেই ইন্ডিয়ান আর্মির তাঁবুতে গিয়ে রেডিয়োর খবর শোনে মানিক, সেকশনের ছেলেদের শোনায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন একাকিত্ব ও গোপন স্মৃতির জ্বালা ভুলে থাকার জন্য এলাকার গ্রামীণ যুবকগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করে সবসময়। বয়সে বড় যারা, তারাও সেকশন কমান্ডার বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র হওয়ার কারণে মান্যগণ্য করে তাকে। মানিকও মূর্খ চাষা বলে বয়োজ্যেষ্ঠদের হেলা না করে ভাই বলে সম্বোধন করে। পালিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে সবসময় নিজের সিদ্ধান্তটি সঙ্গীদের ওপর আরোপ করে মানিক, 'পালিয়ে কোনো মুক্তি নাই রে ভাই। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার সৌভাগ্য যদি না-ই হয়, স্বাধীন দেশেই ফিরব আমরা।'

মানিককে সমর্থন দিয়েও নানারকম যুক্তি দেয় ছেলেরা। ট্রেনিংয়ে না পাঠাক, শেষ পর্যন্ত কষ্ট করে থাকলে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাবে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারের কাছে দাম পাওয়া যাবে, ক্যাম্পের এই দামি কম্বল একেবারেই দিয়ে দেবে আমাদের। তাছাড়া ইন্ডিয়ায় তবু প্রাণে বাঁচার নিশ্চয়তা আছে কিন্তু পালিয়ে যুদ্ধরত বাংলাদেশে ফিরে গেলেই রাজাকার সন্দেহে মুক্তিবাহিনী যদি তাদের বিচার করতে চায়, কী প্রমাণ দেবে তারা?

কোরবানি ঈদের দিন মাংস-ভাত খাওয়ার পর শীতের দুপুরে মাঠে বসে রোদ পোহানোর সময় সেকশনের একটি ছেলেকে দুজন ধরে এনে মানিকের কাছে বিচার চায়, 'ওস্তাদ, বিচার করেন। এ শালা আমার ব্যাগ হইতে পঁচিশ টাকা চুরি করিয়া নিঃস্ব করছে আমাকে। আজ ঈদের দিন একটা বিড়ি টানার পয়সা নাই আমার, অথচ এ হারামজাদার পকেটে চারমিনার সিগারেট আসল কীভাবে?'

অপরাধী সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পাওয়ার কথা বলতেই টাকা-হারানো ছেলেটি তাকে পেটাতে শুরু করে। চোরের বিরুদ্ধে আরো দুজন যোগ দেয়, এর আগে পকেট থেকে টাকা চুরি গেছে তাদেরও। মধ্যস্থতা করতে গিয়েও উত্তেজনা বাড়ায় কেউ, কিন্তু মানিক সেকশনের ছেলেদের মারপিঠ থামাতে পারে না, উত্তেজিত কণ্ঠে উপদেশ দেয় শুধু, 'মুক্তিযুদ্ধ করতে এসে তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছ, ছি! ছি!'

চোর হিসেবে সাব্যস্ত ছেলেটির ঘুষি খেয়ে নাক ফেটে গেছে। নাকের রক্ত চেপে ধরে সে কান্নার গলায় বলে, 'মুক্তিফৌজ হইতে আসায় মোকে তোমরা চোর বানাইলেন! দেশে ফিরিয়া পাক আর্মির গুলি খায়া মরাটাও সম্মানের, তবু চোরের বদনাম নিয়া থাকিম না মুই তোমারগুলার সাথে।'

আহত বাসেদকে সত্যি সত্যি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে দেখে মানিক ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে, 'আর কয়টা দিন অপেক্ষা কর, সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসাথে স্বাধীন দেশে ফিরব আমরা। তুই আফজালের টাকা চুরি করিস নাই মানলাম, কিন্তু সেকশনেরই কেউ চুরি করেছে অবশ্যই। আফজালের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি নিজের থেকে ওকে দশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি।'

টাকা হারানো নিঃস্ব আফজালকে নিজের পকেটের দশটি টাকা দিয়ে মানিক তার সেকশনের ছেলেদের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু এলাকার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের একজন আকবর তাকে মাঠে ডেকে নিয়ে একান্তে অন্য সঙ্গীর বিরুদ্ধে গুরুতর গোপন তথ্য জানায়। বলার আগে অবশ্য মানিকের হাত ধরে আকবর আর কাউকে না বলার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। তথ্যটি হলো, আকবর যার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে সেই বারী হলো একজন রাজাকার। রাজাকার হিসেবে মধুপুরে ক্যাম্পে ডিউটি করেছে, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে বেতনও পেয়েছে। শেষে মুক্তিবাহিনীর দাবাড়ি খেয়ে নিজেও মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য ইন্ডিয়া এসেছে। বারী ইন্ডিয়া আসার সমস্ত খরচ ছাড়াও আকবরকে কোরানের কিড়া দিয়েছিল বলে চুপ করে ছিল, কিন্তু মানিক দেশে ফিরে কোনোদিন জানতে পারলে আকবরকেও ভুল বুঝতে পারে। তাই আগেভাগে বলে দিয়ে বুক হালকা করল।

মানিক অবাক হলেও বারীর প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণা জাগে না। নিজের এলাকায় দেখা রাজাকারগুলোকে মনে পড়ে। তার নানার মতো পাকিস্তানের প্রতি অন্ধ অনুরাগে নয়, অনেকে বেকারত্ব ঘোচাতেও রাজাকারে নাম লিখিয়েছে। চকিতে মালতীর সঙ্গে নিষিদ্ধ সম্পর্কের স্মৃতিও মনে পড়ে। মানিক জানায়, দেশ স্বাধীন হলেও রাজাকার হিসেবে বারী যাতে শাস্তি না পায়, সেটাই আমাদের দেখতে হবে।

৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড মিত্রবাহিনী হিসেবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করলে, চূড়ান্ত বিজয়ের দিন গুনতে থাকে সবাই। বিকেলে যথারীতি বাঁশির ডাক শুনে মাঠে ফলইন হওয়ার পর মানিক আজ মশিয়ার আকন্দ এমেনেকে দেখতে পায়, সঙ্গে আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা এবং ক্যাপ্টেন জগমোহন সিং। একটা খোলা জিপে চড়ে এসেছেন নেতারা, বক্তৃতা করবেন। মাইকও লাগানো হয়েছে। সারবদ্ধ সব ছেলেকে আরামে দাঁড় করানো হয়। জিপের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন এমেনে সাহেব : টাপুরহাট ইয়ুথ ক্যাম্পের প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার, ৬ ডিসেম্বর আমাদের আশ্রয়দাতা মহান বন্ধু ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃতি দিয়েছে। জলে স্থলে আকাশপথে ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী এখন বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে শত্রুবাহিনীকে আঘাত হানতে শুরু করেছে। মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে বিপর্যস্ত হানাদার পাকবাহিনী পিছু হটছে প্রতিদিন। তাদের ভরাডুবি হতে আর কয়েকদিন সময় লাগবে মাত্র। অচিরেই শত্রুমুক্ত দেশমাতৃকার মাটিতে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারব আমরা, তোমরা তাই শৃঙ্খলার সাথে ধৈর্য ধারণ করো, আমরা যখন নির্দেশ দেব তখন তোমরা দেশে ফিরতে পারবে...

পরিচিত নেতার বক্তৃতা শোনার সময় স্বাধীন দেশে এমেনে পরিবারের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা ভাবে মানিক। কিন্তু আশ্চর্য যে, তার পরিবারের সবার মুখ স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করলেও কোনো সম্পর্কই ভাবনা-কল্পনায় স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। আসমাদের কলকাতার ঠিকানাটি যত্নের সঙ্গে ব্যাগে রেখে দিয়েছে, কলকাতায় আসমা-অনিতা ও তাদের মায়ের সঙ্গে দেখা হলে আগামী দিনের সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কহীনতার ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারত মানিক। কিন্তু নিজের খবর দিতে কিংবা এমেনে পরিবারের খবর নিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় না মানিকের।

ক্যাম্পের ভেতরে খবরের কাগজ পড়ে কিংবা রেডিয়ো শুনে যুদ্ধের খবর জানার উপায় নেই। ইন্ডিয়ান গুর্খা সেনারা একটি তাঁবুতে জয় বাংলার ছেলেদের জন্য চা-বিস্কিট, সিগারেট-বিড়ির অস্থায়ী দোকান দিয়েছে। একটা ছোট রেডিয়ো রয়েছে তাদের। দিনেরবেলা চা-বিস্কিট এবং বিড়ি খেতে খেতে সেই রেডিয়ো শুনে যুদ্ধের সর্বশেষ খবর জানার চেষ্টা করে অনেকেই। বঙ্গোপসাগরে আমেরিকান সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতির খবর অন্যদিকে ঢাকা ঘিরে ফেলা মিত্রবাহিনী চরম টেনশন সৃষ্টি করে রেখেছে।

১৬ ডিসেম্বর রাতে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধজয়ের খবরটি ক্যাম্পে প্রথম কে ঘোষণা করে মানিক জানে না। বেজায় শীত নেমেছে বলে সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেয়ে কম্বলের নিচে ঢুকেছিল সে। রাতে হঠাৎ বাইরে গুলির শব্দ, সমবেত হাজার কণ্ঠে জয় বাংলার উল্লাস ধ্বনি শুনে ক্যাম্পের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে সবাই। রেসকোর্সে আজ মিত্রবাহিনীর প্রধান কমান্ডার জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে পাকবাহিনী। বাংলাদেশ এখন দখলদার সেনামুক্ত, স্বাধীন। গলা ছেড়ে জয় বাংলা স্লোগান দেয় যুবশিবিরের হাজার হাজার ছেলে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, খুশিতে লাফাতে থাকে, শীতের মধ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

একজন লুঙ্গি খুলে অন্ধকারে পাগলের মতো দৌড়ায়। স্বাধীন, আমরা এখন স্বাধীন! জয় বাংলা।

অবশেষে প্রত্যাশিত বিজয়ের খবরে আবেগ-বিহ্বল মানিকও রাতে ঘুমাতে পারে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গত নয় মাসের নানা ঘটনার স্মৃতি-অভিজ্ঞতা মনে ছায়া ফেলে। বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীনতা নিয়ে দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখেছিল। অবশেষে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার গ্লানি আর পরেশ কাকাকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিয়ে তার বিধবা স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অপরাধ নিয়ে মানিক একা কোনমুখে ফিরবে? বিজয়ের খবর শুনে স্বামী হারানোর শোকে মালতী হয়তো নতুন করে কাঁদতে বসেছে। মানিক তাকে নিয়ে স্বাধীন দেশে ফিরতে পারবে না। মালতীর মামাই নিশ্চয় ভাগ্নিকে নিয়ে জয় বাংলা যাত্রা করবে শিগগির, গ্রামে পৌঁছে মানিকের চরিত্র নিয়েও জনে জনে না বললেও পরেশ কাকার মা-ভাইদের কাছে তো বলবে অবশ্যই। মানিক সিদ্ধান্ত নেয়, এখনই সরাসরি গ্রামে ফিরবে না সে। বরং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যাওয়ার কথা ভাবে সে। ঢাকায় যাওয়ার আগে ইন্ডিয়া এসে যদি কলকাতাটা একবার চোখের দেখা দেখে যায়, তাহলে সেটাই হয়তো একাত্তরে ইন্ডিয়া ভ্রমণের বড় স্মৃতি হয়ে থাকবে। কারণ একা মশিয়ার এমেলের পরিবার ও আসমা নয়, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনরা তো কলকাতায় ছিল এবং আছে এখনো।

বিনিদ্র রাত কেটে গেলে ভোরে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী আকবর ও বরকতকে ঘুম থেকে জাগায় মানিক। বলে, 'ক্যাম্প থেকে রিলিজ করতেও দু'চারদিন সময় লাগবে অবশ্যই। আমি এর মধ্যে কলকাতায় একটা জরুরি কাজ সেরে আসি। বাড়ি ফেরার টাকা-পয়সাও কিছু জোগাড় করতে হবে। আমি ফেরার আগেই যদি তোমরা চলে যাও, আব্বাকে শুধু খবর দিও, আমি বেঁচে আছি।'

সেকশনের অন্য ছেলেরা জেগে ওঠার আগেই আকবর ও বারীর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে মানিক ব্যাগটি কাঁধে ক্যাম্পের গেটের দিকে এগোয়। বিজয়ের আনন্দেই বোধহয়, আজ গেটে কোনো সেন্ট্রিকে ডিউটিরত দেখতে পায় না। রোজ ডবল মার্চ করে তোষ্যা নদীর দিকে যেত সে প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য, আর আজ খেয়া পেরিয়ে আবার কোচবিহার স্টেশনে যাবে সে, তারপর ট্রেন ধরে জয় বাংলার বিজয় টিকেটে আপাতত কলকাতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিশ

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের খবর শুনেও রাতে সজব ভুঁইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হলো — ভাবতেও খুশি ও গর্ব বুকে উতলায় ঠিকই, সেইসঙ্গে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও কম হয় না। ভুঁইয়ার সবচেয়ে বড় অহংকার পুত্র মানিক এবং বিশ্বস্ত সাথী পরেশ এখনো ইন্ডিয়ায়। দেশ ছাড়ার পর থেকে তাদের কোনো খবর পায়নি। প্রবাসী সরকার ঢাকায় ফিরে ক্ষমতা বুঝে নেয়নি এখনো। এদিকে পাকিস্তানের কবর হওয়ার পরও ভুঁইয়ার চিরশত্রু কাজী চেয়ারম্যান আগের মতোই সোচ্চার বক্তব্য রাখছে, 'কিসের স্বাধীনতা বাহে! পাক আর্মির বদলে দেশে ঢুকছে ইন্ডিয়ান আর্মি। পাকিস্তান ভাঙিয়া কার অধীন হইলেন তোমরা অচিরেই তা বুঝতে পারবেন।'

শ্বশুরের এরকম আস্ফালনের কারণেই ইউনিয়নে বিজয় মিছিল করতে পারেনি ভুঁইয়া। আর করবে কাদের নিয়ে? গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধারা এখনো ফেরেনি। রাজাকার ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দিয়েছে যে অচেনা মুক্তিবাহিনী, তারা সজব ভুঁইয়ার সঙ্গে দেখা করেনি পর্যন্ত। রাতের আঁধারে নদীর ওপার হতে এসেছিল, ভোরের আলো ফোটার আগেই অপারেশন শেষে তিনজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে গেছে। বাকিরা রাতের আঁধারেই পালিয়েছে সবাই। রাজাকার ক্যাম্প উচ্ছেদের পর মুক্তিরা পালের গোদা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি অপারেশনেও গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বুড়ো শকুন বড় সতর্ক। গোলাগুলির শব্দ শুনে বিপদের গন্ধ শুঁকে রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। চেয়ারম্যানকে খুঁজে না পেয়ে তার বাড়িতে আগুন দেওয়া উচিত ছিল না কি মুক্তিবাহিনীর? দেয়নি, নির্দেশনা দেওয়ার জন্য তাদের পেছনে ছিল না কেউ। এদিকে নৈরাজ্য পরিস্থিতি অচিরেই শেষ হবে বুঝেই হয়তো পলাতক রাজাকার ও দাগী চোর-ডাকাতরা গোপন দল বানিয়ে ডাকাতি শুরু করেছে। পরেশের বাড়ি এবং ঠ্যাংভাঙা হাটেও সাহা বস্ত্রঘর ভেঙে লুটপাট করেছে ডাকাতরা। নরেশ পালিয়েছিল বলে জানে বেঁচেছে। ভুঁইয়াবাড়িতে মিলিটারি, রাজাকার বা ডাকাতরা হানা দেয়নি এখনো। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে এমন একটা রাত যায়নি, যে রাতে এদের ভয় ছাড়া নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছে সজব ভুঁইয়া। বিজয়ের খবর শুনেও পুরোপুরি ভয় কাটেনি এখনো। কিন্তু ভয় নিয়ে আগের মতো পালিয়ে বেড়ালে এলাকায় নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে?

AMARBOI.COM

শীতকালে সাধারণত বেলা করে ঘুম ভাঙে ভুঁইয়ার। কিন্তু আজ ভোরবেলায় লেপের উম দু'পায়ে ছুড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। সিগারেট ধরাতে দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে আগুন জ্বালা ও ধোঁয়া-টানা কাশির মধ্যেও আজ বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ পায়, তারপরও স্ত্রীকে চেঁচিয়ে আদেশ করে, 'কই রে, সক্কাল আমাকে চা-নাশতা দে। টাউনে যাব। দেখি এমেনে সাহেবের ফেরার খবর পাই কি না।'

ঘরের বাইরে বেরিয়ে শীতের দাপট দেখে ভুঁইয়া কিছুটা কুঁকড়ে যায়। কুয়াশাভেজা সকালে বাড়িঘর নিস্তব্ধ। দেশে এত বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল, বিশ্বে জন্ম নিল বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু হরিপুরের প্রকৃতি রং একটুও বদলায়নি, শীতটা বরং জাঁকিয়ে নেমেছে। গাঁয়ের লোকেরাও এমন, এত বড় একখান স্বাধীনতা পেয়েও কাঁথামুড়ে আগের মতোই ঘুমাচ্ছে সবাই। নজিবরের মতো দু'চারজন ছাড়া জয় বাংলা উল্লাস নিয়ে দলে দলে ছুটে আসেনি ভুঁইয়াবাড়িতে। উল্টো এখনো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছেই খবরটার সত্যতা যাচাই করে। পাকবাহিনীর পরাজয়ের পর হরিপুরের চেয়ারম্যানের বাড়িতেও যদি দাউ দাউ আগুন জ্বলত, ঘুম ভাঙত লোকজনের, ভুঁইয়ারও শীতবোধটা তাতে কমত নিশ্চয়ই।

শুধু হরিপুর ইউনিয়ন নয়, স্বাধীন বাংলাদেশটা এখন তার দল ও দলের নেতারা চালাবে। নির্বাচিত চেয়ারম্যান না হলেও, ভুঁইয়ার ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাড়বে অনেক। যুদ্ধের শুরুতে যেমন, স্বাধীন দেশেও তেমনি দলের নেতা ও ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাতে হবে লোকজনকে। এই সময়ে পরেশ ও মানিক তার পাশে থাকলে সুবিধা হতো অনেক। কিন্তু ওদের ফেরার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকারও সময় নয় এটা। স্বাধীন দেশের হাল এখন শক্ত করে চেপে ধরতে হবে তার দল এবং তাকেও। পায়খানায় বসে এসব দায়িত্ববোধ তার সিগারেট টানা এবং পায়খানার বেগকেও প্রভাবিত করে যেন। বদনার ঠাণ্ডা পানি খরচ করে পায়খানা থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ে পেছন খুলিতে কুয়াশার মধ্যেও আগুনের কালো ধোঁয়া। এগিয়ে যায় সে।

ট্যারা জহির সকালে আগুন পোহায়। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আজ বিউটি, রফিক ও ছোটটিও। সাতসকালে ছেলের কাছে এসেছে মুক্তিফৌজ বাণ্টুর মাও। চাকরবাকরদের মাঝে নিজের ছেলেমেয়েদের দেখে, কিংবা হতে পারে মুক্তিফৌজের মাকে দেখেই মেজাজটা খিঁচড়ে ওঠে তার। ভেজা ও কুঁকড়ে যাওয়া বাম হাতখানা গরম করার উদ্দেশে এবং অবাঞ্ছিত আপদটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার রাগেও আজ পোড়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এগিয়ে যায় ভুঁইয়া।

ভুঁইয়াকে দেখে বাংটুর মা আছিমন ঘোমটা মাথায় টেনে পিছিয়ে যায়, কিন্তু একেবারে আড়ালে যায় না। মাদুকে আদেশ করে, 'ও বাবা মাদু, চেয়ারখানা আনিয়া দে পোড়ের কাছে, তোর বড়বা আগুন তপাবে।'

মাদু বাড়ির ভেতরে ছুটে গিয়ে মনিবকে নিজেদের মাঝে বসানোর জন্য আঙিনা থেকে শীতে ভেজা একটি কাঠের চেয়ার নিয়ে আসে। মায়ের ছেঁড়া শাড়িখানা জামার ওপরে চাদরের মতো গায়ে জড়িয়েছিল, তাই দিয়ে চেয়ারের ভোজা পানি মুছে দেয়। পোড়ের তাপ বাড়াতে ট্যারা জহির কিছু খড় ঠেলে দেয়। আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে সবাই।

বিউটি কথা বলে, 'আব্বা, মুক্তিফৌজের মাও চাচি খবর পাইছে ভাটিয়াটাড়ির কোন মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসছে। মাদুকে যাইতে কয় খবর আনার জন্য।'

বাংটুর মায়ের প্রাপ্য ধমক বিউটিও পায় খানিকটা, 'ধেৎ। মুক্তিবাহিনীরা দেশে ফিরলে তার খবর আগে কে পাবে? আমার কাছেই আসতে হবে সবাইকে। এই মাদু, যা তো তুই নরেশকে ডেকে আন। হিন্দুটাড়ির সুবলকেও আসতে বলবি।'

মাদু মনিবের আদেশ পালনের জন্য দৌড় দিলে ভুঁইয়া ট্যারা জহিরকেও আদেশ করে, 'তুই নজিবরকে খবর দে, আসতে কইস এলায়।'

বাংটুর মা দূরত্ব বজায় রেখে বিউটির সঙ্গে কথা বলে, 'ও মা বিউটি, ওদিনকা পাছা রাইতে স্বপন দেখনু বাংটু হামার যুদ্ধ করতে গুলি খায়া মরি গেইছে। গুলিটা নাগছে তলপেটে। মানুষে কয় নিজের বেটার মরার স্বপ্ন দেখলে অন্যের বেটা মরে। মোর তো খালি নিজের বেটার জন্য চিন্তা নোয়ায়, মোর আসল চিন্তা মানিক বাবাজির জন্যে। আজাকারের হাত হইতে মোকে বাঁচায় মাউরিয়া বাজান মোর নিজেও পালায় যুদ্ধ করতে গেল। দেশ স্বাধীন হইল কিন্তু বাজান হামার বাঁচি থাকিল না মরি গেল, সেই চিন্তায় মোর আইজো নিঁদ হয় নাই রে মা!'

পোড়ের আগুন থেকে সরে গিয়ে শীতে গলা তো এমনিতেই কাঁপছিল আছিমনের, তার ওপর কান্নার গমক ওঠায় গোটা শরীরেই যেন হুহু কাঁপন ওঠে, গলাতেও হুমহুম কান্না। সন্তান বাৎসল্যের সহমর্মিতা জাগার বদলে ভুঁইয়ার বিরক্তির বোধটাই জাগ্রত হয় বেশি। মুক্তিফৌজের মা হিসেবে মূর্খ মহিলাটি ভুঁইয়ার দলের মহান মুক্তিযুদ্ধকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন যা-তা বলে অবমূল্যায়ন করে লোক হাসিয়েছে, আজ চেষ্টা করছে ভুঁইয়াকেও কাঁদাতে। এবার সরাসরি তাকেই ধমক দেয় সে, 'এই ভাগ এখান থেকে, সাতসকালে আজাইরা প্যাঁচাল নিয়ে আসছিস!'

বাণ্টুর মা বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলে সজব ভুঁইয়া নিজের বক্তব্যটি সন্তানদের লক্ষ করে শোনায়, 'আমাদের মানিক কি বাণ্টুদের মতো রাইফেল-বন্দুক নিয়া ক্ষেত-জঙ্গল নদী-বিল দাপায় বেড়ানোর জন্য যুদ্ধে গেছে? সে আছে কলকাতায় মশিয়ার উকিল ও অন্য ছাত্রনেতাদের সাথে, তাদের হুকুমেই মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে। তাদের অনুমতি নিয়াই ইন্ডিয়ান আর্মি দেশ স্বাধীন করি দিছে।'

বিউটি এবার সাহস করে প্রস্তাব দেয়, 'আসমা আপাদের বাড়িতে খবর নেওয়ার জন্য কাউকে পাঠায় দিলে হয় না আব্বা?'

'আমি নিজেই যাব আজকে। দেশ স্বাধীন, তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শুরু করো সবাই।'

'রফিক এমেনের ছেলে সুমনের মতো টাউনের স্কুলে ভর্তি হইতে চায়।'

'আমি তো সাইকেল চালায় স্কুলে যাইতে পারব।'

আঠারো মাইল রাস্তা সাইকেল দাবড়ে ছোট ছেলের ভালো স্কুলে পড়ার আগ্রহ দেখে খুশি হয় ভুঁইয়া। হেসে সান্ত্বনা দেয়, 'তোর ভাইজান ফিরুক, আগে দেখি টাউনে একটা বাসাবাড়ি করা যায় কি না।'

যাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল, একে একে ভুঁইয়াবাড়িতে আসে সবাই। ভুঁইয়া আজ তাদের নিজের শয়নঘরে বসিয়ে গরম চা দেওয়ার আদেশ করে। বিজয়োৎসব করার প্রসন্ন মেজাজ নিয়ে কথা বলে ভুঁইয়া, 'ও নরেশ, ইন্ডিয়া আর্মি পাঠায় দিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন করিল দেখিয়া যাদের এখনো গাও জ্বলে, তাদের কী করা উচিত?'

দাদার মতো ভুঁইয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই বলে নরেশ তার মনের কথাও ধরতে পারে না সবসময়। এই অসহায় দশা ঢাকতে বলে, 'দাদা আর মানিক যে কোনদিন ফেরে ভাই। আমি ভাবছি বর্ডার তো খোলা, নিজে কোচবিহার যাব নাকি? এদিকে হওয়ার পর হইতে বাচ্চাটা ভালো যাচ্ছে না।'

'ভালো থাকে কেমন করি, জন্মের পরপরই বাড়িতে অতবড় একটা ডাকাতি লুটপাট হইতে দেখিল।'

'যারা ডাকাতি করছে, তাদের অবশ্যই খুঁজি বের করা হবে।'

ঠিক এ সময় খুব কাছেই গুলির বুম বুম আওয়াজ শুনে ঘরে বিজয়ের উৎসব-পরিবেশ মুহূর্তের জন্য ছিন্নভিন্ন, পরস্পরের মুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকায় সবাই। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতেও এত কাছাকাছি গুলির শব্দ শোনেনি ভুঁইয়া, ছুটে পালানোর জন্য যখন দেহমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুহূর্তেই টানটান, ঠিক তখন গুলির শব্দের পরই জয় বাংলা আওয়াজ শুনতে পায় সবাই। নজিবর বলে, 'এ জয় বাংলা হামার বাংটুর গলা না হয়?'

'আজাকার-ডাকাইত না হয়, মুক্তিবাহিনী! মুক্তিবাহিনী আইল!'

আঙিনায় অভয়বাণী শোনায় বাংটুর মা। তারপর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত বিস্ময়-খুশি নিয়ে দৌড়াতে থাকে, 'মোর মুক্তিযোদ্ধা বেটা ফিরি আইল বোধহয়।'

একা বাংটু নয়, অস্ত্র হাতে এসেছে পাঁচজন বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা। বাংটুর পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট, গায়ে সোয়েটার, গামছাটাকে মাফলারের মতো পেঁচিয়েছে গলায়। বাকি যুবকদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে সোয়েটার বা চাদর। মাথায় সকলের ঝাঁকড়া বাবড়ি। ভুঁইয়ার বাড়িতে এসে রাইফেল শূন্যে তাক করে গুলি ছুড়েছে ওরাই। গুলিতে বিজয়ের আনন্দ যথেষ্ট প্রকাশ না পাওয়ায় চেঁচিয়ে জয় বাংলা স্লোগানও দেয়।

ছেলেকে চিনতে পেরে আছিমনই প্রথম ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'ও বাবা বক্কর! ও মোর বাংটু বক্কর! বাঁচি আছিস তুই! মুক্তিফৌজ হয়া ফিরি আসছিস তুই?'

বাংটু ছুটে এসে রাইফেলসহ মাকে জড়িয়ে ধরে, 'হ্যাঁ মা, তোর বাংটু এলা মুক্তিযোদ্ধা বক্কর। দেশ স্বাধীন করি ফিরি আসছি হামরা। বড় আব্বা কই মা? মানিক ভাইজান, পরেশ কাকা কেমন আছে সগাই?'

আছিমন রাজাকার ক্যাম্পে নিজের অনিবার্য মৃত্যু থেকে মুক্তি এবং মানিক-পরেশেরও পালিয়ে ইন্ডিয়া যাওয়ার খবরটি সংক্ষেপে শুনিয়ে জানতে চায়, তাদের সঙ্গে বাংটুর দেখা হয়েছে কি না? না, এ জায়গার মুক্তিফৌজ কেউই তাদের দেখেনি, খবরও জানে না। এতদিন রোজ যাদের বীরত্বগাথা শুনেছে, তাদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ পায়নি রতনপুরের মানুষ। ভুঁইয়াবাড়ির বড়-ছোট সবাই বাইরে ছুটে আসে। গ্রামে শীতের ভোরে বাড়িতে আগুন পোহাতে বসেছিল যারা, অগ্নিকুণ্ডের চেয়েও অধিকতর উত্তপ্ত ঘটনার আঁচ পেয়ে তারা সবাই দলে দলে ভুঁইয়া বাড়ির দিকে ছুটে আসতে থাকে। এই প্রথম জলজ্যান্ত একদল মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতি নয় মাসের পশ্চিমা মিলিটারি, রাজাকার ও ডাকাতভীতি মুছে দিয়ে সবার মনে বিজয়ের আনন্দ খলবল জাগিয়ে তোলে। সূর্যের মুখ পুবের আকাশে লাল হয়ে ওঠার আগেই ভুঁইয়া বাড়ির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বাণ্টু ও আম্বার ছাড়া বাকি তিনজনের বাড়ি নদীর ওপারে উলিপুরে। তবে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারা। বিজয় দিবসে তারা ছিল দিনাজপুরের মুক্ত এলাকায়। কমান্ডারকে বলেকয়েই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল পায়ে হেঁটেই। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পরও এলাকায় যদি রাজাকার থেকে থাকে এখনো, তাদের বিরুদ্ধে শেষ অপারেশন চালাবে বলে বাণ্টু দলের পাঁচজনকে নিয়ে প্রথম ভুঁইয়াবাড়িতে এসে উঠেছে।

দুদিন বিলম্বে হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে বাড়িতে বিজয়োৎসবের ভিড় দেখে সজব ভুঁইয়া খুশি হয় ঠিকই, তবে ভেতরে কোথায় যেন চোরা যন্ত্রণার কাঁটাও খচখচ বেঁধে। এলাকার শত্রুদের দমনে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীকে তার একান্ত দরকার। আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কথা বলে সে, 'যাক বাবারা, তোমরা যে দেশ স্বাধীন করিয়া আমার বাড়িতে প্রথম আসলে, ভীষণ খুশি হয়েছি আমি। আমার বাড়িতে না খেয়ে যাইতে পারবা না তোমরা। আমার ছেলে এবং দলের নেতারা ফিরে আসুক, তখন গরু-খাসি জবাই করে থানার সকল মুক্তিফৌজকে বাড়িতে দাওয়াত করি খাওয়াব আমি। অন্তত ১০০ জনকে সার্টিফিকেট দিয়া ইন্ডিয়া পাঠাইছি আমি। তারা ফিরে আইলে আমার বাড়িতেই আগে আসবে নিশ্চয়। তোমরা যখন কষ্ট করি প্রথম আসলে, উপস্থিত দাওয়াত নাও। ও জহির, চা-নাশতা আন, মোরগ জবাই করে ভাত-তরকারি রাঁধতে বল। মোর বাণ্টু মুক্তিফৌজের জন্য যে কী গর্ব হয়, সে কথা বোঝানোর ভাষা নাই বাহে।'

সজব ভুঁইয়া বাণ্টুর বাবড়ি চুলে হাত দিয়েও আদর দেখায়।

'ও বড় আব্বা, বাড়িতে পতাকা ওড়ান নাই ক্যানে? মোর কাছে একটা পতাকা আছে, আগে উড়ায় দেই। ওই জহির ভাই, বাঁশ নিয়া আয় একটা, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ায় দেব।'

গ্রামবাসী বাণ্টুর ফৌজি চেহারা তাজ্জব হয়ে দেখছিল সবাই। ট্যারা জহির প্রাক্তন সহকর্মীর রূপান্তর দেখে অবাক নয় শুধু, হাতে অস্ত্র দেখে ভয়ও পেয়েছে। বাণ্টুর সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছে, মাথায় চাটিও মেরেছে অনেকবার, এখন যদি প্রতিশোধ নিতে বাণ্টু তার ওপর রাইফেল তাক করে? কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার বদলে মুক্তিফৌজ বাণ্টু তাকে জহির ভাই সম্বোধন করায় কৃতজ্ঞতায় গলে যায় সে। বাড়ির ভেতরে ছুটে গিয়ে একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে আসে।

বাঁশের তুলনায় পতাকাটি ছোট, তবু তা বাঁশের আগায় বেঁধে বাণ্টু যখন বাঁশটিকে খাড়া করে সকলকে আদেশ দেয়, 'মোর সাথে গলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়িয়া কন সগাই — জয় বাংলা!' সম্মিলিত কণ্ঠের জয় বাংলা ধ্বনির সঙ্গে ভুঁইয়াবাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা পতপত উড়তে থাকে, গাঁয়ের অবুঝ শিশু ও মহিলারাও বুঝতে পারে, স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। পশ্চিমা মিলিটারি আর কোনোদিনও তাদের মারতে আসবে না।

চা-নাশতা খাওয়ার পর উলিপুরের মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে না আর। বাড়িতে যাবে তারা। ওদের বিদায় দিয়ে আম্বার যায় নিজের বাড়িতে। ভুঁইয়াও আজ সাইকেল নিয়ে শহরে যাবে। ঘরে গিয়ে তৈরি হতে থাকে। বাংটুর নিজ বাড়িতে ফেরার তাড়া কম, কারণ বাড়ির সবাই তো বড়বাড়িতেই ছুটে এসেছে। মায়ের পিছে আছে টেঁপি-হেপিও।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই বাংটু বড়বাড়ির অন্দরহমলে ঢোকে। হাঁকডাক করে ছোট-বড় সকলকে ডাকে, কুশল জানতে চায় সবার। বাংটুর সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকা আন্ডাবাচ্চাসহ আছিমনকে উদ্দেশ করে ভুঁইয়ার স্ত্রী বলে, 'ও মুক্তিফৌজের মাও, তোর বাংটু এ বাড়ির চাকর না হয় আর। বড়বাড়ির বড় সাগাই, মোরগ জবাই করি ভাত রাঁধি, মানিকের বাপ কইছে, সগাই আইজ হামার বাড়িতে খাইমেন।'

বিউটির সৎমা মুক্তিযোদ্ধা বাংটুকে সম্মান দেখায়, নাকি খোঁচা মেরে লোকদেখানো আন্তরিকতা দেখায়, আছিমন ঠিক বুঝতে পারে না। ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দেয়, 'যুদ্ধ করিয়া কত রাইত-বা ঘুমায় নাই, সারা রাইত পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি আইল। দুইদিন বাড়িতে থাকিয়া আরাম করুক। চল বাবা, আগে বাড়িতে চল।'

বিউটিও মুগ্ধ চোখে দেখছিল বাংটুকে। সুযোগ পেয়ে কথা বলে, 'তোকে এলা কী বলে ডাকে সবাই?'

'বক্কর মুক্তি, খালি বাংটু কইলে কেউ চিনবে না মোকে।'

'ঠিক আছে, আমরাও বক্কর মুক্তি কয়া ডাকব।'

'যাওয়ার সময় তোমরা টাকা দুইটা না দিলে বাংটু কি আর বক্কর মুক্তি হইতে পরত?'

গোপন দানের কথা ফাঁস করায় বিউটি কি লজ্জা পায়? বাড়ির কাউকে হয়তো বলেওনি কথাটা। ঋণ পরিশোধের চেষ্টা আর প্রকাশ্যে করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয় বাংটু।

মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে নিয়ে মুক্তির মা ঘরে ফিরতে থাকলে মাদুও পিছে নেয়। মাদুকে আটকাতে ট্যারা জহির চেঁচায়, 'কী রে তুইও যে যাইস! কাম নাই তোর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদুও আজ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে, 'ভাই হামার মুক্তিফৌজ হইছে! এলায় হামার কিসের চাকরি আর কিসের কাম।'

বাংটু তার ঘাড়ের রাইফেলটা মাদুর ঘাড়ে দিয়ে বলে, 'নে, এটা ঘাড়ত নিয়া হাঁট।'

রাইফেল কাঁধে নিতেও ভয় মাদুর, বলে, 'তারপাছে-বা পিছলিয়া গুলি বাইর হয় কোন পাকে!'

'বারাইবে না রে। গুলি আর গ্রেনেড আছে আমার কোমরে।'

পরিচিত বাড়িটা যেরকম রেখে গিয়েছিল বাংটু, সেরকমই আছে এখনো। বাবার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ঘরের খেড়ি চালে লাউয়ের ডগমগ ডগায় সাদা ফুল ও কচি লাউবাচ্চা হয়েছে অনেকগুলো। ভুঁইয়াবাড়িতে মুক্তিবাহিনীর বিপুল আদর-সম্মান দেখার পর নিজের হতদরিদ্র ঘরে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে ঠাঁই দিতেও আজ নিজের দারিদ্র্য বড় বেশি কষ্ট দেয় আছিমনকে। মাচানে কাঁথা বিছিয়ে ছেলেকে আরাম করতে বলে। বাংটু তার কোমরে বাঁধা গুলির ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে মায়ের হাতে দেয়।

'সরকার বেতন হিসেবে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিছে মা। সেই টাকা সউগ খরচ হয় নাই, তোর জন্য জমায় নিয়া আসছি। রাখি দে তুই। খরচখালা কী লাগে, মাদুকে দিয়া করাও।'

টাকাটা শিকায় ঝোলানো একটি মাটির হাঁড়িতে লুকিয়ে রাখে আছিমন। পড়শী কিছু বউঝি ছাড়াও ঢোঁড়া মোহাম্মদও আসে বাংটুকে দেখার জন্য।

ঢোঁড়া জানতে চায়, 'ইন্ডিয়া থাকি খালি কি স্বাধীন বাংলাদেশখান আনলু বাহে বাংটু? নগদ কিছু আনিস নাই? মুক্তিফৌজ বেটার চিন্তায় তোর মার যে ইতিকোনো আহারনিদ্রা বন্ধ হইছে। ও ভাবি, বেটার জন্য ভাত চড়ান, চাউল না থাকলে মোর কাছে চাউল নেন এক সের।'

বাংটু চাচাকে পকেট থেকে কয়টা ইন্ডিয়ান বিড়ি বের করে দেয়, 'নাও চাজি, ইন্ডিয়ার বিড়ি খাও।'

বড়বাড়িতে যারা গিয়েছিল দেখতে, শেখের মামুসহ তাদের অনেকে বাংটু বক্করের বাড়িতেও আসে। মুক্তিবাহিনী দেখে যেন হাউস মেটেনি তাদের। কিন্তু ক্লান্তিতে খুবই কাহিল আর ঘুমকাতর হয়ে পড়েছে বাংটু। লোকজনকে বিদায় করার জন্য বলে, 'যুদ্ধে যাওয়ার পর হইতে খাওয়া আর ঘুমের ঠিকঠিকানা ছিল না হামার। আগে এক দুপুর ঘুম দিয়া উঠি, তারপাছে এলা শোনেন, নয় মাসের যুদ্ধের গল্প নয় বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কইলেও শেষ হবার নয় বাহে।'

ভিড়ভাট্টা ভেঙে যাওয়ার পর ছোট বোন টেপি বলে, 'ভাই, যুদ্ধ থাকি মোর বাদে কী আনছিস?'

বাংটু ছোট বোনকে কোলে নিয়ে আদর করে, হেসে বলে, 'খাওয়ার চিন্তা ছাড়া তোর আর কিছু নাই। জয় বাংলা কও, দেখিস এলা ভোক পালাইবে তোর।'

বাংটু আবারও তার থলে থেকে একটি টাকা বের করে মাদুর হাতে দিয়ে বলে, 'যা লবেনচুষ কিনিয়া খাও সগাই।'

আছিমন ছোটদের লবেনচুষ খাওয়ার সুখে বাগড়া দিয়া বলে, 'লবেনচুষ পরে খান, আগে মুক্তিফৌজ ভাইকে খাওয়ানোর চিন্তা করো। ও মাদু, হাঁসটা ধরিয়া জবাই করি আন বাবা। চুলাটা জ্বালাও তো মা হেপি। তেল, মরিচ, পিঁয়াজ নাই তো কী হইছে। মানুষের বাড়ি থাকি করজ করিয়া আনিম এলায়। মুক্তিফৌজ বেটা কি মোর একলারই গর্ব? স্বাধীন দেশে সগাই এলা জয় বাংলা! মুক্তিবাহিনীকে বড় দেওয়ানির মতো মানুষও ভয় পায়, খাতির করে।'

গাঁয়ের গর্ব নিজের বুকে ধারণ করে বুকে মুক্তিফৌজের মা আছিমন আজ ঘরে মুক্তিফৌজ ছেলে ফেরার খুশির বার্তা গ্রামবাসীকে অবিরাম কথা বলে শোনাতে থাকে। ছেলের জন্য রান্না করতে বসে তার হাত-পা যতটা চলে, তার চেয়ে মুখ চলে আরো বেশি।

একত্রিশ

স্টেশনে অপেক্ষা, ট্রেন বদল এবং ভিড়ের ট্রেনে ভ্রমণ — সব মিলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পথে কাটিয়ে অবশেষে শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে মানিকের কলকাতা দেখার শখ বা শক্তি দেহে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না আর। এক জায়গায় প্ল্যাটফর্মে ঘুমন্ত কিছু লোক দেখে বাকি রাতটুকু ব্যাগে মাথা রেখে শীতে জড়োসড়ো হয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর, নিজের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আসমার সামনে দাঁড়াবার কথা ভাবতেও লজ্জা হয়। জামা-কাপড় ময়লা, মুখে জঙ্গল, পেটে খিদে। ট্রেনে টিকেট কাটেনি, পকেটে অবশিষ্ট মাত্র ইন্ডিয়ান বিশ রুপি। এই টাকা নিয়ে বড় কোনো হোটেলে ঢোকারও সাহস হয় না। এই বিশাল শহরে মশিয়ার এমেনের পরিবার এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অস্থায়ী আশ্রয় একমাত্র ভরসা। এমেনে না থাক, তার স্ত্রী-কন্যারা কিছু টাকা ধার দিলে মানিকের ঢাকা যাওয়াটা সহজ হবে। শুধু টাকা ধার চাওয়ার কারণেই মানিক ঠিকানাটি অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্টেশন পেরিয়ে মানিক রাস্তার ফুটপাত ধরে হাঁটে। ফুটপাতের পথচারী, দোকানপাট, ট্রামলাইন, রাস্তার যানবাহনসহ রাস্তার ধারের বিল্ডিংগুলো দু'চোখে গিলতে থাকে মানিক, কিন্তু তাতে পেটের খিদে কমার বদলে হু-হু করে বাড়তেই থাকে। পকেটের শেষ সম্বলটুকু খাওয়া-দাওয়ায় কমিয়ে ফেললে আসমাদের আশ্রয় অবধি হয়তো পৌঁছতেও পারবে না। মানিক ব্যাগ থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটি বের করে প্রথমে ফুটপাতের এক দোকানিকে দেখায়। লোকটা বাংলা লেখা দেখে নাক কুঁচকে আরেক বাঙালি দোকানদারকে এগিয়ে দেয়। ঠিকানা দেখে লোকটা বিস্তারিত বুঝিয়ে দেয়, কত নম্বর ট্রামে চড়ে ধর্মতলায় যেতে হবে আগে, তারপর সেখানে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে রাস্তা গলি চিনিয়ে দেবে।

ঘণ্টাদুয়েক রাস্তায় কাটিয়ে আরো চারজন লোককে জিজ্ঞেস করে মানিক একটি ঘিঞ্জি গলির নির্দিষ্ট বাড়িটি যখন খুঁজে পায়, তখন বেলা প্রায় দুপুর। দরজায় নক করলে খুলে দেয় একটি অচেনা যুবক।

'বাংলাদেশের এমেনে মশিয়ার আকন্দের ফেমিলি কি এই বাসায় থাকে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওনাকে তো কলকাতায় পাবেন না। উনি কোচবিহারে।'

'ওনার ফেমিলির সবাই আমার পরিচিত। ওরা কেউ নেই বাসায়?'

এমেনের কৌতূহলী স্ত্রী দরজায় উঁকি দেয়। সালাম দেয় মানিক, 'চাচি, আপনারা সবাই ভালো তো? আমি হরিপুরের মানিক।'

'ও মা তুমি! একি চেহারা হয়েছে তোমার! চেনাই যায় না। আসো ভেতরে আস। শেষ পর্যন্ত তুমিও ইন্ডিয়ায় এসেছ তাহলে! '

ছোট ঘরটিতে একটি মাত্র বিছানা আর দুটি চেয়ার। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে আসমার ছোট বোন অনিতা ও সুমন। মানিককে দেখে তারা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সুমন কথা বলে প্রথম, 'কী মানিক ভাই, স্বাধীন তো আমরা হয়েই গেছি। আপনাদের গ্রামটা স্বাধীন হয়নি এখনো?'

'হ্যাঁ, গোটা বাংলাদেশই স্বাধীন হয়ে গেছে সুমন।'

'কলকাতার লোকেরা কী যে খুশি, আমাদের রং দিয়েছে, মিষ্টি দিয়েছে। আমরাও খুশিতে এখন রোজ কলকাতা দেখে বেড়াচ্ছি, কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ট্রেনে দিল্লি যাব। দিল্লি আর তাজমহল দেখে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা প্লেনে স্বাধীন দেশে ফিরে যাব।'

মানিক সুমন ও অনিতার পোশক দেখে বোঝে, বাইরে যাওয়ার জন্যই হয়তো তৈরি হয়েছে ওরা। অনিতা চেঁচিয়ে বড় বোনকে ডাকে, 'আপা দেখ, মানিক ভাই এসেছে। বিউটি কেমন আছে মানিক ভাই?'

'সবাইকে ভালো রেখেই তো বাড়ি ছেড়েছিলাম। এখন কেমন আছে জানি না।'

আসমা বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য সাজছিল সম্ভবত, শাড়ি পরেছে, কাঁধে একটি ব্যাগও। ঘরে এসেই মানিককে দেখে খুশিতে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'আরে আপনি! জয় বাংলা। নানার মায়া কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন তাহলে?'

মানিক পাল্টা জয় বাংলা বলে আসমার বিজয়-আনন্দে ভাগ বসাতে পারে না। ম্লান হাসে শুধু। অচেনা যুবকটি এবার জানতে চায়, 'আপনি কি ফ্রিডমফাইটার? কোন সেক্টরে ছিলেন?'

'আমি যুদ্ধ করিনি।'

'তা কবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ বাবা? কলকাতায় কোথায় উঠেছ, নাকি বিজয়ের খুশিতে বেড়াতে এসেছ?'

আসমার মা সরল মনেই প্রশ্নটা করে হয়তো, কিন্তু শোনায় তীব্র বিদ্রূপের মতো।

'আমি কোচবিহারের এক ক্যাম্পে ছিলাম। ঢাকা হয়ে বাড়িতে ফিরব, সে জন্য কলকাতা এসেছি। আপনাদের ঠিকানাটা ওখানে জয় বাংলা অফিসে রশিদ চাচা দিয়েছিলেন, ভাবলাম দেশে ফেরার আগে একবার খোঁজটা নিয়ে যাই।'

'আন্টি, এনাদের গ্রামের বাড়িতেই বোধহয় শেল্টার নিয়েছিলেন আপনারা? হ্যাঁ, আপনার গল্প আসমার কাছে শুনেছি। তা ভাই, আপনার রাজাকার নানা কি বেঁচে আছে এখনো, নাকি খতম করে দিয়ে এসেছেন?'

মানিক জবাব দেয় না। বুঝতে পারে, অচেনা যুবকটি মানিকের তুলনায় এমেনের পরিবারের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। আসমা পরিচয় করিয়ে দেয়, 'আলম ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ নেই আপনার? স্বাধীন বাংলা বেতারে এর গান শুনেছেন। স্বাধীন বাংলা শিল্পী সমিতি আর মৈত্রী সমিতির সঙ্গে থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অনেক করেছেন আলম ভাই। কলকাতায় আমাদের থাকার ব্যবস্থাও তো আলম ভাই করে দিয়েছেন।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে আমি না, নারায়ণ বাবু সব করেছেন। বাড়ির মালিক নারায়ণ বাবুর পূর্বপুরুষরা রংপুরের বাসিন্দা, গুপ্তপাড়ায় এখনো তাদের আত্মীয়স্বজন আছে। নারায়ণ বাবু ছাড়াও কলকাতার লোকজন আমাদের জন্য অনেক করেছে।'

'ইন্ডিয়া সৈন্য না পাঠালে কী আমরা এত তাড়াতাড়ি স্বাধীন দেশে ফিরতে পারতাম। তা মানিক, তুমি কি কলকাতায় থাকবে কিছুদিন? নাকি এখনই দেশে ফিরবে?'

মানিক তার প্রকৃত অবস্থা ও আসার উদ্দেশ্যটি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না। ওদের শোনার সময় কোথায়? আলম তাড়া দেয়, 'আন্টি মার্কেটিং করতে চাইলে এখনই বের হতে হবে, ব্ল্যাকআউটের রাত। আমার আবার সন্ধ্যায় সার্কাস এভিনিউতে একটা পার্টি মানে নেমন্তন্ন আছে।'

'আপনারা যান চাচি, আমি আজই দেশে চলে যাব।'

'মা, মানিক ভাইকে অন্তত এক কাপ চা করে দাও। ওদের বাড়িতে এক মাস আমাদের কী খাতিরযত্ন করল।'

'হ্যাঁ, দেশে ফিরলে তোমার বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমাদের রংপুরের বাসায় যাবে কিন্তু।'

আলম জানতে চায়, 'আপনি দেশে মানে ঢাকায় ফিরে যাবেন, কীভাবে?'

'দেখি কীভাবে যাওয়া যায়।'

আসমা বলে, 'আপনারা পুরুষ মানুষ, তার ওপর মুক্তিযোদ্ধা, পায়ে হেঁটেও যেতে পারবেন। আসার সময় আমাদের যা কষ্ট হয়েছে। সেজন্য আব্বু বলেছে, প্লেনের টিকেট জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ইন্ডিয়াতেই থাকতে হবে।'

মানিক ভেবেছিল, এ বাসায় এসে হাসিমুখে খিদের কথা বলে আসমার মায়ের কাছে প্রথমে কিছু খেতে চাইবে। কিন্তু অনিতা চায়ের কথা বলা সত্ত্বেও রান্নাঘরে ঢুকতে মহিলার উৎসাহের অভাব দেখে মানিক উঠে দাঁড়ায়। আর এমেনে পরিবারের মার্কেটিং ও দিল্লি ভ্রমণের আয়োজন জানার পরও মানিক তাদের কাছে টাকা ধার চায় কী করে? পারলে তো তারই কিছু দেওয়া উচিত।

রাস্তায় নেমে মানিকের মনে হতে থাকে, কলকাতা শহর যেন তার মাথায় ভেঙে পড়বে। একে তো কাহিল শরীরে ক্ষুধা-তেষ্টা, তার ওপর বুকের মাঝে উথলানো এত রাগ-অপমান-অভিমানের বোঝা বইতে পারে না আর। রাস্তায় একটি খাবার হোটেল চোখে পড়তেই ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকে সে, পকেটের টাকা ও খাবারের দরদাম হিসাব করে অর্ডার দেয়। খাওয়ার পর হোটেলে বসেই পরবর্তী গন্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ভাবে মানিক। খাওয়ার বিল মিটিয়ে পকেটে যা থাকবে, তা দিয়ে বড় জোর শিয়ালদা স্টেশনে ফিরে যেতে পারবে।

ইন্ডিয়া ভ্রমণ ও কলকাতা দেখার শখ মিটে গেছে তার। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকলে বিদেশে হোক আর দেশেই হোক, স্বাধীনতার সুখ যে অর্থহীন — সেটা স্বাধীন ভারতে বসেও হাড়ে হাড়ে টের পায় মানিক, দেশে ফিরেও টের পাবে হয়তো। হাতের মেডইন সুইজারল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন ওয়াচ ঘড়িটা বেচে কিছু টাকা জোগাড় করা যায়। ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর নানাজি তাকে এ ঘড়িটা কিনে দিয়েছিল। নানাজির স্মৃতিচিহ্ন মুছে দেওয়া সহজ। কিন্তু ঘড়ি বেচা টাকায় ইন্ডিয়া বেড়ানোর সুখ আর কতটুকু মিলবে? মালতীর টাকায় মালতীকে সঙ্গে ইন্ডিয়ায় পালিয়ে থাকার প্রস্তাবটিকে পাত্তা দেয়নি মানিক, আসমাদের কলকাতা হিল্লিদিল্লি বেড়ানোর আনন্দও মনে তার ঈর্ষার অনুভূতি জাগায় না। বরং যত জলদি সম্ভব স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই নিজের গন্তব্য ও করণীয় নির্ধারণ করবে। শেয়ালদা স্টেশনে ফেরার ট্রাম ধরার জন্য সে উঠে দাঁড়ায়।

AMARBOI.COM

শেয়ালদা স্টেশন থেকে আবার বিনা টিকেটের যাত্রী হয়ে বনগাঁ, তারপর পায়ে হেঁটে বেনাপোল এবং বিনা বাধায় সীমান্ত চৌকি পেরিয়ে বিজয় দিবসের চার দিন পর, ইন্ডিয়ান সময় সকাল নয়টা সাতচল্লিশে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখে মানিক। দেহমনে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। দীর্ঘ প্রায় চার মাস ইন্ডিয়া প্রবাসের ক্লান্তি, ধকল ও নানা অভিজ্ঞতার স্মৃতিস্বাদ মুহূর্তেই উধাও হয়, শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশ ফিরে পাওয়ার আনন্দে আবার আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়ে মানিক। মুক্তিযোদ্ধা সে হতে পারেনি, স্বাধীনতার আন্দোলনে কোনো ত্যাগ স্বীকার করেনি, শেখ মুজিবের পায়ের আঙুলের মতো দেশপ্রেমিক নেতা হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাও নেই তার, তবু স্বাধীন স্বদেশ ফিরে পেয়ে হারানো মায়ের বুকে আবারো ঠাঁই পাওয়া শিশুর মতো দেহমনে অভূতপূর্ব শিহরণ, এরই নাম কি দেশপ্রেম?

দেশ ছেড়ে পালাবার সময় সঙ্গী পরেশ কাকাসহ শরণার্থী দলের কথা মনে পড়ে। পরেশের মতো কত লক্ষ মানুষ যে গত নয় মাসে হারিয়ে গেছে! বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রক্তক্ষণ-ঘটনা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একজন সামান্য সাক্ষী হিসেবে, নাকি স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুফল ভোগ করার দুর্নিবার তৃষ্ণা নিয়ে মানিক মাথা উঁচু করে একা হাঁটছে? হাঁটার মধ্যে ভয় নেই, কোনো ক্লান্তি নেই।

রাস্তা প্রায় নির্জন। যানবাহন ও পথচারী চলাচল শুরু হয়নি এখনো। মাঝেমধ্যে ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি আসছে কিংবা যাচ্ছে। বিজয়ের পরও ভারতীয় সেনার ট্রাক-ভ্যানগুলো সেনা ছাড়াও আর কী মালামাল বহন করে যাতায়াত করছে কে জানে! জিজ্ঞেস করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কেউ নেই।

ট্রাক বোঝাই একদল সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে দেশে ফিরছে। মানিকের ইচ্ছে হয়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের ট্রাক থামায়। ট্রাকে উঠতে পারলে হাঁটার কষ্ট থাকবে না। কিন্তু অচেনা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাহস নিজের ভেতরে সাড়া দেয় না তেমন। একা হাঁটতেই বরং তার ভালো লাগে। এখন আর ইন্ডিয়ায় শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ থাকার মতো অস্তিত্বের বিপন্নতা বোধ নেই। পথে কোনো বাড়িতে গিয়ে ঘুমাবে। বাড়ি পৌঁছানো নিয়েও মানিকের কোনো তাড়াহুড়া বা দুশ্চিন্তা নেই আর। গোটা বাংলাদেশকেই মনে হয় তার নিজের বাড়ি।

রাস্তার এক পাশে চোখে পড়ে জমির ওপর পরিত্যক্ত বাংকার, বালুর বস্তা। একটি দালানবাড়ি গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। চারদিকে যুদ্ধের দগদগে ক্ষত দেখে বোঝা যায়, শত্রুবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর তুমুল লড়াই হয়েছে এখানে। বাতাসে বুঝি-বা এখনো বারুদের গন্ধ। সামনে রাস্তার ওপরে একটি ছোট্ট ব্রিজ বিধ্বস্ত। পাকবাহিনীকে কোণঠাসা করার জন্য মুক্তিবাহিনী এরকম ছোট-বড় অসংখ্য ব্রিজ-কালভার্ট ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী তাদের চলাচলের জন্য ইস্পাতের পাত বসিয়ে অস্থায়ীভাবে মেরামত করে নিয়েছে সম্ভবত এ রাস্তার ব্রিজগুলো। একটা বিধ্বস্ত ব্রিজের পাশে ইন্ডিয়ান সেনাকেও দেখতে পায় মানিক।

ভাঙা ব্রিজ মেরামত হলেও ব্রিজের তলায় খাল-বিল-নদীতে, নরম মাটির তলায় শরীরে যুদ্ধের বীভৎসতা নিয়ে শুয়ে আছে এখনো অসংখ্য তরতাজা লাশ। আকাশে সবুজের পটুভূমিতে রক্তাক্ত বৃত্তের মাঝে অনেক ভবনে ও বাড়িতে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র পতপত করছে। পতাকাটিকে উড়তে দেখে মানিকের ভেতরে যে আনন্দ-শিহরণ, একি দেশপ্রেমের অনুভূতি নয়? হ্যাঁ, নিজেকে আশ্বস্ত করে মানিক, এ দেশকে সে কারো চেয়ে কম ভালোবাসে না। দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সাহসী আবেগ এখনো মিথ্যে হয়ে যায়নি। একটি সিনেমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশপ্রেমিক নায়ককে দেশের মাটি চুম্বন করতে দেখেছিল সে। মানিকও অন্য কোনো পথ না পা পেয়ে, তার দেশপ্রেমের আবেগ প্রকাশের জন্য মাটিতে বসে পড়ে। লোকজন দেখলে হয়তো ভাববে, বিশ্রাম নিচ্ছে কিংবা পেশাব করতে বসেছে। আসলে সে সত্যি সত্যি এক মুঠো মাটি হাতে নেয়। বিশুদ্ধ আবেগে অন্তরে বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত।

ঘণ্টাতিনেক একটানা হাঁটার পর, পেটের খিদের টানে পায়ের গতি ক্রমে কমে আসে। জিটি রোড ছেড়ে মানিক বাম দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে একটি গ্রাম লক্ষ করে হাঁটতে থাকে। দু'পাশের প্রায় জমিতে পাকা ধানের সোনালি চাদর বিছানো। যুদ্ধ-মড়ক কোনো বাধাই জমির সঙ্গে কিষানের সম্পর্ক ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। অনেক ক্ষেতের ধান কাটা হয়েছে। আবার কামলা-কিষানের অভাবে অনেক ক্ষেতের ধান হয়তো ক্ষেতেই ঝরে যাচ্ছে। বড় গাছপালা ঘেরা এক গেরস্তবাড়ির প্রাঙ্গণে ধানের আঁটির স্তূপ। ধান মাড়াই করছে কয়েকজন কামলা। মানিক তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জানতে চায়, এ বাড়ির মালিক কে ভাই? গামছা কাঁধে কর্মরত বয়স্ক একটি লোক এগিয়ে আসে। মানিকের ভেতরে দেশপ্রেমের জোয়ার তখনো, যেন বাঙলার সব ঘর তার নিজের বাড়ি। বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ ছাড়া সে জানায়, 'আমি বেশ ক্ষুধার্ত। আগে আমাকে কিছু খেতে দিন।'

AMARBOI.COM

গেরস্তটি সমাদর করে মানিককে বৈঠকখানায় বসায়। ভেতর থেকে পানির জগ, গেলাস এবং থালে কিছু চিড়াগুড় এনে কৈফিয়ত দেয়, 'বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ নাই। যুদ্ধের টাইমে বাড়ি ছেড়েছে, এখনো সবাই ফিরে আসে নাই। এর বেশি আপনারে সমাদর করতি পালাম না বাবা।'

মানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগে চিড়া ভিজিয়ে গুড় মাখে।

'তা আপনারে তো চিনতে পারলাম না বাবা। আপনি কি মুক্তি?'

'হ্যাঁ।'

'তা আপনার অস্ত্র কনে?'

'এখন আর অস্ত্র দিয়ে কী হবে চাচা? যুদ্ধ শেষ। আমি ইন্ডিয়া থেকে ফিরছি। ঢাকা যাবো। যশোর গিয়ে দেখি গাড়িঘোড়া কিছু পাই কি না।'

খাওয়ার পর লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মানিক আবার হাঁটতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। রাস্তার পাশে হলুদ মাইল ফলক দেখে বোঝে সে, যশোর শহরে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত রাতে শহরে পৌঁছে কোথায় আশ্রয় নেবে সে? শহরের লোকজন গাঁয়ের লোকদের মতো সরল ও অতিথিপরায়ণ নয় মোটেও।

সন্ধ্যার মুখে রাতটা কাটানোর মতো আশ্রয়ের সন্ধানে মানিক পাকা সড়ক ছেড়ে আবারো মেঠোপথ ধরে অচেনা এক গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায়। জীবনে কখনো আসেনি, তবু গাছপালা ঘেরা শান্ত সন্ধ্যায় ঢাকা বাড়িঘর দেখে মনে হয় নিজের গ্রাম। কোন বাড়িতে আগে ঢুকবে, কার সঙ্গে আগে কথা বলবে, ভাবতে ভাবতে হাঁটে সে। পথে দাঁড়ানো এক মহিলা নজর কাড়ে তার।

প্রায় বৃদ্ধ বয়সের মহিলাটি কারো ফেরার অপেক্ষাতেই যেনবা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। পেছনে সুপুরি নারকেল ঘেরা মাঝারি গোছের একটি গেরস্তবাড়ি। রাস্তাসংলগ্ন ছোট্ট খড়ের ঘর, পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা, হয়তো বা বৈঠকখানা। মহিলাটি মানিকের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রাখে। মুখোমুখি হলেও ঘোমটা টেনে সরে যায় না।

'চাচি, রাতের জন্য আপনার বাড়িতে আমাকে একটু আশ্রয় দেবেন? আমি বিদেশি, এখানে পরিচিত কেউ নেই।'

'তুমি কিডা গো মণি? বাড়ি কনে?'

'আমি মুক্তিযোদ্ধা। ইন্ডিয়া থেকে আসছি, ঢাকা যাব।'

'তুমি মুক্তিযোদ্ধা! এ বাড়িতে ক্যানে আসিছ! মুক্তিযোদ্ধা তুমি?'

মহিলার হঠাৎ আবেগ-বিহ্বল অবস্থা দেখে মানিক ভাবে, তার ছেলে কিংবা অন্য কেউ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে নিশ্চয়।

'এ গ্রামের মানুষ তোমারে কিছু কয় নাই?'

'আমি তো কাউরে চিনি না চাচি। আপনার কাছেই প্রথম এলাম। সারাদিন আমি ভাত খাইনি।'

'আসো মণি, ঘরে বসবা। তারপর তোমার কাছে বিচার দেবানে। তুমিও তো মুক্তিফৌজ। আগে এক মুঠ ভাত খাও সোনা।'

যে সহজ আন্তরিকতা নিয়ে মানিক আশ্রয় ও অন্ন ভিক্ষে করেছিল, তার চেয়েও বেশি আন্তরিকতা নিয়ে মহিলাটি তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। একমাত্র টিনের ঘরটির ভেতরে নিয়ে বিছানায় বসতে বলে। কেন যেন মানিকের গা ছমছম করে। বাড়িটি বড় নির্জন। একটি লম্ফ জ্বললেও ঘরে-বাইরে ভুতুড়ে আঁধার। ঘরের একদিকে মাচান, আরেকদিকে জোড়া বিছানা। বিছানায় শীত নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত কাঁথা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে।

মেহমানের জন্য খাবার নিয়ে আসে মহিলাটি। বদনায় পানি এনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয় হাত-মুখ ধোয়ার জন্য। গামছাও বাড়িয়ে দেয়। সারাদিন এক মুঠো চিড়া খেয়ে কাটানোর পর, হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা ভাতে বেগুন- মুলার ঝোল মেখে খাওয়ার সময় নিজের মৃত মায়ের কথা মনে পড়ে হঠাৎ। অচেনা মহিলাটি মায়ের মতো তাকে আদরযত্ন করে খাওয়াবে বলেই যেন ভাত নিয়ে অপেক্ষা করছিল, রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আইনুলের বাপের জন্যি ভাত সালুন রাঁইধে রেখেছি বাবা। মানুষটা আইজো বাড়ি ফিরল না। আর আমার আইনুল...

মেয়েলোকটি হঠাৎ গলায় সুর তুলে কাঁদতে থাকে। কান্নার বেগ সামলাতে চোখে-মুখে গায়ের চাদর চাপা দেয়। ফোঁপানো কান্নার করুণ সুর থেকে মানিক বুঝতে পারে, লোকে বলছে তার একমাত্র ছেলে আইনুলকে মুক্তিবাহিনী গুলি করে মেরেছে। আবার কারো মতে আইনুল পালিয়ে গেছে ইন্ডিয়ায়।

'কেন? কী করেছিল আপনার ছেলে?'

'রাজাকারের চাকরি নিছিল বাপ।'

এতক্ষণে গা ছমছম করার মানে বুঝতে পারে মানিক। রাজাকারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার অস্বস্তি ও ভয়টাও ভেতরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু রাজাকার হলেও আইনুলের মতো ভালো ছেলে এ গ্রামে কয়জন আছে? মানুষ মারেনি, লুট করেনি, তার ওপর পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ত। মিলিটারি দেখলে ভয়ের কারণে স্যালুট দিত। তবু বিনা দোষে আইনুলকে মুক্তিরা গুলি করে মারবে কেন?

এক স্নেহময়ী জননীর কান্নার নদী থেকে রাজাকার ছেলেকে হারানোর বেদনা যে-কথার স্রোতে উথলে ওঠে, তাতে ঘৃণা জাগার বদলে সমবেদনা প্রবল হয়ে ওঠে মানিকের। মহিলার আর দোষ কী? তাছাড়া তার ছেলে রাজাকার হলেও হয়তো খারাপ ছেলে নয়। মানুষ হিসেবে ব্যক্তিগত ভালো-মন্দ বিচার কি কেবল রাজাকার মুক্তিযোদ্ধার মাপকাঠিতে হতে পারে? আশ্রয়দাত্রীকে সান্ত্বনা দেয় মানিক, 'কাঁদবেন না চাচি। মুক্তিযুদ্ধে আমারও এক কাকা মারা গেছে। লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন বাঙালিরা সবাই মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে থাকবে স্বাধীন বাংলাদেশে।'

আইনুলের মায়ের কান্না তবু থামে না। বিলাপে যুদ্ধের নয় মাসের বাস্তবতা, বিলাপে আইনুলের রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা। মানিক বিরক্ত বোধ করে। তার ঘুম পাচ্ছে। বেশ শীতও করছে।

শোয়ার জন্য ভেতরের খড়ো চালার ফাঁকা ঘরটি দেখিয়ে দেয়

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলা। আইনুলের ঘর। চৌকিতে বিছানা পাতা, গায়ে দেওয়ার জন্য মোটা দুটি কাঁথা। জামাকাপড় পাল্টে মানিক বিছানায় শুয়ে পড়ে। কাঁথায় চিমসে গন্ধ রাজাকারটির প্রতি আবার ঘৃণা জাগায়। রাজাকারের ঘর বিছানা এখন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার দখলে। আইনুলের মা আজ রাতের জন্য দ্বিধাহীন মেনে নিয়েছে এ বাস্তবকে। মানিকই-বা অস্বস্তি বোধ বাড়তে দিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে কেন? কাল ভোরে, লোকজন দেখার আগেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে সে। কলকাতায় আসমাদের আশ্রয়ে, আসমার সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটাবার সুপ্ত বাসনা ছিল বুঝি অন্তরে। অথচ আজ সে শুয়ে আছে কোথায়!

মধ্যরাতে বাড়িতে ডাকাত পড়ার আতঙ্ক নিয়ে ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। বাইরে কিছু পুরুষ ও নারী কণ্ঠের চেঁচামেচি। পুরুষ কণ্ঠ ছাপিয়ে আইনুলের মায়ের পরিচিত কণ্ঠ কানে আসে, 'তোমরা আমার আইনুলরে মেরে ফেলায় দিয়ে আবার তারে খুঁজতি আইছো! আল্লাহ এর বিচার করবে।'

'চোপ মাগি। তোর ছেলে-স্বামীরে না পালি বাড়িতে আগুন দেব কলাম। ঠিক কইরে কও তারা কনে আছে? এই ঘর সার্চ কর। বাক্স টাক্স ভাইঙা দেখ লুটের মাল কিছু পাস নাকি?'

লাথির আঘাতে দরজা ভেঙে পড়ার আগেই দরজা খুলে দেয় মানিক। বুক কাঁপছে। টর্চের আলো মুখে পড়তেই পিছিয়ে গিয়ে জানতে চায়, 'আপনারা কে ভাই?'

ভৌতিক ছায়ার মতো ঘরে ঢোকে কয়েকজন অচেনা যুবক। টর্চের তীব্র আলো ভয়ে কম্পমান মানিকের দিকে জ্বেলে রেখে একজন চেঁচিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, 'রাজাকারের ঘরে এ বেটা কে গো?'

'এই শালাও নিশ্চয় রাজাকার। এরে ধইরে ক্যাম্পে নিয়া চল। আইনুল আর তার বাপের খবর এর কাছেই আমরা পাবা নে।'

মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র যুবকদের কাছে জোর গলায় মানিক নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করতে পারে না। প্রমাণ চাইলে কী বলবে? দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করে, 'দেখুন ভাই, আমি রাজাকার নই।'

'রাজাকার না আলবদর তোর পেটের খবর পেট ফাইড়ে বাইর করবা নে শালা। চল আগে ক্যাম্পে চল।'

রাইফেলধারী দুজন তাকে গলাধাক্কা দেয়।

'ঠিক আছে চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন। আমার ব্যাগটা নিতে দেন।'

ব্যাগটা প্রথমে ওরা পরীক্ষা করে। ভেতরে কোনো অস্ত্র, লুটের মাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা নগদ টাকা না পেয়ে মানিকের হাতে ছুড়ে দেয়। পুনঃ গলাধাক্কা খাওয়ার আগে মানিক তাদের নির্দেশ মতো হাঁটতে থাকে। একবার মনে হয়, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। তাকে ঘিরে কিছু অচেনা সশস্ত্র যুবক। কুয়াশা ও জ্যোৎস্নায় মাখামাখি নিস্তব্ধ রাত। সামনে মৃত্যু নাকি মুক্তি? জানে না সে। যেন একটি দুঃস্বপ্ন দেখছে, নাকি সত্যি সত্যি ঘুমের ঘোরে হাঁটছে মানিক?

বাজারের মতো একটি স্থানে এসে লোকজনের হই চই শুনতে পায় সে। একটি চায়ের দোকানে হ্যাজাকের আলো। ঘরের ভেতর লোকজনের ভিড়, যুবকের সংখ্যাই বেশি। আনন্দোৎসব করার মতো রাত জেগে সবাই গল্প করছে। যুদ্ধ জয়ের গল্প। চা খাচ্ছে, বিড়ি টানছে কেউবা। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দুটি লোক। বন্দিদের একজন যুবক। অপরজনের দাড়ি, টুপি ও গায়ের শাল দেখে মনে হয়, মাতব্বর শ্রেণির কেউ। মানিককে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ঢুকতেই সকলের দৃষ্টি তার দিকে।

'রাজাকাররে ধরতে গিয়ে এ তোমরা কারে ধইরে আনলে গো?'

'রাজাকার আইনুলের বাড়িতে পলায়ে আছিল। এই সুমুন্দীর ছাওয়াল মনে হয় রাজাকারদের কমান্ডার।'

'হ্যাঁ কও কী! কোন ক্যাম্পে আছিল?'

'অপারেশন শুরু হলি হারামজাদার প্যাট ফাইড়ে সব কথাই বাইর করবা নে। আসুক, সকাল আটটার মইধ্যে আমাদের কমান্ডার ফিইরা আসবে। ততক্ষণ এইডারেও হাত-পা বাঁইধা রাখ।'

অপর বন্দি দু'জনের সঙ্গে মানিকেরও হাত-পা বেঁধে তাকে বন্দি করা হয়। মানিক বুঝতে পারে, রণাঙ্গন ছেড়ে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরেও তাদের দেশপ্রেম ও বীরত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শত্রুবাহিনীর স্থানীয় সমর্থক দালালদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাত জেগে বাজারে বিজয়-উৎসব করছে। এদের মাঝে মানিক একা ও ভীতসন্ত্রস্ত। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানার সঙ্গে সম্পর্ক গোপন রাখতে পারবে, কিন্তু ইন্ডিয়া গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হতে না পারার গ্লানি, রাজাকারের ঘরে আশ্রয় গ্রহণের দুর্ভাগ্য এবং রাজাকার-জননীর সাথে স্নেহ-মমতার সম্পর্ক অস্বীকার করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ভাষা খুঁজে পায় না সে। বুক ধকধক করে কেবল। অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শত্রুবাহিনীর সকল জেরার মুখে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াদ চেঁচিয়ে জয় বাংলা বলেছিল। মানিকও কি সেরকম গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠবে? কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কী সব গোপন শলাপরামর্শ করার পর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় অন্য কোনো অপারেশনে চলে যায়। মানিকসহ অন্য বন্দি দু'জনের পাহারায় থাকে স্থানীয় নিরস্ত্র লোকজন, বালক থেকে শুরু করে পাকা চুল-দাড়ির এক বৃদ্ধও আছে এদের মধ্যে।

অবশিষ্ট রাতটুকু দ্রুত ফুরিয়ে যায়। সকালের আলো ফোটার পরপরই ফিরে আসে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার দল। তাদের সঙ্গে কমান্ডার এবং অস্ত্রবিহীন আরো জনাতিনেক লোক। একজনের হাতে একটি সাইকেল। সাইকেলওয়ালা লোকটি বন্দিদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে, 'এ তোমরা কী করিছো! মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আরেক মুক্তিযোদ্ধারে রাজাকার সন্দেহ কইরে বাঁইধে রেখেছ? ঠিক করোনি বাপু। আসল রাজাকাররে ধরতে পারলা না, আর এ ছেলে রাজাকারের সাথে ছিল বলে এরেও ধইরে আনলে।'

সাইকেলওয়ালা লোকটার পরনে লুঙ্গি, গায়ে সোয়েটার, কালো চাদর, তদুপরি মাথায় মাফলার পেঁচিয়ে বাঁধা। কালো একহারা চেহারা, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও লোকটাকে চিনতে পারে না মানিক, কিন্তু এ লোকটা মানিককে যেন ভালো করেই চেনে। অচেনা মানুষটির এইটুকু সমর্থন-সহানুভূতি পেয়েই মানিকের ভেতরে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যায়, চেঁচিয়ে বক্তৃতা শুরু করে, 'মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, আপনাদের মতো ঘাড়ে অস্ত্র নেই, সঙ্গে সার্টিফিকেট নেই, এ দেশের জন্য আমার ভালোবাসা কি আপনাদের চেয়ে কম? আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করুন, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু বলবে জয় বাংলা, আমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে শুনুন স্বাধীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা। রাজাকার বলে আপনারা আমাকে অপমান করেছেন, দুঃখে-লজ্জায় বোবা হয়ে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু জানেন আমার প্রকৃত পরিচয়?'

মানিক যে খালি গলায় এরকম চেঁচিয়ে বক্তৃতা দেবে, মুহূর্ত আগে নিজেও ভাবতে পারেনি সে। মুক্তিযোদ্ধাসহ গোটা ভিড় স্তব্ধ হয়ে থাকে। মানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা থেকে শুরু করে, আওয়ামী লীগ করা পিতার পরিচয়, ইন্ডিয়া পালানো, কাকাকে হারানো, বাড়ির চাকরের মুক্তিযোদ্ধা হওয়া, এমেনে মশিয়ার আকন্দের পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া, ইন্ডিয়ায় কোচবিহারে তার সঙ্গে স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করা, ট্রেনিং নেওয়ার জন্য টাপুরহাট ক্যাম্পে ভর্তি হওয়া এবং কলকাতায় এমেনে পরিবারের খোঁজ নিয়ে স্বাধীন দেশমাতার মাটির টানে পায়ে হেঁটে এত দূর অবধি আসার কাহিনি বিরামহীন বলে যায়। বলার আবেগে সত্য কিছুটা অতিরঞ্জিত হয় বটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু নিজেকে মোটেও মিথ্যুক মনে হয় না তার।

মানিকের বক্তৃতার সত্যতা যাচাই করতে আইনুলের বাড়িতে তার আশ্রয় গ্রহণের কারণ জানতে চায় একজন। মানিক অনুতপ্ত কণ্ঠে সত্যি কথা বলে আবার। সাইকেলওয়ালা লোকটি বলে এবার, 'তাহলে একলা আমার চেনা এক দেশি মুক্তিযোদ্ধারে ধরে আনো নাই তোমরা, এই বিদেশি ছেলেটারেও সন্দেহ করে ধরে এনেছ। ছি, কী কাণ্ড! যশোরের আওয়ামী লীগ নেতারা তোমাদের কীর্তিকলাপ শুনলে কবে কী কও তো। যারে তারে শত্রু মনে কইরে বীরত্ব দেখানো কি মুক্তিবাহিনীর কাম?'

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারটি সাইকেলওয়ালার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'সরি মাস্টারদা, আপনার কথায় আমরা দুজনকেই ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আবার তরিকুল ভাইরে কিছু বলবেন না।'

মানিক এতক্ষণে বুঝতে পারে, সাইকেলওয়ালা লোকটি আসলে তার হয়ে নয়, অন্য বন্দি যুবকটির পক্ষে ওকালতি করতে এসেছিল। তবে কমান্ডার যুবকটি এসে মানিকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'সরি ভাই, ভুল হয়ে গেছে। আমি ছিলাম না, ওরা এলাকার রাজাকারদের খুঁজতে গিয়ে আপনারে ধরে এনে কষ্ট দিয়েছে। এই, এদের দু'জনকে ছেড়ে দাও।'

মানিক ও অন্য যুবকটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। একজন হতাশ কণ্ঠে জানতে চায়, 'তাহলি এই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানরে কী করব ওস্তাদ? এরেও ছাইড়া দেব?'

'না, তার বিচার হবে। কী বলেন ভাই, রাজাকার-আলবদরদের কি ক্ষমা করা উচিত?'

নিজের নানার কথা স্মরণ করে মানিক আগের মতো চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'কক্ষনো নয়। রাজাকার যদি আমার আপন রক্তসম্পর্কের কেউ হয়, তবু তাকে ক্ষমা করতে বলব না আমি।'

অতঃপর মানিককে আপ্যায়ন করতে নিজের বাসায় নেওয়ার প্রস্তাব দেয় কমান্ডার যুবকটি। কিন্তু মানিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে। যশোর শহরে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফেরার উপায় খোঁজার কথা বলে সে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে থাকে।

কুয়াশাভেজা মেঠো রাস্তা পেরিয়ে মানিক যখন আবার পাকা সড়কে ওঠে, সাইকেলওয়ালা লোকটি পেছনে এসে থামে আবার। পরিচিতজনের মতো আন্তরিক কণ্ঠে আহ্বান জানায়, 'ও ভাই ছাত্রনেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধা, তুমি তো যশোর হয়েই ঢাকা যাবা। ঢাকা যাওয়ার বাস-ট্রেন তো মনে হয় পাবা না, চালু হয় নাই এখনো। ওঠো আমার সাইকেলে, দেখি তোমারে কোন পথে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়।'

চেনা নেই জানা নেই, তবু দ্বিধাহীন লোকটার সাইকেলে উঠে বসে মানিক। যেভাবেই হোক, তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছতে চায় সে।

বত্রিশ

মাষ্টারদা লোকটা আসলে কে, কোথায় তাকে পৌঁছে দেবে, কিছুই জানতে চায় না মানিক। রাজাকার হিসেবে বন্দি হওয়ার লজ্জায়, নাকি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার আবেগময় সাহসে সকল ভয় কেটে গেছে তার? লোকটার পরিচয় নিয়েও সে মাথা ঘামায় না। লোকটাই বরং সাইকেল চালাতে চালাতে কৌতূহল দেখায়, মানিকের টুকটাক খবর জানতে থাকে।

'ঢাকা যাওয়ার গাড়িঘোড়া যদি এখন না পাও, তাহলে কী করবে?'

'গাড়িঘোড়া না পেলে পায়ে হেঁটেই রওনা দেব।'

'ঢাকা তাড়াতাড়ি পৌঁছাটা এত জরুরি কেন?'

'মোটেও জরুরি নয়। কলকাতা থেকে কপর্দকহীন, তবু স্বাধীন দেশে ফেরাটা জরুরি ছিল। এখন ইচ্ছে কী জানেন, ভোরের হাওয়া খাওয়ার মতো স্বাধীনতার যাত্রালগ্নে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পুরো দেশটা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াব।'

'বাহ! কবিতাও লেখো নাকি হে দেশপ্রেমিক?'

'হ্যাঁ লিখি। একটি কবিতা ছাত্র ইউনিয়নের একুশের সংকলনে ছাপাও হয়েছে।'

'স্বাধীনতার স্বাদ, দুধ না ঘোল কী বললে যেন! যাই হোক, স্বাধীনতার মধু কি বিষ খেতে স্বাধীন দেশ পদব্রজে ঘুরতে চাও, ভালো কথা, তা দেশ কি স্বাধীন হয়েছে মণি?'

'কী বলতে চান আপনি?'

'আমি বলতে চাই ষোলোই ডিসেম্বর পাকবাহিনী ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে সারেন্ডার করল, তোমরা মুক্তিবাহিনীরা জয় বাংলা বইলা গলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাটায় স্বাধীনতার স্বাদ নিতেছ। ওদিকে বর্ডার থেকে আসার সময় নিশ্চয় লক্ষ করছ, আমাদের ক্যান্টনমেন্ট থেকে ইন্ডিয়ান আর্মি কাভার্ড ট্রাক-ভ্যান নিয়ে নিজের দেশে চলে যাচ্ছে। এইসব গাড়িতে কী মাল নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়া তোমাদের মাথাব্যথা নাই, চ্যালেঞ্জ করার সাহস নাই। সেই জন্যে তোমার কাছে জানতে চাইছিলাম, দেশ কি আসলে স্বাধীন হয়েছে?'

মানিকের সন্দেহ হয় এ লোকটাও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজাকার কিংবা নকশাল বোধহয়। মানিকের বেপরোয়া ভাষণ শুনেও তার আত্মপরিচয় বিশ্বাস করেনি, তাই এত জেরা করছে। এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে না পেতেই আবারো বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে। তবু ভয় নয়, বরং নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের সুখ পেতে চায় সে।

'কী হলো মণি, আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না যে!'

'মণি না, আমার নাম মানিক। আপনি বোধহয় আমার পরিচয় বিশ্বাস করেন নাই?'

'মনে হতিছে, তোমার আত্মপরিচয়ে কিছু ঘাপলা মানে সংকট আছে। মাঝে মাঝে চাপার জোর দেখাও, আবার চুপ করে থাকো।'

'আপনার আত্মপরিচয়ে সংকট নাই? কে আপনি?'

লোকটা হাসে। সাইকেল চালানোর ক্লান্তি ছাপিয়ে কথা বলে জোর গলায়, 'জীবনে সমস্যা-সংকট মেলাই, তবে আত্মপরিচয়ে নাই। সমাজে পরিচিত সবাই আমারে মাস্টারদা হিসেবেই জানে। আমি আসলে একজন নগণ্য মানুষ।'

'আমিও নগণ্য, তবে সম্ভাবনাময় মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, স্বাধীন দেশে জাতি ভাই হয়েও আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, সন্দেহ করছি। এটা কেন হচ্ছে বলেন তো?'

'তুমিই বলো শুনি।'

'আমার আসলে দেশ নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছে হচ্ছে না এখন, কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। কারণ আমি ক্ষুধার্ত, রাতে ভালো ঘুমও হয়নি।'

'ঠিক আছে, বাজারে গিয়ে আগে তোমার ক্ষুধা ও ঘুম সমস্যার সমাধান করা যায় কি না দেখি।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ সাইকেল চালায় লোকটি। আর মানিকও চুপচাপ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রকৃতি ও মানুষ দেখে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যশোর টাউনে প্রবেশ করে তারা। মানিকের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা শহরের কোন অংশ পেরিয়ে কোথায় নিয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা বুঝতে পারে না সে। একটা বড় মার্কেটের ভেতরে কাঁচাবাজারের কাছে এসে থামে। বাজার বলেই হয়তো জায়গায় লোকজনের আনাগোনা ও ভিড় বেশ। মাস্টারদা যে বাজার এলাকাতেও বেশ পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি, তা বিভিন্ন দোকানি ও লোকজনের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনে সহজে বুঝতে পারে মানিক। লোকজন তাকে মাস্টারদা হিসেবে সম্বোধন করে, মামুলি সমস্যা নিয়েও কথা বলে। একটা দোকানের সামনে সাইকেল রেখে মানিককে নিয়ে সে একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকে। রেস্টুরেন্টের মালিক বা ম্যানেজার থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারাদের কাছেও মাস্টারদা ঘনিষ্ঠ মানুষ।

'আমার মেহমান, মুক্তিযোদ্ধা। ভালো নাশতা খাওয়াও দেখি।'

মানিক আবার মনে করিয়ে দেয় যে, তার পকেট শূন্য। মাস্টারদা জানায়, তার অবস্থাও অভিন্ন। তবে কোনো সমস্যা হবে না। নিজে খাবে না সে। কারণ সকালে নিজের হাতে বানানো চারটি রুটি খেলে দুপুর পর্যন্ত আর কিছু খেতে পারে না। তবে দুধছাড়া চায়ের অর্ডার দেয়। আর মানিক বুটের ডাল দিয়ে তিনটি পরোটা খেয়ে বেশ তৃপ্ত বোধ করে। চা খাওয়ার সময় মাস্টারদা জানতে চায়, পান-সিগারেটের অভ্যাস আছে কি না।

'অভ্যাস নেই, তবে এখন একটা ভালো সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে।'

সিগারেটের নেশা যেমন-তেমন, রহস্যময় লোকটাকে নানাভাবে পরখ করার ইচ্ছেও জাগছে মানিকের। মাস্টারদা বয়টিকে বলতেই সে ম্যানেজারের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে একটি ইন্ডিয়ান উইলস সিগারেট এনে দেয়।

মানিকের ইচ্ছে পূরণের তৃপ্তি দেখে মাস্টারদা বলে, 'আর কী ইচ্ছে হচ্ছে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারো মানিক।'

'দু'তিনদিন ভালো ঘুম হয়নি। গরম পানি দিয়ে গোসল করে লেপের তলায় ঢুকে লম্বা ঘুম দিতে ইচ্ছে করছে।'

মাস্টারদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে।

'যশোরে থাকার মতো আবাসিক হোটেল আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার এমন জানাশোনা নয় যে, বিনে পয়সায় থাকতে দেবে। তাছাড়া তোমার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়েও ভেজাল, প্রমাণ করা কঠিন। এদিকে টাউনে আমার পরিবার নেই, থাকার নিজের জায়গাও নেই। তারপরেও তোমার ইচ্ছে পূরণ হতে পারে একটি শর্তে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী শর্তে?'

'এখন তোমাকে যেখানে নিয়ে যাব, আমার শালা পরিচয়ে যেতে হবে। সে বাসায় কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে ইন্ডিয়া থেকে এসেছ। সমাজে থাকতে হলে একটা সামাজিক পরিচয় থাকা জরুরি, ঠিক কি না?'

'ঠিক আছে, আমি আপনাকে দুলাভাই ডাকব। ভুল যাতে না হয়, সে জন্য আপনার পারিবারিক সামাজিক পরিচয় আমার আরো ভালোভাবে জানা দরকার।'

মাস্টারদা হাসে, বলে, 'উত্তরবঙ্গের লোক একটু সরল বোকা হয় জানি। কিন্তু তুমি ইন্টেলিজেন্ট আছো। কায়দা করে আমাকেও জানতে চাইছ তো। একটা লোক যা বলে, যা চিন্তা করে এবং যে কাজ করে — তার মধ্যেই তার পরিচয় অবশ্যই পাবে। তিনে মিলেই তার চরিত্র। শুধু কথা অনেক সময় প্রতারণা করে। আমার সঙ্গে গেলে আশা করি আমার পরিচয় জানতে পারবে এবং তোমাকেও আমি জানতে পারব। আর যদি স্বাধীনতার স্বাদ পেতে এখনই একা একা রাস্তা হাঁটা শুরু করতে চাও, তাহলে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি।'

'আমার আসলে ঘুমানো দরকার মাস্টারদা।'

'চলো তবে উঠি।

রেস্টুরেন্টে বিল না দিয়ে, বাজারের আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মাস্টারদা মানিককে নিয়ে আবার সাইকেলে উঠে বসে। মিনিট কয়েকের মধ্যে শহরের একটি আবাসিক এলাকার দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামে তারা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে দেখা হয় একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে। নিচতলার দরজা খুলে বেরিয়ে এসে কথা বলে সে, 'স্লামোআলায়কুম মাস্টার কাকা। আমরা তো গ্রাম থেকে আজ এসে পড়লাম। বাড়িঅলা কবে আসবে?'

'দেরি হবে মনে হয়। ইন্ডিয়ান আর্মি যতদিন আছে, ওরা ততদিন থাকবে ইন্ডিয়ায়।'

'আর কাকিরা টাউনে আসবে না?'

'ওদেরও মাসখানেক আরো দেরি হবে। এই যে তোমার কাকির খবর নিয়ে আমার এক শালা এসেছে ইন্ডিয়া থেকে। তোমার বাবাকে বলো, রাতে আসবা নে আমি।'

মানিককে নিয়ে দোতলায় উঠে বন্ধ দরজার তালা খোলে মাস্টারদা। লাইট জ্বেলে ও বন্ধ জানালা খুলে দিয়ে মানিককে বাসা দেখায়। বসার ঘর দেখেই বোঝা যায় বিত্তবান রুচিশীল মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসা। তিনটি বেডরুমে সাজানো বিছানা ও লেপ-কম্বল। বড় রান্নাঘরের পাশে খাবার টেবিল। লনের গাছপালা দেখার জন্য বারান্দায় পাতা একটি ইজিচেয়ার। রুমের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন বাথরুম। রান্নাঘরে লাকড়ির চুলা রয়েছে, কেরোসিনের স্টোভও। স্টোভ জ্বেলে মাস্টারদা একটা পাতিলে গরম পানি বসায়। বসার ঘরে বেমানান একটি বাঁশের বুকশেলফ দেখিয়ে বলে, 'এই বাড়ির মধ্যে আমার নিজস্ব সম্পদ এই বইগুলো। বাড়ির মালিক পরিচিত, আমাকে বিশ্বাস করে বাসা পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। নিচতলার ভাড়াটিয়ারাও পরিচিত, আমি ভাড়া ঠিক করে দিয়েছি। ইচ্ছে করলে আমি ওদের সঙ্গে খেতে পারি। তা না করে স্টোভে দু'বেলা রুটি আর এক বেলা ভর্তা-ভাত বা খিচুড়ি রেঁধে খাই। দুপুরে তুমি আমার সঙ্গে ভর্তা-ভাত খেতে পারো। আর যদি মাছ-গোশত কিংবা পোলাও খাওয়ার ইচ্ছে হয়, বাজারের হোটেলে যেতে হবে।'

মানিক ভর্তা-ভাতের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে স্নান করে। তারপর মাস্টারদার কথামতো বড় বেডরুমটির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। নির্জন বাড়ির নিরাপদ বদ্ধ কামরায় এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন সে। ইচ্ছে করলে লুঙ্গি-জামা খুলে দিগম্বর হয়ে ঘুমাতে পারে। গরমের দিন হলে হয়তো তাই করত। কিন্তু শীত বোধ করছে। লেপটা গায়ের ওপর ছড়িয়ে দেয়। লেপের মিষ্টি গন্ধটা যেন কীরকম, কোনো মেয়ের শরীরের সুগন্ধি উম মিশে আছে কি না কে জানে। বাড়ি ছাড়ার পর, এমনকি নিজের গ্রামের বাড়িতে এমন আরামদায়ক বিছানায় ঘুমায়নি মানিক। বালিশগুলো বেশ নরম বলে দুটি বালিশ মাথার নিচে গুঁজে দেয়। বিছানায় একটি কোলবালিশও রয়েছে। কোলবালিশটায় পা তুলে দিয়ে নিচতলায় দেখা মেয়েটির কথাও মনে পড়ে হঠাৎ। বাস্তবে এক পলক দেখেছে বলে কল্পনায় নানাভাবে হাজির হতে থাকে ঘুমে বেহুঁশ হওয়া পর্যন্ত।

মানিকের ঘুম ভাঙে দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে। সিটকিনি খুলে দিয়ে দেখে, মাস্টারদা দাঁড়িয়ে। নিজেও স্নান করে নিয়েছে।

'তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। অবশ্য ঘুমিয়েছ প্রায় চার ঘণ্টা। এদিকে আমার রান্না শেষ। একটু খেয়ে নাও, তারপর ইচ্ছে করলে আবার ঘুমাতে পার।'

'অনেক ঘুমিয়েছি। আপনার কোনো অসুবিধা করে থাকলে মাফ করবেন।'

ডাইনিং টেবিলে নয়, প্রশস্ত রান্নাঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে বসে ওরা। শুধু ভর্তা-ভাতের কথা বলেছিল। তাই মাছের ঝোলে বড় মাছের টুকরা দেখে অবাক হয়। সন্দেহ হয়, নিচতলায় দেখা ওই মেয়েটি বোধহয় পাঠিয়েছে। কিন্তু না, মানিক ঘুমিয়ে যাওয়ার পর বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে আবার বাজারে গিয়েছিল মাস্টারদা। শালা এসেছে শুনে পরিচিত মাঝি মাছ নিজেই কেটেকুটে দিয়েছে। অনেকদিন পর আজ মাছের ঝোল রেঁধেছে সে। এখন মানিক খেতে পারলে হয়।

খাওয়ার পর্ব শেষে মানিককে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে মাস্টারদা। লোকটার নিজস্ব সম্পদ বাঁশের শেলফে সাজানো বইগুলো দেখে মানিক। বেশিরভাগই মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কিত বই। হোমিও চিকিৎসা ও শাকসবজি চাষ সম্পর্কিত বইও আছে।

'রাস্তা থেকে আপনার এই আশ্রয়ে আসাটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে মাস্টারদা। এই আরামের ঘুম, খাওয়া, বিশ্রাম — মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন তো জীবনের অংশ। দেশ হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে আমিও নতুন করে স্বপ্ন দেখছি মানিক, মনে হয় আমি স্বপ্নের জগতেই বাস করছি।'

'আপনার স্বপ্নের কথা কী শুনব, তার আগে আপনার বাস্তব পরিচয় তো জানা হলো না মাস্টারদা।'

'আমার ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের একটি গ্রামে বাড়ি আর অল্প কিছু জায়গাজমি আছে। একসময় স্কুলে মাস্টারি করতাম, এখন সমাজের নানা স্তরের নানা পেশার মানুষকে ভালো কিছু শেখানোর চেষ্টা করি, তাদের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করি। সবাই আমাকে মাস্টারদা বলে।'

'আপনি নিশ্চয় বাম কোনো পলিটিক্যাল দলে আছেন, কোন দলে?'

'একসময় ছিলাম, এখন কোনো দলে নেই। এখন স্বাধীনভাবে নিজেই কিছু সমিতি সংগঠনের চেষ্টা করছি। তবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রায় সব দলের বহু নেতাকর্মীর সাথেই জানাশোনা আছে। দেশের ভেতরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছে, তাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেরকম এক মুক্তিযোদ্ধাকে ছাড়ায় আনতে গিয়েই তো তোমাকেও বোনাস পেয়ে গেলাম।'

'আমি তো ঠিক ওদের মতো মুক্তিযোদ্ধা না মাস্টারদা, অস্ত্র নিয়ে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ করিনি।'

'কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে তো তোমারে আরো বড় মুক্তিযোদ্ধা মনে হয়েছে। নিজেরে শেখ মুজিবের সৈনিক না দেশপ্রেমিক দাবি করলে, আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ পায়ে হেঁটে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে চাও, তোমার সত্য পরিচয়টা কী কও তো?'

'কোনটা যে সত্য আসল পরিচয়, আমি নিজেও মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত বোধ করি। তবে সত্যকে জানার জন্য চেষ্টা করছি, এটাও আমার একটা পরিচয়।'

'সমাজের জন্য ভালো খারাপ যাই করো, একটা সামাজিক পরিচয় তো আছে, সেই পরিচয়টাই ঠিকমতো দাও আগে।'

'তখন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক পরিচয় যা দিয়েছি, সব সত্যি কথা। তবে কিছু সত্য গোপনও করেছি। আমার আপন নানা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মুক্তিযুদ্ধের আগে তার প্রভাব আমার ওপরে খুব ছিল। বেশ ধার্মিকও ছিলাম। তারপর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ধর্ম অর্থাৎ মুসলমানি পরিচয় বাদ দিয়ে পুরোপুরি বাঙালি হতে চাইলাম। নিজেকে দেশপ্রেমিক প্রমাণের জন্য ইন্ডিয়ায় গিয়ে এক সুন্দরী বিধবার প্রেমিক সেজে তার শরীর ভোগ করেছি। আবার গাঁয়ের গরিব মানুষদের জন্য খুব দরদ বোধ করে পিতাকেও অনেক সময় শত্রু ভাবি, দেশের ও মানুষের স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাই, স্বাধীন বাংলাদেশকে ভালোবেসে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে চাই — এসব আবেগও আছে। কাজেই আমি কতটা ত্যাগী দেশপ্রেমিক আর কতখানি আত্মপ্রেমিক, কতটা বাম আর কতটা ফিউডাল, কতটা মুসলমান আর কতটা বাঙালি কে বলবে? আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন মাস্টারদা, আমার আত্মপরিচয়ে সংকট মানে ঘাপলা আছে।'

'নিজের সম্পর্কে যে এরকম ভাবতে পারে, তার সংকট অবশ্যই কেটে যাবে মানিক। মনে হতিছে, আমি রাস্তায় আজ খাঁটি সোনামানিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গেই থেকে যাও মানিক ভাই, থাকবে?'

মাস্টারদা হঠাৎ এতটাই স্নেহপ্রবণ হয়ে ওঠে যে, আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মানিকের মাথায় পিঠে হাত বুলায়।

'আপনার সঙ্গে থেকে আমি কী করব?'

'আপাতত কিছুদিন এ বাড়িতেই থেকে স্বাধীনতা ভোগ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাশ্রয়ে নিজস্ব সম্পদ বলতে আমার কিছু বই আছে, তা পড়তে পারো। অবশ্য খাওয়াদাওয়ার বড়লোকি এখানে চলবে না, আমি যা খাই তাই খেতে হবে। স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য নেশা বা অবৈধ ভোগসম্ভোগও এ বাড়িতে করতে পারবে না। তবে চা-সিগারেট খেতে চাইলে তোমাকে তার জোগান দিতে পারব আমি।'

'এর চেয়ে বেশি স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সাধ কিংবা সাধ্য আমারও নেই মাস্টারদা। তবে এই নির্জন বাড়িতে অলস শুয়েবসে থাকলে লেপের নিচে ঢুকেও একা লাগবে যে!'

'একা তো আমিও।'

'নিজের সম্পর্কে যখন অনেক সত্য কথা বললাম, আর একটা সত্য কথাও বলি। এরকম পরিবেশে আমার নারীসঙ্গীর কামনাও খুব বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে এই কামতৃষ্ণা এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে, মনে হয় দেশপ্রেম, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সবই তুচ্ছ, আমাকে চালাচ্ছে আসলে এই তৃষ্ণাটাই। কতবার যে তওবা করেছি, তারপরও কল্পনায় যারতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে হস্তমৈথুনের অভ্যাসটাও ছাড়তে পারিনি।'

মানিক রহস্যময় লোকটির সঙ্গে বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করতে কিংবা তাকে পরখ করতেও হতে পারে, নিজের নেতিবাচক দিকগুলো বলে যত সাহস দেখায়, ততই যেন মানিকের প্রতি তার দুর্বলতা বাড়ে।

মাস্টারদা হেসে বলে, 'বুঝেছি তুমি বেশি বেশি ফ্রয়েড পড়েছ। কিন্তু চেতন-অবচেতনের কাম ছাড়াও তোমাকে নিয়ন্ত্রণের আরো সামাজিক শক্তি আছে হে, সেই ব্যাখ্যাটাও ভালো করে জানতে হবে।'

'সত্যি বলছি মাস্টারদা, মাঝে মাঝে মনে হয় এই কামতৃষ্ণা পূরণ না হলে আমি কোনো ভালো কাজেই মন দিতে পারি না।'

'যৌবনের ধর্ম অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। তবে তোমার এই সমস্যার সমাধান আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার এক শ্যালিকা আছে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে শিগগিরই আসবে সে। বাড়ির মালিকের যদি আসতে দেরি হয়, তবে আমার শ্যালিকার সঙ্গে তুমি এ বাসাতেও শুতে পারবে।'

'আপনার শালি বেশ্যা নাকি? মানে বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকা সম্ভব?'

মানিক মুখ ফস্কে শ্যালিকাকে বেশ্যা বলায় মাস্টারদার খারাপ লাগে নিশ্চয়, কিন্তু জবাব দেয় দৃঢ়তার সঙ্গে।

'বিয়ে না করেও যদি আমার শ্যালিকা তোমার সঙ্গে শুতে রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, তবে আমি আপত্তি করব না। অবশ্য সন্তান নিতে পারবে না। আর যদি শোয়ার আগে সে বিয়ের শর্ত দেয়, তাতেও আমি অবাক হব না। কারণ মেয়েরা আসলে তো মায়ের জাত। সব মেয়েই পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা চায়, আর পরিবারের জন্য নিয়ন্ত্রিত যৌনতাই দরকার, ঠিক কি না বলো।'

'আপনার শ্যালিকার সঙ্গে আমি যদি পরিবার গড়ি, তাহলে সেই পরিবারিক জীবন নির্বাহের জন্য আমার অর্থনৈতিক মুক্তি কীভাবে আসবে?'

মাস্টারদা হাতে তালি দিয়ে খুশি বা উত্তেজনা প্রকাশ করে।

'এই তো এতক্ষণে মূল প্রশ্নে এসেছ। তুমি যদি স্বাধীনতার সম্পূর্ণ রূপ দেখতে চাও, তাহলে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে সঠিক জবাব তোমাকে জানতেই হবে। আবার দেশ ও মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে কাজ করতে চাইলেও বেঁচে থাকার জন্য তোমার মৌলিক চাহিদা থাকা-খাওয়া-স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি সমস্যারও সমাধান করতে হবে। আমি আমার জীবনে এ সমস্যা একভাবে সমাধান করেছি, স্বাধীন দেশে নতুন করে পথচলার স্বপ্ন দেখছি। আমার স্বপ্ন ও পথ যদি তোমার পছন্দ হয়, তাহলে আমার শ্যালিকাকে নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে থাকতে পার। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আর পছন্দ না হলে তুমি স্বাধীনভাবে তোমার পথ বেছে নেবে, আমি আপত্তি করব না।'

'তাহলে তো আপনার পথটা আমায় ভালো করে চিনতে হবে, বুঝতে হবে।'

'অবশ্যই। এখন চলো আমার সঙ্গে, আমাদের শহরটা ঘোরা হবে, কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপও হবে।'

মেইন দরজায় তালা দিয়ে মাস্টারদা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বন্ধুর মতো মানিকের ঘাড়ে হাত রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'মনে হচ্ছে কি জানো মানিকসোনা, স্বাধীন বাংলাদেশ শুরুতেই আমাকে একজন ভালো বন্ধু ও সহযোদ্ধা উপহার দিয়েছে।'

মানিকের মনে আবার সন্দেহ জাগে, আসলে লোকটা পাগল নয়তো? পাগল ভেবে মানিকও যথেষ্ট পাগলামি করেছে। মাস্টারদার স্ত্রী-শ্যালিকা যদি হঠাৎ এসে পড়ে এই নির্জন বাসায়, তাহলে কে কতটা পাগল প্রমাণ হবে সহজেই। কিন্তু সেই পাগলামো দেখার জন্য মানিকের কি অপেক্ষা করা উচিত? সেটাও বড় পাগলামো হয়ে যাবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেত্রিশ

যশোর শহরে মাস্টারদা নামক রহস্যময় ব্যক্তিটি দু'দিন নিজের আশ্রয়ে রাখার পর, মানিককে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা হিসেবে তার পরিচিত দুই যুবকের সঙ্গী করে খুলনায় পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গী যুবকদের মধ্যে একজনকে রাজাকার সন্দেহে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে সহবন্দি হিসেবে দেখেছে। তার নাম তাজুল, অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকটির নাম প্রবাল। ওদের সাইকেলে চেপে যশোর থেকে খুলনা দৌলদিয়া ইস্টিমার ঘাটে এসে উপস্থিত হয় তিনজন।

টার্মিনালে নোঙর করা একমাত্র লঞ্চটিতে উঠে একজন খোঁজখবর নেয়। ঢাকাগামী লঞ্চ, কিন্তু যাবে কি না ঠিক নেই। মানিককে টার্মিনালে বসিয়ে রেখে শহরের এক বাসায় সাইকেল রাখার কথা বলে সঙ্গী দু'জনেই চলে যায়। মানিক একা টার্মিনালে বসে অপেক্ষা করে। জেটিতে বাঁধা লঞ্চটির দিকে উদাস তাকিয়ে থাকে। লঞ্চটির আদি অকৃত্রিম নাম এম. ভি. জিন্নাহ। বিজয়ের পর, কিংবা হতে পারে আগেই জিন্নাহ নামটি আলকাতরা দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশে আলকাতরা দিয়ে বড় হরফে লেখা হয়েছে — 'জয় বাংলা'। নদীর জলে বহুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে আছে পুরনো জলযানটি। মাথার ওপর ছোট আকারের পতাকাটি পতপত উড়ছে শুধু। জয় বাংলার গন্তব্য রাজধানী ঢাকা। কিন্তু কখন ছাড়বে ঠিক নেই। যাত্রী জুটেছে মাত্র কয়েকজন। আর যাত্রী পূর্ণ হলেই যে শিগগির ঢাকা রওনা হবে সে, তাও অনিশ্চিত। কারণ নদীপথ এখনো বিপজ্জনক। সারেংয়ের অভিমত, 'মাইন পোতা আছে নদীতে। যাইবাম কেমনে রে ভাই?'

টার্মিনাল বেশ ফাঁকা। মেঝের ওপর বসে আছে দরিদ্র শ্রেণির একটি হিন্দু পরিবার। হয়তো শরণার্থী। বোঁচকায় বাঁধা হাঁড়ি-পাতিল, কাঁথা-কম্বল। যেন একটি চলমান সংসার, ভাসতে ভাসতে এই ঘাটে এসে ভিড়েছে। চুপচাপ পুরুষটির চোখে সর্বস্ব হারানোর শূন্যতা, নাকি সর্বস্ব ফিরে পাওয়ার আকুলতা? বোঝা মুশকিল। নদীর দিকে তাকিয়ে উদাস, বিড়ি টানছে সে। বউটির ঘোমটাবিহীন মাথার সিঁথিতে থ্যাবড়ানো সিঁদুর। ছেলেমেয়েদের রুটি-গুড় খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটি মালতীকে মনে করিয়ে দেয়। পরবাসে সন্তান নিয়ে মালতী এখন কেমন আছে কে জানে!

শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে প্যান্ট-শার্ট পরা একটি ছেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

হাসতে হাসতে মানিকের দিকে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানায়, 'জয় বাংলা।' মানিক ছেলেটিকে চিনতে পারে না। পাশে বসে আগন্তুক গায়ে পড়ে আত্মপরিচয় দেয়, 'জয় বাংলা জয় বাংলা করে নয়টা মাস প্রাণ হাতে লইয়া বাঁইচা থাকলাম ভাই। বিজয়ের পর স্বাধীন দেশে আর কতক্ষণ না খাইয়া থাকা যায় বলেন তো। কলকাতা থাইকা পকেটে শুধু গড়ের মাঠখান আনছি। এই লঞ্চ ঢাকা কখন যাবে ঠিক নাই। তা আপনি কই যাবেন ভাই?'

মানিকও ইন্ডিয়া থেকে এসেছে এবং ঢাকা যাবে শুনে যুবকটি হাত বাড়িয়ে দেয়, 'আমরা একই পথের পথিক। ইন্ডিয়ায় তবু ক্যাম্পে ফ্রি ভাত-রুটি পেয়েছি। কিন্তু স্বাধীন দেশে কার কাছে হাত পাতি ভাই? খিদেয় যে পেট কাঙাল শরণার্থী হইবার চায় আবার।'

যুবকটির পেটে খিদে থাকলেও মুখের হাসিটি অমলিন। বিদায় দেওয়ার আগে মাস্টারদা খিচুড়ি খাওয়ানো ছাড়াও পাঁচটি টাকা মানিকের পকেটে গুঁজে দিয়েছিল। খুলনা পৌঁছে যুবক সঙ্গীদ্বয় হোটেলে খাইয়ে দিয়েছে বলে টাকাটা আস্ত আছে এখনো। মানিক পুরো টাকাটাই ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দেয়, 'আমার কাছে এই সম্বল, আপনি এটা নিয়ে কিছু খেয়ে আসুন ভাই।'

অভিভূত যুবকটি মানিককে জড়িয়ে ধরে বলে, 'থ্যাংকু, আপনার কথা মনে থাকবে। চলুন, এ দিয়ে সস্তার হোটেলে দু'জন পেটভরে খাওয়ার পরেও এক প্যাকেট চার্মিনার সিগারেট কিনতে পারব। তারপর দেখা যাবে।'

'আমি খেয়েছি। আপনি খেয়ে আসুন।'

টাকাটা নিয়ে যুবকটি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই প্রবাল ও তাজুল ভাই ফিরে আসে। সাইকেলের বদলে এবার সঙ্গে তাদের লম্বা ভারী একটা বেডিং। কাঁথা-কম্বল দিয়ে মোড়ানো। বেডিংটা বহন করার জন্যই যেন তাজুল লুঙ্গি পরে সাধারণ মুটে-মজুরের বেশ নিয়েছে। প্রবাল প্যান্ট-শার্ট পরেছে। তার ঘাড়ে একটি ব্যাগ।

'চলেন মানিক, লঞ্চে উঠে বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমাই। না ছাড়ে যদি, বিনা ভাড়ায় রাতটা লঞ্চেই কাটিয়ে দেব।'

লঞ্চের দোতলায় উঠে একটি কোণে বিছানা পেতে ভারী বেডিংটায় মাথা রেখে তাজুল শুয়ে পড়ে, প্রবাল ব্যাগ থেকে বই বের করে একটা। মানিকের টাকায় ভরপেট খেয়ে মুখে পান-সিগারেটসহ বাচাল যুবকটি লঞ্চের দোতলায় উঠে আসছে এতক্ষণে। বাচাল ছেলেটির সান্নিধ্য এড়াতে মানিকও বেডিংয়ে মাথা রেখে চোখ বোজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমের ভান করে চুপচাপ থাকায়, এক সময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়েও পড়ে সে।

মিলিত কণ্ঠের জয় বাংলা ধ্বনি শুনে মানিকের যখন ঘুম ভাঙে, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ঘুমছুট বিহ্বল চেহারা নিয়ে সে চারপাশে তাকায়। তাজুল ঘুমিয়ে গেলেও প্রবাল জেগে জেগে একইভাবে বই পড়ছে। লঞ্চের দোতলাটি ফাঁকা ছিল, এখন নানা ধরনের যাত্রীতে পরিপূর্ণ। সারেংয়ের কেবিনের কাছে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন যুবক। স্লোগান দিচ্ছে তারাই। একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'জয় বাংলা স্লোগান শুইনা মাইন বাস্ট হইতে ভয় পাইব। ছাড়েন জলদি।'

লঞ্চ ছাড়ার সংকেত বাজলে, অচলাবস্থায় বন্দি যাত্রীরাও সচল হওয়ার আনন্দে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। যুবকদের মধ্যে একজনের কাঁধে স্টেনগান, আরেকজনের হাতে রাইফেল। ওরা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ নেই। কোথা থেকে এলো, কোথায়-বা যাবে তারা — কে জানে। ইঞ্জিনের শব্দে গোটা শরীর কাঁপিয়ে 'জয় বাংলা' নোঙর গুটিয়ে নদীতে ভেসে চলে।

লঞ্চের ঠাণ্ডা দেয়ালে হেলান দিয়ে মানিক জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। প্রবালের ডাকে তাজুলেরও ঘুম ভেঙে গেছে। মানিককে এড়িয়ে কানে কানে কী কথা বলে যেন দু'জন। তারপর মানিককে বেডিংয়ের কাছে বসিয়ে রেখে হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে যায় তারা। যাত্রীদের কলগুঞ্জন থিতিয়ে আসে ক্রমে। চাদর কাঁথা গায়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেয় অনেকে। জেগে থাকলেও যে যার মনের নদীতে একা ভাসছে। লঞ্চজুড়ে থমথমে হিমেল স্তব্ধতা।

'এখানে মুক্তিযোদ্ধা কেউ আছেন? মুক্তিযোদ্ধা এবং ইন্ডিয়ার বাংলাদেশ ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে যারা আসছেন, হাত তোলেন।'

এই প্রশ্ন ও আদেশসহ সামনে এসে দাঁড়ায় চারজন যুবক। স্টেনগানধারী মুক্তিযোদ্ধাটি ছাড়া দলের মধ্যে সেই বাচাল ছেলেটিও আছে, মানিক যাকে শেষ সম্বলটুকু পুরোটাই দান করে দিয়েছে। চোখাচোখি হতেই সে বলে ওঠে, 'এই যে ভাই আপনি তো আমাদের লোক। চুপ করে আছেন কেন? ওঠেন ওঠেন।'

মানিক তার সঙ্গীদের খোঁজে। দু'জনই মুক্তিযোদ্ধা তারা, দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করেছে। সত্য মিথ্যে মানিক জানে না, তবে এ কথা সত্য প্রমাণ করার জন্য নিজে সাক্ষী হয়েই তো রাজাকার সন্দেহে মুক্তিবাহিনীর হাতে আটক তাজুলকে মুক্ত করেছে মাস্টারদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন, কি হয়েছে ভাই?'

'জলদি ছাদে চলেন, তারপর কথা। আসেন আসেন।'

মানিক তার সহযাত্রীদের খোঁজে এবং একই সঙ্গে কৌতূহল মেটাতে একাই উঠে দাঁড়ায়। ওদের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠে। সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চের ছাদে উঠে দাঁড়ায় জনাদশেক যুবক। শান্ত নদীতে কুয়াশা ও জ্যোৎস্নার মাখামাখি। হিমেল বাতাসে ঘন হয়ে দাঁড়ায় তারা। বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে একজন, 'বন্ধুগণ, হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তাদের দোসর নন-বেঙ্গলি রাজাকার-আলবদররা আত্মগোপন করে আছে এখনো। তাবলিগ জামাতের ছদ্মবেশে কিছু নন-বেঙ্গলি শত্রু এই লঞ্চে আছে। সংখ্যায় তারা বিশজনের কম নয়। অন্যদিকে আমরা মাত্র এক, দুই, তিন... মোট এগারোজন। সবার হাতে আমাদের অস্ত্র নেই। আমার কাছে একটি পিস্তল, ধলনগর অপারেশনে পাকবাহিনীর এক মেজরকে মেরে এই পিস্তল পেয়েছি আমি। এ ছাড়া রাইফেল ও স্টেন হাতে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সঙ্গে আছে, তারা সামনের ঘাটে নেমে যাবে। তার আগেই আমাদের একটা সিরিয়াস অপারেশন চালাতে হবে।'

'ওস্তাদ, আরো কিছু সাধারণ পাবলিক বাইছা বাইছা দলে লইয়া লই?'

'না, বেশি ঝামেলা করবেন না। একটা গ্রুপ স্টেনগানসহ নিচে চলে যান। দু'একজন করে দোতলায় নিয়ে আসবেন। রাইফেল নিয়ে আপনি থাকবেন দোতলার সিঁড়ির কাছে। তারপর যা করার আমি নির্দেশ দেব। সারেংকেও সতর্ক রাখতে হবে, যেন আমাদের কথামতো লঞ্চ তীরে ভেড়ায় কিংবা চালাতে থাকে।'

ছাদ থেকে নেমে আসার পর পাঁচজন দ্রুত নিচে নেমে যায়। মানিক ছাড়াও আরো দু'জন যুবককে নিয়ে ওস্তাদ অর্থাৎ কমান্ডার দোতলায় এক কোণে অবস্থান নেয়। বিনা ট্রেনিংয়ের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মানিকের এটা প্রথম অপারেশন। উত্তেজনায় বুক ধকধক করে। কমান্ডার চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দেয়, 'ওপরে কাউকে সন্দেহ হয় কি না দেখেন।'

মানিক আবার তার সঙ্গীদের খোঁজে। দোতলায় উঠে এসেছে তারা, গায়ে চাদর মুড়ে বিছানায় শুয়ে আছে একজন, আরেকজন বসে আছে নির্বিকার। মানিক চাপা কণ্ঠে উদ্বেগ-উত্তেজনা প্রকাশ করে, ঘটনাটা জানিয়ে বলে, 'চলুন আপনারাও, সব মুক্তিযোদ্ধা ও ইন্ডিয়া ফেরত যুবক একজোট হয়েছে, চলুন দেখি কী অপারেশন হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীরা তার সাহস বাড়াতে দলে যোগ দেওয়ার বদলে বলে, 'আমরা মুক্তিযোদ্ধা না, আমাদের কথা ওদের কিছু বলবেন না। আপনি দেখুন ওরা কী করে, আমাদের জানাবেন।'

মানিক এবার ডেকের নিদ্রাকাতর যাত্রীদের দিকে তাকায়। চেহারা বেশভূষা দেখে মনে হয় সবাই গাঁয়ের সাধারণ মানুষ। যশোর থেকে সাইকেলে এতটা পথ আসার পরও রহস্যময় সঙ্গীদের পরিচয় নিয়ে মানিকের মনে এখনো খটকা। অচেনা যাত্রীদের দেখে কী করে শত্রু-মিত্র শনাক্ত করবে সে? যাত্রীরা এখনো টের পায়নি, লঞ্চে কী সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। পিস্তলধারী কমান্ডার ইশারায় মানিককে কাছে ডাকে। আদেশ দেয়, 'আমার পাশে থাকেন আপনি।'

নিচ থেকে প্রথমত তিনজন শত্রুকে ধরে আনা হয়। একজনের ফর্সা-লম্বা চেহারায় অবাঙালিত্বের ছাপ প্রকট। একজনের বেশবাস মওলানার, আরেকজনের গায়ে ছেঁড়া কোট, মাথায় টুপি। চোখে-মুখে জ্বলজ্বলে আতঙ্ক। মওলানাটি ঠোঁট বিড় বিড় করছে।

কমান্ডার পিস্তল উঁচিয়ে হুংকার দেয়, 'বাঁচতে চাইলে সত্য পরিচয় দাও। রাজাকার না আলবদর, কোথায় আছিলা?'

'নেহি বাবা। হাম লোক বাঙালিকা দুশমন নেহি বাবা। হামলোক ২০ সাল হইতে এ দেশে আছি।'

'হাম বাঙালি ভাইকো দুশমন নাহি বাবা, হাম ইন্ডিয়া সে আয়া বিহারি।'

'এখন পালাচ্ছ কোথায়?'

'আমরা তাবলিগ জামাত বাবা, ঢাকা যাইতেছি।'

'মুসলমানিত্ব দেখাতে তাবলিগের ভেক নিয়েছ! হারামখোর। বাঙালির রক্তের দাগ এখনো মুছে যায়নি, এই সার্চ করো শালাদের।'

কমান্ডারের নির্দেশে লোক তিনটির শরীর অনুসন্ধানকর্মে তৎপর হয়ে ওঠে কয়েক জোড়া হাত। পকেট থেকে বেরোয় নগদ টাকা-পয়সা, উর্দুতে লেখা কিছু চিঠিপত্র, নোট বুক, কলম, জর্দার কৌটা, সিগারেট, জাঙিয়ার পকেটে লুকানো টাকা এবং হাতে বাঁধা ঘড়িও।

'টাকা-পয়সাসহ সব জিনিস ওস্তাদের কাছে জমা রাখেন।'

মওলানাপ্রতিম লোকটির কাঁধের লম্বা গামছা কেড়ে নেয় কমান্ডার, গামছার মধ্যে জমা হতে থাকে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্র। মওলানার কোমরে বাঁধা রুমাল থেকে বেরোয় কিছু সোনার অলংকার। একজন তার দাড়ি ধরে গালে প্রচণ্ড চড় মেরে চেঁচিয়ে বলে, 'তাবলিগের বাচ্চা, তোর কাছে সোনা কেন? বল হারামজাদা বাঙালির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুটের মাল আর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?'

সম্ভবত অপারেশনে প্রথম সুযোগ পাওয়ার কারণে মানিকের মতো আর একটি যুবক হাতের মুঠোয় শত্রুকে পেয়ে বাঘের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। শত্রুর নিতম্বে ফুটবলের কিক দিয়ে চিৎকার করে, 'সোনার বাংলা শোষণ করে শ্মশান বানিয়েছিস! নয় মাস বাঙালিকে কচুকাটা করেছিস শালারা। আজ তোদের ক্ষমা নেই।'

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে লোকগুলো। কান্নার গলায় ব্যাকুল প্রতিবাদ জানায়, 'নেহি ভাইও, হাম লোক বাংলা চোষণ করে নাই। বাঙালি ভাইকো মারে নাই। হাম বিলকুল বেকসুর।'

গালে চড় দিয়ে ধমক দেয় একজন, 'চোপ শালা মাউড়ার বাচ্চা।'

'বন্ধুরা, এখন নো মারধর। আগে সবগুলোকে ওপরে তুলে সার্চ করেন, যাদের তল্লাশি করা হলো তাদের হাত বেঁধে ছাদে নিয়ে যান। রাইফেলসহ আপনি সিঁড়ির দরজায় থাকবেন। যান। আগে খুঁজে খুঁজে লঞ্চের সব অবাঙালি শত্রুকে একত্রিত করেন। তারপর ছাদে বিচার হবে।'

একজন দৌড়ে সারেংয়ের কেবিন থেকে দড়িছুরি নিয়ে আসে। কমান্ডারের নির্দেশ মতো হাত বেঁধে লোক তিনটিকে ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিচ থেকে ধরে আনা হয় আরো চারজনকে।

একইভাবে কমান্ডারের নেতৃত্বে কিলচড় ও গালিগালাজের মধ্যে দ্রুত তল্লাশির কাজ চলে। ভয়ে ভয়ে মানিকও একজনের পকেটে হাত ঢোকায়। অপারেশনে শত্রুর পকেট তল্লাশির ভূমিকা পালনে তেমন কষ্ট হয় না। খারাপও লাগে না। বরং শত্রুর গোপন পকেটের মানিব্যাগ, জিনিসপত্র পেলে হঠাৎ গুপ্তধন হাতে পাওয়ার মতো দেহে শিহরণ জাগে। তল্লাশকারী যুবক উদ্ধারকৃত নগদ নোট যদি চকিতে নিজের পকেটে ঢোকায়, কেউ দেখবে না। কিন্তু মানিক নিজের কাছে সৎ থাকার জন্য দামি জিনিস থেকে পাই পয়সাটা পর্যন্ত ওস্তাদের গামছায় ঢেলে দেয়। একদিকে উত্তেজিত যুবকদের কিলচড় ও গালিগালাজের মধ্য দিয়ে দেহতল্লাশি ও হাত বাঁধার কাজ, অন্যদিকে অবাঙালি কণ্ঠে উর্দু মেশানো বাংলায় বাঁচার তীব্র আকুতি, কারো-বা শরীরে প্রবল কম্পন, আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে জলও যেন শুকিয়ে গেছে তাদের।

এবার যে দু'জনকে ধরে আনা হয়, তাদের একজনের মাথায় পাগড়ি, পরনে লম্বা পাঞ্জাবি। দাড়ি বেশির ভাগ পাকা। লোকটার বুকে ঝোলানো ছোট কোরান শরিফ। কমান্ডারের কাছে এসে কোরান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরিফখানা খুলে সে গুনগুনিয়ে পড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হাত থেকে কেড়ে নেয় পবিত্র কেতাব, 'শালা খুনির হাতে কোরান। মুসলমানের বাচ্চা ৩০ লক্ষ বাঙালিকে মারার সময় কোথায় ছিল কোরান শরিফ?'

'ম্যায় বাঙালি নেহি, ম্যায় বিহারি নেহি, হাম মুসলমান হায়।'

'তোর মতো মুসলমান ভাইরে ৪০ বছরে অনেক দেখেছি বাঞ্চোৎ এবার তুই দেখ বাঙালি কারে কয়।'

দেহতল্লাশির সময়েও সন্ত্রস্ত মানুষটি চোখ বুজে সুরা আওড়ায়। এমন নিরীহ ধার্মিক শত্রু দেখে মানিকের ভেতরে প্রতিশোধ স্পৃহা কী জাতিবিদ্বেষ ঘৃণা একটুও কাজ করে না। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যই হয়তো, শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও গর্জে ওঠে না হিংস্র মেজাজ। তাদের কান্না ও আতঙ্কিত চেহারা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে সে। নিজেকে প্রশ্ন করে — সত্যি সত্যি কি এই অসহায় অবাঙালি মানুষগুলো নয় মাসের বাঙালি নিধনযজ্ঞে পাকসেনাদের সহযোগী হয়ে কাজ করেছে? এ জন্যই কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় মৃত্যুভয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে, নাকি ঢাকাইয়া যুবকটির কথা সত্যি — মিরপুর-মোহাম্মদপুরে গিয়ে বিহারিরা বাঙালির বিরুদ্ধে আবার একজোট হচ্ছে?

দলের একজন হয়েও মানিককে বোকার মতো নিষ্ক্রিয় দেখে কমান্ডার ধমক দেয়, 'এই যে, আপনি চুপচাপ বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এ বেটাকে সার্চ করেন। কুইক।'

ভয়ে ভয়ে মানিক অন্য লোকটির পকেটে হাত ঢোকায়। এই কনকনে শীতে মানুষটার গায়ে শুধু একটি হাওয়াই শার্ট। পকেট থেকে বেরোয় দশ টাকার একটা নোট, খুচরা পয়সা আর কয়েকটা বিড়ি। কাঁপতে কাঁপতে লোকটা মানিকের হাত চেপে ধরে, 'সব লে লও বাবা, ইয়ে রুপার আংটিভি লও, মুঝকো ছোড় দাও। হাম যশোর হোটেল মে দারুল কাবাব বানাতাম বাবা।'

মানিক আবার ধমক খায়, 'বাঁধেন শালাকে। নিচে এখনো অনেক কালপ্রিট আছে।'

কণ্ঠে না যতটা, তার চেয়েও হাজার গুণ তীব্র আকুল সহানুভূতি প্রার্থনা লোকটার চোখে ফুটে ওঠে। মানিকের দৃষ্টি নরম হয়ে আসে। কিন্তু সহযোদ্ধারা সবাই অপারেশনের উন্মাদনায় ব্যস্ত। দারুল কাবাব বানানো লোকটির ঘাড়ে গাট্টা মেরে তার হাত বাঁধতে আসে একজন। ঠিক সেই সময়ে, মানিককে ধাক্কা মেরে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষটা সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রীদের দিকে ছুট দেয়। কণ্ঠে সমস্ত শক্তি জড়ো করে চেঁচায়, 'মেরে মুসলমান ভাইও, মেরে বাঙালি ভাইও, মুঝকো বাঁচাও।'

লঞ্চের যাত্রীসাধারণ এমনিতে চলমান যুদ্ধের মধ্যে আটকা পড়ে ভয়ে জড়োসড়ো। মুক্তিবাহিনীর অপারেশন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিজ নিজ জায়গায় চুপচাপ বসে ছিল। বাঙালি লোকটির ছোটাছুটি ও মরণ-চিৎকার গোটা লঞ্চেই যেন যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। রাইফেলধারীসহ দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর পেছনে ছোটে। মৃত্যু-তাড়িত মানুষটি যাত্রীদের সাহায্য না পেয়ে লঞ্চের রেলিং আঁকড়ে ধরে এবং আরো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচায়, 'মেরে মুসলমান ভাইওওওও...'। মুক্তিযোদ্ধাটি রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করলে চিৎকারসহ লোকটি নদীতে পড়ে যায়।

লঞ্চজুড়ে কয়েক মুহূর্ত ভয়াবহ নীরবতার মাঝে শুধু অপর বন্দিটির কম্পিত কণ্ঠে আল্লাহর কালাম আবৃত্তি করার শব্দ। অপারেশন নতুন করে গতিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মানিকের রহস্যময় সঙ্গী প্রবাল মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবার। উত্তেজিত কণ্ঠে এই প্রথম কথা বলে গম্ভীর লোকটি।

'আগে আমার একটি কথার জবাব দেন। আপনারা কি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা?'

'হোয়াট ডু য়ু মিন? জানেন আমি মুজিব বাহিনীর একজন কমান্ডার, ছাত্রলীগের জেলা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'মুজিব বাহিনী হউন আর ছাত্রলীগ হউন, আগে আমার কথাটা শোনেন। অপারেশনের নামে যেসব লোককে ধরে এনে মারধর করা হচ্ছে, তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এরা কি সবাই আমাদের শত্রু? ভুলে যাবেন না, এ দেশে কয়েক লক্ষ নন-বেঙ্গলি আছে। বিহারি মাত্র আমাদের শত্রু নয়, তাদেরও শ্রেণিভেদ আছে। রাজাকার-আলবদর প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও এসব নিরীহ অবাঙালির প্রতি যে ব্যবহার করছেন আপনারা, তাতে লঞ্চের পাবলিক আপনাদের ডাকাত ভাবতে পারে। দেশ স্বাধীন করেছেন আপনারা, স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষের জানমালের হেফাজত করবে কে?'

প্রবালের বক্তব্যে সায় দেওয়ার জন্য মানিকের বুক ধকধক করে, আবার ভয়ও হয়। আবারও তাদেরকে রাজাকার সন্দেহ করে বসে যদি? তবু মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করে সে, 'আমার মনে হয় ওস্তাদ ইনি ঠিকই বলেছেন। যাদের ধরে আনা হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু নিরীহ নন-বেঙ্গলিও আছে মনে হয়।' কিন্তু মানিকের মৃদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থন তোয়াক্কা না করে কমান্ডার হুংকার ছোড়ে, 'হু আর য়ু? বাঙালির জাত শত্রু হানাদার বাহিনীর দোসরদের বিরুদ্ধে বড় গলায় লেকচার দিচ্ছেন, কে আপনি? যুদ্ধের নয় মাস কোথায় ছিলেন?'

'আমি আপনাদের মতো মুক্তিযোদ্ধা নই। একজন সাধারণ মানুষ। কী ভাই, আমি কি অন্যায্য কথা বলেছি? আপনারা কি বলেন?'

প্রবাল এবার সাধারণ যাত্রীদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যাত্রীরা আতঙ্কে বোবা। জবাব দেয় না কেউ। লাইটের নিচে কাঁথা গায়ে বসে থাকা মানুষটি বোকার মতো দাঁত বের করে হাসে। হাসিতে কারো প্রতি সমর্থনের চেয়ে অন্তর্গত ভয়টা প্রকট। হাসির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই যেনবা সে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, 'পাঞ্জাবি মিলিটারিরা গেছে। অহন তাগো বদলে আপনারা মুক্তিফৌজরাই স্বাধীন দেশ চালাইবেন। আমরা গরিব মুরক্ষ মানুষ, আমরা কি কমু বাবা। আপনারা যেডা ভালা বোঝেন সেইডা করেন।'

ঠিক এ সময় নিচ থেকে হই চই ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। প্রবালকে ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা নিচে ছুটে যায় দ্রুত। পিস্তল হাতে কমান্ডারও সিঁড়ির কাছে এগিয়ে যায়।

নিচে বেঞ্চির মধ্যে যাত্রীরা যে যার আসন থেকে দাঁড়িয়ে জটলা ও হই চই করছে। তাদের উত্তেজিত চিৎকার কানে আসে, 'মারেন শালাগো, স্বাধীন দেশে জয় বাংলা লঞ্চে উইঠা বাঙালির ওপর গুলি চালায়! স্বাধীন বাংলাদেশ থাইকা সব বিহারি মাইরা সাফা করেন, খালি বিহারি না, এ চোদমারিপুত মনে হয় খান সেনাই।'

অপারেশনের যোদ্ধারা এক অবাঙালি জোয়ানকে বেঁধে মারতে মারতে ওপরে নিয়ে আসে। তাকে ধরতে গেলে হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বের করে সে রুখে দাঁড়িয়েছিল। একজন সাহসী যাত্রী পেছন থেকে রিভলবারসহ জাপটে ধরেছিল তাকে। রিভলবারের গুলি খেয়ে সাধারণ এক যাত্রীর বুক, কারো মতে গলা ফুটো হয়েছে। স্বাধীন হওয়ার পরও নিরপরাধ বাঙালির রক্তে ভেসে যাচ্ছে লঞ্চ। দেখার জন্য নিচে ভিড় জমাচ্ছে লোকজন।

এই ঘটনাটি এবার মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনে বাঙালি-বিহারির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো তীব্র উত্তেজনা সঞ্চার করে। অবাঙালি যুবকটির রিভলবারের একটি মাত্র গুলিই যেন লঞ্চের সকল ছদ্মবেশী অবাঙালি যাত্রীকে নয় মাসে বাঙালির রক্ত ঝরানো শত্রু হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ যাত্রী যারা ছিল নিরপেক্ষ ও ভীত দর্শক মাত্র, তারা এখন একজোট এবং উত্তেজিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেরাই খুঁজে খুঁজে আরো দু'জন অবাঙালিকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়। আবার নিজেদের বাঙালি প্রমাণ করার জন্য সবাই যে যার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে বাংলা ভাষার জোর দেখায়, 'খতম করেন সব ছাতুখোর মাউড়ার বাচ্চাগো।'

একজন নীরব মৌলবিকে বিহারি সন্দেহ করায়, সে হাউমাউ কেঁদে ওঠে, 'আঁই নোয়াখালির বাঙালিরে ভাই, আঁর বাপ বাঙালি, আঁর মাও বাঙালি, আঁর চৌদ্দ পুরুষ বাঙালি, আর আঁই জয় বাংলারে ভাই।' মুক্তিযোদ্ধারা হাসিমুখে তাকে মুক্তি দেয়।

এরপর অপারেশনের কাজ ত্বরিত গতিতে এগিয়ে চলে। অবশিষ্ট বন্দিদের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। কমান্ডার উত্তেজিত যাত্রীদের শান্ত করে, 'আপনারা ভিড় করবেন না। যে যার জায়গায় চুপচাপ বসে থাকুন। যান, আর কোনো ভয় নেই।'

ছাদে সমবেত বন্দিগণ আল্লাহু জিকির করছে। যে দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য মেঘনার বুকে মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছিল, বাঁচার আশায় সেই সর্বশক্তিমানকে প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করে তারা। কমান্ডার নির্দেশ দেয়, 'নো ফায়ারিং। এই নদীতে লক্ষ লক্ষ বাঙালির লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে হানাদার সেনারা। আজ আপনারা হাত-পা বেঁধে একজন একজন করে সব কয়টাকে নদীতে ছুড়ে দেন।'

চ্যাংদোলা করে প্রতিটি বন্দিকে নদীবক্ষে ছুড়ে দেওয়ার সময় যুবকদের সমবেত কণ্ঠে গগনবিদারী স্লোগান ওঠে, জয় বাংলা। জয় বাংলা স্লোগানে জেগে ওঠে বাঙালি জাতির জয়ের অহংকার, জয় বাংলা স্লোগানের ভেতর ডুবে থাকে মৃত্যুভয়ে কম্পমান অবাঙালির অন্তিম চিৎকার এবং পানিতে পতনের ঝপাং আওয়াজ। একজন বন্দি নিরাপদ কবরের বদলে নদীর ঠাণ্ডা স্রোতে শুয়ে থাকতে প্রবল আপত্তি করায়, তার কণ্ঠের হাড়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে একবার মাত্র আঘাত করা হয়। বেচারা তখন নদীতে পড়ার সময় আল্লাহকে ডাকারও সুযোগ পায় না আর।

মানিক ছাদের মধ্যে উঠেও অপারেশন থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নিচে নামবার সিঁড়ির মুখে ব্যর্থ দার্শনিকের মতো দাঁড়িয়ে জীবন ও মৃত্যুর লীলা বোঝার চেষ্টা করছে যেন। অপারেশনের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মানিক জয় বাংলা বলে চেঁচাতে পারে না, এই প্রথম মনে হয় তার, জাতীয়তাবাদী আবেগ ও ঘৃণার নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে অনেক মানবিক বিবেচনাও। ছাদের হু-হু ঠাণ্ডা বাতাসে অসম্ভব শীত বোধ করছে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোরকা ঢাকা একটি মেয়ে, 'মেরি খসম, মেরি হাজবেন্ডকো ছোড় দাও' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে আসে।

'ওস্তাদ, এই মাউরা মাগীকেও কি স্বামীর বিছানায় ছুড়ে মারব?'

'না রে ভাই, একে আমার হাতে ছেড়ে দেন। বাঙালি মা-বইনের ইজ্জত মারার প্রতিশোধ লমু।'

'খবরদার! ভুলে যাবেন না, আমরা বর্বর খানসেনা নই, মহান মুক্তিযোদ্ধা।'

'কিন্তু অপারেশনে উদ্ধার করা টাকা-পয়সা সোনার জিনিসগুলোর কী হবে ওস্তাদ?'

'এগুলো সমানভাবে ভাগ করেন। তাড়াতাড়ি করেন, আমরা সামনের ঘাটে নামব।'

'আমাকে কিন্তু সোনার চেন আর একটা ঘড়ি দিতে হবে ওস্তাদ। চারটা ঘড়ি জমা দিয়েছি আপনার কাছে।'

'ভাগ সমান হবে। যে লোকটা গুলি খেয়েছে আর যে লোকটা এনিমিকে ধরতে সাহায্য করেছে, তাকেও ভাগ দিতে হবে ওস্তাদ।'

'হ্যাঁ বন্ধুগণ, ভাগ সমান হবে। স্বাধীন দেশে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। সমাজতন্ত্র মানে ভাগ সমান। কিন্তু অপারেশন এখনো বাকি আছে বন্ধুরা। 'জয় বাংলা' লঞ্চে এখনো একটি স্বজাতি শত্রু বহাল তবিয়তে আছে।'

'এই বিহারি বউটারে আমরা সামনের ঘাটে নামাইয়া নিয়া যাব।'

'এ মাউরা মাগীর কথা বলছি না আমি, অপারেশনের সময় নন-বেঙ্গলিদের পক্ষ নিয়ে যে বড় বড় লেকচার দিচ্ছিল — সেই লোকটা কোথায়? আমার ডাউট, ও শালা একজন নকশাল। নকশাল ও চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা অনেক জায়গায় আমাদের বিরুদ্ধে ফাইট দিয়েছে। ওটাকে ধরে নিয়ে আসেন।'

'তার বিচার আপনারা পরে করেন, আগে ভাগাভাগি কম্পিলিট হোক। আমরা নেমে যাব।'

মানিক পুরনো সঙ্গীদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। তাদের বাঁচানোর জন্য, নাকি লুটের মালের ভাগ না নেওয়ার ইচ্ছেয় — কে জানে, ছাদের ভাগাভাগির ভিড় থেকে চুপচাপ নিচে নেমে আসে।

প্রবাল গায়ে চাদর জড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট টানছিল।

'কী ভাই, আপনাদের অপারেশন শেষ?'

'প্রবালদা, ওরা আপনাকেও সন্দেহ করছে। আপনার বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। মুজিব বাহিনীর কমান্ডার আপনাকে নকশাল ভাবছে।'

'ওরা মোট কয়জন?'

'সবাই আছে, দশ/বারো জন হবে।'

'রাইফেল আর স্টেন হাতে ছেলে দুটি কোথায়?'

'ওরা সামনের ঘাটে নেমে যাবে বলল। এখন ভাগাভাগি নিয়ে সবাই ব্যস্ত।'

'আপনি রাইফেল বা স্টেন চালাতে পারবেন?'

মানিক মাথা নেড়ে না বলে।

'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বেডিংপত্র পাহারা দেন। তাজু, চল।'

গায়ের চাদর খুলে ফেলতেই দু'জনের হাতে দুটি স্টেনগান দেখে মানিক চমকে ওঠে। যাত্রীদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই অস্ত্র হাতে ওরা লঞ্চের ছাদের দিকে ছুটে যায়।

হঠাৎ লঞ্চের ছাদে গুলির শব্দ শুনে যাত্রীদের কলগুঞ্জন মুহূর্তেই স্তব্ধ। মানিক রুদ্ধশ্বাসে ছাদের সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ নেমে কয়েকজন নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ে যাত্রীদের মাঝখানে গিয়ে লুকায়। একজন অচেনা যাত্রীর কাঁথা কেড়ে নিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে নিজেকে। অপারেশনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে পালাতে দেখে নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যাত্রীগণ। সরবে আল্লাহ রসুলকে স্মরণ করে অনেকেই। ছাদে আবারও গুলির শব্দ। তারপর স্তব্ধতা।

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণ পর ছাদ থেকে নেমে আসে শুধু প্রবাল ও তাজুল। হাতে উদ্যত অস্ত্র। প্রবালের ঘাড়ে অতিরিক্ত একটি স্টেনগান। সশস্ত্র যাত্রীদের চেঁচিয়ে অভয়বাণী শোনায় প্রবাল।

'আপনাদের কোনো ভয় নাই ভাইসব। মুজিববাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধার নামে কয়েকজন সন্ত্রাসী ডাকাত লঞ্চে এতক্ষণ লুটপাট চালাচ্ছিল। কিছু নিরীহ অবাঙালিকে ওরা খতম করেছে। বেঁচে থাকলে ওরা এ দেশে আরো লুটপাট করত। আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি, খতম করেছি শত্রুদের। সর্বহারাদের রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত, সর্বহারাদের ওপর শোষণ নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের লড়াই চলবেই।'

সশস্ত্র যোদ্ধা দুটির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি হয় না কোথাও। অস্ত্র হাতে নিয়ে ওরা লঞ্চের দোতলায় চক্কর দেয়, হয়তো আরো শত্রু খোঁজে, সারেংয়ের কেবিনে টুঁ মারে, তারপর বিজয়-গর্ব নিয়ে ফিরে আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের পাশে।

'কী মানিক, আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। ভালোই হলো, এই অপারেশনে আমাদের আরো দুটি অস্ত্র জোগাড় হয়েছে। নামবেন আমাদের সঙ্গে বরিশালে?'

মানিক ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়, 'আমাকে যে ঢাকা যেতেই হবে ভাই।'

'মাস্টারদা বলে দিয়েছেন আপনাকে নিরাপদে ঢাকা পৌঁছতে যেন সাহায্য করি। আমাদের যা করার করলাম। লঞ্চের বেড এলিমেন্টস সব গেছে, আশা করি এখন নিরাপদে পৌঁছতে পারবেন।'

প্রবাল বেডিং খুলে স্টেনগানটি রাখার সময় মানিক এই প্রথম বুঝতে পারে, কাঁথা-কম্বল মোড়ানো বেডিংটার ভেতরে আসলে অস্ত্র রয়েছে। বেডিং বাঁধাছাদা করে গায়ের চাদরে কাঁধের অস্ত্র লুকিয়ে বেডিং মাথায় তুলে নেয় ওরা। তারপর মানিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং আবার দেখা হওয়ার আশা প্রকাশ করে নিচে নেমে যায়।

বরিশালে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা নেমে যাওয়ার পর বেশ কিছু ঢাকাগামী সাধারণ যাত্রীও ওঠে। কিন্তু কারো হাতে অস্ত্র নেই, কাউকে মুক্তিযোদ্ধাও মনে হয় না। ছাড়ার পর জয় বাংলা আবার স্বাভাবিক গতিপ্রাপ্ত হলে লঞ্চেও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে। আর কোনো অঘটন ঘটবে বলে মনে হয় না। কিন্তু পুরনো বিভীষিকা মনে করিয়ে দিতে সাত-আট বছরের অবাঙালি ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মাকে খোঁজে। বোরকা পরিহিতা ওর মাকে মুক্তিরা শেষ পর্যন্ত নদীতে ছুড়ে দিয়েছে, নাকি বরিশালে নামিয়ে নিয়ে গেছে, কেউ জানে না। মানিকের কাছে জানতে চায় এক সহযাত্রী, কিন্তু মানিক ঠিক বলতে পারে না। ছেলেটির কান্না দেখে ছোট ভাই রফিকের কথা এবং ঢাকায় মামার মেয়ে বীণার কথা মনে পড়ে। রফিকের চেয়ে বয়স হয়তো কিছু কম হবে। কিন্তু মুখখানা বড় মায়াভরা। মাকে না পাওয়া পর্যন্ত ছেলেটি তার কান্না এবং চোখের অনুসন্ধান যেন থামাবে না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অপ্রত্যাশিত এই অপারেশনে শরিক হয়ে উথালপাতাল নানামুখী প্রতিক্রিয়ার ভারে মানিক দিশেহারা। ক্রন্দনরত শিশুটি তার মায়ের কাছে ফিরতে চাইছে, কিন্তু মানিক স্বাধীন স্বদেশের কী রূপ খুঁজে পেতে চায়, কোন গন্তব্যে পৌঁছতে চায় — নিজেও যেন ঠিক জানে না। শিশুটির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ বসে থাকে। চারদিকে সার্চলাইটের তীব্র আলো ফেলে ফেলে 'জয় বাংলা' নিজস্ব শব্দগতিতে অন্ধকার চিরে সামনে এগিয়ে চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌত্রিশ

সদ্য স্বাধীন দেশের রাজধানীতে পা রাখবে বলে মানিকের ভেতরেও কী আনন্দ-শিহরণ! বুড়িগঙ্গায় ভাসমান লঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে ভোরের কুয়াশা ফুঁড়ে ঢাকা শহরের জেগে ওঠা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। ভারত থেকে আসা মুক্তি ও খুলনা-বরিশাল থেকে আসা সাধারণ যাত্রীরাও রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, পরিচিত শহরকে স্বাধীন দেশের রাজধানী হিসেবে ফিরে পাওয়ার আনন্দে কলকল করছে সবাই। যে শহর হানাদার বাহিনীর অস্ত্রের শাসনে মৃত্যুপুরীর বিভীষিকা হয়ে উঠলে প্রাণহাতে পালিয়েছিল মানুষ, আজ সেই শহরকে স্বাধীন দেশের রাজধানী হিসেবে দখল করার আনন্দেই যেন, ভারতের যুবশিবির থেকে আসা ঢাকাইয়া যুবকটি চেঁচিয়ে আবারও স্লোগান দেয়, — জয় বাংলা। তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় অনেকেই।

মানিক মুখচেনা ওই যুবক সহযাত্রীদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী ঢাকা দেখে। এর আগে নদী থেকে ঢাকা, এমনকি নদীটাও ভালো করে দেখা হয়নি। উত্তরবঙ্গে বাড়ি বলে নদীপথে চলাচল করেনি তেমন। সদরঘাটে নামলে পরিচিত পথ কিংবা অচেনা অলিগলি পেরিয়ে যে-কোনো গন্তব্যে হেঁটেও যেতে পারবে সে। কিন্তু বিপদে পড়ার ভয়-ভাবনা বুকে টিসটিস করে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। কারণ অবাঙালি ছেলেটি মানিকের জামা আঁকড়ে তার পিছু নিয়েছে।

বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রাখতেই ব্যক্তিগত সকল ভয়-ভাবনা স্মৃতি-বিস্মৃতি চাপা দিয়ে যে জোরালো দেশপ্রেমের আবেগটা উথলে উঠেছিল, যে আবেগের শক্তিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মাটি মুঠোয় নিয়ে চোখের জল ফেলে দেশের জন্য বাকি জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিল মানিক, রাজধানীতে নামার সময়ে সেই জোরালো আবেগটা আর ফিরে পায় না সে। লঞ্চের অবাঙালি শত্রু নিধন অপারেশনের সময়েও নিজেকে নেতা দূরে থাক, একজন সাহাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি মানিক। সর্বহারা মুক্তিযোদ্ধারাও তাকে নিজেদের লোক ভাবেনি, অন্যদিকে ভারত ফেরত মুক্তিযোদ্ধারাও তাকে যেন সন্দেহের চোখে দেখছে। অথচ বাবা-মা হারানো অবাঙালি ছেলেটি, মানিকের মধ্যে হারানো স্বজনের আদল পেয়েই কি না কে জানে, আঠার মতো লেগে আছে। কান্না থেমেছে বাচ্চাটির, কিন্তু মানিকের জামা আঁকড়ে ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো সে আতঙ্ক-বিহ্বল। ছেলেটির এই ভয় সঞ্চারিত হয় মানিকের মধ্যেও।

লঞ্চে দেশপ্রেমের আবেগ ও সাহসিকতা দেখাতে না পারার হীনম্মন্যতা ঢাকতেই হয়তো বা, হঠাৎ শেখ মুজিবের কথা মনে পড়ে। মুজিবকে কারাগারে রেখেই স্বাধীন হয়েছে দেশ। প্রবাসী সরকারের সবাই কলকাতা থেকে এখনো দেশে ফেরেনি। বিজয়ী ভারতীয় সেনা, নাকি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা এখন দেশ চালাচ্ছে — জানে না সে। মানিকের ভয়টা হয়তো এ কারণেও।

ইচ্ছে করলে বাপ-মা হারানো অবাঙালি বালকটিকে লঞ্চে রেখে, কিংবা সদরঘাটের ভিড়ে হারিয়ে ফেলে মানিক বিপদে পড়ার ভয় ও ঝামেলামুক্ত হয়ে গন্তব্যে একা হাঁটতে পারে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার ভয়েই হয়তো ছেলেটিও লঞ্চ থেকে নামার আগেই মানিকের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। যেন মানিক তার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে। নাকি বাবা-মাসহ আপনজনদের কাছে আর কোনোদিনও ফিরতে না পারার নির্মম বাস্তবতা টের পেয়ে গেছে এইটুকু ছেলে? সে জন্যই হয়তো মানিককে হারিয়ে ফেলার ভয়ে সদা সতর্ক।

লঞ্চ থেকে নেমে ছেলেটি যদি আবার কাঁদতে শুরু করে, নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, তবে মানিকে শহরবাসী অনেকের চোখে সন্দেহভাজন চরিত্র হয়ে উঠবে। ছেলেটিকে রক্ষা করতে গিয়ে বিপন্ন হতে পারে নিজের জীবন। সহযাত্রী একজন ভয়ও দেখিয়েছে, 'এই বিচ্ছুরে লইয়া ঢাকার রাস্তাঘাটে চইলেন না। বিপদে পড়বেন ভাই। তার চাইতে এইডারেও নদীতে ফিইকা দিয়া যান।'

এই দায়িত্ব মানিক একা আর নিতে পারেনি। ঢাকায় মানিকের মামার শ্বশুরের সঙ্গে অনেক অবাঙালি পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ছেলেটিকে সেখানে পৌঁছাতে পারলে হয়তো ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মামার অবাঙালি শ্বশুর নিজেই কোন বিপদে আছে, নাকি ছেলের কাছে করাচি চলে গেছে ইতোমধ্যে, মানিক কোনো খবরই জানে না।

মানিকের নিজস্ব ঠিকানা, বিশ্ববিদ্যায়ল হলে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারে না সে। কারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সঙ্গে ছাত্র-যুবকদের সম্পর্ক এতটাই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই নিষেধ এখনো তুলে নেয়নি কেউ। ২৫ মার্চের কালরাত থেকে হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের যত রক্ত ঝরিয়েছে, সেই রক্তের দাগ হয়তো মুছে যায়নি এখনো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমমেট আরিফ ও জগন্নাথ হলের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী সুরেশ রায়কে মার্চের আন্দোলনে একাত্ম দেখে গিয়েছিল। কে জানে ওরা বেঁচে আছে কি না। নানারকম অনিশ্চয়তার মধ্যে মানিক সিদ্ধান্ত নেয়, বন্ধুদের খোঁজখবর এখন নেবে না। ঢাকায় পরিচিত দুটি ঠাঁই ছাড়া মানিককে গোপীবাগের আরো একটি অচেনা বাসায় যেতে হবে। যশোরে আশ্রয়দাতা মাস্টারদার চিঠি ও খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উদ্দিষ্ট মানুষটির পরিচয় ভালো না জানলেও, সে মাস্টারদার বিপ্লবী দলের একজন হওয়াই স্বাভাবিক। অবাঙালি ছেলেটির বাবা-মা হারানোর কাহিনি শুনলে লোকটা নিশ্চয় সাহায্য করতে পারে। তা ছাড়া মামার বাসার তুলনায় গোপীবাগ কাছে, প্রয়োজনে হেঁটেই যাওয়া যাবে। মানিক লঞ্চ থেকে নামার আগেই সেই লোকের কাছে প্রথমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাগ খুলে মাস্টারদার চিঠি ও লোকটার ঠিকানা বের করে পকেটে ঢোকায় সে।

লঞ্চ সদরঘাটের জেটিতে ভিড়েছে। নামতে শুরু করেছে যাত্রীরা। মানিক সঙ্গের ছেলেটিকে চাপা স্বরে সতর্ক করে, 'একদম চুপ থাকবে। বাতচিত করেগা তো পানি মে ছুড় দেউঙ্গা।'

ছেলেটি তখন কান্নার গলায় আবদার করে, 'আম্মিকা পাস লে চল।'

মানিক ধমক দেয়, 'চোপ।'

ছেলেটি আর কাঁদে না। মানিক প্রায় সবার শেষে কাঁধে ব্যাগ ও এক হাতে ছেলেটির হাত চেপে ধরে সদরঘাটে নামে। জেটিতে মাত্র দু'তিনটি লঞ্চ বাঁধা, ঘাট প্রায় ফাঁকা।

দেশ স্বাধীন হতে না হতেই রাজধানীতে এত রিকশাঅলা কোত্থেকে উদয় হয়েছে কে জানে। নাকি এরা যুদ্ধের সময়ও রিকশা চালানোয় বিরতি দেয়নি? পকেটে একটাও টাকা নেই, কিন্তু বাসা খুঁজে পেলে লোকটার কাছে রিকশাভাড়া নিয়ে দিতে পারবে মানিক। রিকশায় গেলে বিপজ্জনক সঙ্গীকে নিয়ে মানিক নিরাপদ বোধ করবে, বাসা খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে হয়তো।

পকেটে পয়সা না থাকার দারিদ্র্য ঢাকতে মানিক বেশ ডাটের সঙ্গে একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'গোপীবাগ যাবে?'

'যামু। ভাড়া এক টাকা লাগব।'

'এত ভাড়া কেন?'

'যুদ্ধের পর স্বাধীন দ্যাশে আগের রেটে গাড়ি টানলে কী আমাদের পেট চলব সাব? যুদ্ধের টাইমে জান হাতে লইয়া গাড়ি টাইনাও দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলা খাইতে পারি নাই, স্বাধীন দেশেও কি এখন না খাইয়া থাকতে কন?'

'ঠিক আছে চল, কিন্তু এখন পয়সা পাবে না। আগে বাসা খুঁজে পেলে, তাদের কাছে টাকা নিয়ে তোমার ভাড়া দেব।'

'আপনি কি সাব মুক্তিযোদ্ধা?'

'হ্যাঁ, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ইন্ডিয়া থেকে ফিরছি। খুলনা হয়ে বিনা ভাড়ার লঞ্চে স্বাধীন দেশের রাজধানীতে নেমেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি প্রথম।'

কিন্তু এতে রিকশাঅলা কৃতার্থ হওয়ার বদলে সংশয় নিয়ে শুধায়, 'এই পোলাটা কে? আপনি মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু আপনার অস্ত্র কই?'

'অস্ত্র না দেখলে কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রিকশাঅলাটি এবার সত্যই ভয় পায়। জবাব দেয়, 'মুক্তিরা তো অহন স্যার অস্ত্র লইয়া চলে। রিকশায় উইঠা বইলে যেদিকে যাইতে কয়, যাওন লাগে। রাখতে কইলে সারাদিন রাখন লাগে, পয়সা চাওয়ার সাহস পাই না। হেইদিন দুই মুক্তিরে রিকশায় সারাদিন ঘোরাইছি।'

'আমি তোমারে ঠকাব না, চলো।'

বালকটি এ সময় একটাও কথা বলেনি। তাকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ার কারণেও মানিক বেশি বেশি কথা বলছিল। রিকশায় উঠে বসার পর এখন প্রয়োজনে তার মুখও চেপে ধরতে পারবে সে।

AMARBOI.COM

মানিককে খুঁজতে হয় না, বাড়ির নাম্বার মিলিয়ে কয়েকটা গলি ঘুরে একটি তেতলা বাড়ির গেটে নাম্বারের মিল খুঁজে পেয়ে রিকশা থামায়। ছেলেটি এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। আতঙ্ক ও ক্ষুধার ভারে অনেকটা নেতিয়ে গেছে। শেষ রাতের দিকে লঞ্চে মানিকের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিয়েছিল অনেকটা। এখন দিনের বেলাতেও স্বপ্নের ঘোরে বন্দি যেন।

মানিক ছেলেটিকে নিয়ে রিকশা থেকে নেমে রিকশাঅলাকে বলে, 'তুমি এইখানে অপেক্ষা করো, আমি দেখি আমার লোককে পাই কি না। না হলে তোমাকে নিয়ে মামার বাসায় যাব।'

অবাঙালি বাচ্চাটি চারপাশ তাকিয়ে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পায় যেন। পুরনো গান শুরু করে আবার, 'মেরে আম্মি কাঁহা?'

রিকশাঅলাটি ভয় পেয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে, 'এই পোলাটি ক্যাডা?'

মানিক জবাব না দিয়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস্টারদা বলেও দিয়েছিলেন তার বন্ধু আজিজ সাহেব বাড়িটির দোতলায় ভাড়া থাকে। সিঁড়ি ধরে সরাসরি দোতলায় ওঠে মানিক। দরজার কড়া নাড়ার আগে ছেলেটিকে আবার সতর্ক করে, 'একদম চুপ থাকবা।'

একবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠে সাড়া আসে — কে?

'এটা কি আজিজ সাহেবের বাসা? উনি বাসায় আছেন?'

পাশের একটি জানালা খুলে যায়, পর্দা সরিয়ে নারীমুখ ভেসে ওঠে।

'উনি তো অফিসে গেছেন। আপনি কে?'

'আমি আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। অনেক পথ ঘুরে ইন্ডিয়া থেকে আজ ঢাকায় এসেছি। পথে যশোরে ওনার এক বন্ধু মাস্টারদা আপনাদের খোঁজ নিতে বলেছেন, একটা চিঠিও দিয়েছেন।

এবারে দরজা খুলে যায়। ভেতরে ডাকে মহিলা। ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে মানিক, আজিজ সাহেব মাস্টারদার মতো বিপ্লবী নয়। অফিসে গেছেন, ঘরে বউ, তার মানে রীতিমতো সংসারী মানুষ। বসবার ঘরটি খুব সাধারণ, কিছু বেতের চেয়ার-টেবিল, একটি বড় শেলফে অনেকগুলো বই সাজানো।

'এই ছেলে কে?'

মানিক ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছেলেটির আসল পরিচয় দিতে হবে। তাতে রিকশা ভাড়া ও ছেলেটি এবং নিজেরও ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু খেতে চাওয়া সহজ হবে।

'এই ছেলেটির পেছনে একটি ট্র্যাজিক কাহিনি আছে। আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন, আমি বলছি।

ছেলেটিকে মানিক এখনো জানাতে পারেনি যে লঞ্চে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের কিছু বাঙালি যুবক তার বাবা-মাকে লঞ্চের ছাদ থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সে বাংলা বুঝতে পারবে না ভেবে, সংক্ষেপে জয় বাংলা অপারেশনের বৃত্তান্ত শোনায় মহিলাকে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যোগ করে মানিক, 'ওর অবাঙালি বাবা-মাকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু এই ছেলেটাকে মুক্তিযোদ্ধার ভেকধারী ডাকাতদের মতো নদীতে ছুড়ে দিয়ে বা লঞ্চে ফেলে চলে আসতে পারিনি আমি।'

'ওকে নিয়ে এখন কী করবেন?'

'বুঝতে পারছি না। ঢাকায় কলাবাগানে আমার মামার বাসা। মামি আবার নিজেই অবাঙালি পরিবারের মেয়ে। জানি না তারা কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালে আছে। মার্চে ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের আর কোনো খবর জানি না।'

'এই মহল্লাতেও মুক্তিযোদ্ধারা পাশের বাসা থেকে রাজাকার বলে ধরে নিয়ে গেছে একজনকে। দু'দিন আগে মুক্তিযোদ্ধারা কোন বাড়িতে যেন ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী, রাজাকার কী বিহারিদের সাথে সম্পর্ক ছিল জানলেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ধরে নিয়ে এখন শাস্তি দিচ্ছে। এই ছেলেটাকে সাথে নিয়ে আপনি ঘুরছেন দেখলে লোকজন নানারকম সন্দেহ করবে।

'তা ঠিক। কিন্তু কী করব বলেন।'

'এই ছেলে কি বাংলা বলতে পারে। বাবা কী নাম তোমার?'

ছেলেটি জবাব দেয় না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মানিকও তার সঙ্গীর নাম জানার উৎসাহ বোধ করে এতক্ষণে, 'বলো নাম বলো, কেয়া নাম?'

'মেরে নাম রব্বানি। মেরে আম্মি কাঁহা?'

'কত শতবার যে এ প্রশ্ন শুনছি, কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারি না। আপনি এক কাজ করুন, ছেলেটিকে কিছু খেতে দিন আন্টি। আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। নিজেও খাইনি, ছেলেটিকে এখনো কিছু খাওয়াতে পারিনি। আর আপনার কাছে যদি পাঁচ/দশ টাকা থাকে, আমাকে ধার হিসেবে দিন। রিকশা ভাড়া দিতে হবে। ছেলেটাকে নিয়ে আমি এখন আমার বাসায় যাব। তারপর দেখা যাক, কী করা যায়।'

'আপনি এত বড় ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়েছেন, আমি আর একটু খেতে দিতে পারব না? আপনি বসেন। ও অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে বলেছে। এখনো তো অফিস ঠিকমতো শুরু হয়নি। দেশ স্বাধীন হলেও কখন কী হয় টেনশন যায়নি মানুষের।'

মানিক বলে, 'আমি বাইরে একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনি একটি টাকা দিন, রিকশাঅলাকে বিদায় করে দিই অন্তত।'

মহিলার কাছে টাকাটা নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখে মানিক, রিকশাঅলা নেই, হাওয়া হয়ে গেছে।

অচেনা একটি পরিবার এত দ্রুত আপন হয়ে উঠবে, মানিক ভাবতে পারেনি। আজিজ সাহেবের চারটি ছেলেমেয়ে। বড়টি টেনে পড়ে। ছোট মেয়েটি ফাইভ-সিক্সে পড়ে বোধহয়, সে বলে, 'বিহারি ছেলেটিকে হাতমুখ ধুয়ে দিই?'

আজিজ সাহেবের স্ত্রী ভয় পাওয়া গলায় ছেলেমেয়েকে সতর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, 'চুপ। একটা বিহারি ছেলে আমাদের বাসায় এসেছিল, কাউকে বলবি না। বলবি যে একজন মুক্তিযোদ্ধা এসেছিল।'

মানিক এবার মহিলাকে সাহস দেয়, 'হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধাই তো। নিরাপরাধ বিপদগ্রস্ত মানুষ, সে যে-ই হোক, তাকে রক্ষা করাও তো মুক্তিযোদ্ধার কাজ।'

'তুমি আসো বাবা। ভেতরে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হও, আগে একটু চা-নাশতা খাও। আমি ভাত বসাই।'

ভাতের আগে ডিম মামলেটসহ রুটি করে আনে মহিলা। নাশতা খাওয়ার পর মানিক ভাত কিংবা আজিজ সাহেবের ফেরার জন্য অপেক্ষা করে না আর। চিঠিখানা তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এটা ওনার হাতে দেবেন। আর আমি এখন ছেলেটাকে নিয়ে মামার বাসায় যাই। নাকি বাচ্চাটাকে আপাতত এখানে রেখে যাব?'

মহিলা এবার আঁতকে ওঠে, 'না বাবা, তুমি ওকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমার খুব ভয় করছে। কখন যে মহল্লার মুক্তিবাহিনীরা বাড়িতে এসে হামলা চালায়!'

'ঠিক আছে, ওকেও নিয়ে যাচ্ছি। তবে বাসায় গিয়ে যদি মামা বা মামির আত্মীয়স্বজনদের কাউকে না পাই, তাহলে একে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।'

মানিক মামার বাসার উদ্দেশে ছেলেটিকে নিয়ে আবার রাস্তায় নামে। রাস্তায় রাইফেল হাতে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে ছুটে যেতে দেখে সে। গুলিস্তানে গিয়ে নিউমার্কেটে যাওয়ার একটি বাস পায় সে।

পঁয়ত্রিশ

কলাবাগানের পরিচিত দোতলা বাসাটির গেটে পৌঁছে নানারকম শঙ্কা ও উত্তেজনা নিয়ে দোতলার দরজার কড়া নাড়ে মানিক। দরজা খুলে দেয় স্বয়ং মামা।

মানিককে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সশরীরে বেঁচে থাকাটা হাতেনাতে অনুভব করেও আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে কথা বলতে থাকে আমিন মামা, 'বেঁচে আছিস ! কোত্থেকে এলি? শুনেছি তুইও মুক্তিযুদ্ধে গেছিস। বাড়ির খবর কী মানিক, বাবা কোথায়? আর এই ছেলে কে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামার আবেগময় হাঁকডাকে ভেতর থেকে মামি, মামাতো বোন দুটি এবং মামির বাবা-মাও ছুটে আসে। মানিক মামার পরিবারের সবাইকে একত্রে বহালতবিয়তে দেখে মুহূর্তেই শঙ্কামুক্ত হয়। যেমন আশা করেছিল, মানিককে পেয়ে তার চেয়েও বেশি খুশি মামার গোটা পরিবার। মামা সবে অফিস থেকে ফিরেছে। জামাকাপড় ছাড়েনি এখনো। অন্যদিকে মবারক খাঁ যে জামাইয়ের বাসায় আশ্রিত, সেটা তার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা ঘরোয়া চেহারা দেখেও বুঝতে পারেনি মানিক। তাই নিজের কুশল সংবাদ বলার আগে অবাঙালি ছেলেটিকে সঙ্গে আনার কারণ সংক্ষেপে জানায় সে। লঞ্চের অবাঙালি বনাম মুক্তিযোদ্ধা অপারেশনের ঘটনার নির্বিকার উল্লেখ করে শুধু বাচ্চাটির চরম অসহায় দশা বোঝানোর জন্য। কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যায় মামার পরিবার।

মামা আবার জিজ্ঞেস করে, 'আগে বল তুইও কি মুক্তিযোদ্ধা?'

'হ্যাঁ মামা, ইন্ডিয়া থেকে ফিরলাম। মুক্তিযোদ্ধা তো বটে, তবে আমার যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।'

মানিক তো সত্যি জবাব দেয়, কিন্তু শোনায় হেঁয়ালির মতো। মামার শ্বশুর বিষণ্ন, প্রায় কান্নার কণ্ঠে কথা বলে, 'লঞ্চেও অবাঙালি মেরে এসেছ। তোমাদের এনিমি তো এ ঘরেও হাজির আছে ব্রাদার।'

'নানাজি, যারা অবাঙালি মেরেছে তাদের সমর্থন করতে পারিনি বলেই তো আপনাদের কথা ভেবে বাচ্চাটাকে সাথে নিয়ে এলাম। ও তো মোটেই বাংলা বলতে পারে না, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখুন তো নানি, কী করা যায় ছেলেটাকে নিয়ে।'

উর্দুতে কথা বলতে হবে বলেই হয়তো সস্নেহে ছেলেটিকে নিজেদের ঘরে টেনে নিয়ে যায় মবারক খাঁ ও তার স্ত্রী। পিছু নেয় কৌতূহলী মামাতো বোন দুটিও। মামা চা-নাশতা দেওয়ার কথা বলে জামাকাপড় ছাড়তে যায়। মানিককে ফিরে পাওয়ার খুশি, চেয়ে দেখার সুখ যেন মেটে না মামির। ইন্ডিয়া গিয়েও নিভৃতে এই মহিলার কথা মনে হয়েছে অনেকবার, বলবে নাকি কথাটা।

'যুদ্ধে যাইয়া এ কী চেহারা হয়েছে তোমার! গরম পানি করে দিচ্ছি, তুমি গোসল করো। খাওয়া-দাওয়া করে আগে রেস্ট নাও, তারপর তোমার মুক্তিযুদ্ধের কেচ্ছা শোনা যাবে।'

মোহাম্মদপুরে নিজবাড়ি থাকা সত্ত্বেও মামার বাসায় তার শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখে অবাক হয়নি মানিক। কারণ একমাত্র মেয়ে ও নাতনিদের প্রতি তাদের দুর্বলতা জানে সে। কিন্তু এবারের আসা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলতাটি যে ভিন্ন, সেটা বোঝাতে মামাই প্রথম মানিককে শোবার ঘরে ডেকে নেয়।

যুদ্ধের নয় মাস অফিস-সংসার নিয়ে মামা শ্বশুরকুলের সাহসে ঢাকায় নিরাপদে ছিল। বউ-বাচ্চা নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকার কথা ভেবেছিল কয়েকবার, কিন্তু শ্বশুরই পালাতে দেয়নি। শেষদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি চারদিক থেকে ঢাকা আক্রমণ শুরু করলে, বোমারু বিমানের ওড়াউড়ি দেখে খুব টেনশন হয়েছিল। পাকবাহিনীর পরাজয়ের মুখে ভয়ও পেয়েছিল মবারক খাঁ। মেয়েজামাইকে নিজবাড়িতে রেখে সস্ত্রীক করাচিতে ছেলের কাছে যাওয়ার চিন্তা করেছিল। কিন্তু মামা-মামি তখন রাজি হয়নি। সাহস দিয়েছে। কারণ আর কেউ না জানলেও মানিক তো জানে, গোড়া থেকেই তার আমিন মামা মুজিব ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কট্টর সমর্থক। ইন্ডিয়া পালায়নি, মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখেনি, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও বিজয়ে বিশ্বাস ছিল ষোলোআনা। অন্যদিকে অবাঙালি হয়েও স্বাধীন দেশে বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আপত্তি ছিল না মবারক খাঁরও। বাংলা সে চমৎকার বলে। কাজেই বিনা দোষে সে নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাবে কেন? কিন্তু বিজয়ের পর মামার আনন্দোল্লাস একদিনও টেকেনি। কোথায় স্বাধীন দেশ পাওয়ার ফুর্তিতে বুক ফুলিয়ে এখন ঘুরে বেড়াবে, তা না, উল্টো শ্বশুর-শাশুড়িকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। স্ত্রীর সামনেই তার বাবা-মাকে আপদ প্রমাণের চেষ্টা করে সে।

'এদের নিয়ে এখন কী করি বল তো মানিক। মুক্তিরা কখন যে এ বাসাতে এসেও হানা দেয়। বাড়িঅলাটি ভালো বলে এখনো অঘটন কিছু ঘটেনি। তার ওপর তুই আর একটা আপদকে নিয়ে বাসায় তুললি।

'আমি ভেবেছিলাম ছেলেটাকে মোহাম্মদপুরে নানার বাসায় আপাতত রাখা যাবে। কিন্তু উনি যে নিজের বাড়ি ছেড়ে আপনার এখানে উঠেছেন ভাবিনি।'

'আমার এখানে উঠেও শেষ রক্ষা হবে কি না জানি না। বাড়িটাই এখন তার জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে উঠেছে।'

মামি সমস্যাটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিয়ের পর মামা ঘরজামাই হয়ে থাকবে না বলে আলাদা বাসা ভাড়া নিয়েছে। ওদিকে অত বড় বাড়ি নিজের দরকার নেই বলে নিচতলাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নওয়াবপুরের ইলেকট্রনিকস ব্যবসায়ী ইব্রাহিমকে ভাড়া দিয়েছিল মবারক খাঁ। কুমিল্লার মানুষ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, মবারক খাঁকে আপন বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করত। ইব্রাহিমের এক ছেলে ইন্ডিয়া গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে, তার ভায়রার ভাই ঢাকায় আওয়ামী লীগ দলের পাতিনেতা। এসব জানার পরও ভাড়াটিয়াকে একদিনের জন্য শত্রু ভাবেনি মবারক খাঁ। উপরন্তু যুদ্ধের সময়ে তাদের এক আত্মীয়কে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য মবারক খাঁ নিজস্ব চ্যানেলে তদ্বিরও করেছে। যুদ্ধের সময় ব্যবসা খারাপ বলে ছয় মাসের ভাড়া দেয়নি ইব্রাহিম। তারপরও ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের চেষ্টা করেনি মবারক খাঁ। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস, দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই দিন না কাটতেই শ্রদ্ধেয় বাড়িঅলাকে পাকবাহিনীর কোলাবোরেটর সাব্যস্ত করে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছে। তার ছেলে মুক্তিবাহিনী এনে অপমান করে নিজ বাড়ি থেকে এক বস্ত্রে বের করে দিয়েছে মবারক খাঁ ও তার স্ত্রীকে। মেয়ের বাসায় উঠেও স্বাভাবিক হতে পারছে না তারা। চাকরিসূত্রে পাওয়া সরকারি প্লটে সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তোলা বাড়ি এভাবে হারাতে হবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। বাড়ি হারানোর চেয়েও বাবুজির বড় দুঃখ, মানুষ এমন বেইমান নিমকহারাম হয় কীভাবে।

পিতার দুঃখ ধারণ করে মামির চোখে যতটা অশ্রু গড়ায়, মানিকের সহানুভূতি জাগে আরো বেশি। মামাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ওই ভাড়াটিয়ার সঙ্গে দেখা করেননি মামা?'

'ওরা তো বাড়ি দখলের জন্য শুধু শ্বশুরকে নয়, আমাকেও পাকবাহিনীর কোলাবোরেটর প্রমাণের চেষ্টা করছে। কোন দিন যে সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে আমাদের দুজনের বুকে গুলি চালায়! এই অবস্থায় তুই এসে পড়ায় খুব বল পাচ্ছি মানিক।'

মামি বলে, 'আমার কি মনে হইতেছে জানো, আমাদের বিপদে আল্লাহই মানিককে পাঠায় দিলেন। নইলে ইন্ডিয়া হইতে সোজা আমাদের বাসায় সে আসবে কেন?'

এই অবস্থায়, আমি তো কিছুই করতে পারব না — বলা যায় এ রকম? শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানার কথা মনে পড়ে মানিকের। মুক্তিযোদ্ধারা এখনো তাকে জীবিত রেখেছে কী মেরে ফেলেছে জানে না। মামা এ রকম সমস্যায় আছে জানলে অবাঙালি ছেলেটাকে সঙ্গে আনত না সে। ছেলেটিকে উদ্ধার করে আনায় বাড়ি উদ্ধার করার ব্যাপারেও মুক্তিযোদ্ধা মানিকের ওপরে স্বভাবতই বাসায় সবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাশা আরো বাড়বে। কিন্তু কী ভূমিকা পালন করবে মানিক?

মামা মানিকের সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ বাড়াতে অফিসের সমস্যা বলতে থাকে।

'সমস্যা শুধু বাসায় না মানিক। শ্বশুরের কারণে অফিসে আমার ঘনিষ্ঠ কলিগদের কয়েকজন আমাকে পাকিস্তানি দালাল প্রমাণের চেষ্টা করছে। আমি বিহারি মেয়েকে বিয়ে করেছি, শ্বশুরের খুঁটির জোরে প্রমোশন পেয়েছি, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অফিস করেছি, অতএব আমি হয়ে গেছি পাকিস্তানি দালাল। ঘনিষ্ঠ কলিগদের মধ্যেই কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে এরকম প্রোপাগান্ডা করছে। আর ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল যারা, তারা এখন সবাই মুক্তিযোদ্ধা। এমন এক মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে প্রবাসী সরকারের খাস লোক দাবি করে জুনিয়র হয়েও আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছে। এই স্বাধীনতা কি আমরা চেয়েছি মানিক?'

'সরকার তো এখনো সবকিছু কন্ট্রোলে আনতে পারেনি মামা। শেখ মুজিবের খবর এখনো সঠিক জানা যাচ্ছে না, সবকিছু শৃঙ্খলায় আনতে কিছু সময় তো লাগবে।'

'এদিকে তাজউদ্দীনের নতুন সরকার প্রতিদিনই নতুন অর্ডার জারি করছে। সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে দিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কষ্ট করতে হবে সবাইকেই। এগুলো না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আর সুযোগসন্ধানী ক্রিমিনালদের কন্ট্রোলে রেখে আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে না পারলে, স্বাধীন দেশে কেউই আমরা শান্তিতে ঘুমাতে পারব না মানিক।'

স্বাধীন দেশে পা রাখার পর থেকেই তো দেশের জন্য ভালো কিছু করার আবেগ মানিকের ভেতরে টগবগ করছে, কিন্তু মানিক কোন পথে যাবে, কী করবে — কিছুই স্থির করেনি এখনো। অসহায় মামাকে তবু জোর গলায় সান্ত্বনা দেয়, 'সব ঠিক হয়ে যাবে মামা। স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়াই তো বাঙালি জাতির বড় অর্জন। এখন স্বাধীনতাকে ধরে রেখে দেশটাকে গড়ে তোলার জন্য আসলে শেখ মুজিবের মতো নেতা দরকার।'

'হ্যাঁ, মুজিব ছাড়া এই স্বাধীনতা কতদিন থাকবে, কার কী কল্যাণ করবে কে জানে। যাক, তুই ফিরে আসায় আমি তবু অনেকটা বল পাচ্ছি মানিক। তুই এ কয়দিনে দেখ ঢাকায় কিছু চেনা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের খুঁজে পাস কি না। আমি বাড়িঅলাকে নিয়ে কলাবাগানেই আওয়ামী লীগের এক লিডারের সঙ্গে যোগাযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছি। ওই ভাড়াটিয়া শালা যে দলবল নিয়ে আব্বাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, তার চেয়েও বেশি দলবলের ক্ষমতা দেখিয়ে মোহাম্মদপুরের বাড়িতে আমাদের উঠতে হবে। আমার বাবা হোক, আর শ্বশুরই হোক, পাকিস্তানের সমর্থক হওয়াটা যদি তাদের অপরাধ হয়, তবে তার বিচার হবে। তাই বলে আসল মালিককে মেরে ফেলে বাড়ি দখলের ষড়যন্ত্র! স্বাধীন দেশ কি মগের মুল্লুক হবে নাকি?'

লঞ্চের অপারেশনের মতো আর একটা অবাঞ্ছিত অপারেশনে জড়িয়ে পড়ার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না মানিকের। তাছাড়া বাড়িতে ফেরার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মামাকে এই অবস্থায় একা ফেলে পালানোটা ভীরুতা নয় শুধু, বড় স্বার্থপরের কাজ হবে। মানিকের কাছে আরো সাহস ও সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য মামি তাকিয়েই আছে তার দিকে।

'তোমার মামা এখন শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছে। বিজয় হওয়ার আগে থেকেই যদি আমরা মোহাম্মদপুরের বাড়িতে থাকতাম, তাহলে এই বিপদ হতো?'

'চিন্তা করবেন না মামি। মামা তো ঠিকই বলেছে, অন্যের সম্পদ দখল আর লুটপাট করা তো মুক্তিযোদ্ধার কাজ হতে পারে না। মামা চেষ্টা করছে, দেখি, আমিও কতদূর কী করতে পারি।'

AMARBOI.COM

মামাতো বোন বীণা ও মিনাকে ডেকে, ওদের সঙ্গে গল্প করে বাসার পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে মানিক। নিজেও ভুলে থাকতে চায় সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার নানা উৎপাত, সামাজিক বিশৃঙ্খলার দুর্ভোগ। মামার মেয়ে দুটি, বিশেষ করে ছোটটির দিকে তাকালে যে কেউ বলবে, বড় হলে মেয়েটি মায়ের মতো বা মায়ের চেয়েও সুন্দরী হবে। কোনো জাদুবলে এক যুগ পরের ভবিষ্যৎকে যদি এখনই এগিয়ে আনা যেত, তাহলে কাজী আফতাব চেয়ারম্যানকে নাতির জন্য বাইরে মেয়ে খুঁজতে হতো না। মানিকও সম্ভবত অমত করত না। একঘেয়েমি কাটাতে মানিক যখন ছোট বোনদের মাঝে তাদের মায়ের সৌন্দর্য খোঁজে, বীণাই আবার মনে করিয়ে দেয় বাইরের সমস্যার কথা।

'ভাইয়া বিহারি ছেলেটার কী করবে? ওর নাম রব্বানি, বাংলা পড়তে পারে না, বলতেও পারে না।'

সমস্যা যেহেতু মানিকই তৈরি করেছে, সমাধানের উদ্যোগও সে-ই নেয়। মিরপুর বা মোহাম্মদপুর এলাকায় আশ্রিত অবাঙালিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে ছেলেটিকে রেখে আসার প্রস্তাব করে সে। মামার শ্বশুরকুলের সবাই আপত্তি জানায়। ষোলোই ডিসেম্বরের পর মোহাম্মদপুর হাই স্কুলে অনেক অবাঙালি আশ্রয় নিয়ে একজোট হয়ে আছে। মিরপুরেও একজোট হয়ে আছে ওরা, অনেকের হাতেই অস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এখনো ওদের ভুল বোঝাবুঝি এবং গুলি ছোড়াছুড়ি চলেছে। ইন্ডিয়ান আর্মি ওদের পাহারা দিয়ে না রাখলে অবস্থা হয়তো আরো খারাপ হয়ে যেত। জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। এই অবস্থায় মানিক রব্বানিকে নিয়ে তার আত্মীয়স্বজনের খোঁজে ওসব এলাকায় গেলে নিজেও মহাবিপদে পড়তে পারে। মানিককে তেমন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে কেউ রাজি নয়।

মামি পরামর্শ দেয়, 'তার চাইতে এক কাম করো মানিক, ওকে মিরপুর রোডে বা নিউমার্কেটের কোথাও ছেড়ে দিয়া আসো, বাসা খুঁজে আর আসতে পারবে না। আল্লাহ যদি স্বাধীন বাংলাদেশে ওর হায়াত দিয়ে থাকে, বাঁচবে।'

মামির মা উর্দু বলার ভয়ে কথাবার্তা বোধহয় কমিয়ে দিয়েছে। ধার্মিক মহিলা, হাতে তসবি। সে-ই মেয়ের কথায় প্রতিবাদ করে, 'নেহি সামিয়া, বাঙালি বেহারি যো ভি হউক, কুত্তা-বিলাই তো নেহি, ইনসান। মানিক ভেইয়া এনেছে, আমরা এখনই ওকে রাস্তা মে ছোড় দিতে পারি না।'

মবারক খাঁ স্ত্রীকে সমর্থন করে বলে, 'মুক্তিবাহিনী ওর বাবা-মাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। মানিক ব্রাদার আমাদের জন্য ওকে গিফট হিসেবে আনছে, ওকে রাস্তায় মরণের মুখে ছেড়ে দিলে ব্রাদার নাখোশ হবে, বাঙালিরা কেউ এখন এর দায়িত্ব নেবে না। বাচ্চাটাকে বাঁচানোর কোশেশ না করায় আমাদের আফসোস হোবে। তার চেয়ে আমাদের সাথে লুকায় থাক কয়দিন, আমরা বাঁচলে ওর একটা উপায় জরুর হবে।'

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে এনে মানিক নিজের ভেতরের মানবতা মহানুভবতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল হয়তো। কিন্তু অবাঙালি হত্যার দায় মানিকের ওপরেও চাপিয়ে, মানিককেও তার বাড়ি জবরদখলকারী মুক্তিবাহিনীর একজন ভেবেই কি মবারক খাঁ প্রচ্ছন্ন বাঙালিবিদ্বেষ দেখাচ্ছে? বাঙালি সত্তায় অভিমান জাগে মানিকেরও।

'আমি যখন এনেছি, বাচ্চাটাকে আমি গ্রামের বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারব নানাজি। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর দায়িত্ব কোনো বাঙালির পক্ষে না নেওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ লিবারেশন পিরিয়ডে প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব বিহারি পাকিস্তান ও পাকবাহিনীর পক্ষেই ছিল। গত নয় মাসে বাঙালিদের ওপর তারাও তো কম জুলুম করেনি। ওদের হাতে হাজার হাজার নিরপরাধ বাঙালি মরেছে। কাজেই এখন মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কিছু বাড়াবাড়ি তো করতেই পারে। তার ওপর শেখ মুজিব এখনো মুক্তি পায় নাই।'

'মুজিব নাই বলিয়াই তো তোমাদের দায়িত্ব এখন অনেক বেশি। মুজিব ফেরে নাই, কিন্তু তুমি তো ইন্ডিয়া থেকে ফিরলে। তোমাদের হাতে ইন্ডিয়ান আর্মিও আছে, তুমি আমার ন্যায়বিচার করো।'

'আরে আমি কী বিচার করব! আপনি তো আপনার বেয়াইয়ের মতো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বা রাজাকার-আলবদর ছিলেন না। নাকি ছিলেন নানাজি?'

'ওই মাসুম বেহারি বাচ্চার যে অপরাধ, আমারও একই অপরাধ মানিক। আমার ছেলে করাচিতে, অবাঙালি এমনকি আর্মিতেও আমার বন্ধুবান্ধব ছিল। তুমি বলো, এ জন্য কি আমার এই শাস্তি পাওনা হইতে পারে?'

মানিকের সমর্থন সহানুভূতি পেয়ে মবারক খাঁ নিজেকে ফিরে পায় যেন। কথা বলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

'শোনো মানিক, আমি দীর্ঘদিন পাকিস্তানি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিলাম। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর আইনের শাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত না হলে সামরিক বাহিনী দিয়ে স্টিম রোলার চালিয়ে দেশ শাসন করা যায় না, আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খানের পতনে তো সেটা প্রমাণ হইল। তোমাদের প্রবাসী সরকার ঢাকায় ফিরে শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে হুকুম জারি করেছে, নন-বেঙ্গলিদের ৩৫ লাখ টাকার ঊর্ধ্বে সব মিলকারখনা-প্রপার্টি সরকার নিয়ে নিছে। কিন্তু মোহাম্মদপুরে আমার সরকারি প্লট ও বাড়ির মূল্য তো এত টাকা হবে না। আমি অ্যাবসেন্টও নই। আমাকে হত্যার হুমকি দিয়া উৎখাত করে আমার বাড়ি দখল কি তোমার দৃষ্টিতে কোনো অন্যায় না?

'অবশ্যই অন্যায়।'

'ওই লোক আই মিন আমার ভাড়াটিয়া ইব্রাহিম শেখ মুজিব ও মুক্তিযোদ্ধার নাম ভাঙাইয়া এসব করছে, এ রকম লোকের বিরুদ্ধে কি তোমাদের কিছু করার নেই?'

'অবশ্যই আছে। মামা তো চেষ্টা করছে, আমিও দেখছি নানাজি কী করা যায়।'

মবারক খাঁ এবার মানিকের হাত চেপে ধরে আবেগময় কণ্ঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরজি জানায়।

'তাহলে তুমি আমার বাড়িটা উদ্ধার করে দাও ব্রাদার, স্বাধীন বাংলাদেশে আমার মতো নিরপরাধ বাঙালিরা যাতে দেশটাকে আপন ভেবে বসবাস করতে পারে, সে রকম আইনকানুন করে দাও। আমাকে যদি স্বাধীন বাংলাদেশের শত্রু ভাবো, আমি করাচিতে ছেলের কাছে গিয়াও থাকতে পারব। মেয়েজামাইকে নিজের বাড়িতে রেখে যেতে পারলেও সান্ত্বনা পাব।'

'এত উতালা হচ্ছেন কেন! নানাজি, হবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শারীরিক উপস্থিতি এবং মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া মামার পারিবারিক সংকট মোচনে মানিক করার কিছু খুঁজে পায় না। মামা দল-বল বাড়ানোর কথা বলেছে। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যায় সে। পরিত্যক্ত বধ্যভূমির মতো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এখনো সুনসান নির্জনতা। পরিচিত সহপাঠী মুখচেনা ছাত্রনেতাদের কাউকেই খুঁজে পায় না সে। দল বেঁধে যেসব যুবক এখানে সেখানে আড্ডা দেয়, চলাফেরা করে হেঁটে কিংবা গাড়িতে, ওরা নিশ্চয় মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু আত্মপরিচয় দিয়ে ওদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আগ্রহ বা সাহস নিজের ভেতরে খুঁজে পায় না মানিক। ক্ষমতাসীন দলবল বলতে একমাত্র পরিচিত জন মশিয়ার আক্কেল এমএনএ ভরসা। কিন্তু মামার শ্বশুরকে সাহায্য করতে তাকে খোঁজার চেয়ে একা একা দুর্বৃত্ত ভাড়াটিয়াকে মোকাবেলা করাও বরং সহজ মনে হয়।

বিজয়ের মাস শেষে, স্বাধীনতা নতুন বছরে পা রাখায় মানিকও নিজের জীবন নতুন করে শুরু করতে উদগ্রীব। এক অবাঙালি মবারক খাঁকে সাহায্য করার চেয়ে বাঙালি জাতির জন্য অনেক কিছু করার প্রেরণা কাজ করে ভেতরে। কিন্তু মানিক ঠিক কী যে করবে, তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গ্রামে ফেরাটা জরুরি মনে হয়। এমনিতে মামার বাসায় ঝামেলা, তার ওপর চুপচাপ বসে থাকার একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠছে সে।

জানুয়ারির তিন তারিখে হঠাৎ বিবিসির খবর শুনে মানিক বেজায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেছে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হবে। মুজিব কবে মুক্তি পাবে, কোনদিন দেশে ফিরবে, সঠিক খবর কেউ কিছু জানে না। কিন্তু মুজিব পাকিস্তানি কারাগারে এখনো জীবিত, বিশ্ব জনমতের চাপে তাকে ইয়াহিয়া ফাঁসি দিতে পারেনি, ভুট্টোও পারবে না এবং জীবিত শেখ মুজিব দেশে ফিরবে শিগগির — এই খবরে গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরেই যেন আনন্দের বন্যা শুরু হয়। পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পর স্বাধীনতা পাওয়ার খুশিতে জাতির প্রাণে আবগের ঢল নেমেছিল, মুজিবের মুক্তির খবরে বাঙালির মুক্তির আবেগ-আনন্দ যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর জাতির আবেগ-অনুভূতির শরিক হয়ে মানিকেরও একাকিত্ব যেন অনেকটাই কেটে যায়।

বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁকা গুলির শব্দ আর সমবেত কণ্ঠের বিজয়ধ্বনি শুনে মামার বাসায় পালিয়ে থাকা স্বজনদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। মানিক তাদেরকেও খুশির ভাগ দেওয়ার জন্য বলে, 'ও নানাজি, আর কোনো ভয় নেই। মুজিব দেশে ফিরলেই দেখবেন সব টেনশন কাটবে, বিশৃঙ্খলাও কেটে যাবে।'

'আমিও তাই আশা করছি মানিক ভাই। এটা খুব সুখবর, মুজিব ছাড়া এই বাংলাদেশ কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না।'

মানিক বাড়িতে যাওয়ার জন্য মামার অনুমতি চায়, 'ও মামা, আমি এর মধ্যে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি?'

'যাবি কী করে? এখনো তো রাস্তাঘাট ভাঙা, বাস-ট্রেন ঠিকমতো চলছে না। আর কটা দিন দেখ, তুই থাকায় তবু নিশ্চিন্তে অফিস করতে পারছি।'

মামার শ্বশুরও মানিককে আটকে রাখার জন্য বলে, 'এত বড় একটা সুখবর শোনাইলি, নেতা আগে স্বাধীন দেশের মাটিতে ফিরে আসুক, আমাদের জানমালের হেফাজতের দায়িত্ব মুজিব নিজের হাতে তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ছি না ব্রাদার।'

মানিকেরও মনে হয়, মুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবকে না দেখে গেলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ তার কাছেও অপূর্ণ থেকে যাবে। তা ছাড়া দেশে ফিরে নেতা স্বাধীন দেশবাসীকে কী নির্দেশনা দেয়, সেটা জানাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবের লন্ডনে পৌঁছার খবর প্রচারিত হওয়ার পর নেতাকে ফিরে পাওয়ার অপেক্ষায় দেশের মানুষ আরো অস্থির ও উদ্বেল হয়ে ওঠে। মানিকও মামার বাসায় আর চুপচাপ থাকতে পারে না। মামিকে জানিয়ে দেয় সে, মুজিবকে দেখেই মানিকও গ্রামে ফিরে যাবে। এর মধ্যে তার কিছু করার নেই বলেই হয়তো যশোরের মাস্টারদার দেওয়া গোপীবাগের ঠিকানাটির কথা মনে পড়ে। ঢাকায় এসেও মানিক যাতে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, সে জন্য তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেব নামের অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা বলেছিল। চিঠিও লিখে দিয়েছিল একটি। চিঠিতে মাস্টারদা তার সম্পর্কে কী লিখেছে, খুলে দেখেনি মানিক। চিঠির প্রাপক ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলে মাস্টারদার রাজনীতি ও সমাজসেবা সম্পর্কে হয়তো আরো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। বিকেলে মানিক গোপীবাগের সেই বাসাটির দিকে রওনা দেয়।

আজিজ সাহেব বাসাতেই ছিল। বছর চল্লিশ বয়সের হাসিখুশি ভদ্রলোক।

পরিচয় দিতেই উচ্ছ্বসিত গলায় বলে, 'আরে আপনি! ঠিকানা থাকলে আমি নিজেই আপনাকে খুঁজে বের করতাম।

আজিজ সাহেবের স্ত্রীও বেরিয়ে এসে জানতে চায়, 'বিহারি বাচ্চাটার কী করলেন?'

'মামার বাসাতেই রেখেছি। মামা তো ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছে। কারণ তার বিহারি শ্বশুরের মোহাম্মদপুরের বাড়িটা মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে। ওরা সবাই মামার ভাড়া বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।'

আজিজ সাহেব সখেদে বলে, 'চারদিকে যা অবস্থা! এর চেয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি যদি ওপেনলি ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রশাসন চালু করত, তাহলে অন্তত ষোড়শ ডিভিশনের এমন দাপট থাকত না।

'ষোড়শ ডিভিশন মানে?'

'ষোলো তারিখের পর দেশে এখন কত মুক্তিযোদ্ধা দাঁড়িয়ে গেছে দেখছেন না! অস্ত্র হাতে বড় ক্রিমিনাল রাস্তায় ঘুরলেও লোকে তাকে ভাবছে মুক্তিযোদ্ধা। সেদিন আমাদের ব্যাংকে একদল এসেছিল। যেহেতু আমাদের হাবিব ব্যাংক, পাকিস্তানি প্রাইভেট ব্যাংক, এর মালিক পাকিস্তানি, তাই এ ব্যাংকের সব টাকা তারা চায়। নতুন সরকারের অর্ডার ও কাগজপত্র দেখিয়ে রক্ষা পেয়েছি।'

মানিকের কাছে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো খবর তো এখন একটাই। মুজিব প্রত্যাবর্তনের বাসি খবরটা শুনিয়ে বলে সে, 'মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব তো এখন লন্ডনে। দু-এক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবেন তিনি। আমার মনে হয় শেখ মুজিব দেশে ফিরলেই অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।'

আজিজ সাহেব খোঁচা দিয়ে বলে, 'আপনিও দেখছি মহা মুজিব ভক্ত!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুধু আমি নই, বাঙালিমাত্রই তো এখন শেখ মুজিব নামে অজ্ঞান। ঠিক না বলেন?'

'হ্যাঁ, ভক্ত বাঙালি অনেকে অলরেডি হতাশ হতে শুরু করেছে। দেশের মাটিতে পা রাখার আগে দিল্লিতে নামবে শেখ মুজিব। তারপর দেশে ফিরলে ক্ষমতা তার হাতে কনসোলিডেটেড হবে অবশ্যই, কিন্তু তাতে স্বাধীনতা কতটা মিনিংফুল হবে আর কোন শ্রেণি বেশি লাভবান হবে, এসব বিষয় নিয়ে মাস্টারদার সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে নিশ্চয়।'

'মাত্র দুদিন ছিলাম ওনার সঙ্গে। খুব ইন্টারেস্টিং আর রহস্যময় মানুষ মনে হয়েছে ওনাকে।'

'চিঠিতে আপনার খুব প্রশংসা করেছে। ঢাকায় একজনের সঙ্গে আপনাকে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে।'

'আপনি বোধহয় তার অনেক দিনের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, ছাত্রজীবন থেকেই চিনি। মাস্টারদার মতো লোকের ডেডিকেশন ও স্ট্রাগল প্রেরণা দেয় আমাকে। নিজে তো আদর্শের জন্য ওদের মতো হতে পারি না। চাকরি-সংসার করেও যতটা পারি ওদের দলকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।'

'মাস্টারদা কিন্তু তার দলের কথা আমাকে তেমন কিছুই বলেনি।'

'উনি তো ওপেন ফ্রন্টেই কাজ করেন। আপনাকে আগামীকাল একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, ওনার সঙ্গে আলাপ করলেও অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

মানিকের ভয় হয়, মামার বাসায় উঠে যেমন তার অবাঙালি আত্মীয়দের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছে, তেমনি মাস্টারদার লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো নতুন কোনো দায়িত্বে জড়িয়ে পড়বে। কারণ ইন্ডিয়া গিয়েও মানিকের মুক্তিযুদ্ধ করতে না পারার আক্ষেপ ঘোচাতে, নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার জন্য মানিককে বিপ্লবী দলের ক্যাডার বানাবার চেষ্টা মাস্টারদা এখনো ছেড়ে দেয়নি বোধহয়।

মানিক দ্বিধার সঙ্গে বলে, 'দেখুন, মাস্টারদাকে আমি বলেছি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমার কিছু সময় দরকার। দু-একদিনের মধ্যেই গ্রামে ফিরব আমি। ফিরে এসেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি। আপনাকে এ কথাটা বলার জন্যই আমি এসেছি।'

'ঠিক আছে আমি তাহলে মাস্টারদাকে তাই জানিয়ে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা-নাশতার পরও পারস্পরিক চেনাজানার সম্পর্ক আরো খানিকটা গভীর করে লোকটার কাছ থেকে বিদায় নেয় মানিক।

মামার শ্বশুরের বাড়ি পুনরুদ্ধারে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের অক্ষমতা আড়াল করতে মুজিবের অপেক্ষা ও তার প্রত্যাবর্তন দিবসের আবেগকেও কাজে লাগায় মানিক। অবশেষে দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখবে আজ। দিল্লিতে মুজিব যখন ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া সংবর্ধনায় আপ্লুত হচ্ছে, ঢাকা শহরের মানুষ তখন রাস্তায়-রেসকোর্সে জড়ো হতে শুরু করেছে। ভিড় হবে জানা কথা। কিন্তু এত ভিড় কল্পনাও করতে পারেনি মানিক। আগে এবং ভালো করে দেখার জন্য এয়ারপোর্টেও ছুটে গেছে অনেকে। এয়ারপোর্ট থেকে পুরো রাস্তাই লোকে লোকারণ্য। মানিক শুধু দেখতে চায় না, নেতার ভাষণও শুনতে চায়। ফার্মগেট থেকে হেঁটে, জনস্রোতের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে শাহবাগের কাছে এসে দাঁড়ায়। চারদিকে উপচানো ভিড়ের মধ্যে গাছে বাঁধা মাইকের চোঙটি এখন বড় ভরসা।

জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে মানিক ভাবে, একদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ এবং অন্যদিকে যুদ্ধের নয় মাসে রক্ত ঝরানো কষ্টের ভাগ নেতাকে দেওয়ার জন্যই একত্রিত হয়েছে সবাই। মানিক নিজের ভেতরেও সেই কষ্ট বোধ করে। মনে হয়, নয় মাসের অমানিশা পেরিয়ে স্বাধীন দেশের প্রভাতে মুজিবকেই মুক্তির সূর্য হিসেবে দেখে প্রেরণা পেতে চায় মানুষ। মানিক নিজের ভেতরেও অদ্ভুত এক প্রত্যাশার শিহরণ অনুভব করে। মানিকের মুজিবপ্রীতির আবেগ দেখে মাস্টারদাও খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'পেটি বুর্জোয়াসুলভ ভাবাবেগটাই দেশপ্রেম নয় মানিক, দেশের শোষিত সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি এই ভাবাবেগের দেশপ্রেম দিয়ে আসবে না।' কিন্তু নেতার জন্য লক্ষ কোটি মানুষের এই ভালোবাসার ভাবাবেগ কি মিথ্যে? এই আবেগের শক্তি ছাড়া স্বাধীন হতে পারত দেশটা? অন্যদিকে কোনো মানুষ দেশবাসীর ভালোবাসার ভাবাবেগে এত বড় নেতা হয়ে উঠলে, দেশ ও জনগণের স্বার্থ ছাপিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থ বা সুখভোগ কি বড় হয়ে উঠতে পারে? মানিকের বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ মানুষের এমন ভালোবাসা পাওয়ার চেয়ে বড় অর্জন এক ব্যক্তির জীবনে আর কী-বা হতে পারে?

নেতাকে দেখার ও ভাষণ শোনার দীর্ঘ অপেক্ষার সময়টাতেও দেশ ও নেতাকে নিয়ে হাবিজাবি ভাবে মানিক। প্লেন থেকে নামার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর খোলা জিপে দাঁড়িয়ে ফুলের বৃষ্টির সঙ্গে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এয়ারপোর্ট থেকে রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছতে নেতার আড়াই-তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কাছাকাছি থেকে দেখার জন্য রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মানিক। কিন্তু ভিড়ের চাপে এতটাই পিছিয়ে পড়েছে যে, এখন আর ভিড় ঠেলে নেতার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার কোনো জায়গা খুঁজে পায় না। ভাষণ ভালো করে শোনার জন্য মাইকের চোঙটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

জয়ধ্বনি শান্ত হলে ভাষণ শুরু করে নেতা। ৭ই মার্চের ভাষণে কণ্ঠে যে তেজোদীপ্ত আওয়াজ ছিল, তা আজ নেই। আরো গভীর ও বিষণ্ন হয়ে উঠছে বজ্রকণ্ঠ। কারাগারে থেকে ৪২ পাউন্ড ওজন কমে গেছে। তার ওপর সাত কোটি মানুষের মুক্তির আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেগ নিজের মধ্যে ধারণ করে কথা বলা কি সহজ কথা! কথা বলতে বলতে কখনো-বা কান্নায় বুজে আসছিল গলা। বাংলা মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের, সন্তানদের সে বাঙালি করে রেখেছে, কিন্তু মানুষ করেনি। মুজিব তার ভাষণে কবিগুরুর উক্তিকে মিথ্যে প্রমাণ করতে আবেগময় কণ্ঠে স্বাধীনতার অধিকার অর্জনে সফল বাঙালিকে আজ মানুষ হওয়ার উদাহরণ হিসেবে দেখায়। মানিক একাগ্র হয়ে নেতার ভাষণে নিহিত সত্য বোঝার চেষ্টা করে।

AMARBOI.COM

মামার বাসায় রেডিয়োতেও নেতার ভাষণ নিশ্চয় সবাই শুনেছে। তারঃপরও জনস্রোতে ভেসে বাসায় ফিরে মানিক মবারক খাঁকে রিলে করে শোনায়, 'ও নানাজি শুনেছেন তো, মুজিব অবাঙালির ওপর হাত তুলতে না করে দিয়েছে সবাইকে।'

'মুজিবের কথা কি সব মুক্তিযোদ্ধা শুনবে মানিক ভাই?'

'শুনবে না মানে, মুজিবের কথায় লক্ষ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিলো, আর স্বাধীনতাকে রক্ষার আহ্বান শুনবে না! অবশ্যই শুনবে। আপনাদেরও তো বাঙালির সাথে মিশে যাওয়ার আহ্বান জানাল।'

'শুধু আহ্বান জানালে তো হবে না, মিলেমিশে থাকার সুযোগ ও পরিবেশ তো তৈরি করতে হবে।'

'আরে হবে, হবে, সব হবে।'

মানিক রাতের ট্রেনে বাড়ি ফেরার উদ্যোগী হলে মামা-মামি আবার বাদ সাধে। ইউনিভার্সিটি খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। মানিক রগড় করে জবাব দেয়, 'ইউনিভার্সিটি খুললেও মানুষ হওয়ার জন্য আর সেখানে ফিরে যেতে হবে না মামি। মুজিব ভাষণে বলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বাঙালির মানুষ না হওয়া সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি মিথ্যে করে দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা পেয়েই মানুষ হয়ে গেছে। আগে বাড়িতে গিয়ে দেখি, স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্য আর কী কী ছিনিয়ে আনা দরকার।'

শ্বশুরের বাড়ি উদ্ধারের দায়িত্ব একা মামার কাঁধ চাপিয়ে, দেশের জন্য আরো বড় ধরনের দায়িত্ব পালনের উৎসাহ নিয়ে বাড়িতে ফেরার জন্য মানিক ব্যাগ গোছাতে থাকে।

ছত্রিশ

উত্তরবঙ্গে যাওয়ার সবুজরঙা মেল ট্রেনখানা আগে যেমন ছিল, হুবহু তেমনি আছে। ট্রেনের গায়ে লেখা ইপিআর কেটে বাংলাদেশ রেলওয়ে হয়নি এখনো। তবে পূর্ব পাকিস্তানকে কবর দেওয়ার আনন্দে কোনো মুক্তিযোদ্ধা রেলকর্মী সম্ভবত দু-একটি ইপিআরের ওপর আলকাতরা মেরে দিয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে রাস্তাঘাট ব্রিজ-কালভার্ট বিপর্যস্ত এখনো। আগের মতো স্বাভাবিক ভিড় শুরু হয়নি। সদ্য স্বাধীন দেশে পুরনো নিয়মনীতি রক্ষার গরজ কম বলেই হয়তো ট্রেন ছাড়তে পাকা দু'ঘণ্টা লেট হয়।

অধিকাংশ যাত্রী টিকিট কাটার প্রয়োজন বোধ করেনি। মানিকের টিকিট কাটার টাকা রয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়ায় বিনা টিকিটে ভ্রমণের সুযোগ মনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশেও বিনা টিকিটে ভ্রমণ বৈধ হিসেবেই ভাবে সে। শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবে কি না, গন্তব্যে পৌঁছে কতটা শোক-দুঃসংবাদ ধারণ করতে হবে, তার আগে ট্রেনযাত্রাও লঞ্চের মতো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে কি না — কে জানে। তবে ভয়-দুর্ভাবনা মনে ঘেঁষতে না দেওয়ার জন্যই ট্রেনে চোখ বুজে মানিক সুন্দর কিছু একটার নেশায় আচ্ছন্ন থাকতে, মামির মুখখানা স্মরণ করে। মামিকে সরিয়ে দিয়ে আসমা এবং আসমাকে সরিয়ে দিয়ে মালতী, কোচবিহারের রাতটিকে আঁকড়ে ধরে ঘুমাতে চায়।

অবশেষে ইস্টিমারে যমুনা পেরোনোর পর, ফুলছড়ি ঘাট থেকেও ট্রেনখানা যেহেতু বহু ব্রিজ-কালভার্ট ও অনির্ধারিত স্টেশনগুলোতেও থেমে থেমে চলে, মানিকের আশা জাগে মেল ট্রেনখানা যেন তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থানা স্টেশনেও থামে। তাহলে দীর্ঘ বিলম্ব পুষিয়ে নিতে অন্তত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছতে পারবে। ইচ্ছে পূরণের খুশিতে এই প্রথম ঢাকা মেল থেকে পরিচিত গেঁয়ো স্টেশনটিতে নেমে পথের ক্লান্তি অনেকটাই কেটে যায়।

খবর দিয়ে এলে মানিককে বাড়িতে নেওয়ার জন্য সাইকেল নিয়ে স্টেশনে কেউ না কেউ থাকে। খবর না দিয়ে এলেও গাঁয়ের সাইকেলওয়ালা কাউকে না কাউকে পেয়ে যায়। মানিক তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়ার জন্য চারদিকে তাকায়। স্বাধীনতার আগে যেমন ছিল স্টেশনঘর এবং পেছনের দোকান ও হাটবাজার, এখনো তেমনি আছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী এই থানায় ক্যাম্প করেনি। যুদ্ধ ও ধ্বংসের চিহ্ন তাই চোখে পড়ছে না কোথাও। কয়েকটি দোকানে উড্ডীন পতাকায় স্বাধীন স্বদেশ, বাতাস না লাগায় নেতিয়ে জড়োসড়ো, ম্লান দেখায়। হাটবার হওয়ায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাটুরে মানুষের চলাফেরা। মানিকদের গ্রাম থেকেও অনেকে থানাহাটে আসে। বাড়িতে পৌঁছার আগেই গাঁয়ের খবর আগাম জানার জন্য মানিক গ্রামের হাটুরে মানুষ খোঁজে।

স্টেশনঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যে লোকটি, শীতের বিকেলেও তার কালো শরীর নাঙা। কাঁধে ঝোলানো ময়লা জামা, হাতে রাইফেলের মতো ধরা বাঁকখানা, ভার নিয়ে হাটে এসেছিল বোঝা যায়। ভারমুক্ত হয়ে শিশুর কৌতূহল নিয়ে স্টেশনঘরের টেলিগ্রাফ যন্ত্রটা দেখছে। মানিক পেছন থেকেও লোকটাকে ঠিক চিনতে পারে, ঢোঁড়া মোহাম্মদ।

'কী বাহে যাদু, তোমরা এইঠে কী করেন?'

'আউ! আউ! তোমরা কোটে থাকি আইলেন বাহে! তোমার খোঁজে তোমার বাপ যে আইজও রমপুরে এমেনের বাড়িতে গেইছে। হামরা তো ভাবিনো পরেশের মতো তোমরাও বুঝি মিলেটারির গুলি খায়া মরি গেইছেন।'

মানিকের মৃত্যু সম্পর্কিত ধারণাটিও এমন নির্বিকার বলে লোকটা, যেন সত্যি গুলি খেয়ে মরলেও তার কিছু যায় আসত না। ঢোঁড়ার কাছে বাড়ির আরো খবর জানার জন্য মানিক ব্যাকুল তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সে নিজের কথা বলে, 'হামার শেখের মামু নজিবর ভাইয়ের কোষ্টা ধেরি আসছিনু বাহে। গণ্ডোগোলের টাইমে কোষ্টা তো পাইকার-ব্যাপারীরা মাগনাও কিনতে চায় নাই। এলায় সউগ কোষ্টা ইন্ডিয়া মুখে যাবার নাগছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নজিবর চাচা কই?'

'আছে। ধরেন তো বাউস্কাখান, মুই ডাকায় আনো।'

নজিবরকে ডাকতে মানিকের হাতে বাঁশের 'বাউস্কা'খানা গুঁজে দিয়ে ঢোঁড়া মোহাম্মদ হাটের দিকে ছুটে যায়। মানিক কামলা-কিষানের ঘাড়ের জিনিস মাল বহনের বাউস্কা হাতে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করে। তবে ফেলেও দেয় না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হন্তদন্ত নজিবরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে ঢোঁড়া। বিস্ময়-খুশি নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না বলে মানিককে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদে। মানিক দুঃসংবাদ শোনার জন্য শক্ত করে মন।

'কী বাহে, আমাদের বাড়ির সবাই বেঁচেবর্তে আছে তো?'

'হ্যাঁ বাবা, সবাই ভালো আছে। আমি তোমার বাপকে বারে বারে কই, মানিক বাবাজি অবশ্যই ফিরি আসপে। এ আন্দাজ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানিরা জেলে কবর খুঁড়িয়াও মারতে পারে নাই। স্বাধীন বাংলাদেশ আর বাঙালির টানে মুজিব যখন ফিরি আইল, হামার মানিক বাবাজিও ফিরি আসবে অবশ্যই।'

দুদিন আগে শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অসংখ্য বিজয়-মিছিলে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল রাজধানীসহ গোটা দেশ। সেই আনন্দের রেশ যেন এখনো মিলিয়ে যায়নি নজিবরের মন থেকে। রেসকোর্সে শেখ মুজিবের ভাষণও নিশ্চয় রেডিয়োতে শুনেছে।

ঢোঁড়া মোহাম্মদ জানতে চায়, 'ভুঁইয়ার বেটা যে টেরেন থাকিয়া নামলেন, টেরেনখান কি ইন্ডিয়া থাকি আইল?'

'আমি এখন ঢাকা থেকে আসলাম যাদু। কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি ঢাকায় ফিরেছি। তারপর শেখ মুজিবকে রেসকোর্সে দেখে ভাষণ শুনে বাড়ি রওনা হয়েছি।'

'রেডিয়োতে ভাষণ শুনিয়াও বুঝনু, মুজিবের সেই বজরোকণ্ঠ নাই, ভাঙি গেইছে বাবা! শুনতে শুনতে আমিও কাঁদি ফেলাইছি। চলো বাবা, আগে হোটেলে বসি চা-নাশতা খাও। তারপাছে বাড়ি রওনা দেব।'

'না, আমি কিছু খাব না চাচা। কাজ হয়ে থাকলে চলেন যাই। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করব।'

'চলো তা হইলে।'

রেললাইন পেরিয়ে রাস্তার ধারের চায়ের দোকানটার সামনে এসে ঢোঁড়া হঠাৎ থামে, সঙ্গীদেরও থামায়। এক মণ পাট বহন করে আনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য নজিবরের কাছে তার এক কামলার দাম পাওনা হয়েছে। সেই পাওনা সে দাবি করত না, কিন্তু এখন ভুঁইয়ার বেটাকে এক কাপ চা খাওয়ানোর এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না বলে নজিবরকে জানায়, 'কামলার দাম না দিস তো মোকে চাইর আনা পইসা দে নজিবর ভাই, মুই ভুঁইয়ার বেটাকে এক কাপ চা না খিলায় যাইম না।'

মজলিশে বসে নিজের পাতে মাংস নিতে চাইলে কেউ যেমন পাশের জনকে দেওয়ার অনুরোধ জানায়, ঢোঁড়ার চা পানের ইচ্ছেটা প্রায় সেভাবে ধরা পড়ায় মানিক হাসে। সঙ্গীদের আপ্যায়ন করার মতো টাকা রয়েছে তার পকেটে, সে পাল্টা প্রস্তাব দেয়, 'চলেন চাজি, অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে, আগে এখানে বসে একটু চা-নাশতা খাই।'

চা পানের আগে ঢোঁড়া অবশ্য ঘাড়ের ময়লা জামাটা গায়ে চাপায়। বাঁকখানা ঘরের বেড়ায় হেলান দিয়ে রেখে ভদ্রলোক হয়ে বসে। মানিক চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের অর্ডার দিলে, বিস্কুটের বদলে ছোট পাউরুটি খাওয়ার প্রস্তাব দেয় ঢোঁড়া। কারণ হিসেবে বিস্কুটের দামে আকারে বড় এবং চায়ে চুবিয়ে পাউরুটি খাওয়ার মজার যুক্তিও দেয়। মানিক মেহমানের জন্য পাউরুটি এবং নিজের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে গ্রামের খবর বিস্তারিত জানার আগ্রহ দেখায়।

'তোমরা না মুক্তিযুদ্ধে গেছিলেন, তা তোমার হাতে আইফেল কই? হামার বাণ্টু মুক্তিফৌজ হয়া তার ঠ্যাং তো মাটিতে পড়ে না! কোনবেলা যে কাকে আইফেল দিয়ে গুলি করে।'

ঢোঁড়ার সঙ্গে তাল দিয়ে নজিবরও গাঁয়ের মুক্তিফৌজ ও রাজাকারদের নানা খবর উৎসাহভরে শোনাতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা অস্ত্র নিয়ে এবং অস্ত্র ছাড়াও ফিরে এসেছে সবাই। পাকবাহিনী নাই, হরিপুরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আর যত রাজাকার ছিল, সবাই পালিয়ে গেছে। পলাতক রাজাকারদের খুঁজে বেড়াচ্ছে মুক্তিবাহিনী। গত হাটবারে রাজাকার-কমান্ডার খোরশেদকে তিস্তার চরের এক বাড়ি থেকে ধরেছে মুক্তিবাহিনীরা। মরার আগে নিজে স্বীকার করেছে যে, রতনপুরের বাবুর বাড়ি যারা ডাকাতি করেছে, তার মধ্যে সেও ছিল। মুক্তিবাহিনী তামাকপুর চৌপথীর বটতলায় বিচার করেছে রাজাকার খোরশেদের। মারার আগে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে চামড়া কেটে খোরশেদের শরীরে লবণ দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। খোরশেদের মরণচিৎকার দু'মাইল দূর থেকেও শোনা গেছে। দেখার জন্য দশ গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছিল। রতনপুর থেকেও গিয়েছিল কেউ কেউ। ঢোঁড়া ধানকাটা কামে যাওয়ায় টাইম পায় নাই বলে যেতে পারেনি। কিন্তু বাণ্টুদের সঙ্গে নজিবরও গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণ্টুর মাও গিয়েছিল দেখতে। খোরশেদের ভূতের ভয়ে সেই বটতলা দিয়াও একলা মানুষ হাঁটে না আর।

রাজাকারের বিচার নয়, শরণার্থীদের খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করে মানিক। কিন্তু এ বিষয়ে ওরা মুখ না খোলায় শেষে সরাসরি জানতে চায়, 'আমাদের পরেশ কাকাদের বাড়ির আর খবর কী?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পরেশের খবর শোনায় নজিবর।

'হ্যাঁ বাবা, সব মুক্তিযোদ্ধাই ফিরি আসল। আইজ তোমরাও আসিলেন। খালি পরেশটা স্বাধীন দেশের মুখ দেখি যাইতে পারল না! এদিকে তোমার চিন্তায় তোমার বাপের মাথা খারাপ। নরেশকে ইন্ডিয়া পাঠায় দিছিল তোমার আর পরেশের বউ-বাচ্চার খবর নিতে। পরেশের বউ কয় যে, তোমরাও পলায় গিয়া মুক্তিফৌজে নাম লেখাইছেন!'

পরেশ কাকার পরিবারের সঙ্গে ইন্ডিয়া পালানোর ঘটনা স্মরণ করতে চায় না মানিক। গ্রামবাসী কাউকেই কিছু জানাবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু মালতী ফিরে এসেছে শুনে চমকে ওঠে। গ্রামে ফিরে নিশ্চয় সবকিছুই ফাঁস করে দিয়েছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চায় মানিক, 'পরেশ কাকার বউ এখন কোথায়?'

নজিবর বলে, 'নরেশ বিধুয়া ভাউজ্ আর ভাতিজাকে তো ফেলায় দিতে পারে নাই, সাথে নিয়া আসছে। বিধুয়া বউটার দিকে তাকাইলে দুঃখে বুক ফাটে বাহে।'

ঢোঁড়া মন্তব্য করে, 'সেটা তো ঠিকই। হামার বাউদিয়া সেরাজ ভাইয়ের বউ আর পরেশের বউয়ের একই দশা হইছে বাহে। মুক্তিফৌজের মাও ইচ্ছা করলে তবু ফের নিকা বসতে পারবে, কিন্তু হেঁদুর বউ বিধুয়া হইলে তো ফের বিয়া বসতে পারে না। হেঁদুরঘরে কেতাবে নিষেধ আছে। নয় কি ভুঁইয়ার বেটা?'

প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য মানিক বলে, 'বাণ্টু বক্কর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এখন আমাদের বাড়িতে থাকে না? করে কী?'

এরপর চায়ের দোকান থেকে শুরু করে, গোটা হাঁটাপথ জুড়েই বাণ্টু ও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কীর্তি-কাহিনী শোনায় দু'জন। মুখে হুঁম হ্যাঁ করলেও, মানিকের ভেতরে ইন্ডিয়া ফেরত দুঃখিনী মালতী সারাক্ষণ জেগে থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করবে কি করবে না — এই সিদ্ধান্তটাও চট করে নিতে পারে না সে।

দিনের আলোয় অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধা বাণ্টুদের গ্রামে ফেরার ঘটনা যে রকম সাড়া জাগিয়েছিল, মানিকের ক্ষেত্রে সে রকম ঘটে না, তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভ্যর্থনা পাওয়ার ইচ্ছেও জাগেনি তার ভেতরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সঙ্গী নজিবর ও ঢোঁড়া মোহাম্মদের হাঁকডাকে কাছারিঘর থেকে বাংটুই বেরিয়ে আসে প্রথম।

মানিক ভাইজান ফিরছে! উল্লসিত চিৎকারের সঙ্গে সে জড়িয়ে ধরে মানিককে। বৈঠকখানায় আরো কয়েকজন যুবক ও গ্রামবাসীর সঙ্গে স্বয়ং সজব ভুঁইয়াও উপস্থিত ছিল। ছেলে ফিরে আসায় আনন্দের ভাগ উপস্থিত সকলকে দেওয়ার জন্য সে নজিবরের উদ্দেশে আবেগময় কণ্ঠে কথা বলতে থাকে, 'ও নজিবর, কোন্‌ঠে থোকি ধরি আনলি মানিককে? তোদের আগেই আমি রংপুরে উকিল স্যারের বাসায় গিয়া মানিকের খবর পাইছি আজ। কলকাতায় তাদের বাসাতেও গেছিল মানিক। ভাবি কইল কোনো চিন্তা করবেন না। এদিকে আরো সুখবর শুনছিস, মশিয়ার আকন্দ আমাদের মন্ত্রী হইবে। শেখ মুজিবের সঙ্গে অলরেডি তার দেখা ও কথা হইছে। উকিল স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি নিজেই ঢাকায় যাওয়ার কথা বাংটুদের কাছে বলছিলাম।'

নজিবর ও ঢোঁড়া মানিককে আবিষ্কারের কাহিনি শোনাতে থাকলে, মানিক চুপচাপ বাড়িতে ঢোকে। আঙিনায় মা ও ছোট ভাই-বোনদের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কলরব তাকেও বেশ চাঙ্গা করে। বিউটি ভাইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে কেঁদে ভাইয়ের মৃত্যু রটনাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়, 'সগাই কয় আপনি যুদ্ধ করতে গিয়া মারা গেছেন ভাইজান! পরেশ কাকার বউকে পুছ করলে খালি কাঁদে...

'ও নয়া মা, আমার খিদে লাগছে, খাইতে দাও আগে।'

নিজের ঘরে ঢুকে মানিক যুদ্ধদিনের আতঙ্ক ফিরে পাওয়ার মতো চমকে ওঠে। মালতীর মুখ মন থেকে নিমেষে উধাও হয়। তার বিছানায় পাতা জায়নামাজে বসে আছে এলাকার কুখ্যাত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কাজী আফতাব। বাইরের কাছারিঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি, আর অন্দরমহলে পরাজিত শত্রুপক্ষের একজনকে দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না মানিক। ঢোঁড়া ও শেখের মামু পথে নানার পালানোর খবর দিয়েছে, কিন্তু পালিয়ে এ বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার কথা ভুলেও বলেনি। আশ্চর্য! গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা কি জানে না তবে? কিন্তু বাংটু তো এ বাড়িরই একজন।

জীবনে এই প্রথম সম্ভবত, প্রিয় নানাজিকে দেখে সালাম দিতে ভুলে যায় মানিক। এশার নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে তসবি টিপছে। বুড়োর চেহারায় আগের সেই তেজ ও উজ্জ্বলতা নেই। অসুস্থ মানুষের মতো ম্লান দেখাচ্ছে। নাতির দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন এক্ষুনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে।

'কেমন আছেন নানাজি?'

'দেশ স্বাধীন করে এতদিনে ফিরলি! তোর হাতে অস্ত্র কই মানিক?'

ঘৃণা বা ঈর্ষার আগুন নয়, মানিকের কণ্ঠ যেন করুণায় শীতল।

আপনাদের শক্তিশালী পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। মুজিবকেও মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে ভুট্টো। পাকিস্তানি পতাকার বদলে এখন সবখানে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেই পতাকা নামিয়ে আবার পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানোর সাহস আর কারো হবে না। মনে মনে এসব বলে মানিক জবাব দেয়, 'এখন আর অস্ত্র দিয়ে কী হবে নানাজি!'

'আমি যে তোর হাতে মরার জন্য তোর ঘরে আশ্রয় নিয়া অপেক্ষায় আছি রে ভাই। মুক্তিরা তিনবার আমাকে মারার জন্য বাড়ি অ্যাটাক করল। একদল নগদ টাকা না পায়া আলমারি ভাঙিয়া ডাকাতি পর্যন্ত করল। মুক্তিদের কাছে আমি কইছি, আমার মুক্তিযোদ্ধা নাতি ইন্ডিয়া হইতে ফিরি আসুক, তার হাতে গুলি খায়া আমি মরব। মানিক, আমি তোকে হুকুম দিলাম, আমাকে গুলি কর। এ জন্য তোর কোনো গুনাহ হবে না। তোদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে বাঁচার কোনো ইচ্ছা নাই রে আমার।'

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ কাজী আফতাব আজ শিশুর মতো হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ও হরিপুরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিটির এই কান্নার উৎস কি মৃত্যুভীতি, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার কষ্ট, নাকি অন্য কিছু? মানিক ঠিক বুঝতে পারে না। ভালো মানুষ হিসেবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় দাপুটে নানার এমন বিপর্যস্ত করুণদশা দেখে তার কি সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, নাকি প্রতিশোধের কর্তব্যে এখনই বের করে দেওয়া উচিত বাড়ি থেকে?

বিউটি পানির জগ-গ্লাস নিয়ে ঘরে আসে। নানাকে কাঁদতে দেখে শাসনের সুরে সান্ত্বনা দেয়, 'ভাইজান ফিরে আসল, আবার বাচ্চা ছাওয়ার মতো কাঁদেন কেন নানাজি! এখন আর কোনো মুক্তিযোদ্ধা আপনাকে মারার সাহস পাবে না।'

'পরাজয়ের পর নিজের প্রাণ বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত শত্রুর বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন!'

'আমি জান বাঁচাতে তোদের বাড়িতে আসি নাই রে মানিক। পালাতে চাইলে ঢাকা বা রংপুরে পালাতে পারতাম। আমাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো মানুষের অভাব নাই ইউনিয়নেও। কিন্তু কী অন্যায় করেছি যে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব? শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। আমার কারণে পাকবাহিনী বা রাজাকাররা হরিপুরে এসে কোনো অন্যায়-অত্যাচার করতে পারে নাই। শেষদিকে ডাকাইতেরা বাজার ও বাবুর বাড়ি লুটপাট করল। সেই অপরাধ কি আমার? তোর বাপ চেয়ারম্যান হইতে না হইতেই মুক্তিবাহিনীর কয়জনকে দিয়া আমাকে এ বাড়িতে এনে বন্দি করে রাখছে কেন, সেটা তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর।'

বিউটি জানায়, 'বাণ্টুরা নানাকে রাইতে এ বাড়িতে আনি রাখছে ভাইজান। তা না হইলে অন্য মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার খোরশেদের মতো নানাকেও মেরে ফেলত।'

ভাতের ডিশ-তরকারি নিয়ে মানিকের সৎমা ঘরে আসে। বরাবর সতীনের ছেলেমেয়ে দুটির প্রতি পক্ষপাত দেখাতে সোচ্চার সে। বিউটির কথা কানে যাওয়ায় প্রতিবাদ করে সে, 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হউক, আর পাকিস্তানি মেজর হউক, হামার বাজানকে মারা এত সহজ? বেহদ্দ চাষা-কামলার বেটারা মুক্তিফৌজ হইছে বলিয়া কি মোর বাজানের বিচার করার মতো যোগ্য হইছে তারা? বাণ্টু মুক্তিরা জানে না, বাজান কার শ্বশুর আর কার নানা হয়?'

মানিক আজ সৎমাকে শাসন করার সাহস দেখায়। বলে, 'বাণ্টুকে খোঁচা দিয়ে কথা বলার স্বভাবটা বদলালেন তো নয়া মা। বাণ্টু তো শুধু এ বাড়ির চাকর না, ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।'

সৎমায়ের কণ্ঠে তবু শ্লেষ, জবাব দেয়, 'হ্যাঁ বাবা, বাণ্টু তো বাণ্টু, ওর ছোট ভাই মাদু পর্যন্ত স্বাধীন বীর পালোয়ান হইছে। ভুঁইয়াবাড়ির কাম আর করবে না। বীর মুক্তিযোদ্ধার গোষ্ঠীকে জামাই আদরে বসায় বসায় খাওয়ানোটাই তো এখন হামার বড় দায়িত্ব।'

জামাকাপড় ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে এসে নানাজির পাশে বসে মানিক। রাস্তা হাঁটার সময় শীতবোধটা তেমন ছিল না, কিন্তু ঘরেও বেশ ঠাণ্ডা। চাদর গায়ে মাথায় জড়িয়ে নেয়। নানাজি শাল ছাড়াও কানমাথা ঢাকা পশমি টুপি পরেছে কি শীত ঠেকাতে, নাকি ছদ্মবেশের কারণেও? মানিক সিদ্ধান্ত নেয়, বুড়ো মানুষটাকে আর আঘাত দিয়ে কথা বলবে না।

বিছানার ওপর দস্তরখানা পেতে দিয়েছে বিউটি। তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বলে গরম করে আনে। কিন্তু নানাজি নাতি-নাতনির অন্তরের উষ্ণতাও কামনা করে। অভিমান দেখিয়ে বিউটিকে বলে, 'আমি রাতে খাব না রে বিউটি, মানিককে দে।'

'আপনি না খেলে ভাইজানও খাবে না।'

বোনের ইশারা পেয়ে মানিকও তোয়াজ করে, 'হ্যাঁ, নানাজি বসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ্ আমাদের একসঙ্গে খাওয়ার সুযোগ আর কদিন দেবে কে জানে।'

বিউটি সিলিমচিতে গরম পানি ঢেলে নানাজির হাতও ধুয়ে দেয়।

খাওয়ার সময় এমেনে মশিয়ার আকন্দের পরিবারের খবর শোনায় মানিকের নয়া মা। নিশ্চয় শহর থেকে ফিরে বাড়িতে গল্প করেছে আব্বা। যারা এ বাড়িতে দুটি মাস তিন-চার বেলা রাজকীয় খানা খেয়ে গেল, তারা আজ মানিকের বাবাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। এমেনের স্ত্রী খেতে দিয়েছে এক কাপ চা আর দেড়খানা মাত্র বিস্কুট। একটিবার ভাত খাওয়ার কথা পর্যন্ত বলেনি। যে মেয়েকে নাতিবউ করার প্রস্তাবে মত দিয়েছিল মানিকের নানা স্বয়ং, সেই গরবিনী আসমা পর্যন্ত হবু শ্বশুরের সামনে আসেনি একবারও। গরব তো হবারই কথা, এখন তারা মন্ত্রীর পরিবার। এ মাসেই নাকি সবাই ঢাকায় চলে যাবে।

মানিককে কষ্ট নাকি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এসব কথা বলে মুখরা মেয়েলোকটি? জবাব দেয় না সে, মাথা নিচু করে চুপচাপ খেয়ে চলে।

নানাজি বলে, 'মশিয়ার উকিলের মেয়েটাকে তো ভালোই মনে হয়েছিল রে বিউটি। তা ইন্ডিয়ায় যায়া ওদের সাথে দেখা করিস নাই তুই মানিক?'

মানিক না বলে এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চায়। কিন্তু নয়া মার রাগ-ক্ষোভ কমেনি এখনো।

'বেহায়ার মতো মানিকের আব্বা তবু মন্ত্রীর পরিবারকে আর একবার এ বাড়িতে আসার জন্য দাওয়াত দিছে। কিন্তু এলায় কী আর গণ্ডগোলের দুর্দিন আছে? এখন তারা ঢাকায় যাবে, দ্যাশ স্বাধীন হওয়ায় এমেনে মন্ত্রীর বউয়ের ঠ্যাং এলা আসমানে উঠছে বাজান! টাউনি মানুষ মানে নেমকহারামের গুষ্টি, আর একবার দেখা হইলে দুইটা কথা কয়া নিনু হয়।'

এ সময় বাইরে বাণ্টুর গলা শোনা যায়।

'ও ভাইজান, খাওয়া-দাওয়া হয় নাই এলাও?'

বাণ্টু ঘরে এলে অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার সুযোগ পায় মানিক।

'কী রে খাইছিস তুই? বস, আমাদের সঙ্গে খা আর একবার।'

'রাজাকারদের চেয়ারম্যানের সাথে বসিয়া খাওয়ার রুচি আমার হবে না ভাইজান। নানাজিকে দেখলেই হামার পায়ের অক্ত মাথায় ওঠে। কী বুড়া, কোন্‌ঠে গেল তোমার জানের জান ইয়াহিয়া খানের কুত্তার দল?'

ঠাট্টা-মস্করার মেজাজে কথা বলে বাণ্টু বক্কর, তবু অস্বস্তি হয় মানিকের। হাতে অস্ত্র না থাকলেও বক্কর যেন এখন সর্বদাই মুক্তিযোদ্ধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে ইয়ুথ ক্যাম্পে পাওয়া লাল রঙের ফুল সোয়েটার, পরনের লুঙ্গিটাও সম্ভবত ইন্ডিয়ান, গামছা দিয়ে বাঁধা কান-মাথা।

নানাজি বাণ্টুর কথা ঠাট্টা হিসেবেই নেয় হয়তো। জবাবও দেয়, 'ইয়াহিয়া খানের কুত্তার দল ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে সারেন্ডার করল, তবু তোদের গর্বের শ্যাষ নাই না রে বাণ্টু। ইন্ডিয়ান আর্মি যুদ্ধ না করলে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেশ স্বাধীন করতে পারতিস তোরা?'

'সেইটাই তো আমাদের দুঃখ নানা। নয় মাস যুদ্ধ করলাম, দরকার হয় আরো নয় বছর করতাম। পাবলিক ছিল আমাদের সাথে, নিজের দেশ নিজেরা স্বাধীন করি ছাড়তাম আমরা। তোমার পাঞ্জাবি মিলিটারি এই বক্কর মুক্তিকেও বাপ করি ডাকতে বাধ্য হইত।'

'যুদ্ধ করে কী তোরা হারাইলি আর কী স্বাধীনতা পাইলি, সেটা বুঝতে বেশিদিন তোদের লাগবে না রে বাণ্টু। আমি তো বেশিদিন বাঁচব না, আল্লার কাছে দোয়া করি তোদের মুক্তিযুদ্ধের ভালো ফল যেন তোরা ভোগ করিস।'

'আপনার বাঁচা-মরা এখন ডিপেন্ড করে হামার কমান্ডার মানিক ভাইজানের ওপর। ভাইজান যা রায় দেবে, সেইটাই হবে। ও ভাইজান, আপনার সাথে প্রাইভেটে আমার মেলা জরুরি কথাবার্তা আছে কিন্তু। তার আগে আপনার আইসার খবরটা আমরা সগাইকে দিয়া আসি।'

ভাত আগেই খেয়েছে বাণ্টু। বিউটির কাছে পানসুপারি চায় খানকাঘরে উপস্থিত আরো দুই মুক্তিযোদ্ধার জন্য।

রাতে নিজের ঘরে ও বিছানায় কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবাস আবার কোনো অশান্তির কারণ হবে না তো? যশোরে রাজাকারের ঘরে রাত্রিবাসের স্মৃতি প্রশ্নটা জাগায় মানিকের মনে। বাণ্টুর জরুরি কথাবার্তা শোনাটা জরুরি মনে হয় নিজের কাছেও। কাকে খবর দিতে কোথায় গেল সে? খাওয়ার পর নয়া মা গরম দু'কাপ দুধও নিয়ে আসে ছেলে ও বাজানের জন্য। সেই দুধ খাওয়া শেষ না হতেই বিউটি আসে পিতার ফরমান নিয়ে, মানিককে এখনই তার ঘরে যেতে হবে।

সজব ভুঁইয়া কাছারিঘরের দরবার ও রাতের আহারাদি শেষে নিজের ঘরে বিছানায় বসেছে নতুন কম্বল মুড়ি দিয়ে। তার মুখে পান ও হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মানিকের সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য স্ত্রী ও কন্যাকে সে মেহমানের সঙ্গে গল্প করার দায়িত্ব দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়। দরকারি ও সংক্ষিপ্ত কাজের কথা ছাড়া আব্বার সঙ্গে কোনো বিষয়েই মন খুলে কথাবার্তা হয় না কখনো। এরকম পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারী পরেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকার স্মৃতি মনে করে মানিক বিছানার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে। আশ্চর্য যে, বাবার মনেও একই মুহূর্তে পরেশের স্মৃতি জাগরূক ছিল বোধহয়।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে সজব ভুঁইয়া, 'আমি খোঁজ পাইছি, পরেশ ছাড়াও তোদের সেই শরণার্থী নৌকার আটজনকে পাকবাহিনী বালারহাটে গুলি করি মারছে। পাকবাহিনীর গুলির মুখে পড়েও তুই যে জান নিয়া এখনো বাঁচি আছিস, এ জন্য খালি তোর নানাজির দোয়া নয়, গ্রামের মানুষেরও দোয়া কাজ করেছে। তুই ফিরে এসেছিস, এবার গরু-খাসি কোরবানি দিয়া গ্রামের মানুষকে খাওয়াব আমি।'

শুধু কি মানিকের হায়াত দারাজের জন্য দোয়া করেছে সবাই? পাকবাহিনীর হাতে লাখ লাখ মানুষের হত্যা ঠেকাতে দোয়া ছিল না কারো? নিজের সন্তানের বেঁচেবর্তে থাকার আনন্দের চেয়ে লাখ লাখ নিহত মানুষের শোকটাকেই বড় করে দেখা উচিত নয় কি? এসব কঠিন প্রশ্ন তুলে পিতার সঙ্গে তর্ক করতে চায় না মানিক।

'বাণ্টু আমার ফেরার খবর কোথায় কার কাছে জানাতে গেল?'

'গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবরটা দিতে পাঠালাম। অস্ত্র হাতে পায়া কিছু ছোটলোকের বাচ্চার এমন বাড়বাড়ি গেছে! বাণ্টুর কথাই ধর, ওর কথাবার্তা শুনিয়া মেজাজ কন্ট্রোলে রাখা কঠিন। যাক, তুই যে কয়দিন গ্রামে আছিস আমার থানার মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডারের দায়িত্ব নিতে হবে তোকে।'

'আমি তো ইন্ডিয়া গিয়ে ট্রেনিং নেইনি আব্বা, যুদ্ধও করিনি।

'তাতে কী হইছে? মশিয়ার উকিল ইন্ডিয়া গিয়া কি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে? মুজিব তো নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানে জেলে ছিল, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কি তার অবদান কারো চেয়ে কম লেখা হবে? নেতাদের বন্দুক হাতে যুদ্ধ করতে হয় না মানিক। ইন্ডিয়া গেছিলি সেইটাই বড় কথা। অস্ত্র ছাড়াই একা ঠ্যাংভাঙা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেছিলি তুই — সে খবর সবাই জানে। আমি লোকজনকে বলেছি ইন্ডিয়ায় মুজিবনগর সরকারে মশিয়ার উকিলের সঙ্গে ছিলি তুই। ওনার পুরা ফেমিলির সঙ্গে আমাদের প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক। কালকে তুই রংপুরে উকিল স্যারের বাসা থেকে একবার ঘুরে আয়। দেখলাম ওরাও তোর জন্য বেশ চিন্তা করছে।'

মানিক এর আগে পিতার মুখের ওপর না করেনি কখনো। কিন্তু আজ এক প্রবল না মানিকের ভেতর আলোড়িত হতে থাকে। নীরবতাকে ছেলের সম্মতি ভেবেই হয়তো ভুঁইয়া সিগারেটে সুখটান দিয়ে, আরো চাপা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলে।

'তোর নানার কী বিচার করবি মানিক?'

'আমি কী বিচার করব! মুজিব তো ফিরেই বলেছে, সরকার পাকিস্তানি দালালদের যা বিচার করার করবে।'

'মুক্তিবাহিনীরা তো নিজেদেরকে এ সরকারের মা-বাপ ভাবতে শুরু করেছে। আমি বাড়িতে এনে শেল্টার না দিলে, তোর নানাকে ওরা এতদিনে খতম করে দিত। মুক্তিরা নিজেরাই বিচার করে কয়েকটা রাজাকারকে অলরেডি কুত্তা-শিয়ালের মতো মেরে ফেলেছে।'

জেলার কুখ্যাত শান্তি কমিটি চেয়ারম্যান কাজী আফতাবের জন্যও যে অনুরূপ পরিণতি অপেক্ষা করছে, তার কিছু গোপন তথ্য-প্রমাণ ছেলেকে জানায় ভুঁইয়া। যেহেতু থানার সব মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে তার যোগাযোগ, ভুঁইয়া জানে কোথায় কী হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। একটি দল চেয়ারম্যানের বাড়িতে দু'বার হানা দিয়েছিল, চেয়ারম্যানের বাড়ি ডাকাতির সঙ্গেও জড়িত আছে মুক্তিদের কেউ কেউ। এছাড়া থানার রিলিফ কমিটির কো-অর্ডিনেটর এবং ইউনিয়নের রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সজব ভুঁইয়া জানে, কিছুদিন আগেও যারা ছিল কাজী চেয়ারম্যানের একান্ত কাছের লোক, তারা এখন অনেকেই বিচার চাইছে তার। এই পরিস্থিতিতে, মানিক ও বিউটির কথা ভেবে ভুঁইয়া যদি শ্রদ্ধেয় শ্বশুরকে নিজ বাড়িতে এনে না রাখত, তাহলে বুড়োকে আজ জীবিত দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য মানিকের হতো কি?

পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে ভুঁইয়া আবার জানতে চায়, 'কী প্রতিশোধ নিতে চাস তোর নানার ওপরে?'

মানিক ঠিক বুঝতে পারে না, তার চতুর পলিটিশিয়ান পিতা আসলে কী চায় মানিকের কাছে। সরলভাবে কথা বলে সে।

'কীসের প্রতিশোধ আব্বা! ব্যক্তিগতভাবে উনি তো আমাদের, আমার মনে হয় কারোরই কোনো ক্ষতি করেন নাই।'

'করেছেন কি করেন নাই — তা নিয়ে আমি তোর সাথে রাজনৈতিক তর্ক করব না মানিক। ক্ষতি না করলে তো সারা দেশে মানুষ রাজাকার-শান্তি কমিটির লোকদের নিয়ে মাথায় করে নাচত। প্রতিশোধ নিতে বিচার চায় কেন? যাক, তোর নানাজিকে আসলে আমরাও শেল্টার দিয়ে বেশিদিন রক্ষা করতে পারব না মানিক।'

মানিক সরাসরি বাবার দিকে তাকিয়ে তার মতলব বুঝতে চায় এবং শ্বশুরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও সীমাহীন সন্তান বাৎসল্যের নিচে কংক্রিট ইচ্ছেটি দেখতে পায়। বাবাই দেখায় তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোদের মা নাই, কিন্তু তার বাবার প্রতি দায়িত্ব আমিও অস্বীকার করতে পারি না। একমাত্র ছেলের সঙ্গেও ওনার বিরোধ ও ব্যবধান। মরার পর বারোভূতে তার বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে খাবে। কিন্তু মায়ের হক হিসেবে তোদেরও তো ন্যায্য অধিকার আছে। তুই তোর নানাজিকে বুঝিয়ে বল, বাঁচতে চাইলে সব বিষয়-সম্পত্তি তোদের দুই ভাই-বইনের নামে হেবা-দলিল করি দেউক। এখন তুই জেদ ধরলে না করতে পারবে না বুড়া।'

প্রবল আপত্তিতে মানিকের বুক এতটা ফুলতে থাকে যে, চাপা স্বভাবের ঢাকনাও যেন ছিঁড়ে যায়।

'ওনার সম্পত্তি আমার নামে লিখে চাইব কেন? এটা কী বলছেন আপনি!'

'তাহলে কার নামে লিখে চাইবি, আমার নামে? শোন, আমি অনেক ভেবেচিন্তে তোদের ভালোর জন্যই এটা বলছি। বুড়া যদি তোর প্রস্তাবে রাজি হয়, কালকেই রেজিস্ট্রি অফিস গিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাউনে একটা বাসাবাড়িও করতে হবে। কারণ বিউটি সেয়ানা হচ্ছে, ওকে বেশিদিন গ্রামে রাখা যাবে না। নানাজিকে নিয়ে তোরা ভাই-বোনরা টাউনের বাসাতেও থাকতে পারবি। রফিকেরও খুব ইচ্ছা টাউনের স্কুলে লেখাপড়া করার।'

পিতার কোনো যুক্তিই মানিকের কাছে প্রশ্রয় পায় না আর। তার দিকে না তাকাবার জন্য হ্যারিকেনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কালো ধোঁয়া উঠে চিমনিটি ওপরের দিকে কালো হতে শুরু করেছে। মানিক উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'

মানিকের ঘরের হ্যারিকেনটিও আলোর সঙ্গে চিমনিতে কালো ধোঁয়া ছড়িয়েছে। ঘরের ঘোলাটে আলোয় বোঝা যায়, নানাজি তার বিছানায় লেপের নিচে, আর চেয়ারে বসে নয়া মা ও বিউটি পারিবারিক গল্প করছে। মানিককে দেখে নয়া মা ঠাট্টা করে, 'বাপবা! বাপেবেটায় এখন শেখের বড় চেলা হইছে। দুইজনকে এতক্ষণ গল্প করতে কোনোদিন দেখো নাই মুই।'

নয়া মাও স্বামীর মতলবের সমর্থক কি না, বুঝতে পারে না মানিক। বলে, 'আমার খুব ঘুম পাইতেছে নয়া মা, আপনারা যান, ঘুমান গিয়া। বিউটি আর একটা লেপ বা কাঁথা দিয়ে যা।'

বিউটি আর একটা নতুন কম্বল নিয়ে এলে মানিক দরজা লাগিয়ে, লণ্ঠনের আলো কমিয়ে নানার পাশে শুয়ে পড়ে। অবশ্য এক লেপের নিচে নয়, নিজের জন্য আনকোরা নতুন কম্বলটি ছড়াতে গিয়ে টাপুরহাট ইয়ুথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাম্পের কম্বলটি মনে পড়ে, একই রকম না? আগে বাড়িতে দেখেনি কখনো। এলো কোথা থেকে?

বিছানায় শোয়ার পর নানাজি ফিসফিসিয়ে কথা বলে প্রথম, 'কী রে মানিক, বাপবেটায় কী চকরান্ত করলি?'

'আমরা চক্রান্ত করলাম তা কেমনে বুঝলেন?'

'তোর বাপ এতকাল নানা চক্রান্তের পলিটিক্স করেও তো ইলেকশনে আমাকে হারাতে পারে নাই। এখন তারা দলবল নিয়ে গোটা দেশ চালাবে, চকরান্ত সফল করা তো কঠিন নয়।'

'সব জেনেও এ বাড়িতে আপনার আশ্রয় নেওয়া ঠিক হয় নাই নানাজি।'

'আমি কি ইচ্ছে করে এসেছি রে! তোদের বাংটু মুক্তিযোদ্ধারাই ধরি আনছে আমাকে। এ বাড়িতে আসার পর নামাজে বসে রোজ আল্লার কাছে মুনাজাত করছি, মুক্তিবাহিনীর হাতেই যদি আমার মরণ লিখে রেখেছ খোদা, তা হইলে বাংটু মুক্তির হাতে কেন, আমার নাতির হাতেই যেন আমার মরণ হয়।'

'ঢাকায় তো বাস-ট্রেন চলে। আপনি ঢাকায় মামার বাসাতেও যেতে পারতেন। মামা বাসায় অবাঙালি শ্বশুর-শাশুড়ি, তার ওপর আপনাকে নিয়া খুব টেনশন করছে দেখলাম।'

'তুই ঢাকায় আছিস জানলে ঠিকই যাইতাম মানিক। পাকিস্তান ভাঙল, তার ওপর মরার আগে আমিনের সাথে আর দেখা হবে না কথা হবে না, নাতনি দুইটাকেও আর চোখের দেখা দেখতে পাব না — ভাবলেও বুক ভাঙি যায় আমার।'

রাত তো ইতিমধ্যে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঘরে টিনের চালে শিশির পড়ার শব্দ ছাপিয়ে বাইরে যেন একাধিক মানুষের সাড়া পেয়েও মানিক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। বুঝতে না পেরে আবার নানাজির কাছেই জানতে চায়, 'বাইরে কিসের যেন আওয়াজ পাইলাম নানাজি।'

'বাংটু মুক্তিরা নাকি আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য কাছারিঘরে অস্ত্র নিয়া ঘুমায়, ওরাই বোধহয়।'

মানিকের মনে পড়ে তার সঙ্গে বাংটুর একান্তে জরুলি কথা বলার আগ্রহ। কম্বলের উম চটকে উঠে দাঁড়ায় সে, নানাজিকে বলে, 'নানাজি আপনি ঘুমান। আমি একটু দেখে আসি।'

কোনো রকম সাড়া না করে মানিক অন্ধকার আঙিনা পেরিয়ে কাছারিঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁইত্রিশ

আছিমন ফজরের ওয়াক্তে উঠে আজ পিঠা তৈরি করতে বসেছে। মুক্তিফৌজ ছেলেকে এখন পর্যন্ত বাড়িতে তার শখের খাওয়া কিছুই খাওয়াতে পারে নাই। তার ওপর বাণ্টুর মায়ের বহুদিনের ইচ্ছা মানিককে দাওয়াত করে একবেলা খাওয়ায়। বাণ্টুই বলেছে পিঠা খাওয়াতে। মানিককেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সকালে বাণ্টু তাকে নিয়ে আসবে।

গরিবের ঘরে পিঠা-পুলি তো খেতে চাইল আর করে দিলাম — এত সহজ ব্যাপার নয়। পরের ঢেঁকিতে গিয়ে চালের গুঁড়া করো, পিঁড়ি ও হাঁড়ি-পাতিল খুঁজতে এর বাড়ি তার বাড়ি ছোটাছুটি, গুড়, তেল ও দুধ কেনা ইত্যাদি জোগাড়যন্ত্র একদিনেই হয় না। মানিককে পিঠা খাওয়ানোর কথা বলে বাবুর বাড়ি থেকে একটা নারকেলও চেয়ে এনেছে। দুধপিঠা সাঁঝরাতেই করে রেখেছিল আছিমন। মোরগডাকা সকালে উঠে ভাপা ও চিতই করেছে। বাড়িতে পিঠা হবে বলে টেপি-হেপিরও ঘুম নেই। মায়ের সাথে ভোরে উঠেছে, চুলায় জ্বাল ঠেলছে, শীতে আগুন পোহানোর সঙ্গে ভাপা ও চিতই পিঠার ঘ্রাণে খাওয়ার আগেই মন ভরে গেছে তৃপ্তিতে।

মাদুও উঠেছে আজ সাতসকালে। তবে পিঠার সাথে বাড়তি আনন্দ-আয়োজনের তালে আছে সে। ভাইয়ের বদলি-চাকরি ছাড়ার পর মাছ মারার নেশাটা বেড়েছে তার। মুক্তিযোদ্ধা ভাইও বলে দিয়েছে, চাকর হওয়ার চেয়ে স্বাধীন মাঝি হলেই বেশি আয়। ভাইয়ের কাছে পয়সা নিয়ে দুটি বড় বড়শি কিনেছে মাদু, যাকে বলে গাড়া বড়শি। শক্ত খুঁটির মতো ছিপ গেড়ে বড়শিতে ব্যাঙ ও জিয়ল পুঁটি গেঁথে বিলের পানিতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। ছোট মাছ খাওয়ার লোভে বড় বোয়াল যদি বড়শিটা একবার গিলে বিলের পানিতে লেজের বাড়ি দিয়ে ফটফটাং আওয়াজ তোলে! সম্ভাব্য আওয়াজটা মাদু ঘরে বিছানায় শুয়েও শোনার চেষ্টা করেছে। তারপর ভোর হতেই গেছে ছুটে। বড় বোয়াল কী গজার মাছ বড়শিতে গাঁথা পড়ে যদি, তবে সেই মাছ দিয়ে মানিক ভাইকে ভাতও খাওয়াবে।

মুক্তির মায়ের আঙিনায় উৎসবের এত বড় আয়োজন হলে তাতে যোগ দেওয়াটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ঢোঁড়ার জন্য, অন্তত নিজে সে রকমই ভাবে সে। মুক্তির মাকে হাট থেকে গুড় ও বাজার থেকে দুধ কিনে এনে দেওয়ার সময় একটা বিড়ির পয়সা মারা দূরে থাক, নিজের পকেটের এক আনা পয়সা ভরেছে। কুড়াল দিয়ে লাকড়ি চিরে দিয়েছে। তাই বলে পিঠার ভাগের ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার জন্য সাতসকালে ঢোঁড়া চুলার পাড়ে এসে বসেছে — এ রকম ভাবা ঠিক হবে না। কথাটা সে বাণ্টুর মাকে স্মরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়ে দেয়, 'ফের মনে করেন না ভাবি, লালচের মতো পিঠার লোভে আসি বসনু।'

কেন যে যখন তখন বাণ্টুর মায়ের কাছে ছুটে আসে, সেটা তো অনেক দিন ধরেই বুঝিয়ে আসছে ঢোঁড়া। কিন্তু এমন ভোরবেলা আগুনের তাপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের উত্তাপ প্রকাশের সুযোগ তো আর সব সময় আসে না। মুক্তিযোদ্ধা বাণ্টু বাড়িতে না থাকলেই খুশি হয় সে। কারণটা বলেও ফেলে, 'বাণ্টু বাড়িত থাকলেও তোমার কাছে আসতে মোর ভয় নাগে ভাবি। আইফেলখান তাক করিয়া যদি টেপে, তা হইলে মোর শরীলের গরম অক্ত পেন্দনের শাড়ি খুলিয়া বাঁধিয়া দিলেও আটকাইতে পারমেন না।'

'আল্লার ফজরে ঢঙের কথা ধরি আইলেন! আইফেল নিয়া ভুঁইয়ার বাড়ি পাহারা দেওয়ার পরও চেয়ারম্যান যে পালায় গেল, এ জন্য ভুঁইয়া হামার বাণ্টুর কী বা বিচার করে। এই চিন্তায় মোর নিঁদ হয় নাই।'

চেয়ারম্যান মুক্তিবাহিনীর দাবাড়ি খেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে এসে লুকিয়ে আছে, এ খবর ভুঁইয়াবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পড়শিরা অবশ্যই জানত, বাড়ির ভেতরে স্বচক্ষে চেয়ারম্যানকে দেখেছেও কেউ কেউ। কিন্তু এ গোপন তথ্যটি নিয়ে সরব হয়নি কেউই। তবে মানিক বাড়িতে আসার পরপরই তার চেয়ারম্যান নানার গায়েব হওয়ার খবরটি জেনে যায় অনেকে, ফিসফাস আলোচনাও হয় নিজেদের মধ্যে। বাণ্টুও বলেছে মাকে, 'ভাইজানকে দেখিয়া ভয়ে পাগার পার হইছে বুড়া।' কিন্তু কোথায় কীভাবে পালিয়ে গেল, তা বাড়ির মানুষ হয়েও বাণ্টু জানে না।

চেয়ারম্যানের মতো জলজ্যান্ত মানুষ ভুঁইয়াবাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কেউ সহজভাবে নিতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারকে প্রকাশ্য দিবালোকে শাস্তি দিয়ে মেরেছে, কাজেই মানিক ও তার বাপের পক্ষে শত্রু আত্মীয়কে গোপনে গুম করে দেওয়া অসম্ভব কি? আবার মানিক বা মুক্তিবাহিনীর হাতে মরণ ঠেকাতে চেয়ারম্যান পালিয়ে গেছে ভেবে খুশি হয় অনেকেই। বাণ্টু আরো বলেছে, বদনা হাতে জঙ্গলবাড়িতে পায়খানা করতে গিয়েছিল চেয়ারম্যান। আর ফিরে আসেনি।

বাড়িতে পিঠা-উৎসব আয়োজনের চিন্তায় চেয়ারম্যানকেও পিঠা খাওয়ানোর ইচ্ছে ছিল আছিমনের। অত বড় মানুষকে দাওয়াত করে বাড়িতে আনা যাবে না। বাণ্টুর দ্বারা পিঠা পাঠানোর কথা ভেবেছিল সে। স্বপ্নটার কথা ঢোঁড়া জানত বলে ঠাট্টা করে, 'চেয়ারম্যানকে পিঠা খাওয়ানোর শখ তোমার পুরিল না ভাবি। তার চাইতে মোকে চেয়ারম্যান মনে করিয়া একখান গরম ভাপা দাও তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোঁড়া অনেকক্ষণ ধরে চেখে দেখার কথা বলে একটি গরম পিঠা চাইবে ভাবছিল। মেয়ে দুটিকে আছিমন একটি করে পিঠা দিয়েছে, চুলার জ্বাল ঠেলা রেখে তাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে দুই বোন। কিন্তু ঢোঁড়া বাচ্চাদের মতো লালচ বা নির্লজ্জ হতে পারে না। এবার চেয়ারম্যানের ওপর দিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে আবদারটা করতে পারার খুশিতে হাসে সে।

আছিমন ঢোঁড়াকেও একটি গরম পিঠা এগিয়ে দেয়।

পিঠা করা যখন শেষ, মাদু বিল থেকে গাড়া বড়শি নিয়ে ফিরে আসে। একটাও মাছ পায়নি, তবু হতাশ নয় সে। আল্লার রহমতে একদিন বড় মাছ সে ধরবেই। বড় মাছ পেলে দেখাতে নিয়ে যাবে বড়বাড়িতেও। মাদুর মা মাছের গান বাদ দিয়ে গরম পিঠা খেতে মেহমানদের ডেকে আনার হুকুম দেয় মাদুকে। কিন্তু মাদু বড়বাড়ি যাবে না, কারণ গেলেই তাকে কাজে লাগিয়ে দেবে ট্যারা জহির। বড় ভাই ভুঁইয়াবাড়িতে বসে বসে খায়, সে তার চাকরির কাম করবে কেন? তাছাড়া ভাই তো বলে দিয়েছে, ভুঁইয়াবাড়িতে সারা বছর চাকরি করে মাদু যা পাবে, তার চেয়ে বিলে মাছ ধরলেই ভালো চলবে তাদের। দিনেরাতে সেই চেষ্টাই করছে মাদু।

আছিমনকে সাহায্য করতে ঢোঁড়াই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয়। মানিককে ডেকে আনতে যায় সে। সেদিন স্টেশন থেকে অতটা পথ একসাথে হেঁটে আসার সময় ভুঁইয়ার বেটার সঙ্গে যে ভিতিরের সম্পর্ক হয়েছে, তাতে ঢোঁড়া নিজের ঘরসংসারে একাকিত্বের সমস্যার কথাও তুলেছিল। সমাধান দেয়নি ভুঁইয়ার বেটা। কিন্তু এখন চেয়ারম্যান নানাকে হঠিয়ে দিয়ে চেয়ারম্যানি ক্ষমতা যেহেতু নাতির হাতে, আবার মুক্তিবাহিনীর সর্দারও সে, অন্যদিকে পিঠার আয়োজন বলতে গেলে তো ঢোঁড়ার বাড়িতেই, ডেকে এনে খাতির করার সময় ঢোঁড়া আজো তার সমস্যার সমাধান চাইতে পারে, নাকি? বাণ্টুর বাপ বাউদিয়া বছরখানেকের বেশি সময় ধরে বাড়িছাড়া, বলতে গেলে বাউদিয়ার বউ-বাচ্চার লিগাল গার্ডিয়ান তো ঢোঁড়াই। কাজেই তালাকি বউ জুলুর মা যদি আর ফিরে নাই আসে, তবে রাতেও যাতে বাণ্টুর মাও তার ঘরে থাকতে শরম না পায়, কিংবা ঢোঁড়াও তার হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়ে যাওয়ার অধিকার পায়, তার কি একটি বিধিব্যবস্থা করে দিতে পারে না মানিক? মৌলবি-মুন্সি যা খরচ নেয়, ঢোঁড়াই দেবে না হয়। ভুঁইয়ার বেটা এলে আজ ঠাট্টাচ্ছলে কথাটা সরাসরি বলে দেখবে সে।

বাণ্টু আসল মেহমান মানিক ছাড়াও নজিবরকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। ঢোঁড়া তাকে স্বাগত জানাতে হেসে বলে, 'অনেক দিন বাঁচপেন বাহে ভুঁইয়ার বেটা। মুক্তির মাও আর মুই দুইজনে চুলার পাড়ে বসিয়া এতক্ষণ তোমার আলাপ করতে আছিনো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাকে নিয়া আবার কিসের আলাপ বাহে?'

'গরিবের বাড়িতেও দাওয়াত কবুল করিছেন। এটা হামার কত বড় কপাল। তা শেখের মামু তোমার পাছ নিছে ক্যানে?'

'মুক্তিরা যেখানে, শেখের মামু সেখানে না থাকলে কাঁয় থাকপে রে আহম্মক!'

'আসল কথা হইল মুক্তির মায়ের পিঠার গোন্ধ পাইছিস তুইও।'

সকালের মিষ্টি রোদ এখন আছিমনের ছোট্ট উঠান ছাড়াও, উঠানের কোণে কলাগাছের পাতাতেও চলকে পড়ছে। ঘরের কাঁথাগুলোও রোদ পোহাচ্ছে। উঠানে পিঁড়ি টেনে বসে অতিথিরা। নিকানো উঠান, হেপি-টেপি তো সকালেই ঝাঁট দিয়েছে। পরিষ্কার উঠানে মুরগি পায়খানা করেছে আবারও। পাসুন নিয়ে হেপি তাও পরিষ্কার করে দেয়। আছিমন থাল ভরে পিঠা দেয় দাওয়াতিদের। বাণ্টু মাকে ঘরে ডেকে কানে কানে বলে, 'বিউটির জন্য কয়টা পিঠা দেইস মা, চুপ করি দিম এলায়।'

মানিক ঢোঁড়াকেও বসতে বললে বাড়ির মানুষ হিসেবে আগে খাওয়ার কথাটি জানিয়ে সরাসরি জরুরি প্রসঙ্গটি তোলে সে।

'ও বাহে ভুঁইয়ার বেটা, মোর ঘরটা যে বছরখানিক ধরিয়া খালি পড়ি আছে। মোর একটা ব্যবস্থা করি দাও এবার। চেরম্যান নানা পালায় গেইছে, তোমরাই এলা হামার চেরম্যান হন।'

কিন্তু মুক্তির মা আছিমনই ঢোঁড়ার সমস্যাটি চাপা দিতে চেয়ারম্যানকে চাগিয়ে তোলে আবার।

'তোমরা বাড়ি আসতে না আসতেই চেয়ারম্যান যে গায়েব হইল, তোমার বাপ আবার বাণ্টুর দোষ ধরবে না তো বাবা?'

মানিকের চকিতে সন্দেহ জাগে, বাণ্টুই হয়তো এ বিষয়ে তার মাকে কিছু বলেছে। কিন্তু বাণ্টু নিজে সাফাই গায়, 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের গল্প আমার সামনে করিস না তো মা। মানিক ভাইজান বিছানায় পাহারা দিয়াও বুড়াকে ধরি রাখতে পারে নাই। পায়খানা যাওয়ার অছিলায় বদনা নিয়া বুড়া বাইম মাছের মতো জঙ্গলবাড়ি দিয়া পালাইছে। বড়বা খুঁজতে কইলে জঙ্গলের দিকে ফায়ার শুরু করব আমি।'

আছিমন শাসন করে ছেলেকে, 'খবরদার! হাজার দোষ থাউক, তাঁয় তোর মুরব্বি, মানিক বাবাজির মায়ের বাপ। দেওয়ানি হুকুম দিলেও চেয়ারম্যানকে মুক্তিরা গুলি করে যদি, গ্রামের সউগ মানুষ মুক্তিফৌজকে খারাপ কইবে। ঠিক কথা না একাব্বরের বাপ?'

নজিবর চুপ থাকলেও, ঢোঁড়া সমর্থন জানায়, 'সেটা তো ঠিকে ভাবি। মুক্তি হইছিস বলিয়া যাকে তাকে গুলি করাটা ঠিক না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক বলে, 'মুক্তিফৌজরা যাতে অকারণ গোলাগুলি করতে না পারে, সে জন্য শেখ মুজিব মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র জমা দিতে হুকুম দিছে। মুক্তিবাহিনীর জন্য মিলিশিয়া ক্যাম্প করছে সরকার, বক্করকেও সেখানে গিয়া অস্ত্র জমা দিতে হবে।'

মিলিশিয়া বাহিনীতে নাম লেখালে বাণ্টু থাকবে কোথায়, খাবে কী, বেতন পাবে কি না এবং মিলিশিয়া বাহিনী হয়ে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আবার — মনে এ রকম নানা প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আছিমনের এসব চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করার জন্য মানিক আর সময় দেয় না। পিঠা খাওয়া শেষ করেই আছিমনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায়, ঠ্যাংভাঙা বাজারে তার কী যেন জরুরি কাজ আছে। বাণ্টু একটা বাটিতে কয়েকটা পিঠা নিয়ে, বাটিটা গামছায় আড়াল করে ফিরে যায় বড়বাড়ির দিকে।

নানাকে বাড়ি থেকে নিরাপদে রাতের অন্ধকারে সরিয়ে দিয়ে বাবার একটি চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার সাফল্যে মানিক খুশি, সেই সঙ্গে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বিরোধের আশঙ্কাও মনে জাগে। মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই আশা করেছিল মানিক ফিরে নানার উপযুক্ত বিচার করবে। রাজাকার কমান্ডার খোরশেদকে এলাকার মুক্তিরা যেভাবে হত্যা করেছে, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান নানারও বিচার করে শাস্তি দিলে আপসহীন দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মানিকের খ্যাতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত সন্দেহ নেই। সজব ভুঁইয়াও হয়তো সেটাই চেয়েছিল। শ্বশুরের সকল বিষয়-সম্পত্তি ছেলেমেয়ের নামে লিখে নেওয়ার পর শত্রুকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই ছিল তার লক্ষ্য। এ কারণে বাপের প্রতি সৃষ্ট রাগ-ঘৃণার কথা বাণ্টুকে কিছুই বলেনি মানিক।

মুক্তিযোদ্ধা হয়েও নানাকে বাঁচানোর ব্যাপারে বাণ্টুর ভূমিকা দ্বিধাহীন। শেষরাতের দিকে সাইকেলে নানাকে কাউনিয়া স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়েছে সে। কাউকে না বলার জন্য মানিক বাণ্টুকে সতর্ক করেছে বারবার। অন্য মুক্তিযোদ্ধারা জানলে মানিকের দেশপ্রেম বা আদর্শবাদ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ম্লান করে দেবে কি? আড়ালে হয়তো তাকে নিয়ে টিটকারি দেবে সবাই। অন্যদিকে সজব ভুঁইয়া জানতে পারলে সন্তানকেও বিশ্বাস করবে না আর। কিন্তু ছেলেমানুষ বাণ্টু খবরটা গোপন রাখতে পারবে কতদিন কে জানে।

মানিকের ভয়ে বুড়ো পালিয়ে যাওয়ার খবর রটে যাওয়ায় অবশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মানিকের খ্যাতি বেড়েছে। সকালবেলা দুজনের নাশতা নিয়ে ঘরে এসে নানাকে দেখতে না পেয়ে চমকে উঠেছিল বিউটি। মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোনকেও নানার পালানোর কথা বলে রহস্যে রেখেছে। বিউটির উদ্বেগ, নিজ বাড়িতে ফিরে গেলে বা একা থাকলে মুক্তিরা তাকে গুলি করে মারতে পারে। নানাজি নিরাপদে ঢাকা যাওয়ার ট্রেনে উঠেছে শুনলে বিউটিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতো। কিন্তু বোনকেও বিশ্বাস না করে বলেছে মানিক, 'পালিয়ে ও বুড়া মরুক কী বাঁচুক, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই।'

খবরটা জেনে ভুঁইয়া শুধু বাণ্টুকে জিজ্ঞেস করেছিল, কখন কোনদিকে এবং কীভাবে পালায় গেল বুড়া? বাণ্টু আল্লার কিড়ে দিয়ে এ বিষয়ে তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আবার গোপনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানিকের কাছে, 'জানলে কিন্তু বড় আব্বা মোর ওপর হেভি ফায়ার হইবে ভাইজান।'

'কাকপক্ষী কাউকেই জানাবি না।'

বাইরে বেরোলেও চেয়ারম্যান নানার আত্মগোপন ও প্রকৃত অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় মানিক। অবশ্য ঠ্যাংভাঙা বাজারে এখন পলাতক ও প্রাক্তন কাজী চেয়ারম্যান নয়, বর্তমান রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান সজব ভুঁইয়ার উপস্থিতি ও একচ্ছত্র প্রভাব। নানা ও বাপের কারণে মানিক এলাকায় তো আগেও সবার মনোযোগ পেয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর বাপ-নানাকে ছাড়িয়ে সে-ই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। বাজারে নরেশের দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকলেও নিজের মূল্য টের পায় মানিক।

মানিক ফিরেছে শুনে পরদিন সকালেই বাড়িতে ছুটে এসেছিল নরেশ। দাদার মৃত্যুপথের সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে নতুন করে ডুকরে কেঁদেছে। সেই কান্নার মধ্যে মানিকের প্রতি গোপন ঘৃণাও মিশে ছিল কি? মালতী কিংবা তার মামা-মামি নিশ্চয় মানিককে ক্ষমা করেনি। মানিকের চরিত্র বিষয়ে নরেশ কতটা অবহিত হয়েছে জানে না সে। ফলে সেদিন বাড়িতে নেওয়ার জন্য টানাটানি করলেও পরে যাব বলে এড়িয়ে গেছে মানিক। বাবুর বাড়ির বউঝিদের বাসি কান্নার মুখোমুখি হতে পারবে, কিন্তু মালতীর সামনে নিজের লজ্জা গোপন করতে পারবে কি? মালতী সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানার আশা নিয়ে ঠ্যাংভাঙা বাজারে আজ নরেশের দোকানে বসেছে মানিক। তাকে ঘিরে লোকজনের আনাগোনাও ক্রমে বাড়ছে।

আগুনে পোড়েনি বলে নরেশের দোকানের বাহ্যিক চেহারা আগের মতোই আছে। ডাকাতরা দোকানের মাল সব লুট করেছে, এক গজ কাপড়ের টুকরাও রেখে যায়নি। কিন্তু আশ্চর্য যে খালেক খলিফার মেশিনটা নেয়নি। ডাকাতদের সঙ্গে খলিফার যোগ থাকা নিয়েও সন্দেহ আছে কারো কারো মনে। কিন্তু পুরনো শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহার চেয়ে স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে নতুন যাত্রা শুরুর চেষ্টাটাই বেশি নরেশের। এর মধ্যে নতুন কিছু কাপড় তুলেছে। বউদিকে আনার জন্য ইন্ডিয়া গিয়ে কিছু ইন্ডিয়ান শাড়ি এবং লুঙ্গিও কিনে এনেছে। তবে সবার মনে সংশয় — পরেশ নেই, দাদার অভাবে নরেশ একা আগাবে, সাহাদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারবে? সামলাবেই-বা একা কী করে?

মানিককে দেখে খালেক খলিফা নিজেই টি-স্টলে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে এসেছে। মানিকের কাছে এসে, মানিককে নিয়েই কথা শুরু করে সে।

'আমি নরেশকে সব সময় কই ভাইগ্না, পরেশ গেছে, কিন্তু মানিক বাবাজি যে পরেশের বউ-বাচ্চাটাকে বাঁচায় রাখতে পারছে, এ জন্য তোদের গোটা হিন্দুটাড়ির কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার ওপরে। মানিক না থাকলে কি পরেশের বউ-বাচ্চা আজ স্বাধীন দেশের মুখ দেখতে পারত?'

উপস্থিত সবাই সমর্থন করে কথাটা। পরেশের মৃত্যুর খবর ও কারণ লোকজন আগেই জেনেছে। শরণার্থী নৌকার ওপর হামলার গল্প নিজেরাও এক অপরকে শুনিয়েছে সন্দেহ নাই। নরেশও বউদির কাছে শুনে নতুন তথ্য যোগ করেছে হয়তো। আজ খালেক খলিফাকে সমর্থন করতেও বউদিকে উদ্ধৃত করে সে, 'বউদিও তো সেই কথাই বলে খালিফা। মানিক না থাকলে শিবু আর বউদিও দাদার মতো মরিয়া ভূত হইত এতদিনে।'

মানিক আজ নিশ্চিত হয়, পরেশের হারিয়ে যাওয়া কিংবা মৃত্যুর ঘটনার জন্য যেমন মানিক-মালতীর অবৈধ সম্পর্কটিকেই দায়ী ও সন্দেহ করতে শুরু করেছিল কোচবিহারের নরেন দত্ত ও তার স্ত্রী, গ্রামের লোকজন অন্তত কেউ সেরকম সন্দেহই করেনি, করবেও না। অথচ নিজের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করে মানিক নিজের সামান্য অপরাধকে বড় করে দেখছে কেন? সিদ্ধান্ত নেয় সে, মালতীর মুখোমুখি দাঁড়াবে আবার।

মৃত পরেশ কিংবা তার বিধবা স্ত্রী নয়, মানিকের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে তার চেয়ারম্যান নানার ভালো থাকা না-থাকার বিষয়টি নিয়ে যে ঠ্যাংভাঙায় লোকজনের মাথাব্যথাটা তীব্র, সেটা বুঝতে দেরি হয় না তার। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নানার ভূমিকার পক্ষে ও বিরুদ্ধেও কথা বলে লোকজন। নানার অবস্থান ও পরিণতি জানার জন্য জ্বলজ্বলে কৌতূহল নিয়ে তাকায় তার দিকে। অনেকে কানে কানে সরাসরি প্রশ্নটা ঢোকায়। বাবাকে যে জবাব দিয়েছে মানিক, সকলকে একই কথা বলে সে, 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে নানাজি যদি পাকবাহিনীর দালালি করে থাকে, তবে যেখানেই পালাক, অবশ্যই তার বিচার হবে, শাস্তিও হবে। শেখ মুজিব দেশে ফিরেই এ ঘোষণা দিয়েছে।'

কাজী চেয়ারম্যানের কোনো খবর না পেয়ে নানার গ্রামের এক মামা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিককে চেয়ারম্যানবাড়ির হালহকিকত বিস্তারিত জানায়। নানিকে দেখার জন্য শিগগির যাবে বলে তাকে আশ্বস্ত করে মানিক।

নরেশের দোকানে মানিককে ঘিরে যেমন, তেমনি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে সজব ভুঁইয়াকে ঘিরে রিলিফপ্রার্থী মানুষের ভিড় উপচে উঠেছে আজ। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ইন্ডিয়াফেরত শরণার্থী পুনর্বাসনে রিলিফ বিতরণ করা সরকারের এখন বড় কাজ। কিন্তু ইন্ডিয়া পালায়নি যারা কিংবা যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমন শত শত গরিব দুস্থ মানুষজন রিলিফের আশায় ভিড় করেছে ঠ্যাংভাঙায়। এলাকায় এত গরিব-দুস্থকে একসঙ্গে দেখে অবাক হয় মানিক।

রিলিফ পায়নি যারা কিংবা ভুঁইয়ার কাছে পৌছতে পারে না যারা, এমন কিছু দুস্থ গরিব মানুষ চেয়ারম্যানের নাতি ও ছেলে বাজারে আছে শুনে মানিকের কাছেও ছুটে আসে। অভিযোগ জানায় তার বাবার বিরুদ্ধে। তারা ইন্ডিয়া পালায়নি ঠিকই, কিন্তু মিলিটারির ভয়ে ছোটাছুটি ও পালাপালি তো অবশ্যই করেছিল। হিন্দু শরণার্থীদের চেয়ে তাদের রিলিফ পাওয়ার যোগ্যতা কোনো অংশে কম? মিলিটারি-রাজাকাররা ঘরবাড়িতে আগুন দেয়নি বটে, কিন্তু ঘরটা ছাড়া তাদের ঘরের মধ্যে আর আছে কী? ভুঁইয়ার বেটা নিজের চক্ষে দেখে আসুক। এই ভরা কাটামাড়ির মৌসুমেও তাদের ঘরে ভাত নাই, ঠাণ্ডায় গায়ে দেওয়ার বস্ত্র নাই, ধারকরজ দেওয়ার মতো উপযুক্ত মানুষ নাই, এই অবস্থায় শেখ মুজিব যদি তাদের রিলিফ দিয়েও না বাঁচায়, স্বাধীন দেশে কীভাবে বাঁচবে তারা?

শৈশব থেকে গাঁয়ে সেরাজ বাউদিয়া কি টোঁড়ার মতো সহায়সম্পদহীন গরিব মানুষ দেখে আসছে মানিক, বন্যার সময় বাঁধ-রাস্তায় বা স্কুলঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী বন্যার্ত মানুষের দুর্দশা দেখেছে, ইন্ডিয়ায় গিয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের দুর্বিষহ জীবনযাপনও দেখে এলো, কিন্তু এইসব দেখার কারণে দুস্থ মানুষের জন্য মানবিক দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি জাগ্রত হয় আর কতটুকু? মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন স্বদেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, স্বাধীন দেশের মাটি ছুঁয়ে এবং পাকিস্তানি কারাগার থেকে শেখ মুজিব ফিরে আসায় দেশপ্রেমের যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিল মানিক, গরিব দুস্থদের ভিড় দেখে তেমনটি হতে পারে না কেন? যশোরের মাস্টারদার কথা মনে পড়ে। শেখ মুজিবও তো দেশে ফিরে রেসকোর্সে ঘোষণা করেছে, দেশের মানুষ যাতে আশ্রয় পায়, উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে — তার ব্যবস্থা করাই এখন তার বড় কাজ। তেমন ব্যবস্থা করতে নিজ এলাকার মানবেতর জীবনের খাঁচায় হাজার হাজার বন্দি মানুষও যদি তার দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত না করে, তবে মুক্তিযোদ্ধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় কীভাবে সার্থক করবে?

গরিব মানুষের ভিড় দেখে মানিক যখন নিজের ভেতরে মহানুভবতার আবেগ খুঁজতে ব্যস্ত, লাঠি হাতে এক দুস্থ বুড়ি ভিড়ের সামনে এসে বাজখাঁই গলায় চেয়ারম্যানের নাতি ও ছেলেকে তালাশ করে। চিনিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। বুড়ি সকলকে শুনিয়ে একইভাবে আত্মপরিচয় দেয়, কাজী চেয়ারম্যানের যে বইন থাকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে, তার জায়ের মেয়ের খালা শাশুড়ি সে। কপাল পড়ে যাওয়ায় বুড়ি এখন খেতে পায় না, মেম্বার-চেয়ারম্যানরা সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন তো কাজী চেয়ারম্যান নাই, তার বাড়িতে তার বইনের কাছে গিয়া শোনে মুক্তিবাহিনীর ভয়ে সে পলায় গেছে। তার জামাই হয়েছে চেয়ারম্যান। সে নাকি খালি হিন্দু শরণার্থীদের রিলিফ দেবে। অতএব মানিক তাকে এখনই নিয়ে যাক বাপের কাছে, বুড়ির হয়ে বাপকে অনুরোধ করুক, 'যাতে মুই এক সের গম আর একখান কম্বল পাঁও, তার ব্যবস্থা তুই করি দে দাদা, না হইলে এই লাঠি দিয়া তোকে মুই ডাণ্ডায় মারি ফেলাইম।'

বুড়ির কৃত্রিম রাগ দেখেও হাসে অনেকে। কম্বল পাওয়ার দাবিটি প্রতিষ্ঠা করতে বুড়ি শীতের কষ্ট বোঝাতে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে কীভাবে কাঁপে, তা একটু অভিনয় করে কিংবা সত্যি সত্যি কেঁপে দেখিয়েও দেয়। লোকজন হাসে।

কিন্তু মানিক একটুও হাসে না। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায়ের আগে সমবেত সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি শোনায়, 'আমি আব্বাকে বলে আপনাদের কিছু নিয়ে দিতে পারব না। বাড়িতে আসেন, সাধ্যমতো আপনাদের সাহায্য করব আমি।'

আটত্রিশ

অবশেষে হাটের দিন বিকেলে মানিক হেঁদুটাড়ি তথা পরেশশূন্য বাবুরবাড়িতে যায়।

ঠ্যাংভাঙা হাটের দিন সব বাড়ির পুরুষ মানুষের হাটে যাওয়াটা অবধারিত, ব্যতিক্রম শিশু ও অচল বুড়োরা। কেনাকাটা বা পকেটে পয়সা না থাকলেও লোকেরা হাটে যায়, যাওয়াটা অভ্যাস বলেও যায় অনেকে। মানিক স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে নিয়মিত হাটেবাজারে যেতে শুরু করেছে মূলত জনসংযোগের জন্য। গ্রামে থেকে কীভাবে জনসেবা বা সমাজসেবা করবে — সেটা মানুষের সঙ্গে না মিশলে বুঝবে কী করে? কিন্তু আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাটবারের বিকেলে হিন্দুটাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে মালতীর সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনে। নরেশ ও পাড়ার পুরুষরা হাটে থাকবে সবাই, তারা ফেরার আগেই বাড়িতে মালতীকে একা পাওয়ার নির্জনতা পাওয়া যাবে নিশ্চয়। বাড়িতে আসার পর মানিক যায়নি বলে মালতী শিবুকে নিয়ে নিজেই গিয়েছিল। মানিক বাজারে থাকায় দেখা হয়নি। বিউটির সঙ্গে যা কথাবর্তা হয়েছে, তাতে নিজের জন্য বিশেষ কোনো বার্তা খুঁজে পায়নি মানিক।

মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে রাজাকার ও চোর-ডাকাতরা জোট বেঁধে বাবুর বাড়ি লুট করেছে। বাড়ির প্রাঙ্গণের পূজার ঘরটিও রেহাই দেয়নি। গোলাঘরের ধান-চাল থেকে শুরু করে খাট-পালং বিছানাপত্র যে যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। নরেশ পোয়াতি বউ, বুড়ি মা ও পিসিকে নিয়ে কিছুদিন পালিয়ে থেকে জানে বেচেছে বটে, কিন্তু লুটপাট ঠেকাতে পারেনি। তবে এত ঝড়ঝাপ্টার পরও বাইরে থেকে বাবুবাড়ির চেহারা আগের মতোই দেখতে পায় মানিক। সামনের খোলানে মাড়াইয়ের অপেক্ষায় ধানের আঁটি ও অন্যদিকে পোয়ালখড়ের পুঞ্জ। গরু-বাছুর কি মানুষজন নেই।

বাড়ির ভেতরেও সুনসান নির্জনতা। প্রাণবন্ত ও হই চই-পছন্দ স্বভাবের পরেশ কাকার অনুপস্থিতির শোক যেন গোটা বাড়িজুড়ে। মানিকও শোকার্ত কণ্ঠে ডাকে, 'এ বাড়ির লোকজন কই?'

পরেশ কাকার বুড়ি পিসির হাকডাক শুনে শিবুকে কোলে নিয়ে আসে পরেশের বুড়ি মা। কোচবিহারে থাকার সময় শিবু প্রথম কয়েকদিন বাবা বাবা করে কান্নাকাটি করলে, শেষ দিকে মানিকেরও বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল। মানিককে দেখলেই দাদা দাদা বলে কোলে আসার জন্য হাত বাড়াত। আশ্চর্য যে, এতদিন পরও মানিককে দেখেই সে দাদা বলে হাত বাড়ায়। মানিক শিবুকে কোলে তুলে নেয়।

কান্নাকাটি দেখার ও তা ঠেকানোর মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তো এসেছে মানিক। হাসিখুশির শিবুকে আদর দিতে নিজেও প্রসন্ন মেজাজে বলে, 'ও দিদি, কেমন আছেন আপনি? এই দেখেন শিবু সবকিছু ভুলে কীরকম হাসিখুশি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, আপনাদেরও শিবুর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।'

'তোকে বসতে দেওয়ার মতো চেয়ারও নাই ঘরে। বউমারা দিঘির পাড়ে রোদ পোয়ায়, চল, ওইখানে বসি গল্প করবি।'

মানিক শিবুকে কোলে নিয়ে বাবুর দিঘির পাড়ে যায়। পশ্চিম দিকটি খোলা বলে উঁচু পাড়ের ওপর বিকেলের রোদ পড়েছে। পাড়ে রোদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে বসে আছে পরেশ-নরেশের বউ ছাড়াও হিন্দুটাড়ির কয়েকজন মহিলা। মালতী খালি ঘাসের ওপর বসে আছে ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, নরেশের মেয়ে — না দেখেও বুঝতে পারে মানিক। পাশেই নরেশের বউ। মানিককে দেখে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মালতী কোলের বাচ্চার সঙ্গে একতরফা খোশগল্প করছিল বোধহয়, মানিকের উপস্থিতিতে তার মুখের রং বদল করে মাত্র, কিন্তু ফিরে তাকায় না, উঠেও দাঁড়ায় না।

শিবু মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানিককে চিনিয়ে দেয়, 'ও মা, মা, দাদা, মা, দাদা।'

'হ্যাঁ, ঘরে নিয়ে বসতে দাও।'

'না, এইখানে বসি, রোদ আছে।'

একটি কিশোরী মেয়ে হুকুম পেয়ে বাড়িতে যায় একটা মোড়া আনার জন্য। পরেশের মা বাড়ির পুকুরটাকেও নতুন করে চিনিয়ে দেয়, 'কত মাছ ছিল দিঘিতে! সব মানুষ লুটপাট করি নিয়া গেছে। দিঘিরপাড়ের নারকেল গাছের ডাব-নারকেলও ছাড়ে নাই। পরেশ বাড়িতে থাকলে বাবুর বাড়ির একটা গাছেও হাত দেওয়ার সাহস পায় নাই মানুষ। একটা সুতা নিতেও ভয় পাইছিল মানুষ।'

'আবার সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি।'

'কেমনে ঠিক হইবে রে ভাই? পরেশ কি আর ফিরি আসপে?'

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পুরনো ক্ষতেই খোঁচা দিয়েছে মানিক। কান্নার জন্য সবাই প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরেশের মা কান্নার কণ্ঠে জানতে চায়, 'দাদা রে, তুই কি নিজের চক্ষে দেখছিস, পরেশ মিলিটারির গুলি খায়া মরি আছে? দেখছিস যদি, শিবুর দ্বারা ওর মুখে একটু আগুন দিস নাই ক্যানে রে দাদা? স্বাধীনতার জন্য মোর পরেশ তোর বাপের সাথে দল করিয়া দিনে রাইতে এত কাজ করলে! স্বাধীন দেশ দেখার আগে তার লাশ কুকুর-শেয়ালে খাইলে ক্যানে রে?'

পরেশের মায়ের কান্না মুহূর্তেই সংক্রমিত হয় উপস্থিত অন্য মহিলাদের মধ্যে।

কিন্তু যার বেশি কাঁদার কথা, সে কথা বলে প্রায় স্বাভাবিক গলায়, 'ও মা, আসতে না আসতে মানিককে আবার কাঁদন দেখাইতে শুরু করলেন! আমার কান্না দেখার ভয়ে কোচবিহারে আমাকে একলা রেখে যুদ্ধ করতে গেল, কাকা নাই বলে এ বাড়িতে আসার সময়ও হয় না, কাল সে জন্য শিবুকে নিয়ে আমি গেলাম।'

মানিক কান্না চেপে সান্ত্বনা দেয়, 'শিবুর দিকে তাকান, ও কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু ভুলে স্বাভাবিক হতে চাইছে। কিন্তু আপনারা যদি বারবার কাকার জন্য কান্নাকাটি করেন, শিবুকে কীভাবে মানুষ করবেন? ওর জন্য মন শক্ত করতে হবে সবাইকে।'

'নিজের সন্তান না হইলে বুঝবু না রে ভাই। তুই বাড়িতে আসার দুই দিন আগেও তোর বাপ এ বাড়িতে আসছিল। পরেশের মতো তুইও আর ফিরি আসবি না মনে করিয়া ডুকরে কাঁদছে। পরেশ নাই, তুইও নাই, তোর বাপ কয় — এই স্বাধীনতা দিয়া একলা আমি কী করব কাকি?'

মানিক মালতীর কোলের শিশুটির দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে, 'এটা তো মনে হয় ছোট কাকির মেয়ে? বাহ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো।'

'এটাও আমার মেয়ে মানিক। যুদ্ধের সময়ে জন্ম, স্বাধীন দেশে ফিরে আসিয়া ওরা নাম পাল্টে রেখেছি মুক্তি সাহা।'

এ সময় শিবু মানিকের কোল থেকে নেমে বাচ্চাটির কাছে ছুটে যায়। মানিক ভাবে, মুক্তিকে আদর করবে বুঝি, কিন্তু আক্রমণ করে বসে হঠাৎ।

'কী হিংসুক ছেলে রে বাবা!'

শিবুকে প্রতিহত করতে মুক্তিকে তার মায়ের কোলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মালতী। ছেলেকেও কোলে তুলে নেয়। হিন্দুটাড়ির বিধবারা সবাই সাদা থান পরে, কিন্তু মালতী একটি সাধারণ ছাপা সুতির শাড়ি পরেছে, গায়ে কালো চাদর। ইন্ডিয়ায় দেখা মালতীর চেয়ে গ্রামের পরিচিত পরিবেশে বেশি সুন্দর দেখায়। মালতীর নগ্ন কোমরের সামান্য উদ্ভাস কোচবিহারের নিষিদ্ধ আগুনের স্মৃতিও উসকে দেয় যেন।

নরেশের স্ত্রী বলে, 'তোমার ছোট কাকা কয়, কোচবিহারে দিদির মামারা নাকি তোমাকে মানিক সাহা নামে আমাদের আপন ভাতিজা হিসেবেই জানে সবাই। খুব প্রশংসা করেছে তোমার।'

পরেশের মা ছেলের শোক ভোলে না বোধহয়, কণ্ঠে কান্নার রেশ নিয়ে বলে, 'পরেশ মানিকের বাপকে আপন ভাইয়ের চাইতেও বেশি জানত। তোর বাপ কাঁদি কয়, পরেশ না থাকায় মোর ডাইন হাতখান যেন খসি পড়ছে কাকি। যা দাদা, বাড়ির ভেতরে গিয়া বস। বউমা, শিবুকে মোর কাছে দিয়া একটু চা-টা করি দাও। কাপ-পিরিচ, বাসনকোসন যা ছিল, সবই লুট হইছে রে দাদা। টাউন থাকিয়া নরেশ আবার কিনিয়া আনছে।'

শিবুকে নিয়ে মালতীর পিছু পিছু বাড়ির ভেতরে যায় মানিক।

পরেশের ঘরে ঢুকে মালতীর শোক ও শূন্যতা নতুন করে উপলব্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে সহজেই। কত সুন্দর সাজানো-গোছানো ছিল ঘরটি। খাট, আলনা, আলমারি, শোকেস ভরা কত যে জিনিসপত্র। এখন শুধু খাটটাই আছে, বসার একটা চেয়ারও নেই। মানিক শিবুকে নিয়ে বিছানায় বসে। কিন্তু শিবু চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়। বিছানা থেকে নেমেই ছুট দেয় বাইরে, মায়ের কাছে।

নরেশের বউ অঞ্জনা বাচ্চা কোলে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। কথা বলে হাসিমুখে, 'তোমার কাকা বলে গেছে, তুমি আসলে যেন সারাদিন বাড়িতে আটকে রাখি। তুমি আস না বলে দিদিকেই তোমাদের বাড়িতে রোজ পাঠায় দিতে বলেছে।'

মনে ভয়, মুখে হাসি ফুটিয়ে জানতে চায় মানিক অঞ্জনার কাছে, 'কেন কাকি? কাকা আমাকে আটকে রাখতে বলেছে কেন?'

'দিদি এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি মানিক। ছেলেকে নিয়ে একেবারে বাপের বাড়িতে যেতে চায়। বিপদের সময় তোমরা এক সাথে ছিলে, তোমার সঙ্গে গল্পসল্প করলে বেচারি মনে কিছু সান্ত্বনা পাবে। যতদিন গ্রামে আছ, দিদিকে বুঝসুঝ দিয়ে মনটাকে একটু শক্ত করতে বলো।'

মানিকের মন তবু সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হতে পারে না, নরেশ ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর কাছেও বউদির সঙ্গে মানিকের শরীরী সম্পর্কের কথা বলেছে নিশ্চয়। নইলে সঙ্গ দেওয়ার উৎসাহ দেয় কেন?

'কাকি কোথায় গেল? আমি না হয় পরে আসব কাকি, এখন যাই।'

'না বাবা, বসো। একটু চা-টা খাও, দিদির সঙ্গে তো কথাই বললে না। বসো একটু, আমি চা বানাই।'

মিনিট দুয়েক একা অপেক্ষার পর মানিক যখন চলে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বারান্দায়, মালতী রান্নাঘর থেকে ঘরে আসে। হাতে চায়ের কাপ।

'চলে যাচ্ছ? যাবাই তো। যুদ্ধের সময়ও ভিনদেশে তোমাকে ধরে রাখতে পারি নাই, স্বাধীন দেশে তোমাকে কেমন করে আটকাব? চা-টা খেয়ে যাও।'

মালতীর কথায় প্রচ্ছন্ন অভিমান নাকি অভিযোগ? থমথমে বিষণ্ন চেহারাতেও যেন চাপা ঘৃণা। মানিক মাথা নিচু করে, ঘরে ঢোকে আবার।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আর কিছু দিতে পারলাম না। ঘরে আর কিছুই নাই। ভালো বাসনকোসনগুলো সব লুট হয়েছে। তোমার বাপ সরকারি কিছু হাঁড়ি-পাতিল রিলিফ হিসাবে দিয়াছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাল আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, বিউটি বলল, কী দরকারি কথা আছে আমার সঙ্গে।'

'নরেশ তোমাকে কিছু বলেনি?'

'কোচবিহারের কথা?'

'হ্যাঁ। তোমার আসল পরিচয় তো নরেশ ওদের জানিয়ে দিয়ে এসেছে।'

'অঞ্জনা কাকি তো একটু আগেও বলল, ওরা আমার খুব প্রশংসা করেছে।'

'তুমি তাই বিশ্বাস করলে?'

'ওসব পেছনের কথা থাক কাকি। মনে করেন একটা দুঃস্বপ্ন, কেটে গেছে।'

'এই দুঃস্বপ্ন, এত ক্ষয়ক্ষতি কি ভোলার মতো মানিক? স্বামীকে হারিয়ে যে দুঃখ পেয়েছি, তুমি ওইদিন ওভাবে আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম। শিবুও দাদা দাদা বলে কত যে কেঁদেছে।'

'কষ্ট কি আমিও কম পেয়েছি? মুক্তিযুদ্ধ আপনার জীবনটা যেমন পাল্টে দিয়েছে, আমার জীবনটাও পাল্টে দিয়েছে। আমি হয়তো আর ঢাকা ফিরে যাব না।'

'গ্রামে থেকে কী করবে?'

'দেশ স্বাধীন হলো, তারপরও দেশের জন্য মানুষের জন্য কত কী করার আছে!'

'আর যাই করো, আমার কষ্ট আর বাড়িও না।'

মালতীর চোখে জল উছলায়। মালতীর কষ্ট কি কোচবিহারে রাতের অন্ধকারে মানিকের পালিয়ে যাওয়ার জন্য, নাকি প্রবাসে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগে মানিকের অবৈধ ভালোবাসা প্রকাশের দুঃসাহসের কারণেও?

'আপনার মামা-মামি কাকাকে কী বলেছে?'

'ওদের ছোটলোকি সন্দেহের কথা তোমাকে তো বলেছিলাম। ওই রাতের পর ওরা সন্দেহটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য হিসেবে বিশ্বাস করেছে, নরেশকেও সব জানিয়েছে।'

'আসল সত্য তো একদিন প্রকাশ পাবেই।'

'কী আসল সত্য?'

'আমি ভালো না খারাপ, আমার প্রকৃত পরিচয়?'

মালতী মানিকের দিকে অপলক তাকায়। মালতী সে রাতে ছি বলে বাধা দেওয়ায় মানিক ভালোবাসার কথা বলেছিল। সর্বস্ব হারানো নিঃস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীর দিকে তাকিয়ে থেকে আজ মনে হয়, সেদিন মিথ্যে বলেনি সে এবং কোনো অপরাধও করেনি। এই মালতীকে মানিক ভালোবাসে, আসমাকে নয়, সে আসলে এই মেয়েকেই ভালোবাসতে চেয়েছে। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মাটিতে পা রেখে যে রকম অনুভূতি হয়েছিল, দুঃখিনী মালতীকে দেখে সেই রকম অনুভূতি বুকের ভেতর টনটন করছে। মানিকের দেশপ্রেম আর মালতীর প্রতি ভালোবাসা যেন একাকার হয়ে উঠতে চায়। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অপরাধবোধ চাপা দিয়ে ভালোবাসাটা সত্য হয়ে উঠতে চায় বলে বুকের ভেতর আলোড়ন শুরু হয়। সিদ্ধান্ত নেয়, মালতীকে আগের মতো আর কাকি ডাকবে না মানিক।

'আমার কাছ থেকে পালানোর পর বাণ্টুর মতো তুমিও তাহলে অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছ?'

'না। তবে ট্রেনিং নেওয়া শেষ হয়েছে। এবারে যুদ্ধ শুরু হবে।'

'দেশ তো স্বাধীন হলো। আবার কিসের যুদ্ধ শুরু করবে তুমি?'

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর মানিক এ কয়দিনে স্বাধীনতার স্বরূপ যা দেখেছে, মালতীকে সব বলতে ইচ্ছে করে। সর্বহারার মুক্তির পথ সম্পর্কে মানিক যা জেনেছে, মালতীকেও সব জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মালতী এখনো নিজে সর্বহারা হওয়ার শোকেই পাথর, মানিকের জন্য অন্তরের কোণে হয়তো জমিয়ে রেখেছে ছি ধিক্কার। বোঝালেও সে হয়তো ভুল বুঝবে।

'আমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আসমার ওখানে এমেনের কলকাতার বাসায় গিয়েছিলে শুনলাম। কতদিন ছিলে ওখানে?'

'একদিনও না।'

'শুনলাম তার বাবা মন্ত্রী হয়েছে। দেখা করতে যাবে না?'

'না'।

'আবার বাড়ি থেকে কবে পালাবে?'

মানিক খোলা দরজার দিকে তাকায়, তারপর মালতীর দিকে একাগ্র দৃষ্টি চেপে রাখে। চাপা আবেগময় বক্তব্য দু'চোখে জ্বলজ্বল করে — 'আর পালাব না মালতী। তোমাকে একা রেখে আমি আর কোথাও পালাব না। গ্রাম থেকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুন জীবন নতুন লড়াই শুরু করব এবার।

'মালতীর চোখ নতুন করে ছি বলে কি? মানিকের সাহস দেখেই যেন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।'

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে, 'আমি পরে আসব। অনেক কথা বলতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊনচল্লিশ

বাণ্টু যে আগের মতো চাকরের কাম না করেই ভুঁইয়াবাড়িতে তিন বেলা খায়, সে জন্য তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়টাই দায়ী আসলে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেকে সারাক্ষণ বড় করে দেখতে হয় এবং দেখাতেও হয় অন্যদের কাছে। মুক্তিযুদ্ধ থেকে আনা অস্ত্র সে মনিববাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। রাতে শত্রু মোকাবিলার জন্য সশস্ত্র ঘুমায় এ বাড়িতেই। স্বাধীনতার বড় শত্রু রাজাকার-আলবদর বা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান যখন গ্রামে লুকিয়ে ছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের অস্ত্র নিশপিশ করেছে। শত্রু খতম কী শত্রু-বাঁচানোর গরজেও বাণ্টুকে অস্ত্র হাতে জেগে থাকতে হয়েছে সারারাত। মনিব বলেছে বলে বড়বাড়িতে চোরডাকাত ঠেকাতেও অস্ত্র হাতে সজাগ থাকে বাণ্টু। অতঃপর দিনে মুক্তিফৌজ হিসেবে গ্রামে মাতবরি করা আর রাতে বড়বাড়িতে চোর-ডাকাত ঠেকাতে হুঁশিয়ার থাকাটাই তার কাজ।

ট্যারা জহির একদিন ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, 'চাষাড়ি কাম করলে মুক্তিফৌজের সম্মান যায়, কিন্তু মাদুও কি মুক্তিফৌজ হয়া গেইছে! ও কাম করে না ক্যান?'

'মাদু ছোট মানুষ, বড়বাড়িতে গোলামি না করিয়া সে যদি স্বাধীনভাবে থাকতে চায়, তাতে তোর গাও জ্বলে ক্যানে রে হিংসাচোদা?'

বাণ্টুর মেজাজ নীরবে সহ্য করে ট্যারা জহির। কিন্তু ভুঁইয়ার এত বড় গেরস্তি, ট্যারার পক্ষে কি একলা সামলানো সম্ভব? সম্ভব নয় বলে অন্য কামলাপাইট রাখতে হয়। বাণ্টু তবু গরুর দড়িটাও ধরে না। ট্যারা বোঝে বাণ্টুকে আগের মতো সহকর্মী হিসেবে পাবে না আর। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে মনিব যদি বিনা কামে তাকে বসিয়ে বসিয়ে জামাই আদরে খাওয়ায়, তারই-বা আপত্তির কী আছে? তবে দেশে আবার যদি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, সবার আগে মুক্তিফৌজ হওয়ার জন্য ট্যারা জহিরই ছুটে যাবে এবার। এ কথাটা নিজেকে নয় শুধু, গ্রামবাসীকেও প্রায়ই শোনায় ট্যারা জহির।

মুক্তিফৌজ হিসেবে বাণ্টু ভুঁইয়াবাড়িতে কতদিন আর বসে বসে খাবে? এ প্রশ্ন শুধু ট্যারা জহির নয়, বাণ্টুর মা থেকে শুরু করে গ্রামের ছোট-বড়, এমনকি বাণ্টু নিজেও নিজেকে অনেকবার করেছে। সঠিক জবাব কেউ তাকে দেয়নি, নিজেও খুঁজে পায়নি। মনিবও তাকে ক্ষেতের কামকাজ করার কথা বলেনি এখনো। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শ্বশুরকে বাড়িতে ধরে আনার আদেশ করেছিল, অন্য দুই মুক্তিফৌজকে নিয়ে বাণ্টু সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াও যে কারো কাছে কোনো খবর নিয়ে যেতে বললে সাইকেল নিয়ে ছুটে যায় বাংটু। রিলিফ বিতরণের দিন উপস্থিত থাকতে বললে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকে ঠ্যাংভাঙা বাজারেও। কিন্তু এসব কাজ করে বাংটু যে কোনোদিনই মনিবের কাছে পরেশের মতো বিশ্বস্ত বা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না, সেটা সবাই বোঝে।

শ্বশুর বাড়ি থেকে পালানোর পর বাংটুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি ভুঁইয়া। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে ভাবলেও ভয় হয়। অন্যদিকে যার জন্য করি চুরি, সেও কয় চোর — মানিক ভাইয়ের ব্যবহারটাও যেন এ রকম। একদিন সে বাংটুর কাছেই জানতে চায়, 'কী রে বক্কর, মুক্তিযোদ্ধা হইছিস খালি কি ভুঁইয়া আর তার বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য?'

'এখন আর কার বিরুদ্ধে অপারেশন চালাব ভাইজান? হামার সেক্টরের সাথী মুক্তিফৌজরা যে কাঁয় কোন্ঠে আছে, কাঁয় কীবা করতেছে, তাও তো জানি না।'

মুজিব তো বলেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়তে হবে, স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। রেডিয়োতে শেখের ভাষণ বাংটু নিজেও শুনেছে। কিন্তু দেশের জন্য মুক্তিবাহিনী এখন কী কাজটা করবে, কী করা উচিত, মুজিব নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। মানিক ভাইও যদি সেটা স্পষ্ট করে না বলে দেয়, তাহলে বাংটু কী করবে?

অবশেষে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় বাংটু। রংপুরেও খোলা হয়েছে মিলিশিয়া ক্যাম্প। সেখানে অস্ত্র জমা দিয়ে মুক্তিফৌজ হিসেবে কে কোন সেক্টরে কার আন্ডারে যুদ্ধ করেছে এসব পরিচয় লেখাতে হবে। তারপর মিলিশিয়া বাহিনীকে কী কাজে লাগানো হবে, কী রকম বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে — ক্যাম্পে গেলেই বিস্তারিত জানতে পাবে বাংটু। মিলিশিয়া বাহিনী হতে ইচ্ছুক এলাকার অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই। তবে সবচেয়ে খুশি হয় বাংটু। স্বাধীন দেশে নিজের দিশেহারা ভাব আর ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সে। বড়বাড়ি বসে বসে খাওয়ার চাকরি ছেড়ে শেখ মুজিবের মিলিশিয়া হওয়ার সুখবরটি নিজেই গ্রামবাসীদের জনে জনে বলতে থাকে।

ভুঁইয়াবাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার একদিন আগেই ভোরবেলা বিউটির কাছে সুখবরটি জানানোর সুযোগ পায় বাংটু। বাড়ির পেছনের খোলানে ছোট ভাইকে নিয়ে পোড় তপাচ্ছিল সে। বাংটু যোগ দিয়ে খবরটি দেয়।

'আজকেই মনে হয় এ বাড়িতে আমার শেষ আগুন তপানো। কাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে আমরা অস্ত্র নিয়া চলি যামো মিলিশিয়া বাহিনীতে।'

'মিলিশিয়া কি মিলিটারির মতো? কত বেতন পাবু?'

'বেতন শেখ মুজিব যা দেবে, তাই হামরা খুশি হয়া নেমো। বেতন না দিয়াও যদি খালি ভাত-কাপড় দিয়া হুকুম দেয় পুলিশ-চৌকিদারের মতো দেশখান পাহারা দাও, দেমো। ধরো, দেশ গড়তে যদি কয় ক্ষেতে কাম করো, মাটি কাটিয়া রাস্তা বাঁধো, তবে তাও করা লাগবে।'

ভুঁইয়ার ছোট ছেলে রফিক মন্তব্য করে, 'বুঝছি মিলিশিয়া মানে শেখ মুজিবের কামলা। কামলা খাটতে যাবু তুই।'

বড়বাড়িতে বসে খাওয়ার চাকর হওয়ার চেয়ে যে সরকারি মিলিশিয়া হওয়া অনেক গৌরবের, সেটা রফিক না বুঝলেও বিউটি নিশ্চয় বোঝে। কিন্তু বাণ্টু বাড়ি ছেড়ে যাবে বলে খুশি হয় না। মন খারাপ করা কথা বলে, 'তোর সাথে তা হইলে আর দেখাই হবে না আমাদের।'

'ছুটি পাইলে আবার আসমো। হামরা তো আর চিঠি লিখতে পারি না যে মাঝেমধ্যে চিঠি দিয়া খবর দেমো।'

চিঠির খোঁচা দেওয়ায় বিউটি কি একটু লজ্জা পায়? মাথা নিচু করে সে।

'বাণ্টু ভাই, তোর রাইফেলটা কী করবি? আমাকে না হয় দিয়া যা।'

'দুর পাগলা! ওইটাই তো হামার আসল জিনিস, ওখান সরকারের কাছে জমা দেওয়া লাগবে।'

'সেদিন বললি যে, কী ভাবে তোরা যুদ্ধ করেছিস একদিন রাইফেল দিয়া দেখায় দিবি।'

বিউটির শেষ আবদারটি আজ রক্ষা করতে না পারলে আর তো করাই হবে না। বাণ্টু সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে রাইফেল ও গুলি আনতে যায়। ফিরেও আসে অল্প সময়ের মধ্যে।

ভিটার পেছনের জঙ্গলবাড়ি দেখিয়ে বলে, 'মনে করেন ওই জঙ্গলের ওপাকে পাকবাহিনীর ক্যাম্প। মনে করো শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বদনা হাতে ওই জঙ্গলে গিয়া পালাইছে। আমি এখন ক্রলিং করিয়া আগাব, তারপর শত্রুকে টার্গেট করিয়া ফায়ার করব।'

বাণ্টু রাইফেল নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, তারপর ক্রলিং করে বেশ খানিকটা এগোয় এবং ভিটার জঙ্গলের দিকে একটা গাছ নিশানা করে গুলি ছোড়ে। অকস্মাৎ ভিটাবাড়ির নিস্তব্ধতা ফুঁড়ে গুলির শব্দ হলে খড়ের গাদার পেছনে ধান খুটে খাওয়া মুরগিগুলো ভয়ে মাথা তোলে, কক কক করে পালায় কেউ-বা, খড় মুখে বাঁধা গরুগুলোও সন্ত্রস্ত হয়। বিউটি কানে আঙুল দিয়ে বলে, 'এই খবরদার, গুলি করিস না আর।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ির ভেতরেও তখন গুলির শব্দ শুনে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমেছে সজব ভুঁইয়া। আতঙ্ক-বিহ্বল চেতনায় শত্রুদের অবয়ব স্পষ্ট হওয়ার আগেই বাড়ির পেছনে বাণ্টুর সহাস্য কথা কানে যায় তার, 'নাও, এক গুলিতেই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান খতম।'

বাণ্টুর যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা দেখতে বাড়ির প্রায় সকলেই জড়ো হয়েছিল পেছন খুলিতে। বাণ্টু ট্যারা জহিরের দিকে যখন রাইফেল তাক করে মিছেমিছি গুলির ভয় দেখায়, ঠিক তখন সজব ভুঁইয়া হুংকার ছোড়ে, 'কী রে বাণ্টু বক্কর, গুলির আওয়াজ হইল কেন?'

'বড়বা, বিউটিবু দেখতে চাইছিল, সেই জন্য একটা বেলাঙ্ক ফায়ার করলাম। এইটাই হামার শেষ ফায়ার। কালকে তো অস্ত্র জমা দিতে রংপুরে যাব।'

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে বাড়িতে ভুঁইয়ার মনে ডাকাত পড়ার আতঙ্কটাই যেমন চলকে উঠেছিল প্রথম, তেমনি ডাকাতবিনাশী হিংস্র ক্রোধ চনমন করে জাগে বাণ্টুকে দেখে। ওর রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে বিচ্চুটাকে এখনই পাল্টা গুলি করলেও এই রাগ শেষ হবার নয়। কাছে গিয়েও নিজেকে তাই সংযত করে সজব ভুঁইয়া, 'এটা কি খেলনা রে হারামজাদা! যা, ভালো করে রাখ। কালকে গুলিসহ জমা দিতে যাবি। যে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেবে না, তারা বিপদে পড়বে বলে রাখলাম। থানায় কেস হবে তাদের নামে।'

বড়বাড়িতে বাণ্টুর বিদায়ী গুলির আওয়াজ নজিবরের পুরনো প্রতিশ্রুতি এমনভাবে জাগিয়ে তোলে যে, পরিবারের মধ্যেও তা হুলস্থূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেখ মুজিব জীবিত দেশে ফিরলে বাড়িতে মিলাদ দেবে সে। কথাটা যুদ্ধের সময় ভুঁইয়াবাড়িতে দশজনের সামনে একাধিকবার ঘোষণা করেছিল। বাণ্টুকেও বলেছে, গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের দাওয়াত করে খাওয়াবে একদিন। এখন মুক্তিযোদ্ধারা যদি কালকেই মিলিশিয়া বাহিনীতে চলে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা নজিবরকে ওয়াদা খেলাপের জন্য যদি গুলি করার হুমকি দেয়, বুক পেতে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে নজিবরের? তার চেয়েও বড় কথা, শেখের মামুর মান থাকবে না গ্রামে।

মুক্তিফৌজ বাণ্টুর বিদায়ী গুলির শব্দ শুনেই তাই প্রতিশ্রুতি পূরণে তৎপর হয়ে ওঠে নজিবর। বাধাটা আসে ঘর থেকেই প্রথম। মিলাদ উপলক্ষে বড়জোর এক সের জিলাপি কী গজা কেনার টাকা ব্যয় হলেও একাব্বরের মা আপত্তি করত না। কিন্তু শেখের মামু উৎসবের মতো বাড়িতে মহা ধুমধাম করে মুক্তিফৌজদের জেয়াফত খাওয়াতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভটা কী? জেয়াফতের বাড়ির দুটি হাঁস, চারটা মুরগি ছাড়াও জাঙলার দুটি লাউ যাবে — সেগুলোর আসল মালিক কে? অবশ্যই একাব্বরের মা। মুক্তিযোদ্ধা বলতে বাংটু ও তার মায়ের কথাই মনে আসে একাব্বরের মায়ের। পড়শি এ দুটি মানুষের চেয়ে নিজের পোষা হাঁস-মুরগির জীবন তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। মুক্তিফৌজ বাংটুকে নিয়ে লোকেরা যতই গল্পগান করুক, তাকে বড়বাড়ির চাকরের বেশি কিছু ভাবতে পারে না সে। বাংটুকে ডাকলে মুক্তিফৌজের মা আসবে বিনা ডাকেই। এদের জন্য আকালের দিনে এতগুলা টাকা খরচ করে লাভটা কী পাবে শেখের মামু? এমনিতেই স্বাধীনতা পেয়ে তেল-নুনসহ সব জিনিসেরই দাম হু-হু বাড়ছে। পাট বেচে যে কয়টা টাকা হাতে এসেছে, তা দিয়ে বউয়ের জন্য একখানা ইন্ডিয়ান শাড়ি কেনার সাহস পায়নি নজিবর। অথচ বাংটু ও তার মাকে খাওয়াতে এত ধুমধাম!

শেখের নামে মিলাদের বিরোধিতা করেও একাব্বরের মা একাব্বরের বাপকে ঝাঁঝাল যুক্তি দেয়, 'শেখ মুজিবর দেশের রাজা হয়া একখান কম্বল দিছে হামাকে? বাংটুর মাও কত 'ইলিপ' পাবার নাগছে, ফের শুনি শেখ মুজিবর বাংটুকে চাকরিও দিলে। বেটার গর্বে বাংটুর মায়ের ঠ্যাং মাটিত পড়ে না। কিন্তু শেখের নামে এলাও তোমার এত খাউজানি কিসের?'

'শেখ মুজিবের মূল্য তুই বুঝবু না রে মূর্খ মাগী। মুজিব না থাকলে সাত কোটি বাঙালি মরিয়া এতদিনে ভূত হইত। মুজিব না থাকলে বাংটুর মতো মুক্তিফৌজরা আইজ মিলিশিয়ার চাকরি পাইত না। শেখ না থাকলে সজব ভুঁইয়া আর নজিবর পীরভাইয়ের মতো এক কাতারে বসিয়া খাইতে পারত কোনোদিন? ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত মুজিবরকে সম্মান করি কত কী দিলে, আর তোর কাছে সামান্য হাঁস-মুরগির জীবনের দাম বেশি হইল!'

মুজিবের গুণকীর্তনও স্ত্রীর ঔদার্য জাগাতে পারে না, সাফসাফ জানিয়ে দেয় সে, 'মোকে তোমার পীরের গুণকীত্তন করিয়া লাভ নাই। বাংটু আর তার মায়ের জন্য হাঁস পোষো নাই মুই।'

'আহা খালি বাংটু না-হয়, সজব ভুঁইয়া আর তার বেটা মানিকও আসপে জেয়াফতে। মক্তিযোদ্ধার মধ্যে ধর, জনা সাতেক।'

সজব ভুঁইয়া ও তার ছেলের নাম শুনে নজিবরগিন্নি নরম হয়ে আসে অনেকটা। কারণ এমন নামিদামি মানুষকে খাওয়ানোর উপলক্ষ হরহামেশা ঘটে না। তাছাড়া ভুঁইয়ার কাছে একাব্বরকে দিয়ে রিলিপের একখানা কম্বলের আরজি জানিয়েছে, বাড়িতে এনে 'জেয়াফত' খাওয়ালে কম্বলের দাবিটা জোরালো হবে সন্দেহ নেই। নজিবরের বউ তবু শর্ত জুড়ে দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘মোর হাঁসের দাম দেওয়া লাগবে কিন্তু।’

‘আচ্ছা হইল! আগামী হাটে তোর জন্য ইন্ডিয়ান শাড়ি না কিনলে শেকের মামু নাম পাল্টে থুইস মোর।’

এ সময় বাড়িতে দাম্পত্য কলহের আওয়াজ পেয়ে গায়ে রিলিপের কম্বল জড়িয়ে মুক্তির মা আছিমন আঙিনার এসে হাজির হয়। হাসিমুখে জানতে চায়, ‘কী হইছে — শেখের মামু আর মামি ফুটিল্-বিহানে ঝগড়া করে ক্যানে?’

স্বামীকে চোখ ঠেরে একাব্বরের মা বলে, ‘আসল দাওয়াতি আসিয়া হাজির। নে মুক্তির মাও, তোর বেটা আর ভুঁইয়ার বেটা হামার বাড়িতে দাওয়াত খাইবে আইজ। মোর হাঁস দুইটা সইর করিয়া দে। পোলার চাউলও বানা লাগবে দুই সের।’

খুশিমনে আছিমন আরো সুখবর জানায়, ‘মোর মুক্তিকে শেখও দাওয়াত দিছে। অস্ত্র জমা নিয়া মিলিশিয়ার চাকরি দেবে। আল্লায় জানে কয় টাকা যে বেতন পায়।’

বাড়ির জোগাড়যন্ত্র শেষ হতে না হতেই নজিবর ছোটে দাওয়াত দিতে।

এমন একটা খুশির দাওয়াত পেয়ে সজব ভুঁইয়া যে নজিবরের মুখে থু মতো কথা বলবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি সে। বাণ্টুর নাম বলতেই গর্জে ওঠে, ‘মুক্তিফৌজ বাণ্টু, সজব ভুঁইয়া আর মানিক তোর কাছে আজ এক হইল রে? বাড়ির চাকরদের সাথে বসি খাইতে ভুঁইয়া বা তার বেটা কেউই যাবে না। তুই মুক্তিফৌজদের যত খুশি জেয়াফত খাওয়াও।’

চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভুঁইয়া সাইকেলে চেপে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এখন নজিবর কী করে? ওদিকে বাড়িতে হাঁস-মুরগি জবাই হয়েছে, বাণ্টু নজিবরের হয়ে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দাওয়াত দিতে গেছে। এ অবস্থায় বাণ্টুকে কি না করা সম্ভব? অন্যদিকে ভুঁইয়া বা তার ছেলেকে বাদ দিয়ে নজিবরের এই আয়োজন শুধু ঘরের স্ত্রীর কাছেই মূল্যহীন নয়, সজব ভুঁইয়া, স্বয়ং শেখ, এমনকি আল্লাহ তায়ালাও তার বাড়ির মিলাদ কবুল করবে কোনোদিন?

মানিককে সমস্যাটির কথা বলতে গিয়ে নজিবরের চোখে তাই পানি আসে।

মানিক তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্বস্ত করে, ‘আব্বা না গেলেও আমি অবশ্যই যাব চাজি। অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও আসবে।’

‘কিন্তু তোমার বাপ রাগ হইলে মোর এই দাওয়াতের মূল্য থাকপে বাজান?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে আব্বাকে এতো ভায় পান কেন! আমি তো আছি, আপনি যান, ব্যবস্থা করেন।'

সন্ধ্যায় নজিবরের বাড়ির মিলাদে মসজিদের ইমাম হুজুর, বাংটুসহ ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা, ছেদরা সলেমনসহ মোট ষোলজন গ্রামবাসী জড়ো হয়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে মানিকই যে প্রধান অতিথি, সেটা মিলাদ ও মুনাজাত শেষ হওয়ার পরই বোঝাতে সচেষ্ট সবাই। বসার ব্যবস্থা হয়েছে খোলা আঙিনায়। ঠাণ্ডা মাটির ওপর মসজিদ থেকে আনা মজলিশি চট বিছিয়ে দিয়েছে বাংটু। দুটি হ্যারিকেনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তর থেকে ভেসে আসে শিরশিরে হিমেল হাওয়া, গায়ের আলোয়ান আর পরনের লুঙ্গি ভেদ করে হু হু কাঁপন জাগাতে চায়। তার ওপর ভেজা মাটির শীতল স্পর্শ চট ফুঁড়ে সবার পশ্চাৎদেশে কামড় বসায় যেন। বৈরী আবহাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করে ছেদরা সলেমন, 'ও শেখের মামু, ঠাণ্ডায় হামার তলপাকখান যে অচল হইল। এক কাম কর, চটের ওপর একখান খ্যাতা বিছায় দিয়া ভুঁইয়ার বেটাকে বসতে দে। মানিক আসায় তোর জেয়াফতে মনে কর কাজী চেয়ারম্যানও আছে, হামার ভুঁইয়া চেয়ারম্যানও আছে, আবার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারও আছে। তার জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল তোর।'

ছেদরার কথায় উপস্থিত সবাই হেসে সমর্থন জোগালেও মানিক মনঃক্ষুণ্ন হয়। লোকজন স্বাধীন দেশেও তার মাঝে নানা ও বাবাকে খুঁজতে চায় কেন? ফলে দুই কাঁধে নয় শুধু, আত্মপরিচয় চাপা পড়ায় বুকের মধ্যেও যেন অসম্ভব ভারবোধ করে মানিক।

মুক্তিযোদ্ধা আম্বারও ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে, 'একটা অপারেশন খালি আপনার জন্য চালাইতে পারলাম না মানিক ভাই! শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আফতাব কাজীকে হাতের মুঠায় পায়াও কোনো শিক্ষা দিতে পারলাম না।'

যশোরে অচেনা মুক্তিবাহিনীর হাতে রাজাকার হিসেবে বন্দি হওয়ার স্মৃতি চকিতে মনে পড়ে মানিকের। দুই কাঁধে বাবা-নানা, সামনে মুক্তিযোদ্ধা, পেছনে ঠাণ্ডার কামড় — সবকিছুকে একই সঙ্গে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সজোরে গলাখাঁকারি দেয় সে। যশোরে অচেনা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছিল, চেনা গ্রামবাসীদের ভুল ভাঙাতে তার চেয়েও গরম বক্তৃতা দিতে হয় তাকে।

'শোনো তোমরা, আমার কথা শোনো আগে। দেশ স্বাধীন হইচে বলে কি তোমরা স্বাধীন হয়ে গেছ? না, হও নাই। নজিবর ও ছেদরার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষা, বাণ্টুর মতো নিঃস্ব ও বেকার মুক্তিযোদ্ধা — কেউই এখনো স্বাধীন হয় নাই। তোমরা কাল অস্ত্র জমা দিতে যাবে, যাও। কিন্তু মনে রাখবা, মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ ছিল, আছে এবং চলবেই। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান পালিয়েছে, কিন্তু তার বাড়ি দখল করে কাল থেকেই অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু করব আমি। এই যুদ্ধে কেবল কাজী চেয়ারম্যান নয়, সজব ভুঁইয়াও যদি শত্রু প্রমাণিত হয়, কাউকেই রেহাই দেব না আমরা।'

মানিকের গরম কথায় দাওয়াতিদের কেবল শীতবোধ যায় না, স্বয়ং শীতও যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে পালাতে থাকে।

ছেদরা সলেমন বলে, 'আবার কোন যুদ্ধ করতে চান বাহে ভুঁইয়ার বেটা? তোমার কথা শুনিয়া যে আমার গাও-মাথা গরম হইল বাহে।'

মানিক এবার শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করে।

'আমি বলতে চাই, দেশ স্বাধীন হলেও মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে তা আমি মনে করি না। শেখ মুজিবও যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মনিরেপক্ষতা কায়েমের কথা বলছে। কিন্তু সত্যই কি শেখ মুজিব ও তার দলের দ্বারা এ দেশে শোষণমুক্ত, ধর্মনিরেপক্ষ, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে? তার আলামত কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এসব প্রশ্নের জবাব জানতে হবে। দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য একা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শত্রু, নাকি সজব ভুঁইয়াও শত্রু — এ প্রশ্নের জবাবও পরিষ্কার বুঝবে হবে।'

একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে, 'আপনি যে কী বলতে চান মানিক ভাই, কিছুই বুঝলাম না। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, আমরা তেমন লেখাপড়া জানি না, সে জন্য বোধহয় আপনার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।'

বাণ্টু বুঝতে পারার গর্ব নিয়ে বলে, 'আরে না বোঝার কী আছে! শেখ মুজিবও তো একই কথা কবার লাগছে। রেডিয়োতে শোনেন নাই? দেশ গড়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্ট করা লাগবে, ধৈর্য ধরা লাগবে। অস্ত্র জমা নিয়া শেখ মুজিব হামাকে সমাজতন্ত্র, ধর্মপেক্ষ মানে মানিক ভাই যেগুলা ভালো কথা কইল, সেইগুলা গড়িয়া তোলার দায়িত্ব দেবে।'

'এই বাণ্টু বক্কর, তুই বেশি ভক্কর-চক্কর করিস না তো। বলেন মানিক ভাই, আপনি যদি আরো অপারেশন চালাবার কথা বলেন, তাহলে কি আমাদের অস্ত্র জমা দেওয়া উচিত? আমিও ভাবছি অস্ত্র জমা দেব কি দেব না।'

'অস্ত্র জমা দেবে অবশ্যই। আমি যে যুদ্ধ শুরুর কথা বলছি, সে যুদ্ধ শুধু বন্দুক দিয়ে হবে না। তোমরা মিলিশিয়া ক্যাম্পে গিয়ে দেখো — মুজিব মুক্তিবাহিনীর জন্য নতুন কী কর্মসূচি দেয়। আমিও এর মধ্যে গ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি ও অমুক্তি সবাইকে নিয়া মুক্তির নতুন কর্মসূচি তৈরি করে ফেলব।'

মসজিদের ইমাম হুজুর বলে, 'আপনাদের দিলের ভেদ জানি না, তবে চেয়ারম্যানের নাতির কথায় আমি খুব ভরসা পাইলাম। দোয়া করি, আপনার নানা-বাবার দ্বারা জায়গার যেটুকু উন্নতি হইছে, আপনার দ্বারা যেন বহুগুণ বেশি হয়।'

খাদ্য পরিবেশনে বিলম্ব হচ্ছিল বলে উঠানে ঠাণ্ডায় বসে দাওয়াতিরা গরম কথাবার্তা বলছিল। রান্নাঘর থেকে আগুন-ধোঁয়ার সঙ্গে খাদ্যের ঘ্রাণ আসছিল এতক্ষণ। এবার গরম খাবার আসে। ভাপওঠা গরম ভাত ও পোলাও-মাংসের ঘ্রাণ মনোযোগ কাড়ে সবার। শীতের কামড়ের কারণে হোক, আর খিদের কারণে হোক, ভালো করে হাত ধোয়ারও তর সয় না তাদের। নজিবরকেও জোর করে নিজের পাশে বসায় ছেদরা সলেমন। মেহমানদারি করার জন্য নজিবরের স্ত্রী পরপুরুষের সামনে আসে না। কিন্তু রান্নাঘর থেকে জোরগলায় নির্দেশনা দিয়ে ছেলেমেয়েকে ব্যতিব্যস্ত রাখে।

প্রধান পরিবেশনকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয় বাণ্টুর মাকে। বাণ্টুর মা অবশ্য নিজের ছেলে বা মুক্তিযোদ্ধাদের পাতে নয়, বেছে বেছে ভালো মাংসটা মানিকের পাতে দিতে ভুল করে না। পর্যাপ্ত আলো না থাকায় তরকারি থেকে মরিচ বাছতে পারে না মানিক। ফলে বেশি ঝাল হওয়ার কারণে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে না সে, কথাও বলতে পারে না অন্যদের মতো।

খাওয়া সাঙ্গ হওয়ার আগেই একটি হ্যারিকেনের আলো দ্রুত মরে যেতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হ্যারিকেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'এক ফোঁটাও তেল নাই বাহে, তেল দাও।'

নজিবর ছেলেকে তেল ভরে আনার নির্দেশ দেয়, রান্নাঘর থেকে জবাব ভেসে আসে, 'হাট হইতে এক ফোঁটা কেরাছিন আনে নাই। এই আকালের দিন এলায় কেরাছিন মুই পাইম কার বাড়িত?'

গত হাটের দিনে কেরাসিন তেলের বোতল ছুড়ে দিয়ে হাটে গিয়েছিল নজিবর। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে অপরাধী কণ্ঠে মেহমানদের কাছে কৈফিয়ত দেয়, 'যুদ্ধের পর হইতে কেরাছিন আর নুনের দাম এমন বাড়তেছে বাহে। ও একাব্বর, দেখ বাবা, কুপিতে তেল আছে কি নাই?'

বাণ্টু দ্রুত খাওয়া শেষ করে সবার আগে হাত ধোয়। সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়ে বলে, 'কেরাসিন লাগবে না বাহে। থাকেন, মুই বিনা তেলের হ্যাজাক বাতি জ্বালে দিম।'

এরপর বাণ্টু রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে এক মুঠো পাটকাঠি বেঁধে লম্বা মশাল বানায় একটা। মশালের আগুন চারদিকে ঘুরিয়ে খাওয়া শেষ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্য করে সবাইকে। তাতে আঙিনায় শীতের তীব্রতাও কমে খানিকটা।

শেখের মামুর বাড়িতে জেয়াফতের কথা ঢোঁড়া মোহাম্মদ বাণ্টুর মায়ের কাছে আগেই জেনেছিল। তাকে দাওয়াত দেয়নি বলে আসেনি। কিন্তু মুক্তির মায়ের ফেরা দেরি দেখে, তাকে খুঁজতে শীতের মধ্যেও কাঁথা গায়ে এগিয়ে আসছিল। উঠানে আগুনের নাচন দেখে ঢোঁড়া আস্তে আস্তে নজিবরের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

দাওয়াত খাওয়ার লোভে যে সে আসেনি, সেটা প্রমাণ করতে এসেই তার আগমনের কারণ মজলিশের সামনে ব্যাখ্যা করতে থাকে ঢোঁড়া, 'মুই মনে করনু শেখের মামুর বাড়িতে বুঝি আগুন নাগিল। দেখো দেখি কাণ্ড! কেরাচিন পোড়ার ভয়ে গ্রামের মানুষ এলা সাঁঝের আগে আইতের খাবার খায়। আর মুই তো খাইছোঁ বৈকালে।'

একে কড়া ঝাল, তার ওপর বাণ্টুর মা বেশি বেশি দেওয়ার কারণে খেতে পারছিল না আর মানিক। অন্যদিকে ঢোঁড়ার খিদেটাও বেশ অনুভব করতে পারছিল সে। নজিবর বা আর কেউ তাকে উপস্থিত দাওয়াত না দেওয়ায় মানিক উদ্যোগী হয়ে বলে, 'ও ঢোঁড়া যাদু, আমাকে একটু সাহায্য করেন বাহে। আইসেন তো আমার সঙ্গে বসেন আপনি, ও চাচি আর একটা থাল দেন তো।'

ডাকামাত্র ঢোঁড়া মোহাম্মদ পাশে বসলে মানিক নিজের পাতের অতিরিক্ত খাবার তার শূন্য থালে তুলে দিতে থাকে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেও মনের ভার কমাতে পারেনি মানিক, কিন্তু ঢোঁড়াকে নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যেন অনেকটা ভারমুক্ত হয় সে।

চল্লিশ

হাটের নিজস্ব একটা হল্লা আছে, একসঙ্গে হাজার মানুষ নানারকম কথা বললে এই আওয়াজটা তৈরি হয়। সন্ধ্যার পর গ্রাম-প্রকৃতি যখন নিঝুম হয়ে ওঠে, বাড়িতে বিছানায় শুয়েও কান পেতে মাইলখানেক দূর থেকেও হাটের হট্টগোলটা শোনা যায়। হাটের ভেতরে যারা, সবাই যে যার কেনাবেচার কথা বলছে, কান পেতে ঠিক জবাবটি শুনছে, তারা হাটের হল্লা ঠিক শুনতে পায় না। হল্লার প্রতিটি কথার আলাদা মানে আছে, কিন্তু একসঙ্গে শুনলে কোনো মানে নেই — আওয়াজমাত্র। মানিক নানাবাড়িতে থাকলে হাটের হল্লা শুনতে পায়। কিন্তু আজ হাটবার ছাড়াও, ঠ্যাংভাঙা বাজারের চায়ের দোকানে বসে হাটের সেই হট্টগোলটা শুনতে পায় যেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হল্লাটা শুরু হয়েছে আসলে তাকে ঘিরে।

গ্রামে থাকলেও কলেজে পড়ে, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা বেকার — এমন পাঁচজন যুবককে নিয়ে বাজারে চায়ের দোকানে বসেছিল সে। গাঁয়ের চাষিমজুর শ্রেণির মানুষ পান-সুপারি ও বিড়ি-তামাকে যেমন অভ্যস্ত, চায়ে ততটা নয়। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার সময়ও তাদের নেই। চা খায় মূলত গাঁয়ের ভদ্রলোক — দালাল, মাতবর ও সচ্ছল শ্রেণির মানুষ। শহরগঞ্জে যারা নিয়মিত যাতায়াত করে নানা ধান্ধায়, এরাই সাধারণত বাজারে টি-স্টলে বসে অলস সময় কাটায়। গরম চায়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে গরম কথা বলে টি-স্টলও গরম করে তোলে। কিন্তু মানিকের টি-স্টলে বসাটা সেরকম নয়। গ্রামে জাগরণী যুবসংঘ সংগঠনের কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছে সে। প্রস্তাবিত সংগঠনের নানা বিষয়ে আমন্ত্রিত যুবকদের মতামত জানতেই জরুরি সভা ডেকেছিল বাজারে। এ সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের রিলিফ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোর্তজা মাস্টার, একজন প্রাক্তন মেম্বার ও ভুঁইয়ার সমর্থক কর্মী হিসেবে ঠ্যাংভাঙায় পরিচিত কয়েকজন টি-স্টলে ঢোকে। যেন মানিকের খোঁজে বা মানিককে দেখেই তারা দল বেঁধে টি-স্টলে এসেছে, মানিককে পাওয়ার খুশিতে চায়ের অর্ডার দিয়ে হালকা চালে কথা শুরু করে মানিককে নিয়েই।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মানিক বাপকে রক্ষার জন্য নানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শুরু করেছিল। আর দেশ স্বাধীন হলে নানাকে বাঁচানোর জন্য এখন বাপের বিরুদ্ধেও লেগেছে। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে মারতে না পারে, সে জন্য নানাবাড়িতে মানিক মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পও বানিয়েছে।

ঠাট্টার ভঙ্গিতে প্রকাশ্যে এই অভিযোগ তুলে মোর্তজা মাস্টার মানিককে খোঁচা দিয়ে বলে, 'বুঝলাম না বাবা তোমার পলিটিক্সের মাহাত্ম্য!'

সজব ভুঁইয়ার পাশে একসময় যেমন ছিল পরেশ সাহা, রিলিফ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে এখন তেমনি মোর্তজা মাস্টার। প্রাক্তন চেয়ারম্যান-বিরোধী পলিটিক্স ও ভিলেজ পলিটিক্সেও মাস্টারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানিকের সন্দেহ হয়, বাবাও হয়তো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে কিংবা নরেশের দোকানে রয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে টি-স্টলেও আসতে পারে। জবাব দেয় সে, 'আপনাদের মতো পলিটিক্স আমি করি না, করবও না মাস্টার চাচা।'

'সেই জন্য তো তোমার রাজনীতিটা বুঝতে চাই বাবা। গ্রামের চ্যাংড়াদের নিয়া কিসের দল পাকাইতে চাও তুমি, একটু বোঝায় বলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো শুনি।'

মানিক কয়েকদিন ধরে নিজের উদ্দেশ্য-আদর্শ গাঁয়ের চেনা-অচেনা যুবকদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল। মানিকের হয়ে উপস্থিত যুবকগুলো কথা বলতে শুরু করে।

হান্নান বলে, 'না বোঝার কী আছে মামা। মানিক ভাই তো আপনাদের মতো চেয়ারম্যান-মেম্বার হয়ে রিলিফ চুরির রাজনীতি করবে না। আমরা একটা জাগরণী সংঘ গঠন করিয়া গ্রামের মানুষকে জাগাবার চেষ্টা করব।'

'শেখ মুজিব তো গোটা বাঙালি জাতিকে জাগায় দিয়া স্বাধীনতাই আনিয়া দিলে। তোমরা গ্রামের মানুষকে জাগায় দিয়া তাদের কোন মোকামে নিতে চাও ভাইগ্না?'

'মুজিব বলে নাই স্বাধীনতার সুফল সব ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সুফল যাতে কেবল দলের লোকেরাই লুটেপুটে খাইতে না পারে, সে জন্য সবাইকে জাগাতে হবে।'

'এটাকে তো বলি বাপের বিরুদ্ধে মানিক বাবাজির পলিটিক্স।'

'মুজিব বলে নাই সোনার দেশ গড়ার জন্য সোনার মানুষ দরকার? গ্রামেও যাতে সেই সোনার মানুষ তৈরি করা যায় — আমরা সংঘ সমিতির মাধ্যমে সেই চেষ্টা করব।'

'আরে হে, সোনার মানুষ গড়ার জন্য এত সোনা পাইমেন কোনঠে?'

'গ্রামের যুবশক্তি এক হইলে সেটাই হবে আমাদের বড় সোনা।'

'সোনা সোনা করিস, শালা সোনা মানে জানিস?'

'হা-হা, হি-হি।'

'এ তো হাসির কথা নয়, ভালো কথা। সোনার মানুষ আর সোনার বাংলা গড়ার জন্য এখন যদি সব বাঙালি এক না থাকিয়া নিজেদের মধ্যে দলাদলি আর কাদা ছোড়াছুড়ি করতে থাকি, তা হইলে হিংসাহিংসি অশান্তি বাড়বে, তোমরা কি সেইটা চাও?'

'ক্ষমতায় থাকিয়া যদি আপনারা সবার জন্য ন্যায়বিচার না করেন, তা হইলে হিংসাহিংসি বাড়বে।'

'মুজির তো খালি দলের নেতা না, গোটা জাতির নেতা। সব দলকে নিয়া উচিত তার জাতীয় সরকার গঠন করা।'

'প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া মুজিবের উচিত হয় নাই। সরকারি ক্ষমতার বাইরে থাকলেই তার পপুলারিটি থাকত, এখন মানুষের গাল খাইতে হইবে।'

'ভাসানীর মতো যারা নিজেরা কোনোদিন ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাইতে পারবে না, এসব হইল তাদের কথা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুজিব তো বলছে তিন বছর কিছুই দিতে পারবে না। তার পরও তোমরা ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধারা এত অধৈর্য কেন হে? কেন ছাত্রলীগ ভেঙে দুই গ্রুপ হয়? কেন স্বাধীনতার বছর না ঘুরতেই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও এত দলাদলি গ্রুপিং শুরু হয়?'

'যাই বলেন ভাই রে, হিংসা হইল বাঙালির সেরা সম্পদ। কারো ভালো কেউ দেখতে পায় না।'

'এখন হিংসা-অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে লাভ হইবে কার?'

কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের মতো জামাত মুসলিম লীগের, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ মেনে নেয় নাই। 'ইন্ডিয়ান আর্মি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে দিল, তারপর তিন মাস ইন্ডিয়ান আর্মি দেশের ভেতরে ছিল বলে কাজী চেয়ারম্যান স্বাধীনতার পরও দেশটা ইন্ডিয়া হয়ে গেছে বলে প্রচার করেছে। মুজিব তিন মাসের মধ্যে ইন্ডিয়ান আর্মি ফেরত পাঠাল। সংবিধান রচনার কাজ চলছে, সংবিধান না থাকায় নতুন নতুন আইন করে দেশ চালাতে হচ্ছে সরকারকে। দালাল আইন করে দালালদের বিচার শুরু করবে। এর মধ্যে যদি ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা অধৈর্য হয়ে দলাদলি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তবে রাজাকার-আলবদররাই আবার ক্ষমতায় আসবে।'

'হরিপুরে সাধারণ মানুষ তো কইতে শুরু করছে, জামাইয়ের চাইতে হামার কাজী চেয়ারম্যানই ভালো ছিল।'

'শিক্ষিত ছেলে যদি বাপ-চাচাকে রিলিফচোর বলে, তা হইলে সাধারণ মানুষের আর দোষ কী বাহে?'

টি-স্টলে চায়ের কাপে রাজনীতির ঝড় তুলে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি বা উত্তেজনা উপভোগ করতে পছন্দ করে, মানিক মোটেও সেরকম নয়। টি-স্টলে কথার পিঠে কথা শুনে তার হাটের হল্লার কথাই মনে পড়ে, যে হল্লা সবার কণ্ঠ ধারণ করে সম্মিলিতভাবে কোনো মানে দাঁড় করায় না। মোর্তজা মাস্টার আবারও সরাসরি তার কাছে শুনতে চায়।

'কী বাবা তুমি কি আমাদের রিলিফচোর বানায় আন্দোলন করে চেয়ারম্যান নানাকে রক্ষার চেষ্টা করছ না? বলো, ঢাকা না গিয়ে গ্রামে থেকে তোমার সংঘ-সংগঠন করার উদ্দেশ্যটা কী?'

মানিক বুঝতে পারে, বাড়ি থেকে রিলিফের তিনটি কম্বল গ্রামের গরিবদের মাঝে বিতরণ করা এবং বাড়ি ছেড়ে নানার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর পিতার সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়েনি কেবল, বিরোধের সম্পর্ক শুরু হয়েছে। মাস্টারের মাধ্যমে বাপকেও জানিয়ে দেয় সে।

'দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ শেষ হয়ে যায় নাই চাচা। আমি কাজের মাধ্যমেই আমার উদ্দেশ্যটা বোঝাতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের সহযোগিতাও আমার লাগবে। এখন উঠি আমরা।'

সঙ্গীদের নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মানিক। নানা অবাঙালি বেয়াইসহ পালিয়ে ছেলের বাসায় থাক, অথবা পাকবাহিনীকে সহায়তা করার অভিযোগে জেলেই যাক, তার বাড়ি-সম্পত্তি দেশের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগটা কাজে লাগাবে মানিক। ছেলেগুলোকে নিয়ে কথা বলার জন্য নানাবাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে সে।

নানা কিংবা পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, নিজের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় শুধু কথা দিয়েও নয়, কাজের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানিক। বাংটুর মতো গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধা — যারা দেশপ্রেমের অগ্নিময় আবেগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দেশগড়ার লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকারের বেপরোয়া আবেগ নিয়ে তারা মানিককে উৎসাহ-সমর্থন জোগায়। নিজেদের বিস্তর ভূসম্পত্তির পাশে প্রায় ভূমিহীন গরিব চাষিমজুরদের না খেয়ে থাকা গরিবি দশাও সমাজ বদলের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগায়। ধর্মীয় অনুশাসনে বন্দি মালতীর মতো দুঃখিনী মেয়েকে মুক্ত করার পথ খুঁজতেও গ্রামে থেকে কিছু করার প্রেরণা পায় মানিক। নিজের প্রেরণা গাঁয়ের স্বল্পচেনা ও অচেনা যুবকদের মাঝেও সঞ্চারের চেষ্টা করে।

মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা হতে না-পারা শিক্ষিত কী অশিক্ষিত অনেক ছেলের সঙ্গে কথা বলেছে মানিক। তাদের মধ্যে নানাবাড়ির পড়শি ছেলে হান্নান মানিকের এত ভক্ত হয়ে উঠেছে যে, মুক্তিযোদ্ধা হয়েও বাংটুদের সঙ্গে মিলিশিয়া বাহিনীতে যায়নি। অবশ্য তার অবস্থা বাংটু-আম্বারদের মতো নয়। মাঝারি গেরস্তের ছেলে, কলেজে ভর্তি হয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ায় লেখাপড়া না করেও সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা দিলেই সে আইএ পাস করবে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এই আইন করেছে সরকার। ফলে লেখাপড়া না থাকায় মানিকের নেতৃত্বে সমাজসেবামূলক কাজেই তার আগ্রহ বেশি। হান্নানের মতো সমর্থক যুবকদের নিয়ে নানাবাড়িতে রোজই বৈঠক করে মানিক। মুক্তিযোদ্ধারা হানা দেওয়ার পর চেয়ারম্যানবাড়িতে লোকজনের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নানা ঢাকা যাওয়ার পর চেয়ারম্যান-বাড়িতে যে শূন্যতা, তা এখন ভরিয়ে তুলেছে মানিক। কাজী চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ সমর্থকরাও তার খোঁজখবর নিতে এবং দেশের অবস্থা নিয়ে আলাপ করতে আসে মানিকের কাছে। নানি খুশির সঙ্গে বলে, 'চেয়ারম্যান নাই মরতেই এ বাড়ির চেয়ারম্যান হইছিস! তোর মানুষজনকে এত চা-নাশতা খাওয়াইতে পারব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না আমি। বিয়া করিয়া বউ আন বাড়িতে, চ্যাংড়া চেয়ারম্যানের সেবা চেংড়ি বউ করবে।'

দিনভর জনসংযোগের কাজ করার পরও রাত জেগে মানিক জাগরণী সংঘের সংবিধান রচনার কাজ করে। মগজের কোষে যত জনহিতকর চিন্তা ও স্বপ্ন, কলমের কালিতে তা কাগজে মূর্ত হয়ে ওঠে। চারটি মূল স্তম্ভের ওপর হরিপুরের জনসমাজকে দেখতে পায় মানিক। ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নেই, হরিপুরের মানুষের জাতীয় পরিচয় বাঙালি। সমাজে একক কোনো দল বা ব্যক্তির জমিদারসুলভ আধিপত্য নেই, সবাই মিলে যখন যাকে দায়িত্ব দিচ্ছে, তারাই চেয়ারম্যান-মেম্বার হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করছে। সব কলকারখানার মতো দেশের সমস্ত ভূসম্পদের মালিক হয়েছে রাষ্ট্র, ন্যায্য ভাগ পাবে বলে হরিপুরের মাঠে মাঠে কৃষকরা গান গেয়ে কাজ করছে। এসব লক্ষ্য-আদর্শ কাগজে লেখা থাকলেই তো হবে না, বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করাটাই আসল কথা। মানিক নিজের সাধ্য অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনে হাতেনাতে কাজও শুরু করে দেয়।

নানাবাড়ির বৈঠকঘরটি রূপান্তরিত হয়ে হরিপুর জাগরণী সংঘের কেন্দ্রীয় অফিসে। জাগরণী কৃষক সমিতির একটি অফিস ঠ্যাংভাঙা হাটেও। হাটের দিন কৃষকরা এসে সেখানে চাঁদা দেয়, ঋণ নেয়। আবার কৃষক সমিতির পাশে রয়েছে জাগরণী পাঠাগারও। গাঁয়ের লেখাপড়া জানা যুবকেরা পাঠাগারে বসে বই ও সংবাদপত্র পড়ে, বাড়িতেও নিয়ে যায়। যারা লেখাপড়া জানে না, স্কুলে যাওয়ার সামর্থ্য বা আগ্রহ নেই যাদের, তাদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা করে জাগরণী সংঘ। ভুঁইয়াবাড়ির কাছারিঘরে বয়স্ক নৈশ শিক্ষাকেন্দ্রের সাইনবোর্ড দেখতে পায় সবাই। রাতে হ্যাজাক বাতি জ্বেলে সেখানে বয়স্ক লোকজন পড়তে আসে। আম্বার-কাসেমের মতো স্বল্প লেখাপড়া জানা মুক্তিযোদ্ধা ও এমনকি মাদ্রাসার ছাত্ররাও সেখানে শিক্ষকতা করে। মেয়েদের কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করে জাগরণী সংঘ। বাণ্টুর মায়ের মতো মহিলারা সাক্ষর হওয়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হতে পারে কীভাবে, তার ব্যবস্থা করতে বাবুর বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয় জাগরণী নারী প্রগতি সমিতির স্কুল ও অফিস। পরেশের বিধবা স্ত্রী মালতী হয় সমিতির প্রধান কর্ণধার। নরেশের স্ত্রী অঞ্জনা ও ভুঁইয়ার মেয়ে বিউটির মতো গাঁয়ের লেখাপড়া জানা মেয়েরা এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত, পিছিয়ে থাকা কুসংস্কারচ্ছন্ন মেয়েদের সাহায্য করে তারা।

জাগরণী সংঘের বিভিন্ন সমিতি ও স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানা সাময়িক কর্মসূচি। রিলিফ ও সরকারের কাছে নানা ন্যায্য দাবি জানিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে, থানা সদরে, এমনকি জেলার ডিসি-অফিস অভিমুখেও মিছিল বের হয় মাঝে মাঝে। পত্রিকায় খবর বেরোয়। সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে যশোরের মাস্টারদা কিছু বাম নেতা নিয়ে আসে, ঢাকা থেকেও আসে জাতীয় পর্যায়ের বেশ কিছু নেতা। স্বভাবের দিক থেকে যতই প্রচারবিমুখ হোক মানিক, জাগরণী সংঘের জেগে ওঠার খবর রাজধানীতে অনেক রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কানেও পৌঁছে যায়।

একদিন মানিকের ডাক পড়ে বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও। মন্ত্রী মশিয়ার আকন্দই মানিককে জোর করে নেতার কাছে নিয়ে যায়। নেতা সবই জানে, হেসে বলে, 'কী রে মানিক, গ্রামে থেকে কী এসব জাগরণ-ফাগরণ করছিস! আগামী ইলেকশনে তোকে নমিনেশন দিচ্ছি, পার্লামেন্টে এসে দেশের কাজ কর।' মানিক জবাব দেয়, 'ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আপনার দলে নেতাকর্মীর তো অভাব নেই বঙ্গবন্ধু। আপনি সোনার বাংলা গড়তে চান, আমি গ্রামে থেকে সাধ্যমতো সেই চেষ্টা করছি। আপনি আমাকে শুধু দোয়া করেন।' বঙ্গবন্ধু মানিককে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তোর মতো সোনার ছেলে থাকলে সোনার বাংলা অবশ্যই গড়ে উঠবে রে।' মানিক চোখ বুজে বঙ্গবন্ধুর আলিঙ্গনের উষ্ণ পরশ, এমনকি মুখে বিদেশি টোব্যাকোর গন্ধটুকু পর্যন্ত পায় এবং প্রাপ্তিসুখে তার ঠোঁটে হাসি ফোটে।

AMARBOI.COM

এসব স্বপ্ন যদি একদিন বাস্তব হয়, বাস্তব যদি স্মৃতি হয়, তা হলেও স্বপ্ন-বাস্তব-স্মৃতির কথা কাউকেই বলতে পারবে না মানিক, বললেও কি বিশ্বাস করবে কেউ?

রাত জেগে জাগরণী সংঘ নিয়ে স্বপ্ন দেখা নয় শুধু, দিনে সমিতির কাজ ও তহবিল সংগ্রহ নিয়ে ছোটাছুটি করে মানিক। কাজী আফতাব চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতেও তার ঘরগেরস্তালি বোন, চাকর এবং আধিয়াররাই সামলে রাখে। মানিক ডাকাতের মতো সব লুটে নেওয়ার মানসিকতা দেখাতেও পারে না। তারপরও ফান্ডের জন্য নানার সংসারই তার বড় ভরসা। তহবিল বাড়ানোসহ সমিতির কার্যক্রম আরো কীভাবে গতিশীল করা যায়, বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য এক সকালে নাশতা খাওয়ার আগে সাইকেল নিয়ে নানাবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মানিক। নিজেদের বাড়ি পেরিয়ে সরাসরি হিন্দুটাড়ির বাবুবাড়িতে গিয়ে বেল বাজায়।

নরেশ এখনো বাজারে যায়নি। ব্যবসা ছাড়াও আবাদের কাজ তদারক করতে হয় তাকে। তবে চা-নাশতা খেয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল সে। মানিক নরেশের ঘরে গিয়ে বসে।

'কাকা, আমাদের জাগরণী সংঘে আপনাকেও ইনভলভ হতে হবে।'

নরেশ বলে, 'তোমার চিন্তায় তোমার বাপের মাথা খারাপ হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি খুলেছে, কিন্তু তুমি ঢাকায় না গিয়ে নানাবাড়িতে থেকে কী সব করে বেড়াচ্ছ!'

'শিগগির দেখতে পাবেন কাকা। তার আগে আপনার বাড়ির জায়গায় একটা ছোটখাটো ঘর, টিনের না হোক, অন্তত খড়ের ঘর তুলে দিতে হবে। এখানে একটা স্কুল করব। কাকিরা দুজনেই লেখাপড়া জানে, তারাই চালাবে এসব।'

'কে পড়বে আমাদের বাড়ির স্কুলে? সরকারি যে প্রাইমারি স্কুল আছে, সেইখানে ছেলেমেয়েরা যায় না।'

'কাকা, সবকিছু শেখ মুজিব আর সরকারের ওপর ছেড়ে দিলে তারাই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে দেবে, আর আপনারা বসে বসে শুধু ভোগ করবেন — এই মানসিকতা থাকলে পরেশ কাকার রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ব্যর্থ হবে কাকা।'

'জায়গা দিলাম, ঘরও না হয় তুলে দিলাম। কিন্তু আগে বলো, কে পড়বে তোমার এই স্কুলে?'

'কেন হিন্দুটাড়ি ও রতনপুরের সব মহিলারাই এই স্কুলে আসবে। ধর্মের ভেদাভেদ এই স্কুলে থাকবে না। যারা অক্ষর চেনে না নাম স্বাক্ষর করতে পারে না, তারা অক্ষর চিনবে। তা ছাড়া গ্রামের গরিব মেয়েরা কীভাবে আত্মসচেতন ও স্বাবলম্বী হতে পারে, তার ব্যবস্থাও স্কুলে থাকবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু স্কুলের মাস্টারি করবে কে?'

বড় কাকার বউ মালতী কাকি মূল দায়িত্বে থাকবে। বিধবা হয়েছে বলে সারাজীবন স্বামীর শোক নিয়ে কাঁদলে তার চলবে? তা ছাড়া ছোট কাকি, বিউটিসহ গ্রামে যারা লেখাপড়া জানে, তারাও টিচার-অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।'

'তোমার বাপের সাথে কি এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করেছ?'

'সবকিছু আব্বার অনুমতি নিয়ে করতে হবে নাকি? আব্বাকে বলবেন, সরকারি সম্পদ বা অন্য কারো সম্পদ দখল করে বড় হওয়ার চিন্তা আমার নাই। কারো অনিষ্ট নয়, বরং সবার ভালোর জন্যই চিন্তা করছি আমি। শুধু চিন্তা নয়, নিজের চিন্তা অনুযায়ী কাজও শুরু করেছি। পরেশ কাকা বেঁচে থাকলে আমাকে অবশ্যই এসব কাজে খুব উৎসাহ দিয়ে সমর্থন করত কাকা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিও করব রে বাবা, দেখি আজ সকালে বাজারে যাওয়ার আগে তোমার আব্বার সঙ্গে তোমাদের জাগরণীর ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করব। তুমিও চলো আমার সঙ্গে।'

'না, আব্বার রাজনীতি ও চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মিলবে না। আপনি যান, আমি দেখি আপনাদের পাড়ার লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি।'

এ সময় মালতী বলে, 'তুমি যেও না মানিক, আমি খেজুরের রসের পায়েস বসিয়েছি, চা-নাশতা খেয়ে যাও।'

মানিককে ঘরে রেখেই নরেশ বেরিয়ে যায়। অঞ্জনা কাকির সঙ্গে কথা বলার সময় শিবু এসে তাদের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। মালতী উপস্থিত না থাকলেও বাইরে থেকে নরেশের সঙ্গে মানিকের কথাবার্তা শুনেছে নিশ্চয়। কারণ কথা বলে সেই সূত্র ধরেই।

'একটা সত্যি কথা বলো তো, তুমি আর পড়াশোনা করবে না, ঢাকা যাবে না, গ্রামে থেকে কত কী করতে চাইছ — কেন? কার জন্য?'

কী জবাব দেওয়া যায় ভাবার জন্যই হয়তো মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকে মানিক। শরণার্থী জীবনের দুর্ভোগ ও বৈধব্যের শোক কাটিয়ে মালতী বাড়ির পরিবেশে আগের মতো নয় শুধু, আগের চেয়েও যেন বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে। মানিকের চোখ বলে — তোমার জন্যই থাকতে চাই গ্রামে, কিন্তু মুখে বলে, 'দাদি ও ছোটু কাকি কোথায় গেল? সবাকেই বুঝিয়ে বলি।'

'ওরা দিঘির পাড়ে গেছে। শুনবে না কেউ, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলো।'

'কী সত্যি কথা বলব?'

'ঢাকা না গিয়ে গ্রামে থাকতে চাইছ কেন?'

'আগেও তো বলেছি, মুক্তিযুদ্ধ তোমাকে যেমন, তেমনি আমাকেও বদলে দিয়েছে। গ্রামে থেকেই দেশের জন্য কিছু করতে চাই।'

'কিন্তু আমাকে জড়াতে চাইছ কেন?'

'ভালো কাজে জড়াতে চাইছি, এতে কেউ আপত্তি করবে না। কাজের মধ্য দিয়ে আমরা কাছাকাছি থাকব।'

'এটা তো কোচবিহার টাউন না মানিক, রতনপুর গ্রাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে সমাজ তো পাল্টায়নি।'

মানিক ইতিউতি তাকিয়ে চাপা গভীর স্বরে জবাব দেয়, 'আজ একটা সত্যি কথা বলি মালতী। ওই রাতের পর প্রথম প্রথম খুব অনুতাপ হয়েছিল, নিজেকে বর্বর পাকবাহিনীর মতো মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কী ভাবি জানো, আমি কোনো অন্যায় করিনি। ভালোবাসা পাপ নয়, অন্যায় নয়।'

মালতী হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে মানিককে থামিয়ে দেয়। চোখে-মুখে অনন্য খুশির ঝিলিক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে শিবুর সঙ্গে কথাবার্তায় মালতীর কণ্ঠে আনন্দোচ্ছ্বাস ঘরে বসেও শুনতে পায় মানিক। অতঃপর মানিককেও চেঁচিয়ে ডাকে সে, 'ও মানিক, দেখে যাও শিবু আমাদের গাছে উঠছে।'

একচল্লিশ

জাতশত্রু শ্বশুরের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাতৃহারা ছেলেমেয়ে দুটি ভুঁইয়ার পরিবারে অশান্তি, এমনকি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে উঠবে, আশা করেনি কখনো। কোন বাপই বা সন্তানের কাছে কষ্ট পেতে চায়? ছেলেকে ফিরে পেয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছিল তার। বুড়া পায়খানার বদনা হাতে ভুঁইয়াবাড়ি থেকে নেংটিখেঁচা দৌড় দিয়েছে। প্রথমদিকে বাণ্টুর দেওয়া এ খবর বিশ্বাস করে শত্রুর প্রতি আদর্শহীন ছেলের আপসহীন রাগ ও ঘৃণা আন্দাজ করে সান্ত্বনাও পেয়েছিল। কিন্তু আসল ঘটনা জানার পর মনে দাগা পেয়েছে। নানার রাজনীতি নানার সমর্থক বাহিনী লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যা করার পরও নানা কি তবে মানিকের কাছে বাপের চেয়েও বেশি?

তারপরও মানিক নানার বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করায়, বুড়ার বিষয়-সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল ভুঁইয়া। কিন্তু স্বাধীন দেশে বাপকে অপমান করাটাই যেন তার বড় কাজ হয়ে উঠেছে। বুড়া পলাতক ঠিকই, তার সমর্থকরা গোপনে মানিকের সঙ্গে রোজ বৈঠক করে। সব খবরই ভুঁইয়ার কানে আসে। অন্যদিকে বাণ্টুর মতো ছোটলোক মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়েও নাকি দল পাকাচ্ছে মানিক। কোনদিন যে রিলিফচোর বাবার বিরুদ্ধে মিছিলও শুরু করে! নানাবাড়িতে ওঠার পর হিন্দুটাড়িতে এসেছে কয়েক দিন। কিন্তু নিজের বাড়িতে ওঠেনি। অন্যদিকে পরেশের বউয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েও কথা কানে আসছে। বাবুবাড়ির বিধবা বউয়ের সঙ্গে ছেলের মাখামাখি সম্পর্ক অনেকেই গুরুত্ব দেবে না, কিন্তু সজব ভুঁইয়ার কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভাববে বাড়ির চাকর বাণ্টু — এমন খবর শুনলে মানুষ তো মানুষ, গ্রামের গরুছাগল কুত্তা-বিলাইয়ের গায়ের লোম খাড়া হবে অবশ্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণ্টুকে অনেক আগেই বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে উচিত শিক্ষা দিতে পারত ভুঁইয়া। কিন্তু মানিকের কারণেই পারেনি। ছোটলোকের বাচ্চার যেন পাখা গজিয়েছে। ভুঁইয়ার ঘরজামাই হওয়ারও স্বপ্ন দেখছে। ফলে জহিরের মতো চাষাড়ি-কামে রুচি নেই, ছোট ভাইকেও চাকরিছাড়া করেছে। স্ত্রীর কাছে এ মন্তব্য শুনে প্রথমে স্ত্রীকেই পায়ের স্যান্ডেল ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লোকেরা এমন কথা বললে ঘরের বউয়ের কী দোষ? কথায় আছে না, যা রটে তার কিছু তো বটে। বাণ্টু-বিউটির কথাবার্তা শুনেও বটেটুকু দেখেছে ভুঁইয়া। বাণ্টুর এতটা বাড় বেড়েছে আসলে মানিকের আশকারা পেয়েই। মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে না গেলে এতদিনে ছোটলোকের বাচ্চাকে গ্রামছাড়া করার জন্য ভুঁইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করত অবশ্যই। মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে বাণ্টু ফিরে আসার পর এখন সেই গুরুদায়িত্ব পালন ফরজ হয়ে উঠেছে ভুঁইয়ার জন্য।

শেষ পর্যন্ত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিলিশিয়া বাহিনী না করায় গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের ফিরে আসার খবরটি বাণ্টুকে দেখার আগেই পেয়েছে সজব ভুঁইয়া। খুশিও হয়েছে। স্বাধীন দেশেও মুক্তিবাহিনী যদি সরকারের কাছে বিশেষ বাহিনীর সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা পায়, তবে দলের কোনো নেতাকেও মানবে না ওরা। অস্ত্র হাতে পেয়ে কয়েকদিন স্বাধীন দেশের মা-বাপ হয়ে যেমন দাপিয়ে বেড়িয়েছে, ওদের সেরকম দপদপানি আরো বেড়ে যেত। এখন চাকরের বাচ্চা বাণ্টু কত বড় মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে, অচিরেই দেখতে পাবে গ্রামবাসী।

দুপুরবেলা বাড়িতে ঢুকে ভুঁইয়ার চোখ বাণ্টুকে খোঁজে। কান খাড়া থাকে বাণ্টুর কথা শোনার জন্য। শেষে খেতে বসে স্ত্রীর কাছে জানতে চায়, 'বাণ্টু কই? আসে নাই এ বাড়িতে?'

এ বাড়িতে না এসে যাবে কোথায়? মুক্তির মাও এসেছিল, ভুঁইয়ার স্ত্রীকে লেকচার দিয়ে বুঝিয়েছে, বড়বাড়ি হলো মুক্তিবাহিনীর আসল বাড়ি। শেখ মুজিব নাকি বলে দিয়েছে, যতদিন মুক্তিবাহিনীকে চাকরি-বেতন না দেয়, বাণ্টুর দায়িত্ব ভুঁইয়াকেই নিতে হবে। খাবার দিতে দেরি হয়েছিল বলে বাণ্টু আজ বিউটিকে ভাত দেওয়ার অর্ডার দিয়েছে। আর মেয়েটাও এমন, বাপ খাওয়ার আগে মা-বেটা দুজনকেই পেট পুরে খেতে দিয়েছে।

সজব ভুঁইয়া আজ মেয়েকে ডেকে জানতে চায়, 'বাণ্টু কী বলে মা?'

'শেখ মুজিব মুক্তিবাহিনীকে কোনো কাজ দিলো না দেখে মন খারাপ হইছে ওর। তার ওপর ভাইজান বাড়িতে নাই দেখিয়া দেখা করার জন্য নানাবাড়িতেই গেল বোধহয়।'

ভুঁইয়া শুধু বলে, হুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুদিন পর খেতে বসে বাবার ডাক, হুম এবং কই মাছের কাঁটা চোষাকে প্রসন্ন মেজাজের লক্ষণ ভাবে বিউটি। আবদার জানায়, 'আব্বা রফিককে নিয়ে নানাবাড়িতে দুই দিনের জন্য বেড়াইতে যাই?'

'কেন, তোমার নানাজিও কি ঢাকা হইতে ফিরি আসছে?'

'না। নানির শরীর খারাপ। ভাইজান তো কয়দিন বাড়িতেই আইসে না।'

'তোমার ভাইজান তো নিজেকে এ বাড়ির ছেলে ভাবে না। তা তুমিও কি সজব ভুঁইয়ার মেয়ে হয়ে থাকতে চাও না?'

কী গভীর অভিমান-ক্রোধ চেপে রেখে যে আদরের মেয়েকে এমন কথা শোনায়, মেয়ে তা সহজেই আঁচ করে বোধহয়। চোখে পানি আসে তার। মেয়ের চোখে জল দেখে রাগটা পানি হয় ভুঁইয়ারও।

'তোমার ভাইজান ও বাড়িতে থাকি আমার বিরুদ্ধে পলিটিক্স শুরু করেছে। ও বাড়িতে তোমরা আর কেউ যাবে না। বাণ্টুর সঙ্গেও তোমাকে যেন কোনো কথা বলতে না দেখি কখনো।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেয় বিউটি।

খাওয়ার পর বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ট্যারা জহিরকে হুকুম দেয় সজব ভুঁইয়া। বাণ্টু, তার মা, চাচা ঢোঁড়া ও শেখের মামু নজিবরকেও জরুরি ডেকে আনতে হবে।

বিকেলে ভুঁইয়ার কাছারিঘরের বেড়ায় ছয়টি সাইকেল জড়ো হয়। ঘরের ভেতরে মোর্তজা মাস্টার, নরেশ, মুক্তিযোদ্ধা কাসেম, আম্বার, নওসের, শামসু ছাড়াও গ্রামের আরো কয়েকজন। এটা যে আসলে বিচারসভা, সেটা সভায় যোগ দিয়ে আসামি বাণ্টুও বুঝতে পারে না। বরং কাসেমের কাছে হাসিমুখে অনুপস্থিত অন্য মুক্তিদের আসার বিষয়ে খবর জানতে চায়। মুক্তির মায়ের সঙ্গে আজ মুক্তির চাচারও ডাক পড়ায় ঢোঁড়াও আজ খুশি, নজিবরকে কানে কানে জিজ্ঞেস করে, 'খাওয়া-দাওয়া হয়া গেইছে নাকি?'

খাওয়া-দাওয়ার ধারণা আসলে আছিমনই দিয়েছে ঢোঁড়াকে। অস্ত্র জমা দিতে যাওয়ার আগে গাঁয়ের মুক্তিবাহিনীকে শেখের মামু ধুমধাম করে খাইয়েছে। আর শেখ মুজিবের দলের লোক হয়েও ভুঁইয়া এখনো সেরকম আয়োজন করেনি। বাণ্টু চলে যাওয়ায় মুক্তির মায়ের মনে হয়েছিল, ভুঁইয়ার বাড়ি ছেড়ে তার মুক্তিফৌজ ছেলে যেনবা দেশের রাজা শেখের বাড়িতেই গেল! সেখানে ফ্রি খাওয়া পাবে, চাকরি পাবে, মাস গেলে বেতন পাবে — তারপর মাসকয়েক পর নগদ টাকা আর মা-ভাইবোনদের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনাকাটা করে বাড়ি আসবে বাংটু। মায়ের হাতে নগদ টাকাও গুঁজে দেবে। সেই টাকায় বাড়িতে একটি টিনের ঘর ডাঙাবে। তারপর দেখেশুনে বিয়ে দেবে বাংটুর। যুদ্ধ করে অস্ত্র নিয়ে ফিরে আসায় গ্রামে যেমন সাড়া জেগেছিল, বাংটুও শহর থেকে ফিরে এলে মুক্তির মায়ের বাড়িতে আবারও ভিড় করবে পড়শিরা।

যাকে ঘিরে এত স্বপ্ন এত গর্ব, সেই মুক্তি বাংটু অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে চোরের মতো, একদম খালি হাতে। শেখের বিবেচনা নিয়ে অনেকক্ষণ বগর বগর করেও নিজের কিংবা ছেলের মনের হতাশা দূর করতে পারেনি আছিমন। ট্যারা জহির আজ বাড়ি গিয়ে মনিবের পক্ষে জেয়াফত দেওয়ায় সান্ত্বনা পেয়েছে কিছুটা। চাকরি বা নগদ টাকা না পাক, মুক্তিফৌজদের ডেকে নিয়ে শেখ মুজিব সম্মান দেখিয়েছে। কাজেই ভুঁইয়ারও দেরিতে হুঁশ ফিরেছে বোধহয়। অন্দরমহলে ঢুকে আছিমন তাই স্বচক্ষে খাওয়ার-দাওয়ার আয়োজন দেখতে যায়।

সজব ভুঁইয়া মুখে পান ও সিগারেট নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, কাছারিঘরে নিজের আসন নিয়ে বাংটুর মাকে খোঁজে।

'কী রে বাংটু, তোর মাও আসে নাই?'

ঢোঁড়া আছিমনের আসাটা নিশ্চিত করে বলে, 'মোকেও জোর করি নিয়া আইল ক্যানে-বা।'

'ডাক দে, খালি বাংটু তো নয়, গ্রামের মধ্যে বাংটুর মাও বড় মুক্তিযোদ্ধা। রাইফেলের চেয়ে তার মুখের তেজ কি কম?'

ভুঁইয়ার রসিকতা শুনে সবাই হাসে, বাড়তি রস সৃষ্টির জন্য ঠ্যাংভাঙা রাজাকার ক্যাম্পে বন্দি হয়েও মুক্তির মায়ের চোপা গ্রেনেডের মতো কেমন বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সেই পুরনো গল্পটাও করে একজন। তলব পেয়ে বাংটুর মা মাথায় বড় ঘোমটা টেনে অন্দরমহল থেকে বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। সজব ভুঁইয়া মাস্টারের সঙ্গে আলাপ বন্ধ করে সরাসরি তাকায় বাংটুর দিকে। বাংটু তখনো বুঝতে পারে না, এ সভা বসেছে আসলে তার বিচার করার জন্য।

ভুঁইয়া তাই শুরুতে সাফ সাফ জানায়, 'আমি সবাইকে ডেকেছি মুক্তিফৌজ বাংটুর একটা বিচার করার জন্য।'

এক ফুঁয়ে বাতি নেভানোর মতো ঘরের পরিবেশ মুহূর্তেই পাল্টে দেয় ভুঁইয়া। সত্যি কথা বলার হুকুম দিয়ে একই সঙ্গে অভিযোগ দায়ের এবং আসামিকে জেরা শুরু করে। জেরা শুরুর আগেই তো আজ মনিবের গলাখাঁকারি শুনেই নিজের মুক্তিফৌজ পরিচয় ভুলে গিয়েছিল বাংটু। চোখও নামিয়ে ফেলে, মনে পড়ে, এই মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতেই তার বাপটা শেষ পর্যন্ত হারিয়েই গেল।

'বাংটু বল দেখি, কাজী আফতাব চেয়ারম্যান পাকবাহিনীর দালাল ছিল, না আমি ছিলাম?'

'চেয়ারম্যান নানা দালাল।'

'দালাল চেয়ারম্যান যাতে পালাইতে না পারে, তার জন্য এ বাড়িতে আনিয়া তোকে পাহারা দিতে কইলাম। বলি নাই?'

'জি, বলেছেন।'

'সেই চেয়ারম্যান পালাইল কেমনে?'

'মানিক ভাইজানের ঘর হইতে রাইতে পায়খানা করার জন্য বদনা হাতে পেছনের জঙ্গলবাড়িতে দিয়া পলায় গেছে।'

'দেখেন মিথ্যে কথা বলার সময় গলা ওর একটুও কাঁপে না! কী রে হারামজাদা, মুক্তিযোদ্ধা হয়েও আমার সামনে মিছা কথা বলার জন্য বুক কাঁপে না তোর?'

'কাঁপে।'

'তা হইলে সত্যি কথা বল। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বুড়াকে সাইকেলে নিয়া কাউনিয়া স্টেশনে গিয়া ট্রেনে তুলি দিয়াছে কে?'

'আমি দিছি।'

'বুড়া এ জন্য কয় টাকা পুরস্কার দিছে তোকে?'

'দশ টাকা।'

'বুড়া যদি আগেও তোকে দশটা টাকা পুরস্কার দিত, তা হইলে অবশ্যই মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ার বদলে রাজাকারে নাম লেখাইতিস তুই। বুড়া হুকুম দিলে রাজাকার হইতিস না তুই?'

বাংটু এই প্রথম চোখ তুলে জবাব দেয়, 'না'।

'ভালো কথা। যে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে, সে শত্রুর পক্ষে দালাল-রাজাকার হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পর তোকে এ বাড়ির ঘরজামাই হওয়ার স্বপ্ন দেখাইছে কে?'

বাংটু জবাব দিতে পারে না। স্বপ্নের জন্য যে কাকে দায়ী করা যায়, সে জানেও না। তবে এই মানুষটার কাছে জামাই আদর পাওয়ার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি বাংটু।

'আমার মেয়ে বিউটির নামে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কী বলেছিস তুই?'

বাংটু উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে তীব্র চোখে তাকায়। কাসেমও বিচারকের মতো ধমকের গলায় জেরা করে, 'আমাদের সাথে না, বিউটিকে নিয়া মুক্তিযোদ্ধা হান্নানের সাথে কী কথা হইছে তোর?'

বাংটুকে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ভুঁইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, 'থাক, আমার মেয়েকে নিয়া কোনো কথাবার্তা হোক, আমি চাই না। আমাকে না জানিয়েই মুক্তিযুদ্ধের একজন জাতশত্রু শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কাজী আফতাবকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, সেটা আপনারা নিজের কানে শুনলেন। আসল কালপ্রিটকে এতদিনে চিনতেও পারলেন।'

বাইরে থেকে ঘোমটার আড়াল থেকে মুক্তির মা এবার বলে, 'মোর মুক্তিফৌজ বেটার নামে কোনো হারামজাদারা দেওয়ানির কানে এত কথা লাগাইছে? বাণ্টুর চৌদ্দপুরুষ এ বাড়ির গোলামি করিয়া এ বাড়ির খায়া মানুষ হইছে। যে পাতে খাইবে, সেই পাতে হাগার মতো বেইমান নয় মোর বেটা। বয়সে তিনমাসি ছোট হইলেও বাণ্টু বিউটিকে বুবু করিয়া ডাকায়।'

'চোপ। তোর কাছে কিছু শুনতে চাইছি আমি?'

ঘরে স্তব্ধতা নামলে সজব ভুঁইয়া আবার বাণ্টুকে জেরা শুরু করে, 'এ বাড়িতে চাকরি করছিস, তোর কাছে এখনো বেতনের টাকা পাওনা আছি আমি। আমার বাড়িতে ছিলি বলিয়াই তুই মুক্তিযোদ্ধা হইছিস, যুদ্ধ করিয়া দেশ স্বাধীন করছিস। ঠিক কি না?

বাণ্টুসহ সবার মাথা নড়ে বলে, ঠিক।

ভুঁইয়া এবার শান্ত কণ্ঠে রায় ঘোষণা করে, 'হাজার হোক তুই মুক্তিযোদ্ধা। দেশের অহংকার। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পর তোকে দিয়া চাকরবাকরের কাম আমি করাই নাই, তেমনি আজো তোর বিচার আমি করব না। দেশ স্বাধীন করেছিস, তোকেও আজ থেকে স্বাধীন করিয়া দিলাম। আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় তোর চৌদ্দগোষ্ঠীকে আর যেন না দেখি আমি। কাজী চেয়ারম্যানের পক্ষ নিয়া যত পারিস আমার বিরুদ্ধে কথা বল, কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়া যদি আর একটা কথা বলতে শুনি, তবে তোকে জ্যান্ত কবর দেব আমি। যাহ, তোর মাকে নিয়ে আমার চোখের সামন থাকিয়া দূর হ এখন।'

চূড়ান্ত রায় শুনেও বাণ্টু মাথা নিচু করে থাকে। ঢোঁড়াই তখন ভাতিজাকে ধমক দেয়, 'ফের দেওয়ানির সামনে মাথা উঁচা করি খাড়া হয়া আছিস! পাও ধরিয়া মাফ চা হারামজাদা।'

বাণ্টু মাফ চাওয়ার বদলে ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। আছিমনও যায় পিছে পিছে। মোর্তজা মাস্টারসহ উপস্থিত সবাই বাণ্টুকে একটু টাইট দেওয়াটা খুব দরকার ছিল বলে মন্তব্য করলে ভুঁইয়া জহিরকে ডেকে চা ও পান-সুপারি আনার হুকুম দেয়।

ঢোঁড়ার কী করা উচিত বুঝতে পারে না, আবার আসামিপক্ষের একমাত্র উপস্থিত প্রতিনিধি হিসেবে নীরবও থাকতে পারে না। নজিবরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকিয়ে কথা বলে, 'বাংটুর মাও ভাবিকে মুই হাজারবার কইছোঁ, শেখের মামুকে কইছোঁ, মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তির মাও হয়া মুই কী হনু রে গরব করাটা হামার শোভা পায় না।

'দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, গরব করবে না কেন রে ঢোঁড়া?'

সেটা তো ঠিকই দেওয়ানি, গরব তো করবেই।'

'বাড়ির চাকর হিসাবে নয়, মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ওকে রিলিফ দিয়েছি আমি। ভবিষ্যতেও দেব।'

'সেটা তো ঠিকই, এতো রিলিফ কাজী চেয়ারম্যানও কাউকে দেয় নাই। বাংটুর মা দিনোতেও ইলিফের কম্বল গাত দিয়া ঘুরি বেড়ায়।'

'ওদের কথা বাদ দাও। তা কাসেম তোদের কী খবর, মিলিশিয়া বাহিনী তো হইল না, কী করবি এখন?'

বাংটু ও তার মায়ের কথা বাদ দিয়ে বৈঠকঘরে অতঃপর অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভুঁইয়া চেয়ারম্যানের যে কথাবর্তা হতে থাকে, তা ঢোঁড়ার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কারণ মনের মধ্যে তার একটাই প্রশ্ন — মুক্তি ও তার মায়ের হইল কী? তারপরও চা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে। কিন্তু চায়ের কাপে আম্বার মুক্তিফৌজ পর্যন্ত আসতেই শেষ হয়ে যায়। সবার চা খাওয়া ও কথাবার্তার ফাঁক গলিয়ে চুপচাপ উঠে যায় ঢোঁড়া।

বেয়াল্লিশ

বিচারসভা থেকে বেরিয়ে বাংটু হনহনিয়ে হাঁটে, কোনো গন্তব্য ঠিক করতে না পেরে নিজেদের ঘরে আসে। বাড়িতে করার কিছু নেই বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং শুয়েও স্থির হতে পারে না বলে গায়ে কাঁথা টেনে নেয়। বাংটুর মাও ফিরে এসেছে বাড়িতে। ভুঁইয়ার ধমক গলায় খিল হয়ে ছিল এতক্ষণ, ঘরে ছেলেকে মরার মতো শুয়ে থাকতে দেখে গলার খিলটা খুলে যায় হঠাৎ, কিন্তু কান্নার স্রোতে কথা বেরিয়ে আসে ভুঁইয়ার উদ্দেশে।

'কাঁয় মোর মুক্তি বেটার বিরুদ্ধে চকরান্ত করতেছে? কী দোষে এত বড় শাস্তি দেন হামাকে? কার পাকা ধানে মই দিতে গেছিল মোর মুক্তিফৌজ বেটা?'

বাংটু গায়ের কাঁথাখানা উঠানে মায়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জগন্নাথের বিলের ধারে রাস্তা ধরে হনহনিয়ে হাঁটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র জমা দিয়ে আসার পর মানিক ভাইজানের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। চেয়ারম্যান নানার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে সে। গন্তব্য খুঁজে পেয়ে বাংটুর হাঁটার গতি আরো বেড়ে যায়।

কাজী চেয়ারম্যানকে বাড়ি থেকে সাইকেলে করে ঢাকা পালানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথাটি একমাত্র তার নাতি ও নাতনি ছাড়া কেউ জানে না। মানিক বারবার সতর্ক করে দিয়েছে কাউকেই না বলার জন্য। তাই মাকে পর্যন্ত বলেনি কথাটা বাংটু। কিন্তু নানার জন্য নাতনির চিন্তা দেখে, কাকপক্ষীকে না বলার শর্ত এবং কোরানের কিড়া দিয়ে বিউটিকে গোপনে বলেছে খবরটা। এতদিন পর সেই খবর বিউটি না মানিক — কে বাপকে বলে দিয়েছে বাংটু জানে না। যার জন্য চুরি করা, তারাই যদি চোর বলে — তবে কীরকম যে লাগে, এর আগে তা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি বাংটু।

বিষয়টি নিয়ে বিউটিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই। বিউটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে আসলে মুক্তিযোদ্ধা হান্নানের। নানাবাড়ির কাছে বাড়ি, দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। বিউটি নানার বাড়িতে থাকার সময়ে হান্নান তার সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ পেয়েছে। এ খবর বিউটির সৎমা পর্যন্ত জানে, বিউটির বাপকেও বলে দিয়েছে। কিন্তু বাংটু কিছু জানত না বলেই ঢাকায় মানিক ভাইয়ের সঙ্গে দরকারি চিঠি চালাচালির কথা মনে করে বিউটির চিঠি হান্নানকে দিয়েছে, আবার হান্নানের দুটি চিঠি বিউটিকেও দিয়েছে। পরে ব্যাপারটা নিজের কাছে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় বিউটিকেও সতর্ক করেছে বাংটু। বিউটি অনুরোধ জানালে কথা দিয়েছিল বাংটু কাউকে না বলার, সে কথা রেখেছে বাংটু। পেটের মধ্যে চেপে না রেখে চিঠি চালাচালির মতো মারাত্মক গোপন কথা ফাঁস করবেই বা কোনমুখে, দোষটা তো বোকা বাংটুরও। তবে সেই ঘটনার পর এতই সতর্ক হয়েছে যে, বিউটিকে অঙ্ক করতে দেখেও একবার সন্দেহের বশে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হাতের আউডাল দিয়া কী লেখেন খাতায়?' অন্যদিকে হান্নান বিউটি প্রসঙ্গে কথা তোলায় সেদিনও, মিলিশিয়া ক্যাম্পে যাওয়ার আগে ধমক দিয়ে বলেছিল তাকে, 'বিয়া যদি করতে চাইস, মানিক ভাইজানকে প্রস্তাব দিয়া দেখ।' হান্নান আইএ পরীক্ষা দেবে বলে তাদের সঙ্গে মিলিশিয়ায় যায়নি। এর মধ্যে সে কী প্রস্তাব পাঠিয়েছে, বাংটুর নামে কার কাছে কী কথা লাগিয়েছে, কিছুই জানে না সে।

চেয়ারম্যানের বাড়ি যাওয়ার মাইল তিনেক পথ প্রায় ডবল মার্চ করে যায় বাংটু। তাতে শরীর ও মন দুটাই বেশ গরম হয়ে ওঠে। মাথা দিয়ে ঘামও ঝরে। সন্ধ্যার পরপরই চেয়ারম্যানবাড়িতে পৌঁছায় সে। বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোকার আগে কাছারিঘরে গমগমে কথাবার্তা ও জানালায় হ্যারিকেনের আলো দেখে চমকে ওঠে, চেয়ারম্যান নানা কি ফিরেছে তবে? এ জন্যই ভুঁইয়া ফায়ার হয়েছে তার ওপরে? ঘরে উঁকি দিতে চেয়ারম্যানের চেয়ারে মানিককে দেখে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণে ঘরে উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে চোখ ঘোরাতেই হান্নানকে দেখে বেজায় চমকে ওঠে।

বাণ্টুকে দেখে জাগরণী যুবসংঘের সভা মুহূর্তের জন্য থমকে যায় মাত্র, তারপর সভার গতি বাড়াতে মানিক হেসে স্বাগত জানায় বাণ্টুকে, 'অনেকদিন বাঁচবি রে বাণ্টু বক্কর। একটু আগেই এদের কাছে তোর কথা বলছিলাম। তুই না থাকলে আমাদের জাগরণী সংঘ প্রাণ পাবে না। আয়, আয়, আমরা কমিটি নিয়ে আলাপ করছি।'

বাণ্টু দরজা থেকে ভেতরে ঢোকে বটে, কিন্তু আসন নেওয়ার বদলে মানিকের সামনে দাঁড়িয়েই বিস্ফোরণ ঘটায় যেন।

'ভাইজান, আসল শয়তানের সাথে বসিয়া তোমরা এটে আড্ডা মারেন, আর ওপাকে বড়বা কী দোষে মোকে অপমান করি বাড়ি হইতে বাইর করি দিলে? এই বিচার আগে করেন।'

ভুঁইয়ার যে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি, সেই প্রশ্নের জবাব দিতেই কি চেঁচিয়ে কথা বলে বাণ্টু, যাতে তার বক্তব্য ভুঁইয়ার বৈঠকঘরেও পৌঁছে যায়?

মানিক বাণ্টুর অস্বাভাবিক উত্তেজনার নেপথ্য-ঘটনা ঠিক বুঝতে পারে না। জাগরণী সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও ঠ্যাংভাঙা বাজারে অফিস খোলা নিয়ে সভায় জরুরি আলাপ হচ্ছিল। মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে যেসব যুবক, তাদের কয়েকজনকেও কমিটিতে জায়গা দেওয়ার জন্য, বিশেষত বাণ্টু বক্করের কথা মনে রেখে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। উপস্থিত সকলেই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে মানিককে রাখার ব্যাপারে একবাক্যে হ্যাঁ বলছিল, তখন বাণ্টু এসে সভায় অপ্রাসঙ্গিক উত্তেজনা সঞ্চার করে।

'আব্বা তোকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল মানে?'

'চেয়ারম্যান নানার বিচার আপনি করলেন না, সে দোষ কি আমার? চেয়ারম্যান নানা পালায় যাওয়ার সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপায় কেন?'

'বিচারের ভয়ে নানাজি বাড়ি ছেড়ে পালায় গেছে বলেই তো তার বাড়িঘর আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারছি, এটাও কী কম লাভ? তাছাড়া দালালের বিচার তো আইন অনুযায়ী হবে, আমরা বিচার করার কে?'

মানিকের মুখ দেখে বাণ্টু বুঝতে পারে, আসল কথাটা সে মুক্তিবাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেদের কাছে ফাঁস করুক — মানিক এখনো তা চায় না।

'ঠিক আছে, চেয়ারম্যান নানা তোমার বাড়ি হইতে পালায় যাওয়ার সব দোষ না হয় আমি মাথায় তুলিয়া নিলাম। কিন্তু বড়বা মোর নামে মিছা কলঙ্ক দিলে ক্যানে? মুই কি তোমার বইন বিউটিকে বিয়ার প্রস্তাব দিছিনু কারো দ্বারা? এক বাড়িতে থাকিয়া বিউটির সাথে খচরামি ব্যবহার করিছোঁ কোনোদিন?'

এ সময় একজন যুক্তি দেয়, 'মুক্তিফৌজ হওয়ার পর থেকে মানিক ভাইদের বাড়িতে থাকিয়া তো কোনো কাজ করিস নাই। সেই রাগে মনে হয় ভুঁইয়া চাচা তোকে বাড়ি হইতে বাইর করি দিছে।'

'বাড়ি থাকি গেটআউট করি দিছে, ঠিক আছে। কিন্তু বিউটিবুর জন্য আমাকে থ্রেট করলে কেন?'

হান্নান এবার বলে, 'আমরা জরুরি আলোচনা করছিলাম, তুই কী সব আউলফাউল কথা নিয়া আসলু রে! হয় চুপ করিয়া বসিয়া মিটিং শোন, না হইলে এখান থাকিয়াও গেটআউট হ।'

গর্জে ওঠে বাণ্টু, 'চোপ শালা! তুই কী আমার কমান্ডার, কমান্ড করিস। চোরের মায়ের বড় গলা! আগে তোর বিচার হইবে, ভাইজান এই হান্নানের বিচার করেন আগে।'

'হান্নানের কী বিচার?'

সজব ভুঁইয়া যেমন বাণ্টুকে জেরা করেছিল আজ, বাণ্টুও তেমনি ঝানু উকিলের মতো মানিক ও হান্নানকে জেরা করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হান্নান ঢাকায় গিয়ে মানিকের সঙ্গে দেখা করেছিল কি না এবং বিউটিকে দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিল কি না এবং হান্নানের মাধ্যমে বিউটিকে চিঠি দিয়েছিল কি না?

বিরক্ত মানিক ধমকায়, 'কিসের চিঠির কথা বলিস?'

'পুছ করেন ওই মিথ্যাবাদীকে, আপনার নাম করিয়া বিউটিকে দেয়ার জন্য আমাকে সে চিঠি দিছিল কেন? শালা শিক্ষিতের বাল, কানাকে চ্যাট দেখাইস!'

'মিথ্যে কথা মানিক ভাই। চাকরবাকরদের হাতে আমি চিঠি দেব কেন?'

'মুক্তিফৌজ হয়া এত বড় মিছা কথা বলিস! ভাইজান আব্বার কয়, হান্নান হইল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। ঠিকই, এ শালা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা।'

'শালা ছোটলোকের বাচ্চা, মুক্তিফৌজ হইয়া তুই কোন লাট হইছিস রে আমার নামেও মিথ্যা কথা বলিস। এক চড়ে দাঁত খুলে দেব হারামজাদা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিছা কথা আমি কই না তুই কইস রে! বিউটিকে দেওয়ার জন্য খারাপ চিঠি লেখিস নাই তুই? ভাইজান, এই হারামজাদার আইজ বিচার না করেন তো আমি এর বিচার করব।'

মানিকের জাগরণী সংঘের জরুরি সভায় হঠাৎ আগুন লেগেছে যেন। চিৎকার হই চই শুনে বাড়ির চাকর কুজা মামা ও পড়শি লোকজনও ছুটে এসেছে। কাছারিঘরের পেছনে এসে নানি চেঁচায়, 'ও মানিক কী হইল, কিসের কাজিয়া নাগিল?'

অপ্রস্তুত মানিক স্তম্ভিত। দুর্বল কণ্ঠে — এই কী হচ্ছে, চুপ করো, ছি! বলে শাসন করে বটে, কিন্তু উত্তেজিত মুক্তিযোদ্ধাদের কানে তা যায় না যেন। হান্নানই প্রথম উঠে এসে ছোটলোকের বাচ্চা বলে বাংটুর গালে চড় বসায়।

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংটু তো তৈরি হয়েই এসেছিল, মার খেয়ে পাল্টা মার দেওয়ার জন্য নিজের শরীরটাকে প্রচণ্ড গোলার মতো নিক্ষেপ করে এমনভাবে হান্নানকে আঘাত করে, হান্নান ঘরের মেঝেতে পড়ে এবং সশব্দে একখানা চেয়ারও উল্টে যায়। দুজনকে নিরস্ত্র করার জন্য মধ্যস্থতাকারীরা দুই গ্রুপ হয়ে দুজনকে ধরেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অশরীরী পিশাচ ভর করা মানুষের মতো বাংটু মুক্তিদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে মুখও চলে তার, 'শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে শেষ করতে পারি নাই, তোকে আইজ ফিনিশ করি দেব হারামজাদা। অস্ত্র জমা দিছি বলিয়া কী ভাবছিস মোর মুক্তিযোদ্ধা নামখানও বাতিল হইছে?'

রাগকে রাগ দিয়ে দমনের চেষ্টায় মানিক বাংটুর গালে চড় কষিয়ে দিয়ে বলে, 'বড় বাইড় বেড়ে গেছে তোর। আব্বা তোকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, আমিও এ বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছি, আর কখনো আসবি না আমার কাছে, যাহ, ভাগ।'

মানিকের চড় খেয়ে বাংটু বোবা আক্রোশ নিয়ে ফোলে। অন্য মুক্তিযোদ্ধা বিচারকের রায় সমর্থন করতেই যেনবা বাংটুর মাথায় মৃদু চাটি মেরে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে, 'হারামজাদা আমাদের জরুরি সভাটা পণ্ড করে দিলি। যা, এখন ভাগ।'

'কিন্তু বাংটুর কম্পেলেন মিথ্যা কিনা, সেই বিচার হওয়া উচিত মানিক ভাই।'

মানিক সিদ্ধান্ত দেয়, 'এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। আজকের মতো সভা স্থগিত। তোমরা যাও সবাই। আমার মেজাজটাই খারাপ করে দিয়েছে বাংটু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভার শোরগোল ও উত্তেজনা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মানিক বৈঠকখানা ছেড়ে নানাবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে একা হয়।

নিরস্ত্র হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা বাণ্টুকে ভুঁইয়াবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে শুনে মানিক অবাক হয়নি, পিতার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা সত্য প্রমাণিত হওয়ায় বরং খুশি হয়েছিল। অন্যদিকে নিজের চরিত্র জাহিরের জন্য কিংবা হতে পারে বাণ্টুকে জরুরি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যে জবাবটা তৎক্ষণাৎ মানিকের মনে এসেছিল, 'সজব ভুঁইয়ার মতো ফিউডাল শোষকদের তোর মতো মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজন না থাকাই স্বাভাবিক রে বাণ্টু বক্কর। ভালোই হয়েছে, এখন থেকে তুই আমার সঙ্গে এ বাড়িতেই থাকবি।' মনে আসা স্বতঃস্ফূর্ত জবাবটি মুখে উচ্চারণ না করে, হঠাৎ বাণ্টুকে চড় মেরে সভা থেকে ভাগিয়ে দিল কেন? কাজটা কি ঠিক করেছে সে? নিজের এলাকায় হুলস্থূল বিপ্লব ঘটাতে চায় মানিক, কিন্তু মাত্র ষোলোজন গ্রামীণ যুবকের আকস্মিক উত্তেজনা-বিশৃঙ্খলা কন্ট্রোল করতে পারেনি আজ। সভাপতি হিসেবে নিজের এই ব্যর্থতা ও হতাশা থেকেই কি বাণ্টুকে আজ চড় মেরেছে? বাণ্টুর অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে সাহস যেমন হয়নি, তেমনি সংগঠনের সদস্যদের ওপরেও নিজের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর একটা বড় কারণ বোধহয় ছোট বোন বিউটির প্রতি দুর্বলতা। মাত্র ক্লাস টেনের ছাত্রী বিউটি, এই বয়সে তাকে নিয়ে তার সংঘের ছেলেরা তার সামনেই নানা স্ক্যান্ডাল রটাবে, একাধিক যুবক তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দেবে — ভেতর থেকে মেনে নিতে পারে না মানিকও।

একা হওয়ার পরও বাণ্টুর রাগ-অপমান এবং বিউটি বিষয়ক অভিযোগ কিছুতেই ভুলতে পারে না মানিক। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাণ্টুর আশ্চর্য রূপান্তর এলাকায় তার কদর ও খ্যাতি বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তাই বলে বিউটিকে তার বিয়ের স্বপ্ন কিংবা গোপন প্রেমের সম্পর্ক কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না মানিকের। অন্যদিকে হান্নানের বিউটির প্রতি দুর্বলতা এবং চিঠি লেখা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। বিউটি নানাবাড়িতে এলে হান্নানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটাও সহজ। সে জন্যই কি আব্বা বিউটিকে নানাবাড়িতে আসতে দিতে চায় না? এবং সে জন্যই কি শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে বিউটিকে ভাইয়ের সঙ্গে শহরে রাখতে আগ্রহী ভুঁইয়া, এমনকি তার শত্রু শ্বশুরও? বিউটিকে হান্নানের চিঠি লেখার অভিযোগটি হয়তো সত্য, ছেলেটার হাতের লেখাও মন্দ না। মূলে বিউটির প্রতি দুর্বলতা এবং বিউটির কাছে পৌঁছতে চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই কি মানিকের সব কাজে সে এত বেশি আগ্রহ ও সমর্থন দেখায়? বাণ্টু আজ চিৎকার করে হান্নানের আসল চরিত্র যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে নিভৃত ঘরে মালতীর ভাবনাও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

গত পরশুদিন মালতীকেও মানিক চার পৃষ্ঠার লম্বা একটি চিঠি স্বহস্তে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। চিঠি ঠিক নয়, মানিকের স্বপ্ন-আদর্শের মুসাবিদা বলা চলে। ঢাকায় ফিরে ব্যক্তিগত সুখময়-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার বদলে কেন মানিক গ্রামে পড়ে আছে এবং কী করতে চায় আসলে? মালতীর এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে স্বাধীন দেশের নতুন সমাজ গড়তে মালতীকে একান্ত পাশে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটির কথা জানতে পারলেও হয়তো মানিক অবৈধ প্রেমপত্র দিয়েছে বলে লোকজন নানা স্ক্যান্ডাল রটাবে। বাণ্টুও একদিন চেঁচিয়ে বলবে, 'কিসের দেশ গড়া আর কিসের সমাজসেবার আদর্শ বাহে! পরেশের বিধবা বউয়ের সঙ্গে মানিক ভাইজানের গোপনে নকটপকট করার মজাটাই আসল কথা।' আসলেই কি আসল কথা এটুকু মাত্র? হান্নান যেমন বিউটিকে পাওয়ার স্বপ্ন ও তৃষ্ণা নিয়ে দিনেরাতে মানিকের সঙ্গে লেগে আছে, মানিকও কি মালতীকে পাওয়ার জন্য চার পৃষ্ঠার লম্বা চিঠি দিয়েছে? নিজেকে শুধ মামুলি এক প্রেমিক ভাবতে পারে না মানিক। মালতীও কি তুচ্ছ প্রেমিক ভাববে তাকে? নিজেকে শুধু মালতীর প্রেমিক ভাবে না বলেই মানিক বাণ্টুর কথা এবং বাণ্টুর প্রতি দায়িত্ববোধ ভুলতে পারে না। নরেশ কাকার কাছে গেলে বাণ্টুর বিচারের ব্যাপারটা হয়তো বিশদ জানা যাবে এবং মানিক নিজের করণীয় কর্তব্যও ঠিক করতে পারবে।

মানিক নানিকে বাড়ি যাওয়ার কথা বলে সাইকেলে উঠে বসে।

বর্ষাকাল শুরু হলেও প্রকৃতিতে আজ গ্রীষ্মের আমেজ। ফুটফুটে চাঁদনি রাত। ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় ওঠার মোড়ের মধ্যে তিনটি যুবককে দাঁড়ানো দেখে চমকে ওঠে মানিক। হান্নানসহ জাগরণী সংঘের আরো দুজন যুবক। মানিককে দেখে ওদের একজন কথা বলে, 'মানিক ভাই নাকি? কই যান এত রাইতে?' বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে মানিক ওদের দিকে আর ফিরে তাকায় না। জ্যোৎস্নাভেজা নির্জন পথ ও নিঝুম চরাচরে সাইকেলের চাকা ঘোরার শাঁ শাঁ আওয়াজ শুনে নিজেকে মনে হয় আজ ভিন্নগ্রহের এক জীব।

এত রাতে মালতীকে একা পাওয়া কঠিন হবে জেনেই মানিক আজ বাবুবাড়িতে ঢুকে নরেশকে ডাকে, 'ও কাকা, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?'

মেয়ে ঘুমায়নি বলে নরেশ ও তার স্ত্রী জেগেই ছিল, আলো জ্বলছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে। দরজা খুলে দিয়ে নরেশ মানিককে দেখে অবাক হওয়ার বদলে হেসে স্বাগত জানায়।

'তুমি আজ আসবে আমার মনটা বলছিল। তোমার কাকিকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম তোমার কথা।'

'আজ সন্ধ্যায় বাণ্টু গিয়েছিল আমার কাছে। ওকে আব্বা বাড়ি থেকে নাকি অপমান করে বের করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, বিচারে আমিও ছিলাম তো। ভাই আগেই বলেছিল আমাদের।'

'কী ব্যাপার বলেন তো কাকা, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

'বসো তো আগে, ঠাণ্ডা হয়ে বসো।'

নরেশের স্ত্রী মেয়ে কান্না শুরু করলে তাকে কোলে নিয়ে বিছানা থেকে নামে, মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য ঘর থেকে বেরোয় এবং মন্তব্য করে, 'মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বাণ্টুও খুব বাড়াবাড়ি করছিল বাবা।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় আব্বাই বাড়াবাড়ি করছে।'

এ সময় মালতী ঘরে আসে। শিবুকে নিয়ে শাশুড়ির ঘরে শোয় সে। শিবু ঘুমিয়ে গেলেও মানিকের অপেক্ষাতেই জেগে ছিল কি? এসেই হাসিমুখে জানতে চায়, 'কী ব্যাপার এত রাতে? আমি তো ভাবলাম বাড়িতে আবার ডাকাত পড়ল নাকি? মুক্তিযোদ্ধারাও নাকি আজকাল চুরি-ডাকাতি করছে।'

মালতীর কথা ও চোখ-মুখের চাপা খুশিতেও কি মানিকের চিঠির জবাব উঁকি দেয়? কিন্তু মানিক কথা বলে নরেশের দিকে তাকিয়ে, 'বাণ্টু কি চুরি-ডাকাতি করার মতো ছেলে কাকা? অসম্ভব।'

'বাণ্টুটা সেরকম নয়, কিন্তু বিউটি সম্পর্কে আজেবাজে কথা বাইরে বলাটা ওর উচিত হয় নাই। তোমার আব্বার মাথা গরম হওয়াটা স্বাভাবিক। তাও তো ঠাণ্ডা মাথায়, কোনোরকম শাস্তি না দিয়েই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'আমার ভীষণ খারাপ লাগছে কাকা। হাজার হোক বাণ্টু সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। আব্বারা ক্ষমতা পেয়ে রিলিফও চুরি করবে আবার মুক্তিযোদ্ধার প্রতি অবিচার করবে, এটা মানতে পারছি না আমি।'

মালতী বলে, 'মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে বলে বাণ্টু যদি বিউটিকে বিয়ে করতে চায়, মানতে পারবে তুমি?'

মানিকের দেওয়া চিঠির বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইছে কি মালতী? জবাব দেয় সে, 'সমাজ-সংস্কারের চেয়ে প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতি চিরন্তন, দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু বিউটি এবং বাণ্টু দুজনেই তো এখনো ছোট। বিয়ের বয়স হয়নি। বয়স হওয়ার পর ওরা যদি একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যকে ভালোবাসার কথা বলত, তবে আমি কোনো দোষ ধরতাম না। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতাম। বাণ্টু আমাকে বিচার দিতে গিয়ে বলেছে, বিয়ের কথা সে কাউকেই বলেনি, অন্য ছেলেরাই বরং বিউটিকে নিয়ে এরকম স্ক্যান্ডাল রটাচ্ছে।'

নরেশের বউ বলে, 'বাণ্টু বাড়িতে থাকলে বাজে কথা বেশি রটবে বলেই তো ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে তোমার আব্বা। ঠিকই করেছে বাহে, তাছাড়া বাণ্টুর মা-টাও বড় দজ্জাল বেটিছাওয়া।'

'এই ঘটনায় আমার জাগরণী সংঘের ছেলেদের মধ্যেও দলাদলি শুরু হয়েছে। আমাকেও ভুল বুঝতে পারে অনেকে। আসার সময় দেখলাম, এত রাতেও রাস্তায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। বড় অস্থির লাগছিল বলেই আপনাদের এখানে ছুটে আসলাম কাকা। বাড়িতে গেলে আব্বার সঙ্গে আমার ঝগড়া লাগবে। যাই, নানাবাড়িতে ফিরে যাই আবার।'

'এত রাতে আবার একা নানাবাড়ি ফিরে যাবে?'

'তার চেয়ে রাতটা আমাদের বাড়িতেই থাকো বাবা, দাদার ঘরটা তো খালি পড়ে আছে। ও বউদি, যাও মানিককে ও ঘরে বিছানাটা করে দাও। কাল সকালে মানিককে নিয়ে ওর আব্বার কাছে যাব আমি।'

স্বামীর মতকে নরেশের স্ত্রীও সমর্থন দেয়। কিন্তু মালতীর কথায় যেন বিদ্রূপের সুর, বলে, 'তোমার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা বাড়িতে থাকলে তবু বাড়িতে চোর-ডাকাত আসার ভয় কম থাকবে। আসো মানিক, ও ঘরে তোমার বিছানা করে দেই।'

মালতী ঘরের দরজায় হ্যারিকেন রেখে মানিকের বিছানা ঠিকঠাক করে যখন, মানিক নরেশ কাকার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওদের সঙ্গে কথা বলে। রাতে নানাবাড়িতে খেয়ে এসেছে শুনেও অঞ্জনা কাকি এত রাতে চা করার কথা বলে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে চা প্রত্যাখ্যান করে মানিক, কিন্তু নরেশের কথামতো সাইকেলখানা ঘরে তোলে। মালতীর শাশুড়ি-সন্তান ও বাড়ির অন্যান্য লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। যতটা গলা নামিয়ে কথা বললে নরেশের ঘরে পৌঁছবে না, মালতী সেরকম গলা নামিয়ে কথা বলে, 'তোমার মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। এত রাতে এসেছ, তার ওপর এ বাড়িতে থাকতে চাইছ।'

'আমি কিন্তু চিঠির জবাব নিতে এসেছি মালতী। জবাবটা দাও, আমি চলে যাই।'

'তোমার চিঠির মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝি নাই। সেই জন্য তো বললাম তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'মাথা ঠিক আছে। ভেতরে খুব অশান্তি, অস্থিরতা। তুমি সত্যটা মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিলেই আমি শান্ত হব।'

'কী সত্য?'

'ভালোবাসার সত্য।'

মালতীর মুখে যেন আবারও বিজলি চমকায়। সেদিনের মতো ঠোঁটে আঙুল তুলে সতর্ক করে মানিককে। উঠানে জ্যোৎস্না আর ঘরে হ্যারিকেনের হলুদ আলোয় বড় বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় আজ তাকে। মালতী বিছানাটি ঝাড়ে, চাদর বিছিয়ে দেয়। বিছানায় পাশাপাশি দুটি বালিশ, যেন মালতীও আজ এ ঘরেই শোবে। মানিকের বুক টিপটিপ করে।

'তুমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাও।'

'একা?'

'একা না তো দোকা কোথায় পাবে? পাগল! আমি গেলাম।'

মানিক তাকে বাধা দেওয়ার আগেই মালতী যাকে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় অবশ্য নিজেই ঘরের দরজা বাইরে থেকে চেপে দেয়। মানিক উঠে গিয়ে দরজার খিল লাগানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

বিছানায় শুয়ে ভাবে মানিক, শাশুড়ি ঘুমিয়ে পড়ার পর মালতী নিশ্চয় আসবে। পাশাপাশি দুটি বালিশ রেখে গেছে কেন? মালতীর বালিশ ও বিছানার শূন্যতা আগলে মালতীর অপেক্ষায় জেগে থাকে মানিক। কোচবিহারে পাওয়া মালতীর তুলনায় আজকের রাতে, স্বাধীন স্বদেশে পাওয়া মালতী যে অনেক বেশি সুন্দর ও মধুর হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই মানিকের। আসন্ন গোপন প্রাপ্তির অনির্বচনীয় স্বাদ ও সুধারসে নিজের সমস্ত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা আজ মুছে দেবে মানিক, নিজের স্বপ্ন ও সংগ্রামকে সত্য হিসেবে অনুভব করবে। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত রাতের আরো গভীরে ঢলে পড়ে, মালতী তবু আসে না। মালতীর অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মানিক শুধু অনুভব করে মালতীকে সে ভালোবাসে, মালতীকে সে কাছে পেতে চায়। এই সত্য মানিকের ভেতরে একসময় এতটা চাপ সৃষ্টি করে যে চুপচাপ সে আর শুয়ে থাকতেও পারে না। মালতীকে বলার জন্য ভেতরে কত যে কথা তোলপাড় করতে থাকে! একবার কেশে নিজের জেগে থাকা ঘোষণা করে, কিন্তু পাশের ঘর থেকে মালতীর কোনো সাড়া মেলে না। মানিক দরজা খুলে নির্জন উঠানে নামে, মালতীর শাশুড়ির বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে, মালতী তবু আসে না। নরেশের ঘর থেকে তার কন্যার জেগে ওঠার আওয়াজ ভেসে আসে। মানিক চোরের মতো চুপিচুপি আবার ঘরে এসে বিছানায় শোয়। অপেক্ষার দুঃসহ প্রহর মানিককে পীড়ন করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে, মালতী তবু আসে না। একসময় রাত পোহানো মোরগের বাক শুনতে পায় মানিক, মালতী তবু এলো না! আলাদা করে রাখা বালিশ দুটি একসঙ্গে রেখে মানিক বিছানা ত্যাগ করে।

ভোরবেলা বাড়ির কেউ জেগে ওঠার আগেই মানিক সাইকেলখানা নিয়ে নানাবাড়ির উদ্দেশে ছুটতে থাকে।

তেতাল্লিশ

বন্যা যে কোন বছর মারাত্মক হবে, আর কোন বছর হবে না, তা হলফ করে বলতে পারে না কেউই। তবে ফি সন বর্ষা মৌসুম এলে তিস্তায় পানি বাড়ে, নদীঘেঁষা চরাঞ্চলে নদীর পানি উছলায়, রোদ-বৃষ্টির মতো প্রতিবছর ছোটখাটো বান নিয়েই নদীর কোলে বসবাস করে চরাঞ্চলের বাসিন্দারা। কিন্তু বানের পানি আঙিনা-বিছানা একাকার করে যখন ঘরের চাল ছোঁয়ার জন্য ফুলতে থাকে, তখন নিরাপদ ডাঙার সন্ধানে পালাতে থাকে মানুষ। স্বাধীন দেশেও সেরকম বন্যা হবে কি না এবং ঢোঁড়া মোহাম্মদের তালাকি বউ ও একমাত্র সন্তান জুলুকে বাপের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে কি না, বোঝার জন্য নদীর অবস্থা দেখতে তিস্তার বাঁধে যায় সে।

বাঁধরাস্তায় উঠে নদীর চেহারা দেখে ভয় পায় ঢোঁড়া। দুদিনেই পানি বেড়ে দরিয়া হয়েছে। চরুয়া গ্রামের বালুচর, ফসলি জমি, মানুষের ঘর-সংসার একাকার করে দিয়ে নদীর ঘোলা পানি এখন বাঁধের পাঁজরেও ঠোকর মারছে। কোমরপানি ভেঙে গরু-ছাগল হাঁস-মুরগি নিয়ে বাঁধসড়কের আশ্রয়ে ছুটে আসতে শুরু করেছে মানুষ। অনেকের মাথায় হাঁড়ি-পাতিল, কাঁথা-বালিশ, ধান-চালের বস্তা, আগুন জ্বালানোর শুকনো লাকড়ি পর্যন্ত। পানি যদি আরো হাতখানেক ফোলে, বাঁধের ওপাশের গ্রামগুলোতে একটা জনপ্রাণীও টিকতে পারবে না আর।

ঢোঁড়া বানভাসি মানুষের মধ্যে তার জুলু ও জুলুর মাকে খোঁজে। একজনকে পেলে অবশ্য আরেকজনের দেখা পাবেই। বাঁধের ওপাশে ভাটিয়াটাড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি। বাঁধরাস্তা থেকেও কপিল ভাটিয়ার টিনের ঘরের ওপাশে শ্বশুরের ঘরের খড়ো চালা ও কলাগাছ দেখা যায়। প্রাক্তন শ্বশুর ভাটিয়া নয়, ঢোঁড়াদের মতো উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা বলে নগদ দুই কুড়ি টাকা খরচা করে বিয়েটা করেছিল ঢোঁড়া। কিন্তু শ্বশুর শালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে হবে কী, বড় খবিজ মানুষ। হিলাবিয়া ছাড়াই জুলুর মা স্বামীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ফেরার মত করলেও বাপে রাজি হয়নি। মেয়ে ও নাতিকে দিয়েও সংসারের সব কাজ করিয়ে নিয়ে দু'বেলা পেটপুরে খেতেও দেয় না। তারপরও বাড়ি ছেড়ে বেরোতে দেয় না। কিন্তু এখন এই বানে ঢোঁড়ার ছেলেকে ঘরে আটকে রাখুক দেখি, কেমন বাপের বেটা! তালাকি-বউ বাপের বাড়ির জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে বানের পানিতে ডুবে মরুক, ঢোঁড়ার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তার একমাত্র বংশধর জুলু, সাঁতার শেখার বয়স হয়নি এখনো, মা বেখেয়াল হলে কখন যে পানিতে ডুবে মরে। জুলুকে যদি বাঁধসড়কে খুঁজে পায়, তবে যতই কান্নাকাটি করুক, ছেলেকে ঘাড়ে নিয়ে বাড়িতে যাবে ঢোঁড়া। ছেলের মা পিছু নিলে তাকে জোরে একটা লাথি দেবে, নাকি ঘরে ঢুকতে দেবে — এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে। কারণ তিনদিন ধরে নিজেরই তার কাজ নেই। জমানো চালের ভাত দু'বেলা নিজের পেটে দিতেই বাধে, তার ওপর আকালের টাইমে সংসারে খাওয়ার দুটি মুখ বাড়ানো বেআক্কেলি কাম নয়?

তিস্তার বড় বন্যা ও নদীভাঙনের শিকার মানুষজনের দুঃখ দেখলে অবশ্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় ঢোঁড়ার। এমনিতে নদীর থাবা এড়িয়ে আছে, উত্তরের কায়েমি এলাকার পুরনো মানুষ তারা। তার ওপর তিস্তায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটা হওয়ায় রতনপুরে বন্যার পানি হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে পারে না আর। অবশ্য বর্ষার পানি জমে এবং ঘুরপথে বানের পানি ঢুকে জগন্নাথের বিলও উছলায়। তাতেই বান রতনপুরের দোলার জমির সমস্ত ফসল এক গ্রাসে খেয়ে নেয়। সদ্য লাগানো রোয়া আমন আর ঘন সবুজ বীজতলা হজম হয়ে গু না হওয়া পর্যন্ত পেট চিতিয়ে খেতের ওপরেই গড়াগড়ি দেয় বেশ কিছুদিন। বাঁধটা হওয়ায় পানি যেমন সহসা ঢুকতে পারে না, বর্ষার পানি নামতেও পারে না তেমনি। তবে বান ডাকলেও রতনপুরের অধিকাংশ গেরস্তবাড়ি থাকে শুকনা। এমনকি ঢোঁড়া বা বাউদিয়ার মতো গরিবের ঘরেও পানি ঢোকে কদাচিৎ। কিন্তু এবারের বন্যা মনে হয় কাউকেই রেহাই দেবে না।

বাঁধরাস্তায় যেখানে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা এসে ঠেকেছে, সেখানে অচেনা দুই সাইকেল আরোহী বানভাসি মানুষকে আরো সব ভয়ের খবর শোনায়। দেশ স্বাধীন হওয়ায় বন্যাও নাকি এবার স্বাধীন হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া যুদ্ধ করে স্বাধীন করে দিয়েছে বাংলাদেশ, এখন স্বাধীন দেশে তিস্তা দিয়ে কত পানি পাঠাচ্ছে, তা নিজের চোখে দেখে অনুমান করো। তাম্বুলপুরের কাছে পানির চাপে এক জায়গায় বাঁধটা ভেঙে গেছে, আরো ভাঙবে। কারণ টাকা মারার জন্য কোনোরকমে বালুমাটি দিয়ে বাঁধটা খাড়া করেছিল কন্ট্রাকটাররা। শেখ মুজিব পাকবাহিনীকে ভাতে-পানিতে মারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু পানি আর দু'চারদিন বাড়লে ভাতে-পানিতে মরা ছাড়া উপায় থাকবে না এ জায়গার মানুষের। রিলিফ দিয়ে বাঁচাবে কয়জনকে? তার ওপর রিলিফচোররা সারাক্ষণ ইঁদুরের মতো রিলিফের বস্তা কাটার তালে আছে।'

স্বচক্ষে বানে-পালানো মানুষ দেখে এবং স্বকর্ণে লোকজনের এসব কথা শুনে ঢোঁড়া জুলুকে খোঁজার চেষ্টা করে না আর। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে থাকে। ফেরার পথে নদীতে বান ডাকার খবরটা ডাঙার অনেককেই শোনায়। ঘরে ফিরে মুক্তির মা ভাবিকে নিজের ভয়-উদ্বেগের ভাগ দেওয়ার জন্য বাংটুদের উঠানে যায় আগে। বাংটু ও মাদু দু'ভাই উঠানে বসে সুতায় বড়শি আর পাটকাঠি বেঁধে বড়শা বানাচ্ছে। ছেলেদের ওপরে কী নিয়ে যেন বগর বগর করছিল বাংটুর মা।

'ও ভাবি, মিলিটারির বাপ আসতেছে! পালান সগাই।'

'কিসের মিলিটারি! এলাও কি দেশে যুদ্ধ আছে?'

'মিলিটারি নয়, মিলিটারির বাপ হইল বান। বানের পানির এক ঠেলাতেই বাঁধের আস্তা ভাঙিয়া গেইছে, আরো ভাঙবে। বানের পানি এলায় হু-হু করিয়া সোন্দায় হামার জগন্নাথের বিলেও। আর তোমার বেটারা এলাও মনের সুখে বড়শা বানায়। হায় রে কলিকাল!'

বাংটু এবার চাচাকে ধমকায়, 'কোনঠে হইতে এই ভুয়া খবর ধরিয়া আইলেন যাদু!'

'নিজের চোখে দেখিয়া আসনু বাহে। চরের মানুষ এক গলা পানি ভাঙিয়া ছুটি আসতেছে বাঁধের ওপর। মোর জুলুটাকে খুঁজিয়া পানু না, আল্লায় জানে মরচে না বাঁচি আছে।'

বড় বানের খবর দিয়ে ঢোঁড়া আসলে বাংটুর মাকে ভয় দেখানোর বদলে সান্ত্বনাই দেয় যেন। তার কিছু সংগত কারণও আছে।

গত হাটে দুটি হাঁস বেচে যে কয়টা নগদ পয়সা আয় হয়েছিল, তা দিয়ে চাল-নুন না কিনে বাংটু সুতা-বড়শি কিনেছে। বুদ্ধি ও আবদারটা অবশ্য ছোট ভাইয়ের। অন্তত শখানেক বড়শা বানিয়ে বড়শিতে কেঁচো গেঁথে দিয়ে দিনে-রাতে বিলে ফেলে রাখবে। কলাগাছের ভুড়ায় চেপে পাহারাও দেবে মাদু। শখানেক বড়শার মধ্যে যদি বিশ-পঁচিশটাতেও শোল-টাকি কী শিং-মাগুর আটকাতে পারে, তাহলে বাজারে মাছ বেচে দুই দিনেই মাদু হাঁসের দাম তুলতে পারবে। চাল-নুন কেনার পয়সাও জুটবে নিয়মিত। ছেলেদের এসব স্বপ্ন-পরিকল্পনা তুচ্ছ করে বাংটুর মা যখন আজকের অনিবার্য উপবাসকে ঠেকানোর কোনো পথ না পেয়ে বড়শি কিনে সব পয়সা নষ্ট করার জন্য ছেলেদের গাল দিচ্ছিল, ঠিক তখন ঢোঁড়া এসে বানের খবরটা শোনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘আসুক বড় বান। বড় বান আসিয়া হামার বাড়িঘরও ভাসায় দেউক। যাতে আর মোকে চুলা জ্বালানোর চিন্তা করতে না হয়।’

মাদু এবারে বুদ্ধি দেয়, ‘ও মা, বড় কলার গাছ কাটিয়া মুই একখান ভুড়া বানাইম। বানের পানি ঘরে ঢুকলে ভুড়ায় চড়িয়া রাঁধতে পারবু, ভুড়ায় চড়িয়া খাইতেও পারমো হামরা, বেড়াইতেও পারমো।’

ছোট মানুষের বুদ্ধির দৌড় দেখে ঢোঁড়া ঠাট্টা না করে পারে না আর, ‘ভুড়ায় চড়িয়া তোর মাও যে রাঁধিবে, চাউল দেবে তাকে কোন নাঙে? মোর ঘরত মোটে আর সের দুয়েক চাউল, ফুরাইলে এক মাসের জন্য উপাস খাটা শুরু করিম। তিস্তায় বড় বান ডাকলে এ জায়গার কামলারা একখান মাস কোনো কাম পাবার নয়। ভুঁইয়ারা আর হামাকে ইলিপও দেবে না। তোর মায়ের এও চুষি খায়াও বাঁচতে পারবেন না বাহে।’

মাদু তবু সহজে হতাশা মানার ছেলে নয়। বলে, ‘ও ঢোঁড়া যাদু, কামলারা কাম পায় না দেখিয়া তো মুই জগন্নাথের মাঝি হনু। মাছ বেচে হামরা সংসার চালামো।’

‘মানুষের চাউল কেনার পইসা নাই, তোর মাছ কেনে কাঁয় বাহে! মাছ খাইতে তেল মরিচ নাগে, পাইবে কোনঠে?’

‘মানুষে যদি মাছ না কেনে, তা হইলে চুলার আগুনে পোড়া দিয়া শুধু নুন দিয়া ভর্তা করি খামো। গেল মঙ্গার টাইমে খাইছি, কচুর চায়া মাছের ভর্তা টেস্ট নাগে বেশি।’

ঢোঁড়া এবার পরাস্ত মেনে ভাউজকে শোনায়, ‘নাও ভাবি, তোমার আর চিন্তা কী! বড় বেটা মুক্তিযোদ্ধা, ছোটটা হইল মাঝি — ভুড়াত চড়িয়া মঙ্গা পাড়ি দেমেন। মোর জুলুটার যে কী হইবে, আল্লায় জানে।’

সকালে মাদু বিল থেকে শাপলার ডাঁটা তুলে এনে দিয়েছে। হাঁড়িতে এক মুঠো খুদ ছিল, সেই খুদকুঁড়া মিশিয়ে ভেটার ডাঁটা খিচুড়ি করে রেঁধে দিয়েছে ছেলেমেয়েদের। নিজের ভাগে কম পড়ায় আছিমন এখন ছেলের কথাবার্তা খেয়েই চাঙ্গা হয় বটে, কিন্তু কথা বলে নিজের দুরবস্থার কষ্টটাই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

ভুঁইয়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর মুক্তিফৌজ কামলা খেটে কয়েক সের চাল পেয়েছে সত্য, কিন্তু নগদ একটা টাকাও রোজগার করেনি। মা আর ছোট ভাইয়ের ওপর নির্ভর করে মাতবরি করে বেড়ায়। কিন্তু শেখ মুজিব যাকে ডেকে নিয়েও চাকরি কি বেতন দিল না, খালি হাতে বাড়িতে ফেরত পাঠাল, ভুঁইয়া যাকে মিথ্যে বদনাম দিয়ে বাড়ি থেকে কুত্তা-বেড়ালের মতো খেদিয়ে দিলো, তার কি মাতবরি করে বেড়ানো শোভা পায়? মুক্তিফৌজ হিসেবে গ্রামের মানুষ যাকে এত সম্মান দিয়েছিল, এখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ভুঁইয়ার ঘরজামাই টিটকারি দেয়। এমন মুক্তিফৌজ বেটার চেয়ে মাদু যদি হেঁদু মাঝিও হয়, তাও ভালো। মুক্তিফৌজ বেটা মিলিটিরি-আজাকারকে মারিয়া দেশ স্বাধীন করল, কিন্তু লাভ হইল কী হামার?

ঢোঁড়াও আছিমনকে সমর্থন করে বলে, 'লাভ দূরের কথা, এলা স্বাধীন দেশে বুঝি হামাকে না খায়া মরা লাগে।'

বড়শা বানানোর কাম শেষ করেছে বাণ্টু। মা ও চাচাকে একসঙ্গে ধমক দেয়, 'চোপ। স্বাধীন দেশে ভুঁইয়ারা রিলিফ লুটপাট করবে, আর হামরা মুক্তিযোদ্ধারা না খায়া মরমো! সেইটা হইতে দেব না।'

'কী করবু তুই?'

'মানিক ভাই যদি মোকে দলে ডাকি না নেয়, তা হইলে অন্য দলে যোগ দেব। অস্ত্র হাতে তুলি নেব। হাতে অস্ত্র দেখলে ভুঁইয়া তখন ফের বাপ বাপ করি বাড়িতে ডাকপে দেখিস।'

ভুঁইয়ার মতো মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার বা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাণ্টুর স্পর্ধা আপনজন হয়েও আছিমন কি ঢোঁড়া কেউ সমর্থন করতে পারে না। এমনধারা দুঃসাহসী কথাবার্তায় ছেলের মুক্তিফৌজ পরিচয়টাই যেন আবার সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আবার মুক্তিফৌজ হয়ে বাণ্টু কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, মুক্তির মা হয়েও আছিমন ঠিক বুঝতে পারে না। বাণ্টুও বিশদ বোঝানোর চেষ্টা করে না। বাইরে বেরোনার আগে হুকুমের গলায় ঢোঁড়াকে নির্দেশ ও মাকে আশ্বাস দেয়, 'ও বাহে যাদু, তোমরা আধ সের চাউল হামার করজ দাও। মুক্তিযোদ্ধা বাণ্টু বক্কর বাঁচি থাকতে স্বাধীন দেশে না খেয়ে থাকপেন না কেউ। মুই বান দেখতে গেইনু, তোমার জুলুর খবর এলা নিয়া আসিম।'

ভুঁইয়া চাকরিটা খেয়ে স্বাধীন করে দেওয়ার পর বাইরে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করাটাই যেন বাণ্টু মুক্তির বড় কাজ। আগে মনিববাড়ির কাছারিঘরে বসে মনিবের পিছে থেকে সেও মাতবরি করত। এখন বাণ্টু মুক্তি কই কই ঘোরে আর কার সাথে কী মাতবরি করে বেড়ায়, আছিমন জানে না। নিজের সাইকেল নেই। তাই অন্যের সাইকেলে বসেও হাটে-বাজারে যায়। ঠ্যাংভাঙা বাজারে নরেশের দোকানে বসেও একদিন কার সঙ্গে নাকি কাজিয়াও করেছে। ভুঁইয়াবাড়ির সামন দিয়ে হাঁটে না ঠিকই, কিন্তু লোকে বলে, বড়বাড়ির সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক বজায় রেখেছে এখনো। ট্যারা জহির দেখেছে বাড়ির পেছন ভিটার জঙ্গলে বাণ্টু লুকিয়ে কী যেন করছিল, ধরা পড়ে যাওয়ায় পায়খানা করার ছল দিয়েছে বাণ্টু। আবার ভিটার গাছে ভূতের মতো লুকিয়ে থেকে নাকি বিউটির সঙ্গে মেলা কথাবার্তা বলেছে। বিউটির সৎমা এ রকম অভিযোগ তুলেছে। বাইরে বেরোলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিফৌজ সম্পর্কে কত কথা শুনতে হয় মুক্তির মাকে। কিন্তু বাণ্টুকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই ধমক দেয়। সঠিক জবাব না দিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায় বেশিরভাগ সময়।

বাণ্টু বেরিয়ে যাওয়ার পর চাল করজ দেওয়ার ভয়ে ঢোঁড়াও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আছিমন কী আর করে, নজিবরের বাড়ির ঐতিহাসিক দাওয়াত খাওয়ার স্মৃতি মনে আসায় সেই বাড়ির দিকেই হাঁটতে থাকে।

আজকেও সারাটা দুপুর ও বিকেল কর্তন করে বাণ্টু ঘরে ফেরে সন্ধ্যার কিছু আগে। কোলে তার ঢোঁড়ার ছেলে জুলু, পেছনে জুলুর মা। জুলুর মায়ের মাথায় মাঝারি সাইজের বোঝা আর কাঁখে একটি ছাগলের বাচ্চা। ছাগলের বাচ্চাটাই অচেনা বাড়িতে এসে ম্যা ম্যা রব তুলে ঢোঁড়ার বউয়ের প্রত্যাবর্তন সংবাদ ঘোষণা দিতে থাকে।

ঢোঁড়ার তালাকি বউ-বাচ্চাকে দেখে আছিমন তিলমাত্র খুশি হয় না, বরং ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। স্বাগত জানানোর বদলে ছেলেকে শাসন করে সে, 'হায় আল্লাহ! তালাক দেওয়া বউকে চাচার ঘরত ফেরত আনলু তুই! সমাজের মানুষ জানলে তোরই বিচার করবে আগে।'

'তোর সমাজের খ্যাতা পোঁড়ো মুই। বানে মানুষ মরে, খোলা রাস্তায় আসি উঠছে ঘরের বেটিছাওয়ারা, এলায় কিসের সমাজ?'

'সেটা তো ঠিকই বাহে বাণ্টু, বানে সমাজও ডোবে।'

বাণ্টুকে সমর্থন দিয়ে জুলুকে নিজের কোলে তুলে নেয় ঢোঁড়া। খুশিতে হাসি ফোটার বদলে বুকটা ধক করে ওঠায় তার কান্না পায়। নানাবাড়িতে থেকে শুকিয়ে আরো রোগা হয়েছে তার জুলু।

বাণ্টুর মা বলে, 'বানে সমাজের মাথাটা ডোবে নাই রে, ডুববেও না কোনোদিন। এমনিতে ভুঁইয়ার বেটিকে বিয়া করার মিছা কথা শুনিয়াই তোকে বাড়ি থাকি খেদায় দিলে, ঢোঁড়ার তালাকি বউকে ঘরত দেখলে ঢোঁড়ার দোষ হবার নয়, দেওয়ানি তোরই দোষ ধরবে। গ্রাম থাকি খেদায় দেবে।'

ঢোঁড়া বলে, 'সেটাও তো ঠিক কথা ভাবি। মোর কী দোষ!'

বাণ্টু হুংকার দিয়ে মায়ের ভয় তাড়াতে চায়, 'বাণ্টু মুক্তি এলা ভুঁইয়ার চাকর না হয় মা। ভুঁইয়ার বাড়িতে খায় না, তার রিলিফও পায় না। এত ভয় পাইস ক্যানে মা! বাণ্টু মুক্তিকে গ্রাম থাকিয়া তাড়ানো এত সোজা না।'

জুলুর মা মাথার বোঝা ও বগলের ছাগল নিচে নামিয়ে রাখে। পরনের শাড়ি নিচের দিকে পুরোটাই ভেজা। আছিমনকে উদ্দেশ করে কথা বলে প্রথম 'বাণ্টুকে ঠ্যাংভাঙার কোন মুনশি কইছে, তালাক বলে হয় নাই। জুলুর বাপও কইছে, তিন তালাক কবার ধরিয়াও বোলে ঢোক গিলি খাইছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংটু আদেশ করে, 'যাও বাহে চাচি, তোমরা ছাগলের বাচ্চা আর জুলুক নিয়া ঘরত যাও। বানের পানি যদি এবার হামার বাড়িতেও ঢোকে, তা হইলে একসাথে সবাই সরকারি জায়গায় গিয়া উঠমো, আর বাঁচলে এক সাথে লড়াই করিয়া সবাই বাঁচমো।

ঢোঁড়া এখনো আধা সের চাল করজ দেয় নাই আছিমনকে, বাংটুকে জোর সমর্থন দিতে গিয়ে তার মাকে বলে, 'ও ভাবি, তোমরা আধ সের চাউল নিয়া যাও তো। আর জুলুর মাও আধ সের চাউল রাঁধুক। বানের পানি যদি হামাকেও ভাসায় এক সাথে উপাস খাটমো, উপাস কেমনে খাটে জানা আছে হামার।'

অতঃপর সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর পড়শি দুই বাড়ির চুলাতেই আগুন জ্বলে, চুলায় শূন্য মাটির হাঁড়িও ওঠে। চুলার পাড়ে বসে বাংটু যখন বিড়ি টানে, এ সময় বাইরে আম্বার মুক্তির ডাকটা শুনতে পায় সবাই।

'বাংটু বাড়িতে আছিস নাকি রে? বাইরে আয়, খবর আছে তোর।'

আম্বারের কথা শুনে বাইরে থেকে ঘুরে এসেই মাকে খুশির খবরটা জানায় বাংটু।

'ও মা, মানিক ভাই মোকে জরুলি ডাকায় পাঠাইছে। রিলিফ দেওয়ার কাম করা লাগবে। মুই যাঁও এলায়।'

'এক মুঠ গরম খাত খায়া যা বাবা।'

'চেরম্যানের বাড়ি গেইলে বুড়ি নানির কাছে ভাত নিয়া খাইম মুই। আসার সময় কয় সের চাউলও রিলিফ নিয়া আসিম এলায়। ভাত হইলে তোমরা পেটভরে খাও সগাই।'

খুশিতে বাংটু অনেক দিন পর আজ জয় বাংলার জয় গানটা গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়।

চাল নিয়ে বাংটু রাতেই ফিরে আসবে — এই আশায় নিশুতি রাতে আছিমন একা অনেকক্ষণ জেগে থাকে। কিন্তু বাংটু রাতে ফেরে না। পরদিন সকালেও আসে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল সাঁঝ হবার পরও বাংটু আসে না। কোনো খবরও পায় না আছিমন। পেটে ক্ষুধা ও মনে নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে রাত কাটে। পরদিন ফুটিল-বেহানে মাদুকে পাঠায় সে হরিপুর চেয়ারম্যানের বাড়ি। মাদু ফিরে এসে খবর জানায়, চেয়ারম্যানের বাড়িতে যায়নি বাংটু। মানিক ভাই তাকে ডাকেনি, কিছু জানেও না। আছিমন নিজে ছুটে যায় আম্বারের কাছে। আম্বার বলে, বাংটু তো একাই মানিক ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়ার কথা। এর বেশি সে কিছু জানেও না। ঢোঁড়া গোপনে ট্যারার কাছে খবর নিয়ে আসে, বড়বাড়িতে বাংটু যায়নি, এমনকি পেছনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিটার জঙ্গলেও তার ছায়া দেখেনি জহির।

তারপরও বাণ্টু মুক্তির মা তার মুক্তিফৌজ ছেলেকে গাঁয়ের পথে খুঁজে বেড়ায়, জনে জনে জিজ্ঞেসও করে। নানাজনে নানা কথা বলে। বাণ্টু আসলে টাউনে গিয়ে রিকশা চালার কাম নিয়েছে। বাপের মতো বাউদিয়া হয়ে কোনো ডাঙ্গার দেশে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোধহয়। বাণ্টুর মা করার কিছু নেই বলেও ছেলেকে খুঁজে বেড়ায়। বানের পানি এবার বাণ্টুদের ঘরের পিড়িলি পর্যন্ত ছুঁয়ে কমতে শুরু করেছে। বানভাসি দুর্গত মানুষ রিলিপের আশায় এখনো গাদাগাদি করে বাঁধসড়কে ও স্কুলঘরে আছে, কিন্তু রিলিফপ্রার্থীদের ভিড়ে বাণ্টু নেই। গাঁয়ের বেশির ভাগ জায়গাজমি রাস্তাঘাট গিলে খেয়ে বান চারদিকে থইথই করছে, বানের পানিতে খলবলিয়ে হাঁটাচলা করছে মানুষ, কিন্তু বাণ্টুকে কোথাও চোখে পড়ে না। ছেলেকে খোঁজার ক্লান্তিতে আছিমন এতটাই কাহিল হয়ে পড়ে যে, বাবুবাড়িতে পৌঁছেই উঠানে মড়ার মতো শুয়ে পড়ে। ছুটে আসে বাবুর বউ ও ছেলের বউয়েরা।

পরেশের বউয়ের কাছে মুমূর্ষু মানুষের শেষ উক্তির মতো কোনোমতে বলে আছিমন, 'ও শিবুর মা, মোকে আগে কিছু খাওয়াও। না হইলে মুই তোমার বাড়িতে আইজ বুঝি মরিয়া ভূত হইমু।'

পরেশের বউ একটা মাটির সানকিতে ডালভেজা সাদা ভাত এনে দেয়, হাত না ধুয়েই গোগ্রাসে খায় আছিমন। মাটির ভাণ্ডেই জগের জল ঢেলে নিয়ে ঢক ঢক করে অনেকটা পানি খায়।

'শিবুর মা, দেশের গণ্ডগোলে হামরা দুইজনে স্বোয়ামি হারাইনু! স্বাধীন দেশে বুঝি মোর মুক্তিফৌজ বেটাকেও হারানু রে বইন।'

বাণ্টুর মায়ের এই দশা দেখেও, নিখোঁজ বাণ্টুর চেয়ে রাস্তায় ভুঁইয়ার সর্বস্ব ছিনতাই হওয়ার বাসি ঘটনাটিই যেন গুরুত্বপূর্ণ পরেশের মায়ের কাছে। গ্রামের সবাই জানে, তবু বুড়ি সেই গল্প শোনায়।

বান ডাকার কয়েকদিন আগে সন্ধ্যায় শহর থেকে ফিরছিল সজব ভুঁইয়া। কয়েকজন ছিনতাইকারী তাকে থামিয়ে পকেটের টাকা-পয়সা, সাইকেল-ঘড়ি সবই কেড়ে নিয়েছে। ছিনতাইকারী ডাকাতদের মুখে গামছা বাঁধা থাকলেও হাতে রাইফেল ছিল, একজনের চেহারা ছিল ঠিক বাণ্টুর মতো। এই ঘটনার পাঁচদিন পরই মোটরসাইকেল কিনেছে ভুঁইয়া। অবশ্য চেয়ারম্যান হয়ে মোটরসাইকেল কেনার আত্মপ্রতিশ্রুতি অনেক আগে থেকেই ছিল। রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এখন মোটরসাইকেলে পেছনে বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করে সে। বাবুর বাড়ির লোকেরাও চুরি-ডাকাতির ভয়ে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারে না। রাজাকার-মুক্তিফৌজরাই এখন অস্ত্র নিয়া চারদিকে ডাকাতি-ছিনতাই করে বেড়ায়। কাজেই 'তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি বাণ্টুও যে ডাকাইতের দলে যোগ দেয় নাই, তোর আল্লা-রসুলের নামে কিড়া দিয়া দাবি করতে পারবু সে কথা?'

'মোর বেটা ডাকাতি করলে মুই বেটাবেটি নিয়া না খায়া আছং ক্যানে বাহে?'

'ভালো মানুষরা কখনো পালায় বেড়ায়? তোর বাণ্টু তা হইলে পালায় গেল কোন্ঠে?'

মালতী শুধু সান্ত্বনা দেয়, 'যেখানেই যাউক ফিরে আসবে। চিন্তা করেন না। সত্যই কি বিউটিকে বিয়া করতে চাইছিল বাণ্টু? সেই দুঃখে পালায় যায় নাই তো?'

এ বিষয়ে কথা বলার রুচি বা তাগদ নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না আছিমন। চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে পরেশের বিধবা বউকে বলে, 'যাঁও রে বইন, দুই দিনের ভোকের পেটে অন্ন দিলু, আল্লা তোকে যেন শান্তি দেয়।'

চুয়াল্লিশ

মাত্র তিনদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর বাণ্টুর বাড়ি ফেরা এবং বাড়ি থেকে চিরবিদায় নেওয়াটা গ্রামে বেশ সাড়া জাগানো ঘটনা হয়ে ওঠে। মুক্তিফৌজ হিসেবে তার স্বাধীন দেশে ফিরে আসাটা ছিল ছোট-বড় সকলের জন্য খুশির ঘটনা। কিন্তু বাণ্টুর চিরবিদায় যেমন ভয়ংকর, তেমনি রহস্যময়। বন্যার পানি নামতে শুরু করলে জগন্নাথের কুড়ার ভয়ংকর পিশাচটার পিঠে ভর দিয়ে ভেসে ওঠে সে।

ছোটভাই মাদু কলাগাছের ভেলায় চেপে জগন্নাথের কুড়ায় গিয়েছিল আসলে বড় মাছ ধরা বড়শি ফেলতে। বিলের পানি বাড়লে বাড়ির কলাগাছ কেটে ভুড়া বানিয়েছে সে। ঘরের সাথের জলাভুঁইখান থেকে ভুড়ায় চেপে বিলের মাঝখানে আসতে পারা সমুদ্র বিজয়ের মতো আনন্দ। এই আনন্দ লুটের জন্য গাঁয়ের চ্যাংড়ারা, এমনকি কখনওবা ঢোঁড়ার মতো বড়রাও মাদুর ভুড়া দেখলে বিলের মাঝে চলে যায়। মাদু ভুড়া দখলে রাখতে এবং মাছ শিকারের নেশাতেও বটে, ভুড়া নিয়ে সারাদিন প্রায় বিলেই থাকে। বড় বড়শি কুড়ার ধারে গাঁথতে বিলের পশ্চিমে গিয়েছিল সে। সেখানে কুড়ার ধারে যে পিতরাজ গাছ, তার নিচের দিকে পাতা ও দলের মধ্যে গরুর ভুঁড়ির মতো জিনিসটা ভাসতে দেখে কুড়ার মাশানটার কথা ভেবে যথারীতি ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সেই ভুঁড়ির সঙ্গে বড় বোয়ালমাছের মতো সজীব প্রাণীকে নড়তে দেখে হাতের লম্বা লগিটা দিয়ে ভুঁড়িটায় গুঁতো মেরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন ভেসে উঠেছে বাণ্টুর লাশ, ভাইয়ের মুখ চিনতে পেরে মাছ ভুড়ায় কাঁপতে শুরু করেছিল। সেই সময় ঢোঁড়ার বউকে বিলের ধারে পানি ভেঙে হাঁটতে না দেখলে মাদুর অবস্থাও হয়তো ভাইয়ের মতোই হতো।

ঢোঁড়া ও মাদু ভেলায় করে মুক্তিফৌজ বাণ্টুর লাশ বাড়িতে এনেছে। তিনদিন বিলের পানি খেয়ে লাশটা ফুলে উঠেছে, কিন্তু মুক্তিফৌজের জামাটা গায়েই আছে এখনো। ঢোঁড়া ও মাদু ধরাধরি করে বাণ্টুকে বাড়ির উঠানে শুইয়ে দেওয়ার আগেই তো বাণ্টুর মা, তার সঙ্গে ঢোঁড়ার তালাকি বউয়ের গলায় বাণ্টুর ঘরে ফেরার খবর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তার ওপর লাশ উঠানে নামিয়ে ঢোঁড়া মাদুকে বলে, 'তুই দৌড় দিয়া ভুঁইয়াবাড়িতে যায়া আগে খবরটা দে, মুই শেখের মামুর কাছে যাঁও।'

ঢোঁড়া ও মাদু গ্রামে ছোটাছুটি শুরু করার আগেই আছিমন মুক্তিফৌজ ছেলের সঙ্গে যেভাবে চিৎকার করে কথাবার্তা শুরু করেছে, তা শুনে ঘরের পোষা হাঁস-মুরগি ও গাছের পাখিরাও ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। বাণ্টুকে দেখতে তাদের বাড়ির দিকে ছুটে আসতে শুরু করে লোকজন।

এ সময় মানিক তার জাগরণী সংঘের চার যুবক সদস্যকে নিয়ে রিলিফ বিতরণের কাজ করছিল তিস্তার বাঁধরাস্তায়। বানের পানি কমতে শুরু করলেও চরাঞ্চলের বানভাসি মানুষ অপেক্ষা করছিল আসলে রিলিফ পাওয়ার আশায়। নানাবাড়ি ছাড়াও এলাকার কিছু গেরস্তবাড়ি থেকে মানিক মাত্র ত্রিশ সের চাল জোগাড় করতে পেরেছে। এইটুকু রিলিফ তো তপ্ত বালুচরে কয়েক ফোঁটা পানির মতো নিঃশেষ হয়েছে, তার পরও বন্যার্তদের জন্য বানের পানির মতো অপরিমেয় সহানুভূতি নিয়ে বিপন্ন মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলছিল সে। সরকারি রিলিফ না পাওয়ার অভিযোগ, পাওয়ার আশায় নানা আবদার, শেখ মুজিব থেকে শুরু করে পিতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, ইন্ডিয়া পানি ঠেলে দিয়ে বড় বান ঘটানোর সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে দুর্গত মানুষগুলোকে কথাবার্তা বলে সাহস ও সান্ত্বনা যতটুকু দিচ্ছিল, তার চেয়ে নিজেই সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছিল বেশি। ঠিক এ সময় অচেনা একজন জিজ্ঞেস করে, 'ও বাহে চেয়ারম্যানের বেটা, তোমাগো মুক্তিফৌজ বাণ্টুরে বলে জগন্নাথের মাশানে মাইরা ফেলল। ভুঁইয়া চেয়ারম্যানও নাকি দেখতে গেছে।'

রতনপুর থেকে নানাবাড়ির দূরত্ব যত, বাঁধরাস্তা ততটা দূরে নয়। দশ কান ও মুখ ঘুরে বাণ্টুর মায়ের কান্না মানিকের কানে পৌঁছতেও সময় লাগে না। সঙ্গী যুবকদের নিয়ে সে বাড়ির দিকে ছোটে। চারদিকের ক্ষেতে পানি বলে ভুঁইয়াবাড়ির সামন দিয়েই যেতে হবে বাউদিয়া-বাণ্টুদের বাড়ি, কিন্তু নিজ বাড়িতে ওঠার বদলে মানিক লোকজনের ছোটাছুটি ও মরাকান্না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসরণ করে বাণ্টুকে দেখতে যায় আগে।

বাণ্টুকে দেখতে আসা কৌতূহলী ভিড়ের সামনে স্বয়ং সজব ভুঁইয়াও উপস্থিত। বাণ্টুর লাশ পচা মাছের মতো গন্ধ ছড়াচ্ছে। তারপরও বাণ্টুর মুখখানা শেষবার দেখে, এই পরিণতির কার্যকারণ নিয়ে লোকজনের কণ্ঠে নানারকম মন্তব্য শোক ও মৃত্যুর রহস্য ঘন করে তোলে।

'মাদুর মতো বড় মাছ ধরতে বাণ্টু কুড়ায় নেমেছিল বলেই কি কুড়ার মাশানে এই কাণ্ড করেছে? কিন্তু ভালো করে দেখ বাণ্টুর গলায় একটা গর্ত, এই গর্ত ছুরি লেগেও হতে পারে, গুলি লেগেও হতে পারে। মাছ ঠুকরেও করতে পারে। তিনদিন আগে বাণ্টুকে মুক্তিযোদ্ধা আম্বার ও আরো তিনজন অচেনা মুক্তিযোদ্ধা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। মানিক ভাইজান রিলিফ দেওয়ার জন্য ডেকেছে শুনে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। সেই রাতে ঢোঁড়ার বউ নাকি বিলের কাছে অদ্ভুত এক শব্দ শুনেছিল, শব্দটা গুলির শব্দ নাকি শকুনের কান্নার শব্দ ঠিক সে বলতে পারবে না, তবে আওয়াজ শুনে বন্যা এবারের বড় গজব হয়ে ওঠার ভয়টাই তার মনে জেগেছিল। মুক্তিফৌজ আম্বারকে গতকালও ভুঁইয়ার কাছারিঘরে দেখার কথা বলে অনেকে।

ঢোঁড়ার ঘরের দাওয়ায় পিতাকে ঘিরে বেষ্টিত ভিড় ও ভিড়ের মন্তব্য এড়িয়ে মানিক বাণ্টুকে দেখার জন্য সরাসরি তাদের উঠানের ভিড়ে আসে। তাকে দেখে ভিড়ের মহিলারা সরে দাঁড়ায়। ছেলের লাশের পাশেই শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল বাণ্টুর মা। মানিককে দেখে নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় যেন। মানিকের পায়ের ওপর আছড়িয়ে পড়ে বলে, 'ও বাজান, তোমার ডাক শুনিয়া মোর মুক্তিবেটা জগন্নাথের কুড়ার তলে গেল ক্যানে? কাঁয় মোর মুক্তিবেটার এই দশা করলে রে বাবা? তোমার বাপ যদি বাড়ি হইতে বাইর করি না দিত, তা হইলে কি মোর বেটার এই দশা হয় আইজ?'

ভিড়ের উৎক্ষিপ্ত শোক, ক্ষোভ ও বিশ্লেষণাত্মক নানামুখী মন্তব্য ছাপিয়ে মুক্তির মায়ের কণ্ঠ আবার মুখর হয়ে উঠলে সজব ভুঁইয়া আবার লাশের কাছে এগিয়ে যায়, 'মুক্তিফৌজ হওয়ায় ওকে চাকরের মতো কামকাজ করায় নিই নাই, সম্মান দেখাইতে স্বাধীন করি দিছিলাম। কার জন্য হামার মুক্তি বাণ্টুর এই দশা সে বিচার পরে হইবে। এখন লাশের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ঢোঁড়া, ও নজিবর, আমার কাছে টাকা নিয়া তোরা দাফনের কাপড় কিনি আন, কবর খোঁড়। মুক্তিফৌজের দাফন-কাফনে যাতে কোনো অমর্যাদা না হয়, তার সব ব্যবস্থা কর তোরা।'

পিতার সিদ্ধান্ত শুনে একটিও কথা না বলে মানিক চুপচাপ ভিড় কাটিয়ে বাড়ির দিকে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে টানা ২১ দিন পর বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে মানিক। ধূমপানের অভ্যাসটা এতদিনে রপ্ত হয়েছে বলে পকেটেও সিগারেটের প্যাকেট রাখে মানিক। নিজের বিছানায় শুয়ে নিজের উদ্‌গিরণ করা ধোঁয়ার মধ্যে কী দেখে আর কী ভাবে, মানিকও ঠিক স্পষ্ট বলতে পারবে না। ছোট বোন বিউটি ঘরে আসে। চোখে ওড়না চেপে জিজ্ঞেস করে, 'বাংটুকে কে মেরে ফেলেছে ভাইজান?'

'বাংটুকে তুই কি ভালোবাসতিস রে বিউটি?'

ভাইয়ের অদ্ভুত দৃষ্টি দেখে ও ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে বিউটির চোখে পানি উছলায়।

'বাংটু কি তোকে ভালোবাসার কথা বলেছিল কখনো? বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল?'

এমন শোকের মধ্যেও ভাইয়ের ভালোবাসা নিয়ে গবেষণা করার ধৈর্য দেখে বিউটি নতুন করে যেন চমকে ওঠে। ওড়নায় চোখ মুছে স্বাভাবিক জবাব দেয়, 'না ভাইজান। আমাকে নাকি হান্নান মুক্তি একটা চিঠি দিতে চেয়েছিল, সেই চিঠি ও নেয় নাই। মুক্তিরাও নাকি আমাকে বিয়া করার কথা বলেছিল ওকে। বাংটুর আসলে কোনো দোষ নাই ভাইজান। ছোট্ট থেকে ও তো এ বাড়িরই খেয়েপরে মানুষ, আব্বা ওকে বের করে দেওয়ায় ও ভীষণ কষ্ট পেয়েছে।'

'হুম। ঠিক আছে তুই যা, আব্বা বাড়িতে ফিরলে বলিস, আব্বার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

বিউটি যেন ভাইয়ের পাশে আরো কিছু সময় কাটাতে চায়।

'ঢাকা থেকে মামা এসেছিল।'

'হ্যাঁ, তার বাবার বাড়িতে থাকতে পারব না, কাজী চেয়ারম্যান সেই হুকুম দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিল।'

'আব্বা ঢাকা গিয়ে মামার বাসাতেও গিয়েছিল ভাইজান।'

'জানি, তুই যা। আব্বা আসলে বলিস।'

আসলে নিজের বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না বলেই বোনকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে আবার সিগারেট জ্বালে সে।

বাড়িতে ফিরে সজব ভুঁইয়াই আজ ছেলেকে নিজের ঘরে ডেকে নেয়।

'বাংটুর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আসলাম। জোহরের পরই জানাজা ও মাটি হবে। তুই থাকবি অবশ্যই।''

'বাংটুর মৃত্যু তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয় আব্বা। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থানায় কেস দিতে গেলে নিয়ম অনুযায়ী বাণ্টুর লাশ পুলিশ নিয়ে যাবে পোস্টমর্টেম করার জন্য। তাছাড়া বাণ্টুর মা বাদী হয়ে কেস দিলে তো তোকেই এক নম্বর আসামি করে কেস দেবে, কারণ তুই তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে বাণ্টু গুম হয়েছে। তারপর কে তাকে খুন করল না কুড়ার মাশানে গলা টিপে মারল সেসব তদন্ত করে পুলিশ কী রিপোর্ট দেবে, সেটা তো তুই ঠিক করতে পারবি না, পুলিশও ঠিক করবে না — যারা প্রচুর ঘুষ দিতে পারবে, ক্ষমতা দেখাতে পারবে, তারাই সেটা ঠিক করে দেবে। বাণ্টুর মায়ের কী সেই ক্ষমতা আছে?'

পিতার শান্ত-স্বাভাবিক মূর্তি এবং দৃঢ় যুক্তি শুনে মানিকের শোকবিহ্বল দশা মুহূর্তেই যেন কেটে যায়। উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দেয় সে, 'বাণ্টুর এভাবে খুন হওয়ার জন্য আপনিও দায়ী আব্বা। আপনাদের থানা-পুলিশ এটা প্রমাণ করতে না পারুক, কিন্তু আমি গ্রামে সবার কাছে প্রমাণ করে দেব — কে বাণ্টুর আসল খুনি।'

আড়ালে বাপকে 'রিলিপচোর' হিসেবে গাল দেওয়ার কথা তার দলের ছেলেদের কাছেও শুনেছিল ভুঁইয়া, বিশ্বাস হতে চায়নি। কিন্তু আজ নিজের কানকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। ভবিষ্যতে এই ছেলের সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকবে, তা আজ নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে চূড়ান্ত প্রশ্নটি করে।

'আমি তোর জন্মদাতা পিতা, এটা মানিস তো?'

মানিক চুপ করে থাকলে ভুঁইয়া শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে থাকে।

'বাড়ির পোষা কুত্তা-বিলাই মরলেও খারাপ লাগে। বাণ্টুটার এই পরিণতি, আমারও খারাপ লাগছে মানিক। কী কারণে কে তাকে খুন করল, সেটা তুই তদন্ত করে বের করতে পারলে আমিও খুশি হব। কিন্তু কথা হলো নিজের কাজ ফেলে তুই এসব করার জন্য গ্রামে আর কতকাল থাকবি ঠিক করেছিস? ওদিকে শুনলাম, নানার সম্পদ নয়ছয় করছিস বলে আমিন বাড়িতে এসে তোকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলেছে।'

'আপনি বাণ্টুকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। আমিও আমার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেব আব্বা।'

'গ্রামের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছিস। স্বাধীন হয়ে দেশে মানুষের যত চাহিদা, তা একা শেখ মুজিব কেন, দশজন শেখ মুজিব এক হলেও শুধু রিলিফ দিয়ে কি এই ব্যাপক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব? সরকারের হাতে টাকা নেই, একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ওপর পুরো দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। শুনেছিস তো সেদিন রংপুর থেকে ফেরার সময় ভর সন্ধ্যায় হাইজ্যাকাররা সাত দরগায় আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, আমাকে খুন করার জন্যই হয়তো ফাঁদ পেতেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা। ছিনতাইকারীদের মধ্যে মুখোশ পরা এই ইউনিয়নেরও কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলে আমার বিশ্বাস। কয়েকজন মুক্তি ডাকাত দলে যোগ দিয়েছে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।'

'বাণ্টু ডাকাতি করার মতো ছেলে না। ডাকাতি-লুটপাট যারা করছে, সেইসব মুক্তিযোদ্ধা আপনার পেছনে, আপনার সঙ্গে আছে।'

ভুঁইয়ার ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন হাসি ফোটে, জবাব দেয় সে, 'গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল করছিস বলে গ্রামের মানুষকে কি আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস? গ্রামে আরো দশ বছর বাস করলেও ভিলেজ পলিটিক্স তুই বুঝবি না মানিক। বাণ্টুর এই পরিণতির জন্য তুই আমাকে দায়ী করছিস, কিন্তু গ্রামের পাবলিক তোকেই একদিন এক নম্বর আসামি হিসেবে প্রমাণ করবে বলে রাখলাম আমি। তোর মতো কিছু কমিউনিস্টের আস্কারা পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন দেশে বিপ্লবের নামে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, দেশে অশান্তি-অরাজকতা সৃষ্টি করছে।'

মানিক তো গ্রামে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার জন্য কাজ করছে না, তবে পিতা যদি তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য নয় সে। জবাব দেয় সে, 'আমি রাজনীতি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'রাজনৈতিক আলোচনার জন্য আমি তোকে ডাকি নাই মানিক। তুই গ্রামে থেকে নিজের জীবনটা এভাবে আর নষ্ট করিস না বাবা। এমনিতে বাড়িতে কোনোদিন যে ডাকাত পড়ে, সেই ভয়ে আমি রাতে ভালো ঘুমাতেও পারি না। তার ওপর আমার ভয় হচ্ছে, বাণ্টুর মতো খুন-খারাপির ঘটনা আরো ঘটবে।'

'বলেছি তো, আমাকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আমার সিদ্ধান্ত আমি নেব।'

'বাড়িতে আসার সময় হয় না তোর, আবার শুনি হিন্দুটাড়িতে বাবুর বাড়িতে গিয়েও রাত কাটাস। পরেশের বিধবা বউকে জড়িয়ে লোকজন তোর নামে নানা কথা বলতে শুরু করেছে। বাপ হয়ে তোর মতো আদর্শবান ছেলে সম্পর্কে এসব কথা শুনতে কি ভালো লাগে আমার?'

মানিক এবার এতটা উত্তেজিত বোধ করে যে, প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না। বালক বয়সে, মায়ের মৃত্যুর পর এই লোকটা যখন দ্বিতীয় বিয়ে করে, মনে হয়েছিল পৃথিবীর মধ্যে বাবাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী। সেই ঘৃণাবোধ যেন এতদিন পরও মুছে যায়নি। বাবার দিকে তাকায় সে, ইচ্ছে হয় জোর গলায় জানিয়ে দেয়, 'মালতীকে সে ভালোবাসে, ভালোবাসার মধ্যে বদনামের কিছু নেই।' কিন্তু প্রেমের এমন দুঃসাহসী নায়ক হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্যতা নেই বলেই হয়তো, কিংবা হতে পারে বাবার সঙ্গে এমন নাটকীয় ব্যবহার করার অক্ষমতার কারণেও, মানিক মাথা নিচু করে নীরব থাকে।

'তুই ঢাকায় ফিরে যা মানিক, ইউনিভার্সিটিতে ফিরে পড়াশোনা শুরু কর আবার, টাকা-পয়সার কোনো সমস্যা হবে না।'

'আমি তো বলেছি আব্বা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ভালো-মন্দ বোঝার বয়স হয়েছে আমার।'

মানিক চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়, কিন্তু তার আগে সজব ভুঁইয়া চেয়ার থেকে উঠে এসে ছেলের হাত চেপে ধরে। কৌশলে হোক, আর আন্তরিক আবেগবশেই হোক, কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে।

'শোন বাবা, নিজে বাবা হওয়ার আগে বুঝতে পারবি না সন্তান বাপের কাছে কী। কোনো বাপ ছেলের কখনো অমঙ্গল চায় না। তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন, কত গর্ব আমাদের। তোর নানা তোর নাম মোহাম্মদ আলী মানিক রেখেছিল, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো দেশের নামকরা মানুষ হবি বলে। কত আশা নিয়ে ঢাকায় পড়তে পাঠালাম তোকে। পড়াশোনা যদি আর সত্যি ভালো না লাগে, তবে চাকরি কর, চাকরি করতে না চাইলে ব্যবসা কর। মিনিস্টার সাহেবের সঙ্গে কথাও বলেছি আমি। তোকে দেখা করতে বলেছেন। চাকরি বা ব্যবসার জন্য লাইসেন্স পারমিটের ব্যবস্থা উনি করে দেবেন। তোর রোজগারের টাকা আমি খেতে চাই না মানিক। বিউটিটারও গ্রামে থেকে লেখাপড়া হবে না, ঢাকায় বাসা নিয়ে ওকেও নিয়ে যা। তুই নিজে মানুষ হিসেবে দাঁড়া, এই জন্য তোকে বাবা হয়েও আজ হাতজোড় করছি আমি।'

বাবার চোখের পানি হাতে পড়ার পরও মানিকের অস্বস্তি হয়, হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় আরো, কিন্তু বাবার মতো তা বেদনার অশ্রুতে গলে যায় না। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুপচাপ ঘর থেকে, তারপর একসময় বাড়ি থেকেই আবার বেরিয়ে যায় সে।

পঁয়তাল্লিশ

বাণ্টুর জানাজা ও কবর হয়ে যাওয়ার পর ভুঁইয়ার পিছে পিছে গ্রামবাসীরাও চলে যেতে থাকে। মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে যায় নামাজিরা। সাঁঝবেলা কবরের কাছে বাণ্টুর শোকার্ত মায়ের পাশে বসে থাকে মানিক। মানিক আছে বলে ঢোঁড়া, নজিবর ও মানিকের সংঘের দুই যুবক এবং বাণ্টুর মাকে ঘিরে পড়শী মহিলারাও আছে। নজিবর বলার আগে তার স্ত্রী আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরাবাড়ির জন্য ভাত রেঁধে এনেছে। সারাদিন খায়নি বলে মাদু ও হেপি-টেপিকে ঘরে বসিয়ে খেতেও দিয়েছে। ভাতের সঙ্গে একটুখানি বেগুনভাজি। তাই দিয়ে ভাত মুখে নিয়ে হেপি অভিযোগ করে, 'ও বাহে চাচি, কী তকাই দিছেন এগুলি — ঝাল নুন কিছু হয় নাই।' এত শোকের মধ্যেও তরকারির ঝাল-নুন নিয়ে আক্ষেপ করার জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীন হেপিকে যেমন ধমক দেয় না কেউ, তেমনি বাংটুর মাকে এক মুঠ খাওয়ার অনুরোধ করারও সাহস হয় না কারো।

বাংটু দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার বীভৎস লাশের উৎকট গন্ধটাও দূর হয়েছে। কবরের কাছে ধূপ জ্বেলে দিয়েছে নজিবর। সেই ধূপের গন্ধ মিলিয়ে যাওয়ার পরও উপস্থিত সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসে বাংটুর টাটকা স্মৃতি হালকা সুবাস ছড়ায়। সেই সুবাসকে আরো জীবন্ত করে তোলার জন্য বাংটুর ভালোমানুষি ও গুণপনা নিয়ে স্মৃতির ফুল তুলতে থাকে সবাই। মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বাংটু যেসব অপারেশন চালিয়েছে, সেসব শোনা গল্পের কথাও স্মরণ হয় সবার। মানিক উপস্থিত বলে মানিকের সঙ্গে বাংটুর সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে মানিকের ডাক শুনেই রাতে না খেয়েই বাড়ি থেকে তার চিরদিনের জন্য বেরিয়ে যাওয়ার গল্পটা ঘুরেফিরে স্মরণ করে অনেকে। ঢোঁড়া এমনভাবে কথা বলে যেন বাংটু পাশের ঘরেই জীবিত এখনো।

'হামার বাংটুর মতো সাহসী চ্যাংড়া এ দুনিয়ায় আর একটাও নাই বাহে। রাইতত খাওয়ার কিছু নাই দেখি মাকে কয়, যুদ্ধ করি দেশখান স্বাধীন করছি আমরা, আর মুই বাঁচি থাকতে তোমাকে উপাস খাটাইবে কোন শালা? কান পাতিয়া খালি মুই মুক্তি আর মুক্তির মায়ের কথাবার্তা শোনো। উয়ার কথাবার্তা শুনলে ভোকও পালায় বাহে।'

স্বামীর শোকশূন্য মন্তব্য শুনে ঢোঁড়ার বউ কান্নার কণ্ঠে বলে, 'মোকে ঘরত তুলিয়া নিজে কবরত গিয়া ঢুকলু বাবা! খাইতে দিতে না পারিয়া তোর চাচা যদি মোকে ফের বাড়ি থাকি বাইর করি দেয়, কাঁয় মোকে আশ্রয় দেবে?'

ভিড়ের মধ্যে কেবল বাংটুর মা এখন কপালে হাত দিয়ে নিস্তব্ধ। আর তাকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা না থাকার কারণেই বোধহয় মানিকও নীরব। বাংটুর খুনিকে খুঁজে শাস্তি দেওয়ার অঙ্গীকারের দৃঢ়তায়, নাকি বাংটুর খুনিদের বিচার করার অক্ষমতা বোঝাতেই মানিক বাংটুর মায়ের পাশে আশ্চর্যরকম নীরব ও গম্ভীর থাকে বুঝতে পারে না। সন্ধ্যার পরই রাত আজ বেজায় কালো হয়ে উঠছে। আঁধারকে ঠেকা দেওয়ার জন্য ঢোঁড়া ও আছিমনের ঘরে কেরোসিনের কুপি নেই। ফলে মেঘে ঢাকা আকাশ দ্রুত রাতকে ঘন করে তোলে। ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হলে ছিপছিপে বৃষ্টিও শুরু হয়, তখন নজিবরের বউ আছিমনকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। ঢোঁড়া মানিককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশ করে বলে, 'বাংটুর দুঃখে আসমানে আল্লাহও মনে হয় কাঁদা শুরু করল বাহে। হামার আর কাঁদন দেখে কাঁয়। ঝরিতে ভেজার বদলে মোর ঘরত আসিয়া বইস বাহে। আঁধারত বসিয়াই একনা গুয়া পান খাও।'

নজিবর মানিকের কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'যাও বাবা এলা বাড়িতে যাও, আর চিন্তা করিয়া কী লাভ। ওপরে হকের হাকিম আছে একজন। ন্যায্য বিচার তাঁয় একদিন করবেই।'

মানিক উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছে নীরবে বিদায় নিয়ে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে মানিক যখন বাবুবাড়ির উঠানে পৌঁছয়, তখন জামাকাপড়ও ভিজে পানি ঝরাচ্ছে। এ বাড়িতে এলে আজকাল নরেশের ঘরে নরেশ বা তার স্ত্রীকে খোঁজে আগে। কিন্তু আজ মালতীর সঙ্গে জরুরি কথা বলার জন্য মানিক পরেশের মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বেপরোয়া কণ্ঠে ডাকে তাকে, 'ও দাদি, দাদি, দরজা খোলেন।'

দরজা খুলে দেয় মালতী। শিবুকে নিয়ে তার শাশুড়ি আসে বারান্দায়।

'কী হয়েছে মানিক?'

'কিছু হয় নাই। নরেশ কাকা তো বাজার থেকে ফেরে নাই বোধহয়?'

'না, ফেরেনি এখনো।'

মানিক এবার পরেশের মায়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, 'ও দাদি, বাংটুকে কবর দিয়ে আসলাম। যুদ্ধের সময় শত্রুরা মানুষকে পাখির মতো গুলি করে মারল। যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করল, স্বাধীন দেশে তারা এভাবে খুন হয়ে যাবে এটা আমি মানতে পারছি না দাদি। আমার মন ভীষণ খারাপ। নানাজি তার বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দেবে, এদিকে আব্বাও বাড়িতে থাকতে দেবে না আর। আজ রাতটা আপনাদের বাড়িতেই থাকব।'

এর আগে মানিক প্রস্তাব দেওয়ার আগেই তো এ-বাড়ির সবাই মানিককে সানন্দে রাতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছে। কিন্তু আজ বিপদের কথা বলে আশ্রয় চাওয়ার পরও বুড়ির মুখ ভার। মানিকের বৃষ্টিভেজা চেহারা দেখেও তেমন উতলা হয় না বুড়ি। কারণটাও বেজার মুখে জানিয়ে দেয়, 'তোর বাপ আসছিল ওদিনকা। তুই যাতে এ বাড়িতে না আসিস, গ্রামেও আর না থাকিস, সে জন্য তোকে বুঝসুঝ দিয়া ঢাকা পাঠাইতে অনুরোধ করছে হামাকেও। হতভাগী বউটা তোকে তো আপন সন্তানের মতোই জ্ঞান করে, কিন্তু মানুষ হারামজাদা তা নিয়াও কত কথা কয়।'

মালতী একটা গামছা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'ভিজে গেছ একেবারে। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা, নরেশের ঘর থেকে একটা তবন এনে দেন তো। বৃষ্টি কমেছে, যান।'

বুড়ি বউয়ের নির্দেশমতো শিবুকে কোলে নিয়ে ভেজা আঙিনায় নেমে গেলে মালতী আবার চাপা কণ্ঠে জানতে চায়, 'কী হয়েছে তোমার?'

'শোনো, তোমার সঙ্গে অনেক জরুরি কথাবার্তা বলতে হবে। আমি এ জন্যই বাড়িতে থাকতে চাইছি। রাতে যদি চুপি চুপি ও ঘরে আসতে না পারো, তাহলে সবার সামনে বলতে বাধ্য হব। তোমাকেও সবার সামনে হ্যাঁ বা না বলতে হবে।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি। তুমি বারান্দায় একটু দাঁড়াও, আমিও নরেশের ঘর থেকে আসি।'

মানিককে ঘরে একা বসিয়ে রেখে মালতীও নরেশের ঘরের দিকে ছুটে যায়। শাশুড়ি ও জায়ের সঙ্গে কী আলোচনা হয় কে জানে, ফিরে আসে একা। হাতে একটা শুকনো লুঙ্গি। হ্যারিকেন ও চাবি হাতে নিয়ে বলে, 'চলো আমাদের ঘরে। মাকে তোমার জন্য খাবার রেডি করতে বললাম। সারাদিন তো বোধহয় কিছু খাওনি। বাণ্টুকে কবর দেওয়া নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত ছিলে শুনলাম।'

তালা খুলে ঘরে ঢুকেই মালতী মানিককে সতর্ক করে, 'সবাই আমাদের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তারপরও তুমি যদি আজ এ বাড়িতে থাকো, আর রাতে আমি এ ঘরে আসি, বাণ্টুর মতো আমাদের দুজনকেই খুন হতে হবে।'

'আমার ভেতরে ঝড় বইছে মালতী। আজ জীবনের বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে জন্য তোমার সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলা দরকার। খুবই জরুরি কথা।'

'কী তোমার জরুরি কথা এখনই বলো। পরে হয়তো চোরের মতো এ ঘরে আসতে ভয় করবে আমার। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। শিবুর দাদি টের পেলে আমাকেও কুলটা অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'মালতী, আব্বা বলে দিয়েছে কালকের মধ্যে আমি ঢাকা না গেলে বিপদ হবে। শেষ পর্যন্ত আমাকে হয়তো গ্রাম ছাড়তেই হবে।'

'আমিও তো তাই চাই মানিক। তুমি ঢাকা ফিরে গিয়ে আবার মন দিয়ে লেখাপড়া করো, তারপর চাকরি-বাকরি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। তারপর দেশের জন্য যা ইচ্ছে করিও।'

'আর তোমার জন্য?'

'আমার জন্য কী করবে তুমি? আমার পোড়া কপালের জন্য তুমি তো দায়ী নও। তুমি বরং শিবু আর আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

'তোমাকে বাদ দিয়ে আমি আর কিছু ভাবতে পারি না মালতী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার কথা এত ভাব কেন? ভেবে কী লাভ?'

'শোনো, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি — ঢাকা যাব, তবে একা নয়। শিবুকে নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। ঢাকাতেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকব আমরা, একসঙ্গে নতুন জীবন শুরু করব। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর পর ফিরে আসব আবার।'

'যা হবার নয়, তা বলে আমার কষ্ট বাড়াও কেন মানিক?'

'কেন হবে না? আজ সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে ভালোবাস না?'

'একবার দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে তোমার কাকাকে হারিয়েছি। আবার তোমার সঙ্গে পালাতে গিয়ে বাপের ভিটার ওপর শিবুর অধিকার আমি হারাতে চাই না। একজনের জন্য কাঁদছি, বাকি জীবনটা না হয় তোমার জন্যও ডবল কাঁদব।'

মালতীর কান্না তার কথা ও চোখ ছাপিয়ে টলমল করতে থাকে। মানিক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলে, মালতী হঠাৎ সবেগে মানিকের গলা জড়িয়ে ধরে, একই সঙ্গে অশ্রু ও ভালোবাসা বর্ষণ করে পাগলের মতো, মানিক মালতীর ঠোঁটের স্পর্শ নিজের গালে, কপালে এবং ঠোঁটে পায়। বুকের মাঝে ধরা দিয়েও মালতী কান্নাভেজা চাপা কণ্ঠে অনুরোধ জানায়, 'তুমি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাও মানিক। তুমি এ বাড়িতে এলে বাণ্টুর মতো তোমাকেও মরতে হবে, আমারও পায়ের তলায় মাটি থাকবে না।'

এ সময় মালতীর শাশুড়ির কণ্ঠ ভেসে আসে, 'ও বউমা, খাবার রেডি হয়েছে, তুমি এসে নিয়ে যাও।'

সবেগে যেমন জড়িয়ে ধরেছিল, তেমনি ঝটিতি আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে নিজেকে সামলে নেয় মালতী। চোখ মুছে ভেজা কণ্ঠে শেষ কথা বলে, 'তুমি ঢাকা চলে যাও মানিক। আমিও আগামী মাসে অনেক দিনের জন্য বাপের বাড়ি যাব।'

মানিককে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হ্যারিকেন হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে মালতী চেঁচিয়ে শাশুড়িকে ডাকে, 'ও মা, অঞ্জনাকে নিয়া আগে এ ঘরে আসেন তো। দেখেন আপনার নাতি কী বলে।'

শাশুড়ি ও জা এ ঘরে এলে মালতী হেসে বলে, 'আপনার পাগল নাতি কেন এসেছে জানেন? তার বাপ কালকের মধ্যে ঢাকা চলে যেতে বলেছে। কিন্তু মানিক যেতে চায় না, পড়তেও চায় না। বলে যে, ও গেলে আমার ও শিবুর কী হবে। আপনি এ পাগল ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে বলেন তো। আমি একটা ডিম ভেজে ভাত নিয়ে আসি।'

নরেশের মা এবং বউ অবাক চোখে একবার মানিককে দেখে, পরক্ষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতীকেও দেখে। মালতী কাঁদছে। মানিক তাদের কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে, 'আমি বাড়িতে ভাত খেয়ে এসেছি। বৃষ্টি কমেছে, আমি চললাম। আপনাদের বাড়িতে আর আসব না।'

মালতীর হাতের গরম ডিমভাজা খাওয়া হয় না আর। তার কাছে শেষ বিদায় নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না মানিক। ঝড় থেমে গেলেও প্রায় ঝড়ের বেগে বাবুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

পরদিন সকালের ট্রেন ধরার জন্য খুব ভোরে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মানিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির কেউ টের পায় না। কারো কাছে বিদায় নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না। বিউটিকে শুধু রাতে বলেছিল, 'আমি কালকেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব রে, তুই ভালো থাকিস।' কোথায় যাবে মানিক, কেন যাবে, কবে আসবে আবার — বোনের এসব কৌতূহল ও কান্নার কোনো দাম দেয়নি। বাড়ির কেউ জেগে ওঠার আগে, গ্রামবাসী কারো চোখে ধরা পড়ার আগেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য জোরপায়ে হাঁটে সে।

তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্য বিলের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় বাণ্টুদের ছোট্ট বাড়িটা দেখে বুক ছমছম করে মানিকের। ভোরের আবছা আলোতেও চোখে পড়ে বাণ্টুর কবরের পাশে দাঁড়ানো মনুষ্যমূর্তি। যেন কবর থেকে বাণ্টুর ভূত মানিকের পথ রোধ করে চেঁচিয়ে বলবে — ভাইজান তোমরা কোন্ঠে পালান?

ভূত নয়, বাণ্টুর কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তার মা আছিমন। রাতের ঝড়বৃষ্টিতে কবরে পানি ঢুকেছে কি না, বাণ্টু নিরাপদে শুয়ে থাকতে পারছে কি না — তাই পরীক্ষা করছে যেন। মানিককে দেখে আছিমন ছুটে আসে, পথরোধ করে দাঁড়ায়, কান্নাভাঙা কণ্ঠে জানতে চায়, 'ও বাবা, মোর মুক্তিযোদ্ধা বেটার খুনের বিচার না করিয়া তোমরা কোন্ঠে যান?'

এখন কী জবাব দেবে মানিক? আছিমনের কান্নায় শরিক হওয়ার বদলে, মুখ ঘুরিয়ে সে সামনের রাস্তা ও জগন্নাথের বিলের দিকে তাকায়। ভোরের সূর্যালোকে পাওয়ার জন্য বুক চিতিয়ে যেন উন্মুখ হয়ে আছে নিথর বিলটা। মানিক বাণ্টুর মায়ের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমি আবার ফিরে আসব চাচি।'

বিদায়ের আগে এইটুকু প্রতিশ্রুতি ছাড়া মুক্তির মা আছিমনকে আর কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না মানিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~